তফসীরে
মা'আরেফুল
কোরআন

চতুর্থ খণ্ড

তফসীরে

মা'আরেফুল কোরআন

চতুর্থ খণ্ড

[সূরা আ'রাফের ৯৪ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত এবং
সূরা আনফাল, সূরা তওবা, সূরা ইউনুস ও সূরা হুদ পর্যন্ত]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (চতুর্থ খণ্ড)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত

ইফা প্রকাশনা : ৬৮৮/৮
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0120-2

দ্বিতীয় সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৮৫

নবম সংস্করণ
নভেম্বর ২০০৯
কার্তিক ১৪১৬
জিলকদ ১৪৩০

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৮৪.০০ টাকা

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN. 4th Vol. : Bangla version by Maulana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Maareful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 November 2009

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundaton.org.bd

Price : Tk 284.00 ; US Dollar : 8.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানি কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবত জ্ঞানের সুবিশাল ভাণ্ডার এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী ছিলেন বিধায় তাঁর বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ উসমান গণী (ফারুক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদকের আরয

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে 'তফসীরে-মা'আরেফুল কোরআন' চতুর্থ খণ্ডের বাংলা অনুবাদ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। সাম্প্রতিককালে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত এবং আট খণ্ডে সমাপ্ত এ সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক তফসীর গ্রন্থটির প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সুধী পাঠকগণের তরফ থেকে যেরূপ উৎসাহপূর্ণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে, তাতে অক্ষম অনুবাদক এবং যাঁরা এই বৃহৎ গ্রন্থটি যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে পাঠকগণের হাতে তুলে দিতে রাতদিন অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করেছেন, তাঁদের পক্ষে আশাতীত উদ্দীপনা অনুভব করাই স্বাভাবিক। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তা'আলার তওফীকই সকল কর্ম সমাধা হওয়ার মূল কারিকা শক্তি। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণের সীমাহীন আগ্রহের ফলেই হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ বিরাট গ্রন্থটির অনুবাদকার্য সমাপ্ত এবং অতি অল্পদিনের ব্যবধানে সব কয়টি খণ্ড প্রকাশ করার সকল সু-ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এ মহতী গ্রন্থের দ্রুত অনুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে অনেক সুধী বন্ধু আমাকে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। বিশেষত এ খণ্ডটির প্রকাশনা পর্যন্ত যাঁরা আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা আবদুল আজীজ, হাফেজ মাওলানা আবু জাফর, মাওলানা আবদুল লতীফ মাহমুদী, মাওলানা সৈয়দ জহিরুল হক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। দোয়া করি এবং সকলের দোয়া চাই, যেন আল্লাহ্ পাক এঁদের সকলের এ নেক প্রচেষ্টা কবূল করেন এবং আরও অধিকতর খিদমত করার তওফীক দান করেন। অনূদিত পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া বিশেষ যত্ন সহকারে নিরীক্ষণ করে দিয়েছেন বিশিষ্ট আলিম মাদরাসায়ে আলীয়া ঢাকার বর্তমান হেড মাওলানা জনাব আল্লামা উবায়দুল হক। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বিশেষত এই প্রতিষ্ঠানের প্রাজ্ঞ মহা-পরিচালক জনাব আবদুস সোবহান, সচিব জনাব ফিরোজ আহমদ আখতার ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ এ গ্রন্থটি প্রকাশ করার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করার ফলেই এ বিরাট কাজ সহজে সমাধা করা সম্ভবপর হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এ মহতী উদ্যোগের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন!

'মা'আরেফুল-কোরআন'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বহু সুধী পাঠক ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে অনেক মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দান করেছেন। আমরা তাঁদের এসব পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণগুলোতে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। সুধী পাঠকগণের খেদমতে আরজ, কারো চোখে এ মহতী গ্রন্থে কোন অসংলগ্নতা দৃষ্টিগোচর হলে পত্র মারফত আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَّبِیٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰی عَفَوْا
وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا
یَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤی اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَكٰتٍ
مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا
یَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤی اَنْ یَّاْتِیَهُمْ بَاْسُنَا بَیَاتًا وَّهُمْ
نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤی اَنْ یَّاْتِیَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًی وَّهُمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾
اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا یَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾ ع

(৯৪) আর আমি কোন জনপদে কোন নবী পাঠাইনি তবে (এমতাবস্থায়) পাকড়াও করেছি সে জনপদের অধিবাসীদের কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে, যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে। (৯৫) অতঃপর অকল্যাণের স্থলে তা কল্যাণে বদলে দিয়েছি। এমনকি তারা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে, আমাদের বাপ-দাদাদের উপরও এমন আনন্দ-বেদনা এসেছে। অতঃপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি এমন আকস্মিকভাবে যে, তারা টেরও পায়নি। (৯৬) আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহিযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদের পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে! (৯৭) এখনও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। (৯৮) আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার

আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে খেলাধুলায় মত্ত। (৯৯) তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে ? বস্তুত আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি (উল্লিখিত এবং সেগুলো ছাড়াও অন্য জনপদসমূহের মধ্যে) কোন জনপদে কোন নবী পাঠাইনি। (এমতাবস্থায় যে,) সেখানকার অধিবাসীদের (প্রেরিত নবীকে অমান্য করার দরুন পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দেওয়া হয়নি এবং সতর্কতার উদ্দেশ্যে তাদেরকে) আমি দারিদ্র্য ও ব্যাধিতে পাকড়াও করিনি যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে (এবং কুফরী-কৃতঘ্নতা ও মিথ্যারোপ থেকে তওবা করে নেয়)। অতঃপর (যখন তারা তাতেও সতর্ক হয়নি, তখন পালাক্রমে কিংবা এ কথা বুঝতে যে, বিপদের পর যে নিয়ামত দান করা হয়, তার মূল্য অধিক হয় এবং নিয়ামতদাতার প্রতি মানুষ স্বাভাবিকভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে) আমি দুরবস্থাকে সচ্ছলতায় বদলে দিয়েছি। এমন কি তাদের (ঐশ্বর্য ও সুস্বাস্থ্যের সাথে সাথে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতেও) বিপুল উন্নতি (সাধিত) হয়েছে। আর (তখন নিজেদের দুর্মতির দরুন) বলতে শুরু করেছে যে, (প্রথমত, সে বিপদাপদ আমাদের কুফরী-কৃতঘ্নতা ও মিথ্যারোপের কারণে ছিল না। যদি তাই হতো, তবে সচ্ছলতা আসবে কেন ? বরং তা হলো সময়ের ঘটনা প্রবাহ। সে জন্যই) আমাদের পিতা-পিতামহদের জীবনেও (এ দু'টি অবস্থা কখনও) অসচ্ছলতা, (কখনও) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। (তেমনিভাবে আমাদের উপর দিয়েও তাই অতিবাহিত হয়ে গেল। যখন তারা এমনি বিভ্রান্তিতে পড়ল) তখন আমি তাদের আকস্মিকভাবে পাকড়াও করেছি। (ধ্বংসাত্মক আযাবের আগমনের কোন) খবরও ছিল না। (অবশ্য নবীরা সংবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তারা সে সংবাদকে ভুল মনে করেছিল এবং আমোদ-প্রমোদে বিভোর হয়েছিল, সেহেতু তাদের ধারণাই হয়নি।) আর (আমি তাদের ধ্বংসাত্মক আযাবের মধ্যে পাকড়াও করেছি, তার কারণ ছিল শুধু তাদের কুফরী ও বিরোধিতা। তা না হলে) যদি সে জনপদের অধিবাসীরা (পয়গম্বরদের প্রতি) ঈমান আনত এবং (তাদের বিরোধিতা থেকে) বেঁচে থাকত, তাহলে আমি (পার্থিব ও আসমানী বিপদের স্থলে) তাদের উপর আসমানি ও পার্থিব বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। (অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং ভূমি থেকে বরকতময় উৎপাদন দান করতাম। অবশ্য এ ধ্বংসের আগে তাদেরকে সচ্ছলতাও দেয়া হয়েছিল একটা রহস্যের ভিত্তিতে। কিন্তু সে সচ্ছলতার মধ্যে বরকত না থাকার কারণে তা প্রাপ্ত নিয়ামতের পরিবর্তে জীবনের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। যেসব নিয়ামতে কল্যাণ ও বরকত থাকে, তা দুনিয়া কিংবা আখিরাত কোনখানেই বিপদরূপে গণ্য হতে পারে না। মূল কথা, তারা যদি ঈমান ও পরিহযগারী অবলম্বন করত তাহলে তাদেরকেও এসব বরকত দেওয়া হতো।) কিন্তু তারা যে (পয়গম্বরদেরই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাই আমি(-ও) তাদের (গর্হিত) কর্মের জন্য তাদের ধ্বংসাত্মক আযাবের মধ্যে নিপতিত করেছি। (উপরের আয়াতে একেই أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপর বর্তমান কাফিরদের ভর্ৎসনামূলক ভাষায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, এ সমস্ত কাহিনী শোনার) পরেও কি (বর্তমান) এই জনপদের অধিবাসীরা [যারা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে বর্তমান] এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর(-ও) আমার আযাব রাতের বেলায় এসে পড়তে পারে যখন তারা থাকবে (বিভোর) ঘুমে (অচেতন)। আর (বর্তমান) জনপদের অধিবাসীরা কি (কুফরী ও মিথ্যারোপ সত্ত্বেও যা পূর্ববর্তী কাফিরদের ধ্বংসের কারণ ছিল) এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, (সেই পূর্ববর্তীদের মতই) তাদের উপরেও আমার আযাব দিন-দুপুরে এসে পড়তে পারে, যখন তারা থাকবে নিজেদের অহেতুক খেলাধুলায় (অর্থাৎ পার্থিব কাজ-কারবারে) নিমগ্ন ? হ্যাঁ, তাহলে কি আল্লাহ্ তা'আলার এই (আকস্মিক) পাকড়াও থেকে (যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে) নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে। বস্তুত (জেনে রেখো) আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও সম্পর্কে একমাত্র তাদের ব্যতীত কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারে না, যাদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী নবীরা (আ) তাঁদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা ও স্মরণীয় ঘটনাবলী, যার বর্ণনাধারা কয়েক রুকু পূর্ব থেকেই চলে আসছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচজন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের। এ কাহিনীর আলোচনা পরবর্তী নয়টি আয়াতের পর বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হতে যাচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কোরআনে করীম বিশ্ব-ইতিহাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তার বর্ণনারীতি হলো এই যে, তাতে সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ কিংবা গল্প-উপন্যাসের মত আলোচ্য বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা না করে বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস ও গল্প-কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী সে পাঁচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ' জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়, বরং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেন তাঁদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদাপদের চাপে তারা নিজেদের গতিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয় বেশি। আর এই বাহ্যিক দুঃখ-কষ্ট প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ রাহমানুর-রাহীমেরই দান। সে জন্যই মাওলানা রুমী বলেছেন ঃ

خلق واباتو چنيں بدخو كنند - تا تراتنا چارا ورسوا كنند

উল্লিখিত আয়াতে اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ বাক্যটির মর্মও তাই। بوس ও باساء শব্দ দু'টির অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। আর ضَرَّ ও ضَرَّاءُ শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো রোগ ও ব্যাধি। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-ও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোন কোন অভিধানবিদ অবশ্য بؤس ও بأساء শব্দ দু'টির অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং ضر ও ضراء অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত উভয়বিধ অর্থেরই মর্ম এক।

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি রসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাঁদের কথা অমান্য করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অবাধ্য লোকগুলোকে পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগব্যাধির সম্মুখীন করে দেয়া যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে এবং পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে একগুঁয়েমি ঃ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا এখানে سيئة শব্দে পূর্বোল্লিখিত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দুরবস্থাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর حسنة শব্দে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দারিদ্র্য-ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির বিপরীত দিক। ধন-সম্পদের বিস্তৃতি ও সচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। পরবর্তী عَفَوْا শব্দটি عَفْوٌ থেকে উদ্ভূত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা। বলা হয় عفا النبات। ঘাস বা বৃক্ষের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। عفا الشحم والوبر অর্থাৎ পশুর মেদ ও লোম বেড়ে গেছে। এ অর্থেই এখানে عَفَوْا শব্দের অর্থ হবে বেড়ে গেছে বা উন্নতি করেছে।

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা-রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ-কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি, বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ অর্থাৎ এটা কোন নতুন বিষয় নয়, সৎ কিংবা অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়, বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও রোগ, কখনও স্বাস্থ্য, কখনও দারিদ্র্য, কখনও সচ্ছলতা—এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষেরও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সারকথা, প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে। তাতে তারাও অকৃতকার্য হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হলো, আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে। কিন্তু তাতেও তারা তেমনি অকৃতকার্য রয়ে গেল। কোনমতেই নিজেদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে এলো না। আর তখনই ধরা পড়লো আকস্মিক আযাবের মধ্যে। فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بغتة (বাগ্‌তাতান) হঠাৎ, সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ—যখন তারা উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদের আকস্মিক আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না।

• তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

অর্থাৎ সে জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং নাফরমানী থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি।

বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত খুলে দেওয়া বলতে উদ্দেশ্য হলো সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেওয়া অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতো আর যমীন থেকে যেকোন বস্তু তাদের মনোমত উৎপাদিত হতো এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। তাতে তাদেরকে এমন কোন চিন্তা-ভাবনা কিংবা টানাপড়েনের সম্মুখীন হতে হতো না, যার দরুন বড় বড় নিয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকমে। কখনও মূল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে রয়েছে, একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া কিংবা সামান্য খাদ্যদ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পূর্ণ উদর খাওয়া, যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। আবার কোন কোন সময় মূল বস্তুতে বাহ্যত কোন বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণ যা ছিল তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এত বেশি কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণত সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায় যে, কোন একটা পাত্র কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা ঘরের অন্য কোন আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে, মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরী করার সময়ই ভেঙে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোন সুযোগ আসে না অথবা উপকারে আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এই বরকত মানুষের ধন-সম্পদেও হতে পারে, মন-মস্তিষ্কেও হতে পারে, আবার কাজকর্মেও হতে পারে। কোন কোন সময় মাত্র এক গ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধও কোন কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোন সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘন্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘন্টায়ও করা যায় না। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহু গুণ বেশি।

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তুর বরকত ঈমান ও পরহিযগারীর উপরই নির্ভরশীল। ঈমান ও পরহিযগারীর পথ অবলম্বন করলে আখিরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও পরহিযগারী পরিহার করলে সেগুলোর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়, বর্তমান

বিশ্বের যে অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে সামনে এসে যায়। এখন বাহ্যিক দিক দিয়ে জমির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য এবং নতুন নতুন আবিষ্কার এত বেশি যা পূর্ববর্তী বংশধরেরা ধারণা বা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এ সমুদয় বস্তুউপকরণের প্রাচুর্য ও আধিক্য সত্ত্বেও আজকের মানুষকে নিতান্তই হতবুদ্ধি, রুগ্ন ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখা যায়। সুখ ও শান্তি কিংবা মানসিক প্রশান্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। এর কারণ এ ছাড়া আর কি বলা যায় যে, উপকরণ সবই বর্তমান এবং প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান, কিন্তু এ সবের মধ্যে যে বরকত ছিল তা শেষ হয়ে গেছে?

এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, সূরা আন'আমের এক আয়াতে কাফির ও দুরাচারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ যখন তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহে বিস্মৃত হয়ে গেছে, তখন আমি তাদের উপর যাবতীয় বিষয়ের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছি এবং অতঃপর আকস্মিকভাবে তাদেরকে আযাবে নিপতিত করেছি। এতে বোঝা যায়, পৃথিবীতে কারো জন্য সব বিষয়ের দরজা খুলে যাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র অনুগ্রহই নয়; বরং তা আল্লাহ্‌র এক প্রকার গযবও হতে পারে। আর এখানে বলা হয়েছে যে, যদি তারা ঈমান ও পরহিযগারী অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। এতে বোঝা যায় যে, আসমান ও যমীনের বরকত লাভ করতে পারা আল্লাহ্‌র দান ও সন্তুষ্টির পরিচায়ক।

কথা হলো এই যে, পৃথিবীর বরকত ও নিয়ামতসমূহ কখনও পাপাচার ও ঔদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করার পর মানুষের পাপকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়ে থাকে এবং তা একান্তই সাময়িক হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তা গযব ও অভিশাপেরই লক্ষণ। আবার কখনও এই নিয়ামত ও বরকত আল্লাহ্‌র দান এবং রহমত হিসাবে স্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। তখন তা হয় ঈমান ও পরহিযগারীর ফল। বাহ্যিক আকারের দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পরিণতি ও ভবিতব্য সম্পর্কে কারোরই কিছু জানা নেই। তবে যাঁরা আল্লাহ্‌র ওলী, তাঁরা লক্ষণ-নিদর্শনের আলোকে এরূপ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন যে, যখন ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া ও ইবাদতের অধিকতর তৌফিক লাভ হয়, তখনই বোঝা যায় যে, এটা রহমত। আর যদি ধন-সম্পদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অমনোযোগ এবং পাপাচার বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা আল্লাহ্‌র গযবের লক্ষণ। আমরা তা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।

চতুর্থ আয়াতে পুনরায় পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, সেই জনপদের অধিবাসীরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আমার আযাব এমনি অবস্থায় এসে আঘাত করবে, যখন হয়ত তারা রাতের নিদ্রায় মগ্ন থাকবে? তাছাড়া এই জনপদবাসীরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, আযাব তাদেরকে এমন অবস্থায় এসে আঘাত করে বসবে, যখন তারা মধ্য-দিবসে খেলাধুলায় মত্ত থাকবে। এরা কি আল্লাহ্‌র অদৃশ্য ব্যবস্থা ও নিয়তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে? তাহলে যথার্থই জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র সে অদৃশ্য

ব্যবস্থা ও নিয়তির ব্যাপারে সে জাতিই কেবল নিশ্চিন্ত হতে পারে, যারা অনিবার্যভাবেই সর্বনাশের সম্মুখীন।

সারমর্ম হলো এই যে, এসব লোক যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত হয়ে আল্লাহ্কে ভুলে গেছে, তাদের এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্র আযাব রাতে কিংবা দিনের বেলায় যেকোন অবস্থায় এসে যেতে পারে। যেমন বিগত জাতিসমূহের প্রতি অবতীর্ণ আযাবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধিমানদের কাজ হচ্ছে অন্যের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং যেসব কাজ অন্যের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে সেসব কাজের ধারে-কাছেও না যাওয়া।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ
الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ
اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ
وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

---

(১০০) তাদের নিকট কি এ কথা প্রকাশিত হয়নি, যারা উত্তরাধিকার লাভ করেছে ? সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে তাদের পাপের দরুন পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুত আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না। (১০১) এগুলো হলো সেসব জনপদ, যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর নিশ্চিতই ওদের কাছে পৌঁছেছিলেন রাসূল নিদর্শন সহকারে। অতএব কস্মিনকালেও এরা ঈমান আনবার ছিল না, তারপরে যা তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (১০২) আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের পক্ষে আযাবকে কেন ভয় করতে হবে—অতঃপর তারই কারণ বাতলে দেওয়া হচ্ছে। আর সে কারণটি হচ্ছে, বিগত উম্মত বা সম্প্রদায়সমূহ যেভাবে কুফর ও শির্ক্জনিত

অপরাধে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরও সেই একই পথ অবলম্বন করা। অর্থাৎ) আর (বিগত) সে জনপদে বসবাসকারীদের পরে যারা (এখন) তাদের স্থলে জনপদে বসবাস করে, উল্লিখিত ঘটনাবলী কি তাদেরকে এ বিষয়ে (এখনও) বলে দেয়নি যে, আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তাহলে তাদেরকে (-ও বিগত উম্মতগুলোর মতই) তাদের (কুফর ও মিথ্যারোপজনিত) অপরাধের দরুন ধ্বংস করে দিতাম। (কেননা বিগত উম্মতগুলোকে এসব অপরাধের জন্যই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।) আর (এসব ঘটনা বাস্তবিকই শিক্ষা গ্রহণ করার মতই ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে) আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর বাঁধন এঁটে দিয়েছি। এতে তারা (সত্য বিষয়কে অন্তর দিয়ে) শুনতে(-ও) পায় না, স্বীকার তো দূরের কথা। এই বাঁধনের দরুন তাদের কঠোরতা এমনি বেড়ে গেছে যে, এমনসব শিক্ষণীয় ঘটনার দ্বারাও তাদের শিক্ষা হয় না। আর এই বাঁধন আঁটার কারণ হলো তাদেরই অতীত কুফরী কার্যকলাপ। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ –এরপরে হয়তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত সমগ্র বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ রূপে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত সেই জনপদসমূহের কিছু কিছু কাহিনী আপনাকে বলে দিচ্ছি। সেই (জনপদের অধিবাসীদের) সবার নিকট তাদের পয়গম্বররা মু'জিযা (অলৌকিক নিদর্শনসমূহ) নিয়ে এসেছিলেন (কিন্তু) তবু (তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে,) যে বিষয়কে তারা প্রথম (ধরে)-ই (একবার) মিথ্যা বলে দিয়েছে, এমনটি আর হয়নি যে, পরে তা মেনে নেবে। (তাছাড়া যেমনি এরা অন্তরের দিক দিয়ে কঠিন ছিল) আল্লাহ্ও তেমনিভাবে কাফিরদের অন্তরে বাঁধন এঁটে দেন। আর (তাদের মধ্যে কোন কোন লোক বিপদের মধ্যে ঈমান গ্রহণের প্রতিজ্ঞাও করে নিত। কিন্তু) অধিকাংশ লোকের মধ্যেই আমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে দেখিনি। (অর্থাৎ বিপদমুক্তির পরই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যেত।) আর আমি অধিকাংশ সে লোককে (নবী-রাসূল প্রেরণ, মু'জিযা প্রকাশ, নিদর্শনসমূহ অবতারণ এবং কৃত ওয়াদা বা চুক্তিসমূহের সম্পাদন সত্ত্বেও নির্দেশ অমান্যকারীই পেয়েছি। বস্তুত কাফিররা চিরকাল এমনি হয়ে আসছে ; তাতে আপনিও দুঃখ করবেন না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহেও বিগত জাতিসমূহের ঘটনাবলী এবং অবস্থার কথা শুনিয়ে বর্তমান আরব-আজমের সমস্ত জাতিকে এ বিষয় বাতলে দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব ঘটনায় তোমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় সতর্কবাণী রয়ে গেছে। যেসব কর্মের ফলে বিগত দিনের লোকদের উপর আল্লাহ্র গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে সেগুলোর কাছেও যাবে না। আর যেসব কর্মের দরুন নবী-রাসূল (আ) ও তাঁদের অনুসারীরা সাফল্য লাভ করেছেন সেগুলো অবলম্বন করবে। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَّوْ نَشَاۤءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ يهدى هدى অর্থ চিহ্নিতকরণ এবং বাতলে দেওয়া। এখানে এর কর্তা হলো সে সমস্ত ঘটনা যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ির উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনা একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরী ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্র বিধানের

বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহ) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও গযব আসতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ – طَبع শব্দের অর্থ ছাপা এবং মোহর লাগানো। তার মানে, এরা অতীত ঘটনাবলী থেকেও কোন রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহ্র গযবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায়; তারা তখন কিছু শুনতে পায় না। হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, কোন লোক যখন প্রথম পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে কালির একটা বিন্দু লেগে যায়। দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে; তওবা না করে, তাহলে এই কালির বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে ঘিরে ফেলে ও মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত, না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে ভালকে মন্দ; মন্দকে ভাল এবং ইষ্টকে অনিষ্ট, অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থাটিকেই কোরআনে رَان, অর্থাৎ অন্তরের মরচে বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরও বহু আয়াতে طَبع অর্থাৎ মোহর এঁটে দেয়া বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মোহর লেগে যাওয়ার পরিণতি তো জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি—কানের দ্বারা শ্রবণের উপর তো তার কোন প্রতিক্রিয়া স্বভাবত হওয়ার কথা নয়। কাজেই উক্ত আয়াতের এ স্থানটিতে فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ 'তারা বোঝে না' বলাই সমীচীন ছিল। কিন্তু কোরআনে করীমে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ তারা শোনে না। এর কারণ হলো এই যে, এখানে শোনা অর্থ মান্য করা এবং অনুসরণ করা, যা বোঝা বা উপলব্ধি করারই ফল। কাজেই প্রকৃত মর্ম দাঁড়ায় এই যে, অন্তরে মোহর এঁটে যাবার দরুন তারা কোন সত্য ও ন্যায় বিষয়কে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হয় না। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, মানুষের অন্তর হলো তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র। অন্তরের ক্রিয়ায় যখন কোন রকম গোলযোগ দেখা দেয়, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপও গোলযোগপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে যখন কোন বিষয়ের ভাল কিংবা মন্দ বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন চোখেও তাই দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۤئِهَا এখানে انباء শব্দটি نبا-এর বহুবচন। যার অর্থ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। অর্থাৎ বিধ্বস্ত জনপদসমূহের কোন কোন ঘটনা আপনাকে বলছি। এখানে من বিশেষণের মাধ্যমে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের যে ঘটনাবলী আলোচনা করা হলো, এগুলোই শেষ নয় বরং এমন হাজারো ঘটনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র।

অতএব বলা হয়েছেঃ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ এসব লোকের প্রতি প্রেরিত নবী ও রাসূলরা তাদের কাছে মু'জিযা (অলৌকিক নিদর্শন)-সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে, যে বিষয় সম্পর্কে একবার তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো যে, এটা ভুল এবং মিথ্যা, তখন আর সে বিষয়ের যথার্থতা ও সত্যতার পক্ষে যতই মু'জিযা এবং দলীল-প্রমাণ উপস্থিত হোক না কেন, কিছুতেই তারা আর তাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হতো না।

এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় এই জানা গেল যে, সমস্ত নবী-রাসূলকেই মু'জিযা দান করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোন নবী (আ)-এর মু'জিযার আলোচনা কোরআনে এসেছে, অনেকের আসেওনি। এতে এমন কোন ধারণা করা যথার্থ হতে পারে না যে, যাদের মু'জিযার বিষয় কোরআনে আলোচিত হয়নি, আদৌ তাদের কোন মু'জিযাই ছিল না। আর সূরা হূদ-এ হযরত হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে এই কথা উল্লিখিত হয়েছেঃ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ অর্থাৎ আপনি কোন মু'জিযা উপস্থিত করেন নি—এই আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের এ উক্তিটি ছিল শুধুমাত্র হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি, কিংবা তাঁর মু'জিযাগুলোকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করে এ কথা বলেছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে তাদের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে, কোন ভুল কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তারা তাই পালন করত; তার বিপরীতে যতই প্রকৃষ্ট দলীল-প্রমাণ আসুক না কেন তারা নিজের ধ্যান-ধারণায় অটল থাকত। আল্লাহ্র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও কাফির জাতিসমূহের এমনি অবস্থা। বহু মুসলমান এমনকি আলিম-ওলামা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাধিতে ভুগছেন। প্রথম ধাক্কায় একবার কোন বিষয়কে মিথ্যা বা ভুল বলে উচ্চারণ করে ফেললে পরে বিষয়টির সত্যতার হাজারো প্রমাণ উপস্থাপিত হলেও তাঁরা নিজের সে ধারণারই অনুসরণ করতে থাকেন। সূফীতত্ত্ব মতে এ অবস্থাটি আল্লাহ্র গযবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর বলা হয়েছেঃ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ যেভাবে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সাধারণ কাফির ও নাস্তিকদের অন্তরেও আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন, যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট না থাকে।

তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই আমি প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী রূপে পাইনি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা বলতে عهد الست (আহদে-আলাস্ত) বোঝানো হয়েছে—যা সৃষ্টির আদিলগ্নে সমস্ত সৃষ্টির জন্মের পূর্বে যখন তাদের আত্মাগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন আল্লাহ্ সেগুলোর কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পরওয়ারদিগার নই ? তখন সমস্ত রূহ বা মানবাত্মা প্রতিজ্ঞা ও স্বীকৃতিস্বরূপ উত্তর দিয়েছিল بَلٰى অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের পরওয়ারদিগার। কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর অধিকাংশ লোকই সে প্রতিজ্ঞার কথা

ভুলে গেছে। আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে সৃষ্টবস্তুর পূজার অভিশাপে জড়িয়ে পড়েছে। সে জন্যই এ আয়াতে আমি তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল পাইনি। অর্থাৎ ওয়াদা পূরণে তাদেরকে যথাযথ পাইনি।–(কবীর)

আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেছেন, 'ওয়াদা' বলতে ঈমানের ওয়াদা বোঝানো উদ্দেশ্য। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا এক্ষেত্রে 'আহ্দ' বা প্রতিজ্ঞা অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা। কাজেই আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অধিকাংশই আমার সাথে ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া অর্থ হলো এই যে, সাধারণত মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, যত মন্দ লোকই হোক না কেন, তখন সে একমাত্র আল্লাহ্‌কেই স্মরণ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে বা মুখে এমন প্রতিজ্ঞা করে নেয় যে, বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং উপাসনায় আত্মনিয়োগ করব, নাফরমানী বা অন্যায় থেকে বেঁচে থাকব। যেমন, কোরআন মজীদেও এমনি বহু লোকের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তারা বিপদমুক্ত হয়ে যখন শান্তি ও স্থিতিশীলতায় ফিরে আসে, তখন আবার রিপুজনিত কামনা-বাসনায় জড়িয়ে পড়ে এবং কৃত ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়।

উল্লিখিত আয়াতের اَكْثَرَ শব্দটি দ্বারা সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা বহু লোক এমন হতভাগাও রয়েছে যে, বিপদের সময়েও এরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না, তখনও এরা ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে না। কাজেই তাদের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগের কোন মানেই হয় না। আর এমনও অনেক লোক রয়েছে, যারা প্রতিজ্ঞাও পূরণ করে এবং ঈমান ও আনুগত্যের দাবিও সম্পাদন করে। কাজেই বলা হয়েছে ঃ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশকে প্রতিজ্ঞা পূরণকারী পাইনি।

তারপর বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ وَّجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি।

এ পর্যন্ত অতীতের নবী-রাসূল (আ) এবং তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উম্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনাটিতে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, মাস'আলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশ সংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে। সে জন্যই কোরআন করীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا
بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ
اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ

إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾
قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ
عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

(১০৩) অতঃপর আমি তাঁদের পরে মূসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলী দিয়ে ফিরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। বস্তুত ওরা তাঁর মুকাবিলায় কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ কি পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের। (১০৪) আর মূসা বললেন, হে ফিরাউন, আমি বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রাসূল। (১০৫) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদিগারের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলদের আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। (১০৬) সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (১০৭) তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (১০৮) আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (১০৯) ফিরাউনের সাঙ্গপাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ যাদুকর। (১১০) সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (উল্লিখিত) সেই নবী-রাসূলদের পরে আমি (হযরত) মূসা (আ)-কে স্বীয় নিদর্শনরাজি (অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ) দিয়ে ফিরাউন এবং তার পারিষদবর্গের নিকট (তাদের হিদায়েত ও পথ-প্রদর্শনকল্পে) পাঠালাম। অতএব, [মূসা (আ) যখন সেসব নিদর্শন প্রকাশ করলেন, তখন] তারা সেই (মু'জিযা) সমূদয়ের হক একেবারেই আদায় করল না। কেননা (সেগুলোর হক ও চাহিদা ছিল ঈমান গ্রহণ করা।) কাজেই দেখুন, সেই দুষ্কৃতকারীদের কেমন (দুর্ভাগ্যজনক) পরিণতি ঘটেছে। (যেমন, কোরআনের অন্যত্র তাদের ডুবে মরার কথা আলোচিত হয়েছে। এগুলো ছিল পূর্ণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অতঃপর তারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ) আর মূসা (আ) আল্লাহ্র হুকুম মুতাবিক ফিরাউনের নিকট গিয়ে বললেন, আমি রাব্বুল-আলামীনের পক্ষ থেকে (তোমাদের হিদায়েতের উদ্দেশ্যে) রাসূল (নিযুক্ত) হয়ে এসেছি।

(যে আমাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করবে, তা ভুল। কারণ) আমার পক্ষে সত্য ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করা শোভন নয়। (তাছাড়া রাসূল হওয়ার ব্যাপারে আমার দাবি শূন্যগর্ভ নয়, বরং) আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে একটি বিরাট নিদর্শনও (মু'জিযা) এনেছি (যা তোমরা চাইলেই দেখাতে পারি)। কাজেই (আমি যখন প্রমাণসহ আগমনকারী রাসূল, তখন আমি যা বলি তোমরা তা অনুসরণ কর। বস্তুত আমার বলার মধ্যে একটা হলো এই যে,) তুমি বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে (দাসত্বের নিগড় থেকে অব্যাহতি দিয়ে) আমার সাথে (তাদের আসল দেশ শামে) পাঠিয়ে দাও। ফিরাউন বলল, আপনি যদি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) কোনও মু'জিযা নিয়ে এসে থাকেন, তাহলে তা উপস্থাপন করুন; যদি আপনি (এ দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাকেন। তিনি (তৎক্ষণাৎ) স্বীয় লাঠিখানা (মাটিতে) ফেলে দিলেন; আর সহসাই তা সুস্পষ্ট এক অজগরে পরিণত হয়ে গেল। (যার অজগর হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ হওয়ার মতো কোন অবকাশ ছিল না।) আর (দ্বিতীয় মু'জিযাটি প্রকাশ করলেন এই যে,) স্বীয় হাত (জামার ভিতরে নিয়ে বগলতলায় দাবিয়ে) বাইরে বের করে আনলেন; আর অমনি তা সমস্ত দর্শকের সামনে অত্যন্ত প্রদীপ্ত হয়ে উঠল এমনিভাবে যে, তাও সবাই দেখল। হযরত মূসা (আ)-এর এসব সুস্পষ্ট মু'জিযা যখন প্রকাশিত হলো, তখন ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, এ লোক বড় যাদুকর। নিজ যাদুর বলে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এখানকার কর্তা হয়ে বসা এবং তোমাদের এখানে থাকতে না দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। অতএব এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি ? সূরা শু'আরায় ফিরাউনের এ কথাটি উদ্ধৃত রয়েছে। যা হোক, রাজা-বাদশাহদের চাটুকারবর্গের যেমন স্বভাব হয়ে থাকে হ্যাঁ-এর সাথে হ্যাঁ মিলিয়ে দেওয়া, তেমনিভাবে (ফিরাউনের কথার সমর্থন ও সত্যায়নের জন্য) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব সর্দার (ও পারিষদবর্গ সেখানে) উপস্থিত ছিল, তারা (একে অন্যের সাথে) বলল, বাস্তবিকই (স্বীয় যাদু বলে বনী ইসরাঈলসহ তিনি নিজে কর্তা হয়ে বসবেন এবং) তোমাদেরকে (বনী ইসরাঈলদের দৃষ্টিতে তোমাদের হীনতার দরুন) তোমাদের (এই) আবাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। কাজেই তোমরা (বাদশাহ যা জিজ্ঞেস করলেন, সে ব্যাপারে) কি পরামর্শ দাও ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরায় নবী-রাসূল এবং তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যত কাহিনী ও ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে, এ হলো সেগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযাসমূহ বিগত অন্য নবী-রাসূলদের তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশি, তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক দিয়েও অধিক। এমনিভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মূর্খতা এবং হঠকারিতাও বিগত উম্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশি কঠিন। তদুপরি এই কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম-আহ্‌কামের কথা এসেছে।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের পরে অর্থাৎ হযরত নূহ, হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আ)-এর বা তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পরে আমি হযরত মূসা (আ)-কে আমার নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা 'আয়াত' বলতে আসমানি

কিতাব তাওয়াতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযাসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে 'ফিরাউন' হতো মিসরের সম্রাটের খেতাব। হযরত মূসা (আ)-এর সময়ে যে ফিরাউন ছিল তার নাম 'কাবুস' বলে উল্লেখ করা হয়। —(কুরতুবী)

فَظَلَمُوْا بِهَا-এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হলো নিদর্শন। অর্থাৎ তারা আয়াত বা নিদর্শনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ্র আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হলো এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত বা নিদর্শনের কোন মর্যাদা বোঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করেছে। কারণ জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোন বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীতে ব্যবহার করা।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ চেয়ে দেখ না, সেই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এর মর্মার্থ এই যে, ওদের দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) ফিরাউনকে বললেন, আমি বিশ্ব-পালক আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল। আর আমার অবস্থা এই যে, আমার যে নবুয়তী মর্যাদা তার দাবি হলো, যাতে আমি আল্লাহ্র প্রতি সত্য ছাড়া কোন বিষয় আরোপ না করি। কারণ নবী (আ)-দের আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা তাঁদের কাছে আল্লাহ্র আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলরা হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত—নিষ্পাপ। সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর; আমি কখনও মিথ্যা বলিওনি, বলতে পারিও না! তাছাড়া قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে, আমি কখনও মিথ্যা বলিনি; বরং আমার দাবির সপক্ষে আমার মু'জিযাসমূহও প্রমাণ হিসাবে রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শোন, আমার কথা মান। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফিরাউন অন্য কোন কথাই লক্ষ্য করল না। মু'জিযা দেখাবার দাবি করতে লাগল এবং বলল ঃ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ বাস্তবিকই যদি তুমি কোন মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।

হযরত মূসা (আ) তার দাবি মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন। আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল। "فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ" 'সু'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক "مُبِيْنٌ" (মুবীন) শব্দ উল্লেখ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না—সাধারণত যা যাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি সংঘটিত হলো প্রকাশ্য দরবারে, সবার সামনে।

কোন কোন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফিরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আ)-এর শরণাপন্ন হলো; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।–(তফসীরে কবীর)

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। আর মু'জিযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না তা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করে দেওয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গে কোন ঐশীশক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মূসা (আ)-এর লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মত কোন বিষয় হতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ – نَزْعٌ (নাযউন) অর্থ হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভিতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা অর্থাৎ নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভিতর থেকে বের করলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দু'টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে اَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ যার অর্থ হলো, স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে থেকে অর্থাৎ কখনও গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনও বগল তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জিযা প্রকাশ পেত— فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ অর্থাৎ সেই হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকতো।

بَيْضَاءُ (বাইদাউন্)-এর শাব্দিক অর্থ সাদা। আর হাতের সাদা হয়ে যাওয়াটা কোন সময় শ্বেতি রোগের কারণেও হতে পারে। তাই অন্য এক আয়াতে এক্ষেত্রে مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ শব্দটিও সংযোজিত করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ হাতের সাদা হয়ে যাওয়াটা কোন উপসর্গের কারণে ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা জানা যায় যে, এ শুভ্রতাও সাধারণ শুভ্রতা ছিল না; বরং তার সঙ্গে এমন দীপ্তিও থাকত, যার ফলে সমগ্র পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। –(কুরতুবী)

এখানে لِلنّٰظِرِيْنَ (দর্শকদের জন্য) কথাটা বাড়িয়ে উল্লিখিত প্রদীপ্তির বিস্ময়করতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে দীপ্তি এমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ছিল যে, তা দেখার জন্য দর্শকরা এসে সমবেত হতো।

তখন ফিরাউনের দাবিতে হযরত মূসা (আ) দু'টি মু'জিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হলো লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া; আর অপরটি হলো হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। প্রথম মু'জিযাটি ছিল বিরোধীদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আর দ্বিতীয়টি তাদের আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মূসা (আ)-এর শিক্ষায় একটি হিদায়েতের জ্যোতি রয়েছে; আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ – مَلَاءٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বোঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জিযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, এ যে বড় পারদর্শী যাদুকর। তার কারণ, فکر هرکس بقدر همت اوست (প্রত্যেকের চিন্তাই তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে)। সে হতভাগারা আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফিরাউনকে খোদা আর যাদুকরদের নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং যাদুকরদের ভোজবাজিই দেখে এসেছে! কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাযাদু। কিন্তু তারাও এখানে سَاحِرٌ-এর সাথে عَلِيْمٌ শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ যাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি বড় পারদর্শী যাদুকর।

মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য ঃ বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা সর্বযুগেই নবী-রাসূলদের মু'জিযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে মু'জিযা ও যাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। যাদুকররা সাধারণত অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশি হবে, তাদের যাদুও তত বেশি কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হলো নবী-রাসূলদের সহজাত অভ্যাস। আর এও একটা পরিষ্কার পার্থক্য যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই নবুয়তের দাবির পর কারও কোন যাদু কার্যকর হয় না।

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানেন যে, যাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা হয়, সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভুক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না; বরং অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, এ কাজটি বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু'জিযাতে বাহ্যিক বা মানসিক কোন বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের কাজ। তাই কোরআন মজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (বরং আল্লাহ্ তা'আলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন)।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'জিযা এবং যাদুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। যারা তত্ত্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোন কারণই নেই। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই বিভ্রান্তিটি দূর করার উদ্দেশ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোঁকা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

সারমর্ম এই যে, ফিরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযাকে নিজেদের যাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ যাদুকর, সাধারণ যাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না!

يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ অর্থাৎ এই বিজ্ঞ যাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া। এবার বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١١﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ
عَلِيْمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ
الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ
تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾ قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا
اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى
مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ
وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾
رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

(১১১) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে-বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য–(১১২) যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে। (১১৩) বস্তুত যাদুকররা এসে ফিরাউনের কাছে উপস্থিত হলো। তারা বলল, আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি ? (১১৪) সে বলল, হ্যাঁ। এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। (১১৫) তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। (১১৬) তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। (১১৭) তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল যা তারা বানিয়েছিল যাদুবলে। (১১৮) সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। (১১৯) সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হলো। (১২০) এবং যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। (১২১) বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদিগারের প্রতি (১২২) যিনি মূসা ও হারুনের পরওয়ারদিগার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যাই হোক, পরামর্শ স্থির করে নিয়ে) তারা [ফিরাউনকে বলল, আপনি তাকে অর্থাৎ মূসা (আ)-কে] কিছুটা সময় দিন এবং (আপনার শাসনাধীন) শহরগুলোতে (অনুচর) চাপরাশীদের (হুকুমনামা) পাঠিয়ে দিন, যাতে তারা (সব শহর থেকে) কুশলী যাদুকরদের (সমবেত করে) আপনার কাছে এনে উপস্থিত করে। (সেমতই ব্যবস্থা নেয়া হলো) আর সেসব যাদুকর ফিরাউনের নিকট এসে উপস্থিত হলো (আর) বলতে লাগল, আমরা যদি [মূসা (আ)-এর উপর] জয়ী হই, তবে তার বদলে আমরা (কি) কোন বড় প্রতিদান (এবং পুরস্কার) পাব ? ফিরাউন বলল, হ্যাঁ (বড় পুরস্কারও পাবে) আর (তদুপরি) তোমরা (আমার) ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। [ফলকথা, মূসা (আ)-কে ফিরাউনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে খবর দেওয়া হলো এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দিন ধার্য হয়ে গেল। আর নির্ধারিত দিনে সবাই এক ময়দানে সমবেত হলো। তখন—] সেই যাদুকররা [মূসা (আ)-এর প্রতি] নিবেদন করল—হে মূসা, (আমরা আপনাকে এ অধিকার দিচ্ছি যে,) হয় আপনি (প্রথমে আপনার লাঠি যমীনে) ফেলুন (যাকে আপনি স্বীয় মু'জিযা বলে অভিহিত করেন) আর না হয়, (আপনি বললে) আমরাই (নিজেদের দড়ি-লাঠি মাঠে) ফেলব। (তখন) মূসা (আ) বললেন, তোমরাই (প্রথম) ফেল। যখন তারা (নিজেদের লাঠি ও দড়িসমূহ) ফেলল, তখন (যাদুর দ্বারা দর্শক) লোকদের নজরবন্দী করে দিল (যার ফলে সে লাঠি ও দড়িগুলোকে সাপের মত আঁকাবাঁকা দেখাতে লাগল) এবং তাদের উপর ভীতির সঞ্চার করে দিল। এভাবে বিরাট যাদু দেখাল। আর (তখন) আমি মূসা (আ)-এর প্রতি (ওহীর মাধ্যমে) নির্দেশ দিলাম যে, আপনি আপনার লাঠি ফেলে দিন (সাধারণভাবে যেমন ফেলে থাকেন। অতএব,) লাঠি ফেলামাত্র তা (অজগর হয়ে) তাদের সমস্ত বানানো খেলনাগুলোকে গিলতে শুরু করে দিল। (অমনি) সত্যের (সত্যতা) প্রকাশ হয়ে গেল এবং তারা (অর্থাৎ যাদুকররা) যা কিছু বানিয়েছিল সবই পণ্ড হয়ে গেল। সুতরাং তারা (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়) সে ক্ষেত্রে হেরে গেল এবং প্রচুর লাঞ্ছিত হলো (এবং মুখ বাঁকিয়ে রয়ে গেল)। আর ঐসব যাদুকর সিজদায় পড়ে গেল (এবং উচ্চৈস্বরে) বলতে লাগল আমরা ঈমান এনেছি বিশ্বপালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারুন (আ)-এরও পালনকর্তা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতগুলোতে মূসা (আ)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফিরাউন যখন হযরত মূসা (আ)-এর প্রকৃষ্ট মু'জিযা দেখল, লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ ঐশী নিদর্শনের যৌক্তিক দাবি ছিল মূসা (আ)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফিরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ যাদুকর এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদের বের করে দেওয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত ?

ফিরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল, اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ এ বাক্যটিতে اَرْجِهْ শব্দটি اِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত–যার অর্থ ঢিলা দেওয়া, শিথিল করা এবং আশা দান করা। আর مَدَائِنَ শব্দটি مَدِيْنَةٌ-এর বহুবচন, যা যেকোন বড় শহরকে বলা হয়। حٰشِرِيْنَ শব্দটি حَاشِرٌ-এর বহুবচন যার অর্থ হলো আহ্বানকারী এবং সংগ্রহকারী। মর্মার্থ হলো সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যাদুকরদের তুলে এনে একত্র করবে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি যাদুকর হয়ে থাকেন এবং যাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তাঁর মুকাবিলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর রয়েছে যারা তাঁকে যাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে যাদুকরদের ডেকে নিয়ে আসবে।

তার কারণ ছিল এই যে, তখন যাদু-মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর যাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মূসা (আ)-কেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা এজন্যই দেওয়া হয়েছিল যাতে যাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু'জিযার মুকাবিলায় যাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার সনাতন রীতিও ছিল তাই। প্রতিটি যুগের নবী-রাসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জিযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আ)-এর যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাঁকে মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেওয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রাসূলে করীম (সা)-এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মিতায়। তাই হুযুরে আকরাম (সা)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো কোরআন, যার মুকাবিলায় গোটা আরব-আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ—অর্থাৎ পারিষদবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী সমগ্র দেশ থেকে যাদুকরদের এনে সমবেত করার ব্যবস্থা করা হলো। আর সেমতে যাদুকররা ফিরাউনের কাছে এসে ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা যদি মূসার উপর জয়লাভ করতে পারি, তাহলে আমরা তার পারিশ্রমিক এবং পুরস্কার পাব তো? ফিরাউন বলল হ্যাঁ, পুরস্কার-পারিশ্রমিক তো পাবেই, তদুপরি তোমরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ সহচরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

মূসা (আ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সারা দেশ থেকে যেসব যাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ে ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত রেওয়ায়েত আছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তূপও ছিল যা ৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল।–(কুরতুবী)

ফিরাউনের যাদুকররা প্রথমে এসেই দর কষাকষি করতে শুরু করল যে, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাব? তার কারণ, যারা ভ্রান্তবাদী, পার্থিব লাভই হলো তাদের মুখ্য। কাজেই যেকোন কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা

লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রাসূলরা এবং তাঁদের যাঁরা নায়েব বা প্রতিনিধি, তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন ঃ وَمَا اَسْـئَلُكُمْ عَلَيْـهِ مِنْ اَجْـرٍ اِنْ اَجْـرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِـيْنَ অর্থাৎ আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কামনা করি না! আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামীন নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। ফিরাউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই; আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

ফিরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেয়ার পর যাদুকররা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। সেমতে, এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাব্যস্ত হলো। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় যাদুকরদের সর্দারের সাথে হযরত মূসা (আ) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি তোমাদের উপর জয়লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো ? সে বলল, আমাদের কাছে এমন যাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর সত্যিই যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফিরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব।-(মাযহারী, কুরতুবী)

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ-এখানে اِلْقَاءٌ-এর অর্থ নিক্ষেপ করা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন যাদুকররা হযরত মূসা (আ)-কে বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। যাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কারণ আমরা নিজেদের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বোঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথম আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল, কিন্তু শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করে নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা করব।

হযরত মূসা (আ) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জিযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশ্বস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, اَلْقُـوْا। অর্থাৎ তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

তফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, যাদুকররা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

একেত্রে এটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একে তো যাদু হলো একটা হারাম কাজ, তদুপরি তা যখন কোন একজন নবীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে, তখন নিঃসন্দেহে তা ছিল কুফরী। এমতাবস্থায় মূসা (আ) কেমন করে তাদেরকে সে অনুমতি দিয়ে বললেন, اَلْقُـوْا।

অর্থাৎ তোমরা নিক্ষেপ কর। কিন্তু বাস্তব বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে এ প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। কারণ এ ক্ষেত্রে এ বিষয় নিশ্চিতই ছিল যে, এরা নিজেদের যাদু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবশ্যই উপস্থাপন করবে। কথাটি হচ্ছিল শুধু প্রথমে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে, আর পরে কে নামবে, তাই নিয়ে। কাজেই এখানে হযরত মূসা (আ) তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে প্রথম সুযোগ তাদেরকেই দিলেন। এতে আরও একটি উপকারিতা ছিল এই যে, প্রথমে যাদুকররা তাদের লাঠি ও দড়িগুলোকে সাপ বানিয়ে নিক; আর তারপর আসুক মূসা (আ)-এর লাঠির মু'জিযা। শুধু তাই নয় যে, মূসা (আ)-এর লাঠিও সাপই হোক; বরং এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করুক যে, যাদু বলে বানানো সমস্ত সাপকে গিলে খাক যাতে যাদুর প্রকাশ্য পরাজয় প্রথম ধাপেই সবার সামনে এসে যেতে পারে।—(বয়ানুল কোরআন)

আরও বলা যেতে পারে যে, মূসা (আ)-এর অনুমতি দান যাদুর জন্য ছিল না; বরং তাদের অপমানকে প্রকাশ করার জন্য ছিল। এর মানে তোমরাই নিজেদের দড়ি-লাঠি নিক্ষেপ করে দেখে নাও তোমাদের যাদুর পরিণতিটা কি দাঁড়ায়। فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ যাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাযাদু দেখাল।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের যাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সম্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, যাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ এবং যাদুর মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কারণ শরীয়তের বা যুক্তির কোন প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি বরং বিভিন্ন প্রকার যাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু হাতের চালাকি, যাতে দর্শকরা একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কোথাও শুধু নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সম্মোহনী। আর কোথাও যদি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাথর হয়ে যাওয়া, তাহলে সেটা শরীয়ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ অর্থাৎ আমি মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠিটি (মাটিতে) ফেলে দাও। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত সাপকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো যাদুকররা যাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার লাঠি আর দড়ি যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মাঝে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি যখন এক বিরাট আযদাহা বা অজগরের আকার ধরে এল, তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল আর যাদুকররা যা কিছু বানিয়েছিল সে সবই মিথ্যায় পরিণত হলো।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ অর্থাৎ তখনই সবাই হেরে গেল এবং অত্যন্ত অপদস্থ হলো।

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ অর্থাৎ যাদুকরদের সিজদায় পতিত করে দেওয়া হলো এবং তারা বলতে লাগল যে, আমরা রাব্বুল আলামীনে অর্থাৎ মূসা ও হারূনের রবের প্রতি ঈমান এনেছি।

'সিজদায় পতিত করে দেওয়া হলো' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূসা (আ)-এর মু'জিযা দেখে এরা এমনি হতভম্ব ও বাধ্য হয়ে গেল যে, একান্ত অজান্তেই সিজদায় পড়ে গেল। এছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঈমান আনার তৌফিক দিয়ে সিজদায় নিপতিত করে দিলেন। আর 'রাব্বুল আলামীন'-এর সাথে 'মূসা ও হারূনের রব' যোগ করে তারা নিজেদের বিষয়টি ফিরাউনের জন্য পরিষ্কার করে দিল। কারণ সে বোকা যে নিজেকেই 'রাব্বুল আলামীন' বলত। কাজেই 'রব্বি মূসা ও হারূন' বলে তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, আমরা আর তোমার আল্লাহ্তে বিশ্বাসী নই।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ
فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾ لَاُقَطِّعَنَّ
اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ
اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا
جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ
الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ
وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ
وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

(১২৩) তোমরা কি (তাহলে) আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই ঈমান নিয়ে আসলে—এটা যে প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদের শহর থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে। (১২৪) অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে

শূলীতে চড়িয়ে মারব। (১২৫) তারা বলল, আমাদের তো মৃত্যুর পর নিজেদের পরওয়ারদিগারের নিকট যেতেই হবে। (১২৬) বস্তুত আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদিগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদের মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর। (১২৭) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মূসা ও তার সম্প্রদায়কে দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য ? সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদের; আর জীবিত রাখব মেয়েদের। বস্তুত আমরা তাদের উপর প্রবল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ফিরাউন (অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল যে, সমস্ত প্রজাই না আবার মুসলমান হয়ে যায়। তখন একটা বিবৃতি তৈরী করে যাদুকরদের) বলতে লাগল ঃ তাহলে মূসা (আ)-এর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ, আমার অনুমতি ছাড়াই। (তাতে) নিঃসন্দেহে (বোঝা যায় যে, যুদ্ধটি লোক দেখানোর জন্য অনুষ্ঠিত হলো) তা ছিল এমন একটা কাজ যাতে তোমাদের অনুষ্ঠান হলো, এই শহরে (একটা ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে যে, তোমরা এই করবে আর আমরা এমন করব, অতঃপর জয়-পরাজয় প্রকাশ করব। আর এই যে ভাগাভাগি তা এজন্য করলে) যাতে তোমরা সবাই (মিলেমিশে) এ শহর থেকে তথাকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করে দিতে পার (এবং পরে নিশ্চিন্ত মনে এখানে সবাই মিলে সাম্রাজ্য করতে পার)। কাজেই বাস্তব বিষয়টি তোমাদের জেনে নেওয়াই উত্তম। (আর তা হলো এই যে,) আমি তোমাদের একদিকের হাত এবং অপরদিকের পা কেটে দেব এবং তারপর তোমাদের শূলীতে চড়াব (যাতে অন্যান্যেরও শিক্ষা হয়ে যায়)। তারা উত্তর দিল যে, (তাতে কোন পরোয়া নেই) আমরা মরে (তো আর কোন মন্দ ঠিকানায় যাচ্ছি না, বরং) নিজেদের মালিকের কাছেই যাব (সেখানে রয়েছে সব রকম নিরাপত্তা ও শান্তিময় সুখ। কাজেই আমাদের তাতে ক্ষতিটা কি ?)। তাছাড়া তুমি আমাদের মাঝে দোষটা কি দেখলে (যার জন্য এত হৈ চৈ তা এই তো) যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের হুকুমের প্রতি ঈমান এনেছি। (যাই হোক, এটা কোন দোষের কথা নয়। অতঃপর ফিরাউন থেকে ফিরে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল যে,) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি ধৈর্য ধারণের কৃপা বর্ষণ কর (যাতে আমরা বিপদে স্থির থাকতে পারি)। আর আমাদের প্রাণ যেন ইসলামে স্থির থাকা অবস্থায় বের হয় (যন্ত্রণার দরুন যেন ঈমানের বিরোধী কোন কথা বেরিয়ে না আসে)। আর [মূসা (আ)-এর মু'জিযা যখন সবার সামনে প্রকাশিত হয়ে গেল ও যাদুকররা ঈমান নিয়ে এল এবং আরও কোন কোন লোক যখন তাঁর অনুগত হয়ে গেল, তখন] ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা (যারা সরকারে প্রচুর সম্মানিতও ছিল, তারা কোন কোন লোকের মুসলমান হয়ে যেতে দেখে ফিরাউনকে বলল,) আপনি কি মূসা (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এভাবে (যথেচ্ছভাবে স্বাধীন) থাকতে দেবেন, যাতে তারা সারা দেশময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা

সৃষ্টি করে বেড়াবে ? (হাঙ্গামা হলো এই যে, নিজের দল ভারী করবে যার পরিণতিতে বিদ্রোহের ভয় রয়ে গেছে।) আর তিনি [অর্থাৎ মূসা (আ)] আপনাকে এবং আপনার প্রস্তাবিত উপাস্যদের পরিহার করতে থাকবে। (অর্থাৎ তাদের উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করতে থাকবে,) আর মূসা (আ)-এর সাথে সাথে তার সম্প্রদায়ও তাই করবে ? (অর্থাৎ আপনি এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন।) ফিরাউন বলল, (আপাতত এ ব্যবস্থাই সমীচীন মনে হয় যে,) আমরা তাদের সন্তানদের হত্যা করতে শুরু করি (যাতে তাদের ক্ষমতা বাড়তে না পারে। তাছাড়া নারীদের বৃদ্ধিতে যেহেতু ভয়ের কোন আশংকা নেই এবং যেহেতু আমাদের নিজেদের খিদমতের জন্যও প্রয়োজন রয়েছে, তাই) নারীদের বাঁচতে দেওয়া হোক। আর আমাদের সব রকম ক্ষমতাই তাদের উপর রয়েছে (কাজেই এ ব্যবস্থায় কোন জটিলতা সৃষ্টি হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ ছিল যে, ফিরাউন তার সম্প্রদায়ের সর্দারদের পরামর্শ অনুযায়ী মূসা (আ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যেসব যাদুকরকে সমগ্র দেশ থেকে এনে সমবেত করেছিল, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে পরাজয় বরণ করল তো বটেই, তদুপরি হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমানও নিয়ে এল।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, যাদুকরদের সর্দার মুসলমান হয়ে গেলে তার দেখাদেখি ফিরাউনের সম্প্রদায়ের ছয় লক্ষ লোক মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে এল এবং তা ঘোষণা করে দিল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের পূর্বে তো হযরত মূসা ও হারুন (আ) এ দু'জন ফিরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এরপরে সবচেয়ে বড় যাদুকর যে স্বীয় সম্প্রদায়ে বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং তার সাথে ছিল ছয় লক্ষ মানুষ, তারা সবাই মুসলমান হয়ে যাবার দরুন একটা বিরাট শক্তি ফিরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

সে সময় ফিরাউনের ব্যাকুলতা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে যাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ আরোপ করল যে, তোমরা মূসা (আ)-এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ কাজটি নিজের দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে করেছ। اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ অর্থাৎ এটা একটা ষড়যন্ত্র, যা তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভিতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলে। তারপর যাদুকরদের লক্ষ্য করে বলল, اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে! অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহস্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারও কাম্য ছিল যে, মূসা (আ)-এর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং লোকদেরও মুসলমান হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝেশুনেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে।

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে মূসা (আ)-এর মু'জিযা আর যাদুকরদের স্বীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে আদি বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকিটি করল এই যে, মূসা (আ)-এর কার্যকলাপ এবং যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ, যা একান্তই ফিরাউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জাতি ও জনসাধারণের সাথে যার কোনই সম্পর্ক ছিল না,–একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলল, لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا অর্থাৎ তোমরা এই ষড়যন্ত্র এ জন্য করেছ যে, তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও। এই চাতুর্য-চালাকির পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য যাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের ষড়যন্ত্রের যে কি পরিণতি, তোমরা এখনই দেখতে পাবে। অতঃপর তা পরিষ্কারভাবে বলল, لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়াব। বিপরীত দিকের কাটা অর্থ হলো ডান হাত, বাম পা। যাতে উভয় পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়বে।

ফিরাউন এই দুরবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় পারিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ এবং অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক প্রবল শক্তি যে, যখন তা কোন আত্মায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় উপকরণের মুকাবিলা করতে তৈরী হয়ে যায়।

যে যাদুকররা কয়েক ঘন্টা আগেও ফিরাউনকে নিজেদের খোদা বলে মানত এবং অন্যকেও এই পথভ্রষ্টতার দীক্ষা দিত, কয়েক মুহূর্তে ইসলামের কলেমা পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সে কি জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে তারা ফিরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠে : اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ। অর্থাৎ তুমি যদি আমাদেরকে হত্যা করে ফেল, তাতে কিছু এসে যায় না, আমরা আমাদের রবের কাছেই চলে যাব, যেখানে আমরা সব রকম শান্তি পাব। যাদুকররা যেহেতু ফিরাউনের প্রচণ্ড প্রতাপ ও শক্তি সম্পর্কে অবগত ছিল, সেহেতু তারা একথা বলেনি যে, আমরা তোমার আয়ত্তে আসব না, কিংবা আমরা মুকাবিলা করব, বরং তার হুমকিকে সত্য মনে করে উত্তর দিয়েছে,—একথা মানি যে, তুমি আমাদিগকে যেকোন রকম শাস্তি দিতে এই পৃথিবীতে ক্ষমতাবান, কিন্তু ঈমান আনার পর আমরা পার্থিব জীবনকে কোন বিষয়ই মনে করি না। পৃথিবী থেকে চলে গেলে এ জীবন থেকে উত্তম জীবন এবং স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ লাভ হবে। তাছাড়া এ অর্থও হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তোমার যা ইচ্ছা তাই করে নাও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা ও তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নীত হবো। আর তিনি অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারের বদলা নেবেন। তখন তোমার এ কাজের পরিণতি তোমার সামনে এসে হাযির হবে। অতএব, অপর এক আয়াতে এক্ষেত্রে সেই যাদুকরদের দ্বারা একথা

বর্ণিত রয়েছে ঃ فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা হুকুম দিয়ে দাও। ব্যাস, এতটুকুই তো যে, তোমার হুকুম আমাদের পার্থিব জীবনে চলতে পারে এবং তোমার রোষানলে আমাদের এ জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঈমান আনার পর আমাদের দৃষ্টিতে এই পার্থিব জীবনের সে গুরুত্বই রয়নি যা ঈমান আনার পূর্বে ছিল। কারণ আমরা জেনেছি যে, এ জীবন দুঃখে হোক সুখে হোক কেটে যাবেই। চিন্তা সে জীবনের ব্যাপারে করা কর্তব্য যার পরে আর মৃত্যু নেই এবং যার শান্তিও স্থায়ী, অশান্তিও স্থায়ী।

চিন্তা করার বিষয় যে, যারা কিছুক্ষণ আগেও নিকৃষ্টতম কুফরীতে আক্রান্ত ছিল, ফিরাউনের মত একজন বাজে লোককে খোদা হিসাবে মানত, আল্লাহর মহিমা-মহত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাদের মধ্যে সহসা এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেমন করে এল যে, এখন বিগত সমস্ত বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে একেবারে তওবা করে নিয়ে সত্য দীনের উপর এমন বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত দেখা যায় এবং দুনিয়া থেকে বিগত হয়ে যাওয়াকে এজন্য পছন্দ করে নেয় যে, এতে স্বীয় রবের কাছে চলে যেতে পারবে।

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহর রাহে জিহাদের সৎ সাহসই যে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাই নয়; বরং মনে হয়, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত মা'রেফত জ্ঞানের দ্বারও যেন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই ফিরাউনের বিরুদ্ধে এহেন সাহসী বিবৃতি দেওয়ার সাথে সাথে এ প্রার্থনাও করে যে, رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের পরিপূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দান কর।

এতে সেই মা'রেফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ যদি না চান, তাহলে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা কিছু কাজেরই নয়। কাজেই এখানে স্থিরতার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এ প্রার্থনা যেমন সত্যকে চিনে নেয়ার ফল, তেমনিভাবে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যও সর্বোত্তম উপায়, যাতে তারা তখন পড়েছিল। কারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তাই এমন বিষয় যা মানুষকে তার প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

ইউরোপের বিগত বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিশন তাদের রিপোর্টে লিখেছিল যে, মুসলমান, যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাসী, এরাই সে জাতি যে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাধিক বীরত্ব প্রদর্শন এবং ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণুতায় সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল।

কাজেই তখন জার্মান যুদ্ধবিশারদরা জাতিকে এই তাগিদ দিত যে, সেনাবাহিনীতে ধর্মভীরুতা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টির যেন চেষ্টা করা হয়। কারণ এতে যে শক্তি লাভ করা যায়, তা অন্য কোন কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। (তফসীরে আল-মানার)

যাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মূসা (আ)-এর এক বিরাট মু'জিযা ঃ পরিতাপের বিষয়, ইদানীং মুসলমানরা এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে চলছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার

প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফিরাউনের যাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝে নিয়েছিল। আর তা সারাজীবন আল্লাহর পরিচয়বিমুখ নাস্তিক কাফিরদের মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল তাই নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে দিয়েছিল। কাজেই হযরত মূসা (আ)-এর এই মু'জিযা লাঠি এবং জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফিরাউনের উপর হযরত মূসা ও হারুন (আ)-এর ভীতিজনক প্রতিক্রিয়া ঃ ফিরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার মূর্খ জাতিকে তার সাথে পুরাতন পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মত ছিল যে, ফিরাউনের সমস্ত রোষানল যাদুকরদের উপরেই শেষ হয়ে গেল। মূসা (আ) সম্পর্কে ফিরাউনের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হলো না, অথচ তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী। কাজেই তাদেরকে বলতে হলো ঃ

اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ অর্থাৎ তাহলে কি তুমি মূসা (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদের পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে?

এতে বাধ্য হয়ে ফিরাউন বলল ঃ سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءَ هُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَ هُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ অর্থাৎ তাঁর বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা সন্তানদের বাঁচতে দেব যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে। থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

তফসীরকার আলিমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফিরাউন এ কথা বলল যে, আমরা বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করব, কিন্তু হররত মূসা ও হারুন (আ) সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোন কথাই এল না। তার কারণ, হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফিরাউনের মনমস্তিষ্কে হযরত মূসা (আ)-এর ব্যাপারে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার করেছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, ফিরাউনের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মূসা (আ)-কে দেখত, তখনই অবচেতন অবস্থায় তার পেশাব বেরিয়ে যেত। আর এটা একান্তই সত্য, সত্যভীতির এমনি অবস্থা হয়ে থাকে।

هیبت حق است ایں از خلق نیست

(আর এটা হলো আল্লাহ্র ভীতি, মানুষের পক্ষ থেকে নয়।)

আর মাওলানা রূমী (র) বলেন ঃ

هرکے ترسید از حق وتقوی گزید
ترسد ازوے جن وانس وهرکه دید

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে, সমগ্র সৃষ্টি তাকে ভয় করতে থাকে।

এক্ষেত্রে ফিরাউনের সম্প্রদায় যে বলেছে, "মূসা (আ) আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদের পরিহার করে দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে" এতে বোঝা যাচ্ছে যে, ফিরাউন যদিও তার সম্প্রদায়ের সামনে স্বয়ং খোদায়ীর দাবিদার ছিল এবং رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলে থাকত, কিন্তু নিজেও মূর্তির আরাধনা-উপাসনা করত।

আর বনী ইসরাঈলদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পুত্র সন্তানদের হত্যা করার উৎপীড়নমূলক নৃশংস আইনের এই প্রবর্তন ছিল দ্বিতীয়বারের প্রবর্তন। এর প্রথম পর্যায় প্রবর্তিত হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-এর জন্মের পূর্বে। যার অকৃতকার্যতার ব্যাপারে তখনও সে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে অপদস্থ করতে চান, তার এমনি ব্যবস্থা হয়ে যায়, যার পরিণতি দাঁড়ায় একান্ত ধ্বংসাত্মক। অতঃপর পরবর্তীতে জানা যাবে, ফিরাউনের এই অত্যাচার-উৎপীড়ন কিভাবে তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছে।

قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ
يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا
مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۖ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ
يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾
وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ
يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ۗ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ
لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

(১২৮) মূসা বললেন তাঁর কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। (১২৯) তারা বলল,

আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদিগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর। (১৩০) তারপর আমি পাকড়াও করেছি—ফিরাউনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (১৩১) অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয়, তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ, তাদের অলক্ষণ যে আল্লাহ্‌রই ইলমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না। (১৩২) তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর যাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এই মজলিসের আলাপ-আলোচনার সংবাদ যখন বনী ইসরাঈলের কাছে গিয়ে পৌছল, তখন তারা ভয়ানক ভীত হলো এবং মূসা (আ)-এর কাছে তার উপায় জিজ্ঞেস করল। তখন) মূসা (আ) নিজ জাতিকে বললেন, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর আর দৃঢ় থাক (ভয় করো না) এ যমীন আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা এর মালিক (ও শাসক) বানাতে পারেন নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে। (সুতরাং কয়েকদিনের জন্য ফিরাউনকে দিয়ে দিয়েছেন) আর সর্বশেষ কৃতকার্যতা তারাই অর্জন করে, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (কাজেই তোমরা ঈমান ও পরহেযগারিতে স্থির থাক। ইনশাআল্লাহ্ এই রাজ্য তোমরাই পেয়ে যাবে। কিছুদিন অপেক্ষার প্রয়োজন।) সম্প্রদায়ের লোকেরা (অত্যন্ত বিমর্ষ ও বেদনা-বিধুর মনে, যার প্রাকৃতিক তাগিদ হলো অভিযোগের পুনরাবৃত্তি) বলতে লাগল যে, (হুযুর!) আমরা তো চিরকালই বিপদে রয়েছি। আপনার আগমনের পূর্বেও (ফিরাউন আমাদের বেগার খাটিয়েছে আর আমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করেছে।) আর আপনার আগমনের পরেও (নানা রকম কষ্ট দেয়া হচ্ছে। এমনকি এখন আবারও সন্তান হত্যার প্রস্তাব স্থির হয়েছে)। মূসা (আ) বললেন, (ভয় করো না) শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন। আর তার স্থলে তোমাদের এ যমীনের অধিপতি বানাবেন এবং তোমাদের কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করবেন (যে, তোমরা সে জন্য শুকরিয়া, ও তার মর্যাদা দান কর না অমনোযোগিতা প্রদর্শন ও পাপে লিপ্ত হও। এতে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান এবং পাপের জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর ফিরাউন এবং তার অনুচররা যখন বিরোধিতা ও অস্বীকৃতিতে উদ্বুদ্ধ হলো তখন) আমি ফিরাউনের অনুগামীদের [ফিরাউনসহ উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী (উক্ত পারার রুকূ) সেই বিপদের সম্মুখীন] করলাম ১. দুর্ভিক্ষে এবং ২. ফল-ফসলের স্বল্প উৎপাদনের মাধ্যমে, যাতে তারা (সত্য বিষয়টি) বুঝতে পারে (এবং তা বোঝার পর গ্রহণ করে নেয়)। বস্তুত (তবুও তারা বোঝেনি বরং তাদের অবস্থা এমন ছিল যে,) যখন তাদের মাঝে সচ্ছলতা (অর্থাৎ উৎপাদনে প্রাচুর্য) আসত তখন বলত যে, এটা আমাদের জন্য হওয়াই উচিত। (অর্থাৎ আমরা ভাগ্যবান, আর এটা তারই বিকাশ। এগুলোকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত মনে করে তার শুকরিয়া আদায় করবে এবং আনুগত্য প্রকাশ করবে তা নয়।) আর যদি তাদের

কোন রকম দুরবস্থার (যেমন, দুর্ভিক্ষ কিংবা উৎপাদন স্বল্পতার) সম্মুখীন হতে হতো, তখন তাকে মূসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করত [উচিত ছিল নিজের দুষ্কর্ম, কুফরী ও মিথ্যার পরিণতি ও শাস্তির কথা মনে করে তওবা করে নেয়া, কিন্তু তা না করে এগুলোকে মূসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের দুর্ভাগ্য বলে অভিহিত করত। অথচ এ সবই ছিল তাদের দুষ্কর্মের পরিণতি, যেমন বলা হচ্ছে] মনে রেখো, এ সমস্ত দুর্ভাগ্যের (কারণ) আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে রয়েছে। (অর্থাৎ তাদের যে কুফরী কাজকর্ম তা আল্লাহ্র জানাই রয়েছে। আর এসব দুর্ভাগ্য তারই পরিণতি এবং শাস্তি।) কিন্তু নিজেদের ভালমন্দতে পার্থক্য করার জ্ঞানের অভাবে তাদের অধিকাংশই (একে) জানতে পারছিল না। (বরং অধিকন্তু) একথা বলত, যত আশ্চর্য বিষয়ই আমাদের সামনে হাযির করে তার মাধ্যমে আমাদের উপর যাদু চালাও (না কেন) তবুও আমরা তোমার কথা কখনও মানব না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফিরাউন মূসা (আ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী ইসরাঈলদের প্রতি তার রাগ বাড়ল যে, তাদের ছেলেদের হত্যা করে মেয়েদের জীবিত রাখার আইন তৈরী করে দিল। এতে বনী ইসরাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, মূসা (আ)-এর জন্মের পূর্বে ফিরাউন তাদের উপর যে আযাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মূসা (আ)-ও যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রাসূলজনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দুটি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। এক. শত্রুর মুকাবিলায় আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং দুই. কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্য ধারণ। সেই সঙ্গে এ কথাও বাতলে দিলেন যে, এই অবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। এই হলো প্রথম আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছে ঃ

اِسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। তারপর বলা হয়েছে ঃ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র ভূমি আল্লাহ্র। তিনি যাকে ইচ্ছা এই ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকী পরহিযগাররাই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে। এখানে এই কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা যদি পরহিযগারী অবলম্বন কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা ও ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি।

জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোঘ ব্যবস্থা ঃ হযরত মূসা (আ) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী ইসরাঈলদের যে দার্শনিকসুলভ ব্যবস্থার দীক্ষা দান করেছিলেন, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই আমোঘ ব্যবস্থা, যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় সুনিশ্চিত। এই ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এটাই হলো এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশ্বস্রষ্টা যার সহায় থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশ্বের সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র সৃষ্টি হয় তাঁরই হুকুমের আওতাভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আপনা থেকেই তার উপকরণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই শত্রুর মুকাবিলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে না, যতটা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কাজে লাগতে পারে। অবশ্য তার শর্ত হলো এই যে, এই সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একান্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে, শুধু মুখে কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়।

দ্বিতীয় অংশটি হলো 'সবর'-এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী সবর-এর প্রকৃত অর্থ হলো ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীরস্থির থাকা এবং রিপুকে আয়ত্তে রাখা। কোন বিপদে ধৈর্য ধারণকে সে জন্যই 'সবর' বলা হয় যে, তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়।

যেকোন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যেকোন বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুদ্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সহ্য করার ক্ষমা অর্জন করে নিতে পারে, সে তার অধিকাংশ উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রাসূলে করীম (সা)-এ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নিয়ামত, যার চাইতে বিস্তৃত আর কোন নিয়ামত কেউ পায়নি।–(আবূ দাউদ)

হযরত মূসা (আ)-এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কুটিলমতি বনী ইসরাঈল কি বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল ঃ أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেওয়া হয়েছে, আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোন একজন পয়গম্বর আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই যদি বহাল থাকল, তাহলে আমরা কি করব।

সে জন্যই আবারও হযরত মূসা (আ) বাস্তব বিষয়টি স্পষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ বিষয়টি দূরে নয় যে, যদি তোমরা আমার উপদেশ মান্য কর, তাহলে শীঘ্রই তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর দেশের উপর স্থাপিত হবে তোমাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা। কিন্তু সাথে সাথে তিনি একথাও বলে দিলেন ঃ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ তার মানে এ দুনিয়ায় পার্থিব কোন রাজ্য বা প্রভুত্ব মুখ্য বিষয় নয়, বরং পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত সততার বিস্তার এবং সর্ব প্রকার অন্যায়-অনাচার প্রতিহত করার জন্যই কাউকে কোন রাজ্য বা প্রভুত্ব দান করা হয়। তাই তোমরা মিসর দেশের আধিপত্য লাভ করবে, তখন সতর্ক থেকো, যাতে তোমরা রাজ্য ও শাসন ক্ষমতার নেশায় তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতির কথা ভুলে না যাও।

রাষ্ট্রক্ষমতা রাষ্ট্রনায়ক শ্রেণীর জন্য পরীক্ষাস্বরূপ ঃ এ আয়াতে যদিও বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা সমগ্র শাসক শ্রেণীকেই এতদ্বারা সতর্ক করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে রাজ্য হোক বা প্রভুত্ব, তাতে একচ্ছত্র অধিকার হলো আল্লাহ্র।

তিনিই মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন এবং যখন ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নিয়ে যান। تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ আয়াতের মর্মও তাই। তদুপরি যাদেরকে পার্থিব রাজ্য দান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা শাসক ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য একটা পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে যে, সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উদ্দেশ্য–ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং নির্দেশিত কাজের প্রতি উৎসাহ দান ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব, কতটা বাস্তবায়িত করে।

'বাহ্‌রে মুহীত' নামক তফসীর এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, বনী আব্বাসের দ্বিতীয় খলীফা মনসূরের খিলাফত প্রাপ্তির পূর্বে একদিন আমর ইবনে ওবায়েদ (র) এসে উপস্থিত হলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন ঃ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ যাতে তাঁর (মনসূরের) খিলাফত প্রাপ্তির সুসংবাদ ছিল। ঘটনাক্রমে এর পরেপরেই মনসূর খলীফা হয়ে যান; আর হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (র)-এর নিকট গিয়ে হাযির হন এবং আয়াতের মাধ্যমে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (র) জওয়াব দেন যে, হ্যাঁ খলীফা হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু একটা বিষয় এখনও বাকি রয়েছে। অর্থাৎ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ এর মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, দেশের খলীফা অথবা আমীর হয়ে যাওয়া কোন গৌরবের বা আনন্দের বিষয় নয়। কেননা এরপরে আল্লাহ্ তা'আলা লক্ষ্য করেন যে, খিলাফত বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রীতিনীতি কি ও কেমনভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে। এখন হলো তার সে দেখার ও লক্ষ্য করার সময়।

অতঃপর উল্লিখিত আয়াতে কৃত ওয়াদার সম্পাদন এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নানা রকম আযাবের সম্মুখীন এবং শেষ পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়গুলো কিছুটা সবিস্তারে বলা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম আযাবটি হলো দুর্ভিক্ষ, পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্মূল্য,—ফিরাউনের সম্প্রদায় যার সম্মুখীন হয়েছিল।

তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, এই দুর্ভিক্ষ তাদের উপর ক্রমাগত সাত বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল। এ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গেই দুটি শব্দ سنين ও نقص ثمرات বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত কাতাদাহ্ (রা) প্রমুখ বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষ ও খরাসংক্রান্ত আযাব ছিল গ্রামবাসীদের জন্য আর ফলমূলের স্বল্পতা ছিল শহরবাসীদের জন্য। কেননা সাধারণত গ্রাম এলাকায়ই শস্যের উৎপাদন হয় বেশি এবং শহরে বেশি থাকে ফলমূলের বাগবাগিচা। তাতে এদিকেই ইঙ্গিত হয় যে, খরার কবল থেকে শস্যক্ষেত্র ফলের বাগান, কোনটাই রক্ষা পায়নি।

কিন্তু কোন জাতির উপর যখন আল্লাহ্‌র কহর বা প্রচণ্ড কোপদৃষ্টি পতিত হয় তখন সঠিক বিষয় তাদের উপলব্ধিতে আসে না। ফিরাউনের সম্প্রদায়ও এই কহরেই পতিত হয়েছিল। আযাবের এই প্রাথমিক প্রচণ্ডতায় তাদের হুঁশ ফেরেনি। তারা এতটুকু সতর্ক হলো না, বরং এ দুর্ভিক্ষ এবং এ ধরনের অন্যান্য যেকোন আগত বিপদ-আপদকে তারা বলতে লাগল যে, এগুলো মূসা (আ)-এর কওমের অমঙ্গল। فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

يَطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ অর্থাৎ যখন তারা কোন কল্যাণ ও আরাম-আয়েসপ্রাপ্ত হয়, তখন বলে যে, এগুলো আমাদের প্রাপ্য; আমাদের পাওয়াই উচিত। আর যখন কোন বিপদ বা অকল্যাণের সম্মুখীন হয়, তখন বলে, এসবই মূসা (আ) এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীদের দুর্ভাগ্যের প্রতিক্রিয়া! আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেন ঃ اَلَا اِنَّمَا طٰئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ এখানে طائر শব্দটির আভিধানিক অর্থ উড়ন্ত জীব বা পাখি। আরবরা পাখির ডান কিংবা বাঁ দিকে উড়াল দ্বারা ভবিষ্যৎ ভাগ্যলক্ষণ ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করত। সেজন্যই শুধু মঙ্গলামঙ্গল সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কথনকেও 'তায়ের' বলা হয়ে থাকে। এ আয়াতে طائر অর্থও তাই। কাজেই আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, ভাগ্যলক্ষণ ভাল হোক বা মন্দ, তা সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। এই পৃথিবীতে যা কিছু প্রকাশ পায়, তা আল্লাহ্র কুদরতে ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। তাতে না আছে কারও নহুছতের হাত, না আছে বরকতের। আর পাখিদের ডানে কিংবা বামে উড়িয়ে যে 'ফাল' বা ভবিষ্যৎ ভাগ্যপরীক্ষা করা হয় এবং উদ্দেশ্যর ভিত্তি রচনা করা হয়, তা সবই তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও মূর্খতা।

আর শেষ পর্যন্ত ফিরাউন মূসা (আ)-এর সমস্ত মু'জিযাকে যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে ঘোষণা করল ঃ مهما تاتنا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين অর্থাৎ আপনি যত রকম নিদর্শন উপস্থাপন করে আমাদের উপর স্বীয় যাদু চালাতে চেষ্টা করুন না কেন, আমরা কখনও আপনার উপর ঈমান আনব না।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

(১৩৩) সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুত

তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। (১৩৪) আর তাদের উপর যখন কোন আযাব পড়ে তখন বলে, হে মূসা ! আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদিগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমাদের সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলদের যেতে দেব। (১৩৫) অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত—যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছানো উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম—বস্তুত তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[যখন ঔদ্ধত্য অবলম্বন করল, তখন) পুনরায় আমি [উল্লিখিত দু'টি বিপদ ছাড়াও এই বিপদগুলো তাদের উপর আরোপ করলাম (৩) তাদের উপর প্রবল বৃষ্টিসহ] তুফান পাঠিয়ে দিলাম (যাতে তাদের সম্পদ ও প্রাণনাশের আশংকা দেখা দিল)। আর এতে ঘাবড়ে গিয়ে মূসা (আ)-এর কাছে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল যে, আমাদের উপর থেকে এ বিপদ সরাবার ব্যবস্থা করুন, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং আপনি যা বলবেন তার অনুসরণ করব। অতঃপর যখন সে সমস্ত বিপদ দূর হয়ে গেল এবং মনোমত শস্যাদি উৎপন্ন হলো, তখন আবার নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল যে, এবার তো রক্ষা পেলাম; সম্পদও প্রচুর হবে। আর তেমনিভাবে নিজেদের কুফরী ও গুমরাহীকে আঁকড়ে রইল, তখন আমি তাদের শস্য ক্ষেতে (৪) পঙ্গপাল (পাঠিয়ে দিলাম) আর [পুনরায় যখন নিজেদের শস্যক্ষেতগুলোকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখল, তখন আবার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তেমনিভাবে ওয়াদা-প্রতিজ্ঞা করল। এভাবে পুনরায় যখন হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ায় সে বিপদ খণ্ডে গেল এবং শস্যাদি যথারীতি ঘরে তুলে আনল, তখন আবার তেমনি পূর্বের মতই নিশ্চিন্ত হয়ে গেল এবং ভাবল, এবার তো শস্যাদি আয়ত্তেই এসে গেছে, কাজেই আবারও নিজেদের কুফরী ও বিরোধিতায় আঁকড়ে থাকল] তখন আমি সে শস্যে (৫) ঘুণ পোকা (জন্মিয়ে দিলাম) আর যখন ঘাবড়ে গিয়ে আবার তেমনিভাবে ওয়াদা-প্রতিজ্ঞা করে দোয়া করাল এবং তাতে সে বিপদও কেটে গেল এবং নিশ্চিন্ত হয়ে গেল যে, এবার কুটে-পিষে খাওয়া যাবে। কাজেই আবারও সেই কুফরী এবং বিরোধিতা আরম্ভ করল। তখন আমি তাদের খাদ্যকে এখানে বিস্বাদ করে দিলাম যে, তাতে (৬) ব্যাঙ [এসে ভিড় করে তাদের খাবার পাত্রে ও হাড়িতে পড়তে শুরু করল এবং তাতে সমস্ত খাবার বিনষ্ট হয়ে গেল। এমনকি ঘরে বসাও দুষ্কর হয়ে পড়ল আর পানি পান করাও দুষ্কর হয়ে পড়ল যে, (৭) তাদের সব] পানি মুখে নেওয়ার সাথে সাথেই রক্তে পরিণত হয়ে যেত। (যা হোক, তাদের উপর এসব বিপদ আরোপিত হয়েছিল। এসবই মূসা (আ)-এর প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছিল যা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ ও বিরোধিতার কারণে। (আর লাঠি ও কিরণময় হাতের মু'জিযাসহ এই সাতটি মু'জিযাকে বলা হয় আয়াতে তিস্‌আ' বা নয় নিদর্শন। বস্তুত এই মু'জিযাসমূহ দেখার

পর শিথিল হয়ে পড়াই উচিত ছিল)। কিন্তু তারা(তখনও) তাকাব্বুর (-ই) করতে থাকে আর তারা ছিলও কিছুটা অপরাধপ্রবণ লোক (যে এতসব কঠিন বিপদের পরেও তা থেকে বিরত হচ্ছিল না)। বস্তুত তাদের উপর যখন উল্লিখিত বিপদের কোন একটি আযাব আসত, তখন তারা বলত, হে মূসা ! আমাদের জন্য আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট সে বিষয়ে প্রার্থনা করুন, যে বিষয় তিনি আপনার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। (আর তা হলো আমাদের বিরত হয়ে যাওয়ার পর বিপদমুক্ত করা)। আমরা এখন প্রতিজ্ঞা করছি যে, আপনি যদি এ আযাবটি আমাদের উপর থেকে সরিয়ে দেন (অর্থাৎ দোয়া করে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই আপনার কথামত ঈমান আনব এবং আমরা বনি ইসরাঈলদেরকেও মুক্তি দিয়ে আপনার সাথে দিয়ে দেব)। অতঃপর মূসা (আ)-এর দোয়ার বরকতে যখন তাদের উপর থেকে সে আযাবকে নির্ধারিত সময়ের জন্য সরিয়ে রাখা হতো, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে আরম্ভ করত (যেমন, উপরে বর্ণিত হয়েছে)। তারপর যখন নানাভাবে দেখে নিলাম যে, তারা নিজেদের অসদাচরণ থেকে কিছুতেই বিরত হচ্ছে না, তখন আমি তাদের উপর পূর্ণ প্রতিশোধ নিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে সাগরে নিমজ্জিত করে দিলাম (যেমন, অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। তার কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং সেগুলোর প্রতি সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করত। আর মিথ্যারোপ ও গাফলতীও যেমন তেমন নয়, বরং একান্ত বিদ্বেষ ও হঠকারিতার সাথে আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে করে ভঙ্গ করেছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলোতে ফিরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মূসা (আ)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফিরাউনের যাদুকররা মূসা (আ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ঈমান এনেছে, কিন্তু ফিরাউনের সম্প্রদায় তেমনি ঔদ্ধত্য ও কুফরীতে আঁকড়ে রয়েছে।

এই ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) বিশ বছর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদের আল্লাহ্র বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহবান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে নয়টি মু'জিযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফিরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্যপথে আনা। وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ আয়াতে এই নয়টি মু'জিযা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এই নয়টি মু'জিযার মধ্যে সর্বপ্রথম দু'টি মু'জিযা অর্থাৎ লাঠি সাপে পরিণত হওয়া এবং হাত কিরণময় হওয়া ফিরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই যাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ) জয়লাভ করেন। তার পরের একটি মু'জিযা যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফিরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন—যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ

থেকে মুক্তি লাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা (আ)-এর সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তা হলো আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

পরবর্তী ছয়টি মু'জিযার বিষয় আলোচিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ। অর্থাৎ—অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুণ পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এতে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হলো এই যে, এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছুসময় বিরতির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আযাব পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে মুনযির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আযাব ফিরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হতো।

ইমাম বগভী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফিরাউনের সম্প্রদায়ের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব চেপে বসে এবং হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ায় তা রহিত হয়ে যায়, এবং তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মূসা (আ) দোয়া করেন, হে আমার পরওয়ারদিগার, এরা এতই উদ্ধত যে, দুর্ভিক্ষের আযাবেও প্রভাবিত হয়নি; নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। এবার তাদের উপর এমন কোন আযাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও পরবর্তীদের জন্য যা হবে ভর্ৎসনামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ্ প্রথমে তাদের উপর নাযিল করেন তুফানজনিত আযাব। প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরদের মতে তুফান অর্থ পানির তুফান; অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে এসে যায়। না থাকে কোথাও শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমিতে চাষবাসের কোন ব্যবস্থা। আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফিরাউন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল বনি ইসরাঈলদেরও জমি-জমা ও ঘরবাড়ি। অথচ বনি ইসরাঈলদের ঘরবাড়ি, জমি-জমা সবই ছিল শুষ্ক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের পানি ছিল না, অথচ ফিরাউন সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ জলের নীচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফিরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আবেদন করল, আপনার পরওয়ারদিগারের দরবারে দোয়া করুন তিনি যেন আমাদের থেকে এ আযাব দূর করে দেন। তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনি ইসরাঈলদের মুক্ত করে দেব। মূসা (আ)-এর দোয়ায় জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য-ফসল অধিকতর সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, আদতে এই তুফান তথা জলোচ্ছ্বাস কোন আযাব ছিল না; বরং আমাদের ফায়দার জন্যেই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের

শস্যভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং মূসা (আ)-এর এতে কোন দখল নেই। এসব কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

এভাবে এরা মাসাধিককাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ্ তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হলো না। তখন দ্বিতীয় আযাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য-ফসল ও বাগানের ফল-ফলারী খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ আযাবের ক্ষেত্রেও মূসা (আ)-এর মু'জিযা পরিলক্ষিত হয় যে, এই সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিবৃতী বা ফিরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্র ও ঘরবাড়িতে ছেয়ে গিয়েছিল। সংলগ্ন ইসরাঈলীদের ঘরবাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফিরাউনের সম্প্রদায় চীৎকার করতে লাগল এবং মূসা (আ)-এর নিকট আবেদন জানাল, এবার আপনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করে আযাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা ওয়াদা করছি যে, ঈমান আনব এবং বনি ইসরাঈলদের মুক্তি দিয়ে দেব। তখন মূসা (আ) আবার দোয়া করলেন এবং এ আযাবও সরে গেল। আযাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য মওজুদ রয়েছে, যা আমরা আরও বৎসরকাল খেতে পারব। তখন আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হলো। ঈমানও আনল না, বনি ইসরাঈলদেরও মুক্তি দিল না।

আবার আল্লাহ্ তা'আলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এই অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আযাব قُمَّلُ (কুম্মালা)। قمل সেই উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুলে বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোন কোন সময় খাদ্যশস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণত ঘুণ এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কুম্মালের এ আযাবে সম্ভবত উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্যশস্যেও ঘুণ ধরেছিল এবং শরীরে, মাথায়ও উকুন পড়েছিল বিপুল পরিমাণে।

সে ঘুণের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল-ভ্রূ পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল।

শেষে আবার ফিরাউনের সম্প্রদায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং মূসা (আ)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ায় এ আযাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল অনিবার্য, এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে! তারা অব্যাহতি লাভের সাথে সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আবার এক মাসের সময় দেওয়া হলো, যাতে প্রচুর আরাম-আয়েসে কাটাল। কিন্তু যখন এই অবকাশেরও কোন সুযোগ নিল না, তখন চতুর্থ আযাব হিসাবে এসে হাযির হলো ব্যাঙ। এত অধিক সংখ্যায় ব্যাঙ তাদের ঘরে জন্মাল যে, কোনখানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত উঠত ব্যাঙের স্তূপ। শুতে গেলে ব্যাঙের স্তূপের নীচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। রান্নার হাড়ি, আটা-চালের মটকা বা টিন সবকিছুই ব্যাঙে ভরে যেত। এই আযাবে

অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে লাগল এবং আগের চাইতেও পাকাপাকি ওয়াদার পর হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ায় এ আযাবও সরলো।

কিন্তু যে জাতির উপর আল্লাহ্‌র গযব চেপে থাকে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং বলতে আরম্ভ করল যে, এবার তো আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, মূসা (আ) মহাযাদুকর, আর এসবই তাঁর যাদুর কীর্তি-কাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অব্যাহতি দান করলেন, কিন্তু তারা এরও কোন সুযোগ নিল না। তখন এল পঞ্চম আযাব 'রক্ত'। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউয থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না করার জন্য তৈরি করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত আযাবের বেলায়ই হযরত মূসা (আ)-এর এ মু'জিযা বরাবর প্রকাশ পেতে থাকে যে, যেকোন আযাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও সুরক্ষিত। রক্তের আযাবের সময় ফিরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা বনি ইসরাঈলদের বাড়ি থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তরখানে বসে কিবতী ও বনী ইসরাঈল খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনি ইসরাঈলেরা তুলত তা যথারূপ থাকত, কিন্তু যে লোকমা বা পানির ঘোট কোন কিবতী মুখে তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আযাবও পূর্বরীতি-নিয়ম অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী জাতি চীৎকার করতে লাগল। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আযাবও সরে গেল, কিন্তু এরা তেমনি গুমরাহীতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কোরআন বলেছে ঃ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ অর্থাৎ এরা আত্মগর্ব প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

অতঃপর ষষ্ঠ আযাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে رِجز-এর নাম বলা হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও رِجز (রিজয) বলা হয়। তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ওদের উপর প্লেগের মহামারী চাপিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাদের ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দোয়া করা হলে প্লেগের আযাবও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আযাব। তাহলো এই যে, তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা ও আসবাবপত্র ছেড়ে মূসা (আ)-এর পশ্চদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণত হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ

فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ
وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ
اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ بِمَا صَبَرُوْا ۚ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ
وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ (১৩৭) وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى
قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا
كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ (১৩৮) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ
فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (১৩৯) قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ
فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (১৪০) وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ
سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِيْ
ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (১৪১)

(১৩৭) আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের, যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনি ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরি করেছিল ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল। (১৩৮) বস্তুত আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনি ইসরাঈলদের। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। বলতে লাগল, হে মূসা ! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। (১৩৯) এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভুল ! (১৪০) তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহ্‌কে ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৪১) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি

তোমাদের ফিরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি; তারা তোমাদের দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের মেরে ফেলত এবং মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রতি তোমাদের পরওয়ারদিগারের বিরাট পরীক্ষা রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে জলমগ্ন করে) আমি সেসব লোককে যারা দুর্বল বলে পরিগণিত হতো (অর্থাৎ বনি ইসরাঈলকে) সে ভূমির পূর্ব ও পশ্চিমের (অর্থাৎ সব দিকের) মালিক বানিয়ে দিয়েছি–যাতে আমি বরকত রেখেছি। [বাহ্যিক বরকত হলো ফল-ফসলের অধিক উৎপাদন। আর অভ্যন্তরীণ বরকত হলো আম্বিয়া (আ) ও বহু সাধক মনীষীবৃন্দের আবাসভূমি ও সমাধিস্থান হিসেবে]। আর আপনার পরওয়ারদিগারের উত্তম ওয়াদা বনি ইসরাঈলদের পক্ষে তাদের ধৈর্যের দরুন পূর্ণ করা হয়েছে। [যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।اصبروا। (ইস্‌বিরু) বলে]। আর আমি ফিরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের নির্মিত, প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় কীর্তি এবং তারা যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী করেছিল সে সবগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছি। বস্তুত (যে সাগরে ফিরাউনকে নিমজ্জিত করা হয়েছে) আমি বনি ইসরাঈলদের তা পার করে দিয়েছি (যে কাহিনী সূরা শুআরায় বর্ণিত রয়েছে)। অতঃপর (সে সাগর পাড়ি দেবার পর) তারা (এমন) এক জাতি (জনপদ) অতিক্রম করল, যারা কতিপয় মূর্তিকে জড়িয়ে বসেছিল (অর্থাৎ তারা সেগুলোর পূজা-পাট করছিল)। বলতে লাগল, হে মূসা ! আমাদের জন্যও এমনি একজন (শরীরী) উপাস্য নির্ধারিত করে দিন, যেমন ওদের এই উপাস্যগুলো। তিনি বললেন, বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে কঠিন মূর্খতা বিদ্যমান। এরা যে কাজে লিপ্ত (তাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) ধ্বংস করে দেওয়া হবে (যেমন, আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি রয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর জয়ী করে তাবৎ মিথ্যা ধ্বংস করে দিয়ে থাকেন)! তাছাড়া তাদের এ কাজটি ভিত্তিহীনও বটে। (কারণ শির্‌ক বা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা যে নিতান্ত অবৈধ, একথা নিশ্চিত ও স্পষ্ট)। তিনি (আরও) বললেন, আল্লাহ্ ছাড়া কি অপর কোন কিছুকে তোমাদের উপাস্য করে দেব, অথচ তিনি তোমাদের (কোন কোন নিয়ামতের দিক দিয়ে) সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদা দান করেছেন! আর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর বক্তব্যের সমর্থনকল্পে বললেন ঃ সে সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের ফিরাউনের সহচরদের অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম অথচ তারা তোমাদের ভীষণ কষ্ট দিত। তোমাদের পুত্রদের নির্বিচারে হত্যা করত আর তোমাদের কন্যাদের নিজেদের বেগার খাটার জন্য এবং সেবার জন্য জীবিত রাখত। বস্তুত এ ঘটনাতে তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে অতি কঠিন পরীক্ষা নিহিত ছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ফিরাউন সম্প্রদায়ের ক্রমাগত ঔদ্ধত্য এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে তাদের সতর্কীকরণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। অতঃপর

উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাদের অশুভ পরিণতি এবং বনি ইসরাঈলদের বিজয় ও কৃতকার্যতার আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا অর্থাৎ যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।

কোরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে "যে জাতিকে ফিরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন করেছিল," বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, 'যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল'। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোন সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে। কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্রই হাতে।

تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

আর যমীনের মালিক বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে اَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'ওয়ারেস' বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্বপুরুষের সম্পদের অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধনসম্পদের মালিক তাঁর সন্তানরাই হবে, তেমনিভাবে আল্লাহ্র জানামতে বনী ইসরাঈলরা পূর্ব থেকেই কওমে ফিরাউনের ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল।

مَشَارِقْ শব্দটি مَشْرِقْ-এর বহুবচন। আর مَغَارِبْ হচ্ছে مَغْرِبْ-এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশারিক' (উদয়াচলসমূহ) এবং 'মাগারিব' (অস্তাচলসমূহ) বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও যমীন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে–যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কওমে-ফিরাউন ও কওমে-আ'মালেকাহ্কে ধ্বংস করার পর বনী ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

আর اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا বলে এ কথাও ব্যক্ত করে দিয়েছেন যে, এই ভূমিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বরকত ও আশীর্বাদ নাযিল করেছেন। শাম বা সিরিয়া সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনেরই বিভিন্ন আয়াতে তার বরকতময় স্থান হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهَا-তেও এ কথাই বলা হয়েছে। এমনিভাবে মিসরভূমির অসাধারণ উর্বরতা বরকতময়তাও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এবং প্রত্যক্ষতার দ্বারা প্রমাণিত হয়। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেছেন, "মিসরের নীল দরিয়া হলো নদীসমূহের সর্দার"। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন যে, বরকতের দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে মিসরে আর বাকি এক ভাগ রয়েছে সমগ্র ভূভাগে।–(বাহ্রে-মুহীত)

সারকথা, যে জাতি অহংকার ও ঔদ্ধত্যে নেশাগ্রস্ত, সে জাতি নিজেদের সংকীর্ণতার দরুন অপর

জাতিকে হীন ও দুর্বল মনে করে রেখেছিল, আমি তাদেরকেই সেই উদ্ধত অহংকারীদের ধনসম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানিয়ে প্রতীয়মান করেছি যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ওয়াদা অবশ্যই সত্য হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে ঃ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِ يْلَ অর্থাৎ আপনার পরওয়ারদিগারের ভাল ও মঙ্গলজনক ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের অনুকূলে পূর্ণ হয়েছে।

এই ভাল বা মঙ্গলজনক ওয়াদা বলতে হয় عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الارض। অর্থাৎ 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে নিধন করে তোমাদের তাদের ভূমির মালিক বানিয়ে দেবেন' বলে হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা বোঝানো হয়েছে। অথবা কোরআনের অন্যত্র স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, সেটিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَحْذَرُوْنَ -

অর্থাৎ আমি চাই যে জাতির প্রতি সহায়তা দান করতে, যাকে এ দেশে হীন ও দুর্বল বলে মনে করা হয়েছে। আর তাদেরকেই সর্দার ও শাসক বানিয়ে দিতে; তাদেরকেই এ জমির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করতে এবং এই জমিতে তাদেরকেই এ হস্তক্ষেপের অধিকার দান করতে চাই। পক্ষান্তরে ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সেনাকে সে বিষয়টি অনুষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিতে চাই, যার ভয়ে ওরা মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা করে চলছে।

প্রকৃতপক্ষে এতদুভয় ওয়াদাই এক। আল্লাহ্র ওয়াদার ভিত্তিতেই মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে ওয়াদা করেছিলেন। এ আয়াতে সে ওয়াদা পূরণের কথা تمت শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ ওয়াদার সমাপ্তি বা পূর্ণতা তখনই হয়, যখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়।

এরই সঙ্গে বনী ইসরাঈলের প্রতি এই দান এবং অনুগ্রহের কারণ ব্যক্ত করে দিয়েছেন بِمَا صَبَرُوْا বলে। অর্থাৎ যেহেতু তারা আল্লাহ্র পথে কষ্ট সয়েছে এবং তাতে অটল রয়েছে।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমার এই দান ও অনুগ্রহ শুধু বনী ইসরাঈলদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না, বরং তা ছিল তাদের সবর ও দৃঢ়তার ফলশ্রুতি। যে ব্যক্তি কিংবা জাতিই এরূপ করবে, স্থান-কাল-নির্বিশেষে তার জন্য আমার এ দান ও অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকবে।

قضائے بدر پیدا کرکہ فرشتے تیری نصرت کو
اترسکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

হযরত মূসা (আ) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে এ কথাই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মুকাবিলা করাই কৃতকার্যতার চাবিকাঠি। হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেছেন—এ

আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এমন কোন লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সেক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হলো তার মুকাবিলা না করে, বরং সবর করা। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উৎপীড়নের মুকাবিলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যর উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, কি অকৃতকার্য হোক—সে ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন কোন লোক মানুষের উৎপীড়নের মুকাবিলা ধৈর্য বা সবর এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ্ স্বয়ং তার জন্য পথ খুলে দেন।

আর যেভাবে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের সাথে তাদের সবর ও দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় এবং যমীনের উপরে শাসনক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী (সা)-এর উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ –

আর যেভাবে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ্র ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল, মহানবী (সা)-এর উম্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহ্র সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে; সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে।–(রূহুল-বয়ান)

এখানে এ প্রশ্ন করা যায় না যে, বনী ইসরাঈলরা তো ধৈর্যের সাথে কাজ করেনি বরং মূসা (আ) যখন ধৈর্যের উপদেশ দেন, তখন রুষ্ট হয়ে বলে উঠল ঃ اُوْذِيْنَا সব সময়ই আমরা দুঃখ–দুর্দশার সম্মুখীন রয়েছি। তার কারণ, প্রথমত ফিরাউনের উৎপীড়নের মুকাবিলায় তাদের ধৈর্য এবং ঈমানের উপর তাদের দৃঢ়তা সর্বক্ষণই প্রতীয়মান। যদি কখনও হঠাৎ একআধটা অনুযোগ বেরিয়েও যায়, তবে তা ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলদের এ কথাটি অভিযোগ অনুযোগ ছিলই না, বরং দুঃখ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেও বলে থাকতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ অর্থাৎ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি সে সমস্ত বস্তু, যা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় তৈরী করে থাকত এবং সেই প্রাসাদ ও বৃক্ষরাজি যেগুলোকে তারা উঁচিয়ে তুলত। ফিরাউন ও ফিরাউনের সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা, ব্যবহার্য আসবাবপত্র এবং মূসার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। আর وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ অর্থাৎ যা কিছু তারা উঁচিয়ে তুলত। এতে উচ্চ প্রাসাদ এবং দালান-কোঠাও যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে বড় বড় বৃক্ষরাজি এবং আঙ্গুরের লতা যা মাচা দিয়ে ছাদের উপর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতো—এসবও অন্তর্ভুক্ত।

এ পর্যন্ত ছিল কওমে-ফিরাউনের ধ্বংসের আলোচনা। তারপর থেকে শুরু হচ্ছে বনী ইসরাঈলের বিজয় ও কৃতকার্যতা লাভের পর তাদের ঔদ্ধত্য, মূর্খতা ও দুষ্কর্মের বিররণ, যা আল্লাহ্র অসংখ্য নিয়ামত প্রত্যক্ষ করার পরেও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য

হলো, রাসূলুল্লাহকে সান্ত্বনা দান যে, পূর্ববর্তী রাসূলরাও স্বীয় উম্মতের দ্বারা ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বর্তমান ঔদ্ধত্য ও উৎপীড়ন কিছুটা লাঘব হয়ে যাবে।

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলদের সাগর পার করে দিয়েছি।

ঘটনাটি হলো এই যে, এই জাতি মূসা (আ)-এর মু'জিযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফিরাউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এ দেখে বনী ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতিনীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই মূসা (আ)-এর নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোন একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে ইবাদত-উপাসনা করতে পারি ; আল্লাহ্র সত্তা তো আর সামনে আসে না। মূসা আলাইহিস্সালাম বললেন ঃ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বড় মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে! এরা মিথ্যার অনুগামী। ওদের এসব ভ্রান্ত রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য বানিয়ে দেব ? অথচ তিনিই তোমাদের দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ তখন মূসা (আ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিল তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম।

অতঃপর বনী ইসরাঈলদের তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফিরাউনের কওমের হাতে তারা এমনই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদের হত্যা করে নারীদের অব্যাহতি দেওয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর বদৌলতে এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল-আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এ যে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ
رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ
فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

---

(১৪২) আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই

হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[আর বনী ইসরাঈলরা যখন যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হলো, তখন মূসা (আ)-এর নিকট আবেদন জানাল যে, এখন যদি আমরা কোন শরীয়ত প্রাপ্ত হই, তাহলে নিশ্চিন্ত মনে সেমতে কাজ করতে পারি। তখন মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করলেন। আল্লাহ্ সে কাহিনীই এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,] আমি মূসা (আ)-কে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করলাম (যাতে তিনি তূর পর্বতে এসে ই'তিকাফ করেন। তখনই তাঁকে শরীয়ত এবং তওরাত গ্রন্থ দেওয়া হবে।) আর ত্রিশ রাত্রির উপসংহারে আরও দশ রাত্রি বাড়িয়ে দিলাম। অর্থাৎ তওরাত দান করে তাতে আরও দশটি রাত্রি ইবাদতের জন্য বাড়িয়ে দিলাম, যার কারণ সূরা বাকারায় বর্ণিত রয়েছে। এভাবে তাঁর পরওয়ারদিগারের (নির্ধারিত) সময় (সব মিলে) চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা (আ) যখন তূর পর্বতে আসতে লাগলেন, তখন স্বীয় ভ্রাতা হারুন (আ)-কে বললেন, আমার পরে আপনি এদের ব্যবস্থা নেবেন এবং তাদের সংশোধন করতে থাকবেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের পথ অবলম্বন করবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলের সেই ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে, যা ফিরাউনের জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে বনী ইসরাঈলদের নিশ্চিন্ত হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, তখন বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আবেদন করেছিল যে, এখন আমরা নিশ্চিন্ত। এবার যদি আমাদের কোন কিতাব এবং শরীয়ত দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিন্ত মনে সে মতে আমল করতে পারি। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন।

এতে وَاعَدْنَا শব্দটি وعده (ওয়াদাহ্) থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হলো এই যে, কাউকে লাভজনক কোন কিছু দেবার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেওয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূসা (আ) ত্রিশ রাত তূর পর্বতে ইতিকাফ ও আল্লাহ্র ইবাদত-আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাতের উপর আরও দশ রাত বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।

وَاعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর পক্ষ থেকে ছিল তওরাত দানের প্রতিশ্রুতি; আর মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত যাবত ইতিকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَعَدْنَا না বলে وَاعَدْنَا বলা হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয়।

প্রথমত, চল্লিশ রাত ইতিকাফ করানোই যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি ? একত্রেই চল্লিশ রাতের ইতিকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল ? আল্লাহ্‌র হিকমতের সীমা-পরিসীমা কে জানবে! তবুও আলিম সমাজ এর কিছু কিছু হিকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হলো ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোন কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করতে হলে প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা না হয়; বরং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা। তফসীরে কুরতুবীতে আরও বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদের শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কাউকে যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে আরও সময় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, মূসা (আ)-এর সাথে হয়েছে—ত্রিশ রাতে যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্য ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ এই দশ রাত বৃদ্ধির ব্যাপারে তফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাতের ইতিকাফের সময় হযরত মূসা (আ) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোযাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোন ইফতার করেন নি। ত্রিশ রোযা শেষ করার পর ইফতার করে তূর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাযির হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রোযাদারের মুখ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মেসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন, কাজেই আর দশটি রোযা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়।

কোন কোন তফসীর-সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ রোযার পর হযরত মূসা (আ) মেসওয়াক করে ফেলেছিলেন, যার ফলে রোযাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, রোযাদারের জন্য মেসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ প্রথমত এই রেওয়ায়েতের কোন সনদ নেই। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু মূসা (আ)-এরই জন্য; সাধারণ নির্দেশ নয়। অথবা মূসা (আ)-এর শরীয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য ছিল যে, রোযার সময় মেসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীয়া বা মহানবী (সা)-এর শরীয়তে রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ خير خصائل الصيام السواك অর্থাৎ রোযাদারের সর্বোত্তম কাজ হলো মেসওয়াক করা। এই রেওয়ায়েতটি জামেউস্-সগীরে উদ্ধৃত করে একে 'হাসান' বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধ দিনের ক্ষুধাতেও ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি, এবং নিজের ভ্রমণসঙ্গীকে বলেছেন যে, اٰتِنَا غَدَاۤءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا অর্থাৎ আমাদের নাশ্‌তা বের কর। কারণ এ ভ্রমণ আমাদের পরিশ্রান্তির সম্মুখীন করে

দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তূর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ রোযা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোন ইফতার করা যাবে না–বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি ?

তফসীরে রূহুল-বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এই পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় সফরের প্রকৃতির পার্থক্যর দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তূর পর্বতের এই সফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ারদিগারের অন্বেষায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোযা পর্যন্ত কোন কষ্টই তিনি অনুভব করেন নি।

ইবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশ ঃ আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রাসূলদের শরীয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, নবী-রাসূলদের শরীয়তে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্রমাস শুরু হয় চাঁদ দেখা থেকে এবং তা রাতের বেলাতেই হতে পারে। সেজন্যই মাস শুরু হয় রাত থেকে এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আসমানি যত ধর্ম রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্রমাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك অর্থাৎ সৌর হিসাব হলো পার্থিব লাভের জন্য আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদত-উপাসনার জন্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর তফসীর অনুসারে এই ত্রিশ রাত্রি ছিল যিলক্বদ মাসের রাত্রি; আর এরই উপর যিলহজ্জ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আ) তওরাতের উপঢৌকনটি লাভ করেছিলেন কুরবানীর দিনে।–(কুরতুবী)

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য ঃ এ আয়াতের ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ্ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হিকমতের ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দেন।— (রূহুল বয়ান)

মানুষের প্রতি সকল কাজে ধীর-স্থিরতা ও ক্রমান্বয়ের শিক্ষা ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে নেওয়া এবং তা ধীর-স্থিরতার সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাধা করা আল্লাহ্ তা'আলার রীতি। কোন কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহ্র পছন্দ নয়।

সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজের জন্য অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহর পক্ষে আসমান-যমীন তথা সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্টির জন্য এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ তিনি যখনই কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণের এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হিদায়েত দানই ছিল উদ্দেশ্য যে, তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত

বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধীর-স্থিরভাবে সমাধা করবে। তেমনিভাবে মূসা (আ)-কে তওরাত দান করার জন্যও যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে।

আর এই হলো সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন বনি ইসরাঈলদের গোমরাহীর সম্মুখীন হতে হয়। কারণ হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ দিনের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন বলতে শুরু করে যে, মূসা তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই আমাদের অপর কোন নেতা নির্ধারণ করে নেওয়াই উচিত। তার ফলে সহসাই 'সামেরী'-র ফাঁদে আটকে গিয়ে 'বাছুর'-এর পূজা করতে শুরু করে দেয়। তারা যদি চিন্তা-ভাবনা এবং নিজেদের কাজে ধীরস্থিরতা ও পর্যায়ক্রমিতা অবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হতো না।—কুরতুবী।

আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটিতে বলা হয়েছে ঃ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ এই বাক্য থেকেও কয়েকটি বিষয় ও আহকাম উদ্ভাবিত হয়।

প্রয়োজনবশত স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ ঃ প্রথমত, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারুন (আ)-কে বললেন, اُخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ। অর্থাৎ আমার পেছনে বা অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও সফরে যাবেন, তখন নিজের কোন লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন।

রাসূলে করীম (সা)-এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি তাঁকে মদীনার বাইরে যেতে হতো, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মুর্তজা (রা)-কে খলীফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী (রা)-কে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন।—কুরতুবী।

মূসা (আ) হারুন (আ)-কে খলীফা নিযুক্ত করার সময় তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হিদায়েত বা নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রথম নির্দেশ হলো اَصْلِحْ এখানে اصلح। -এর কোন কর্ম উল্লেখ হয়নি যে, কার ইসলাহ্ বা সংশোধন করা হবে। এতে বোঝা যায় যে, নিজেরও ইসলাহ্ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও ইসলাহ্ করবেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঙ্গা-ফাসাদজনিত কোন বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনার চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হিদায়েত দেওয়া হলো এই যে, لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ দাঙ্গা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলা বাহুল্য, হারুন (আ) হলেন আল্লাহ্র নবী, তাঁর নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোন আশংকাই ছিল না। কাজেই

এই হিদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

সুতরাং হযরত হারুন (আ) যখন দেখলেন, তাঁর সম্প্রদায় 'সামেরী'-র অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তার কথামত 'বাছুরের' পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামি থেকে বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে হযরত মূসা (আ) যখন ধারণা করলেন যে, হারুন (আ) আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তাঁর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

হযরত মূসা (আ)-এর এ ঘটনা থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা অব্যবস্থা এবং নিশ্চিন্ততাকেই সবচেয়ে বড় বুযুর্গী বলে মনে করে থাকেন।

وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ
قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ
تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا ۚ
فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾
قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ
فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ
قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

(১৪৩) তারপর মূসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর পরওয়ারদিগার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তাঁর পরওয়ারদিগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বললেন, হে প্রভু ! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম

বিশ্বাস স্থাপন করছি। (১৪৪) (পরওয়ারদিগার) বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। (১৪৫) আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদের দেখাব কাফিরদের বাসস্থান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন মূসা (আ) (এই ঘটনায়) আমার (ওয়াদাকৃত) সময়ে এসেছিলেন (যার বর্ণনা করা হচ্ছে), তাঁর পরওয়ারদিগার তাঁর সাথে (বিশেষ অনুগ্রহ ও সদয়) কথাবার্তা বললেন (এবং আগ্রহের প্রবলতায় দর্শন লাভের আগ্রহ সৃষ্টি হলো) তখন নিবেদন করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে তোমার দীদার (বা দর্শন) দান কর, যাতে আমি তোমাকে (একটিবার) দেখতে পাই। (তখন) ইরশাদ হলো, তুমি আমাকে (এ পৃথিবীতে) কস্মিনকালেও দেখতে পারবে না। (কারণ তোমার এ চোখ প্রভুর সৌন্দর্যের জ্যোতি সহ্য করতে পারবে না। যেমন, মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতিতে মিশ্‌কাতে বর্ণিত হয়েছে لا حرقت سبحات وجهه) কিন্তু (তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে,) তুমি এ পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, আমি এর উপর একটি ঝলক ফেলছি, এতে যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে (যা হোক) তুমিও দেখতে পারবে। অতএব, মূসা (আ) সেদিকে দেখতে থাকলেন। বস্তুত তাঁর পরওয়ারদিগার যেইমাত্র এর উপর তাজাল্লী নিক্ষেপ করলেন, যে আলোকচ্ছটা সে পাহাড়কে ছিন্নভিন্ন করে দিল এবং মূসা (আ) অচেতন হয়ে গেলেন। তারপর যখন চেতনা পেলেন, তখন নিবেদন করলেন, নিশ্চয়ই আপনার সত্তা (এই চোখের সহ্যশক্তি থেকে) পবিত্র (ও উর্ধ্বে), আমি আপনার দরবারে (এই সাগ্রহ নিবেদনের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং (আপনার যে বাণী لَنْ تَرَانِىْ তার প্রতি) সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি। ইরশাদ হলো ঃ হে মূসা, আমি (তোমাকে) নিজের পক্ষ থেকে নবুয়ত (-এর পদমর্যাদা দিয়ে) এবং আমার সাথে কথোপকথনের (সম্মান দানের) মাধ্যমে অন্যান্য লোকের উপর তোমাকে বিশিষ্টতা দিয়েছি (তাই যথেষ্ট)। কাজেই (এখন) তোমাকে যা কিছু দান করেছি (অর্থাৎ রিসালত, আমার সাথে কথোপকথন ও তওরাত) তা গ্রহণ কর এবং শুকরিয়া আদায় কর। আর আমি কয়েকটি তখতীর উপর (প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীও) যাবতীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ তাদেরকে লিখে দিয়েছি। (এই তখতীগুলো যখন আমি দিয়েছি) কাজেই তাতে মনোনিবেশ সহকারে (নিজেও) আমল কর এবং নিজ সম্প্রদায়কেও বল, যাতে (তারা) তার ভাল ভাল নির্দেশসমূহ অনুযায়ী (অর্থাৎ তার সমস্ত নির্দেশের উপর যথাযথভাবে) আমল করে। আমি এবার শীঘ্রই তোমাদের (অর্থাৎ বনি ইসরাঈলদের) সেই হুকুম লংঘনকারীদের (অর্থাৎ ফিরাউনী বা আমালেকাদের) স্থান দেখাচ্ছি। (এতে মিসর বা সিরিয়ার উপর যথাশীঘ্র বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অধিকার বিস্তারের সুসংবাদ এবং প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, বনি ইসরাঈলদের আনুগত্য ও ঐশী নির্দেশাবলী পালনের যে বরকত ও মহিমা রয়েছে, তার প্রতি উৎসাহিত করা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَنْ تَرَانِىْ (অর্থাৎ আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না)। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে [অর্থাৎ মূসা (আ)] বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হতো, তাহলে لَنْ تَرَانِىْ না বলে বলা হতো, لَنْ أُرٰى 'আমার দর্শন হতে পারে না'।—মাযহারী।

এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হলো অধিকাংশ আহলে সুন্নাহ্‌র মত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে لَنْ يرى احد منكم ربه حتى يموت অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদিগারকে দেখতে পারবে না।

وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ এতে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় শ্রোতা আল্লাহ্‌র দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে দেওয়া হয়েছে যে, তাও তোমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়। মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি; সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ আরবী অভিধানে تَجَلّٰى অর্থ প্রকাশিত হওয়া ও বিকশিত হওয়া। সূফী সম্প্রদায়ের পরিভাষায় 'তাজাল্লী' অর্থ হলো কোন বিষয়কে কোন কিছুর মাধ্যমে দেখা। যেমন, কোন বস্তুকে আয়নার মাধ্যমে দেখা হয়। সেজন্যই তাজাল্লীকে দর্শন বলা যায় না। স্বয়ং এ আয়াতেই তার সাক্ষ্য বর্তমান যে, আল্লাহ্ তা'আলা দর্শনকে বলেছেন অসম্ভব আর তাজাল্লী বা বিকশিত হওয়াকে তা বলেন নি।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম হযরত আনাস (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী ও হাকেম-এর সনদকে যথার্থ বলেও উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়, বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহ্‌র তাজাল্লী বিকিরিত হয়েছিল সে অংশটি হয়তো প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

হযরত মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্‌র কালাম বা বাক্য বিনিময় : এ বিষয়টি তো কোরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্‌র তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সরাসরিই বাক্যবিনিময় করেছেন। এ কালামের মধ্যে রয়েছে প্রথমত সেসব কালাম যা নবুয়ত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত সেসব কালাম, যা তওরাত দানকালে হয়েছে এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আয়াতের শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কালাম বা বাক্যবিনিময় প্রথম পর্যায়ের কালামের তুলনায় ছিল কিছুটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কালামের তাৎপর্য কি ছিল এবং তা কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া

কেউই জানতে পারে না। তবে এতে শরীয়তের পরিপন্থী নয় এমন যত রকম যৌক্তিক সম্ভাব্যতা থাকতে পারে, সেগুলোর কোন একটিকে বিনা প্রমাণে নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সাহাবী-তাবেঈদের মতামতই সবচাইতে উত্তম যে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেওয়া এবং নানা ধরনের সম্ভাব্যতা খুঁজে বেড়ানোর পেছনে না পড়াই বাঞ্ছনীয়।-(বয়ানুল-কোরআন)

سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ এ ক্ষেত্রে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ কি ঃ এতে দুটি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ হযরত মূসা (আ)-এর বিজয়ের পূর্বে মিসর ফিরাউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে 'দারুল-ফাসিকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালিকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসিক বা পাপাচারী, সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসিকদেরই আবাসভূমি। এতদুভয় অর্থের যে কোন্‌টি এখানে উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার ভিত্তি হলো এই যে, ফিরাউনের সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর বনি ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কিনা ? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; যেমন আয়াত اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ -এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়; তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মূসা (আ)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখতীগুলোর নামই হলো 'তওরাত'।

سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ
يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ
سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۴۶﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۷﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا
لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ

اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ
قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ
بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ
وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۗ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْ
نِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ
وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ ع

(১৪৬) আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হিদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বে-খবর রয়ে গেছে। (১৪৭) বস্তুত যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং আখিরাতের সাক্ষাৎকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন সে বদলাই পাবে যেমন আমল করত। (১৪৮) আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর যা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না ? তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুত তারা ছিল জালিম। (১৪৯) অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ্ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদিগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। (১৫০) তারপর যখন মূসা (আ) নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা নিজ পরওয়ারদিগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে! এবং সে তখতীগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে

লাগলেন! ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গণ্য করো না। (১৫১) মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আনুগত্যের উৎসাহ দানের পর এবার বিরোধিতার দরুন ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে,) আমি এমন সব লোককে আমার নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ করে রাখব যারা পৃথিবীতে (নির্দেশ ও বিধানাবলী মান্য করার ব্যাপারে) দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে, যার কোন অধিকারই তাদের নেই। (কারণ নিজেকে বড় মনে করা, তারই অধিকারভুক্ত বিষয়, যিনি প্রকৃতপক্ষেই বড়। আর তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্।) আর (তাদের জন্য এই বিমুখতার ফল দাঁড়াবে এই যে,) যদি সমগ্র (বিশ্বের) নিদর্শনসমূহ (-ও তারা) দেখে নেয়, তবুও (চরম রূঢ়তাবশত) সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে না এবং হিদায়েতের পথ দেখেও তাকে নিজেদের চলার পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না! অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে নিজ পথ হিসাবে গ্রহণ করে নেবে। (অর্থাৎ সত্যকে গ্রহণ না করাতে অন্তর কঠিন ও রূঢ় হয়ে পড়ে এবং বিমুখতা এমনি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।) আর (এ পর্যায়ের বিমুখতা) এ কারণে যে, তারা আমার আয়াত (বা নিদর্শন)-সমূহকে (আত্মম্ভরিতার দরুন) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (তার তাৎপর্য অনুধাবনে) নিরুৎসাহী রয়েছে। (হিদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকার এ শাস্তি তো হলো দুনিয়াতে—) আর (আখিরাতের শাস্তি হবে এই যে,) এসব লোক, যারা আমার আয়াতসমূহকে এবং কিয়ামতের আগমনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে, তাদের সমস্ত কর্ম (যার মাধ্যম দ্বারা তাদের লাভের আশা ছিল) ব্যর্থ হয়ে যাবে। (আর এই ব্যর্থতার পরিণতিই হলো জাহান্নাম।) এদেরকে সে শাস্তিই দেওয়া হবে, যা কিছু এরা করত। আর [মূসা (আ) তওরাত আনার জন্য তূর পর্বতে চলে গেলে] মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল তাঁর যাওয়ার পর নিজেদের অধিকৃত) অলঙ্কারাদির দ্বারা (যা তারা কিবতীদের কাছ থেকে মিসর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিয়ের ভান করে চেয়ে এনেছিল) একটি বাছুর (বানিয়ে তাকে) উপাস্য সাব্যস্ত করল। (যার তাৎপর্য ছিল এতটুকুই যে,) একটি কাঠামো ছিল যার মধ্যে ছিল একটা শব্দ। (এছাড়া তাতে আর কোন মহত্ত্বই ছিল না, যাতে কোন বুদ্ধিমানের মনে উপাস্য বলে ভ্রম হতে পারে।) তারা কি দেখেনি যে, (তাতে একটা মানুষের সমান ক্ষমতাও ছিল না ? এবং) সেটা তাদের সাথে কোন কথাও বলতে পারছিল না, কিংবা তাদেরকে (দীন বা দুনিয়ার) কোন পথও বাতলে দিচ্ছিল না—(আল্লাহ্র মত কোন বৈশিষ্ট্য তা দূরের কথা। যাহোক,) এ বাছুরটিকে তারা উপাস্য সাব্যস্ত করল এবং (যেহেতু এতে প্রকৃত কোন সন্দেহের কারণ ছিল না, সেহেতু তারা) একটা বোকার মত কাজই করল। আর মূসা (আ)-এর ফিরে আসার পর (যার বর্ণনা পরে আসছে–তাঁর সতর্কীকরণে) যখন (বিষয়টি তারা বুঝতে পারল এবং নিজেদের এহেন গর্হিত আচরণের দরুন) লজ্জিত হলো

আর জানতে পারল যে, বাস্তবিকই তারা পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে, তখন (অনুতাপভরে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং) বলতে লাগল, আমাদের পরওয়ারদিগার যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদের (এ) পাপ ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাব। (সুতরাং এক বিশেষ পন্থায় তওবা করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো—সে কাহিনী সূরা বাকারার فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ... আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।) আর [মূসা (আ)-কে সতর্কীকরণের ব্যাপারটি হলো এই যে,] যখন মূসা (আ) স্বীয় জাতির নিকট (তূর থেকে) ফিরে এলেন (একান্ত) রুষ্ট ও অনুতপ্ত অবস্থায়, (কারণ ওহীর মাধ্যমে তিনি বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। যা সূরা 'তোয়াহা'তে রয়েছে ঃ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا ... ...) তখন (প্রথমে সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে) বললেন, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে এ কাজটি একান্ত গর্হিত করেছ। তোমরা কি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নির্দেশের (আগমনের) পূর্বেই (এহেন) তাড়াহুড়া করে ফেললে ? (আমি যে নির্দেশ নিয়ে আসার জন্যই গিয়েছিলাম, তার অপেক্ষা করলেও তো পারতে।) আর [অতঃপর তিনি হযরত হারুন (আ)-এর প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং ধর্মীয় জোশের আতিশয্যে] সহসা (তওরাতের) তখতীগুলো একদিকে সরিয়ে রাখলেন (তা এত জোরে রাখলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেন ছুঁড়ে মেরেছেন) এবং (হাত খালি করে নিয়ে) স্বীয় ভ্রাতা [হারুন(আ)]-এর মাথা (অর্থাৎ মাথার চুল) ধরে তাঁকে নিজের দিকে (এই বলে) টানতে লাগলেন যে, কেন তুমি যথাযথ ব্যবস্থা নিলে না ? (আর যেহেতু রাগের বশে অনেকটা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং সে রাগও ছিল একান্ত ধর্মীয় কারণে, সেহেতু এ রাগকে যথার্থ বলেই সাব্যস্ত করা যায় এবং তাঁর এই ইজতিহাদজনিত বিচ্যুতির জন্য কোন প্রশ্ন তোলা যায় না।) হারুন (আ) বললেন, হে আমার মায়ের পক্ষীয় ভাই, (আমি আমার সাধ্যানুযায়ী) তাদেরকে (বাধা দিয়েছি, কিন্তু) তারা আমাকে গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং (বরং উপদেশদানের কারণে) আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। এমতাবস্থায় আমার সাথে রূঢ় ব্যবহার করে তুমি শত্রুকে হাসাবার ব্যবস্থা করো না। আর (তোমার ব্যবহার দ্বারা) আমাকে অত্যাচারী জালিমদের সারিতে গণ্য করো না (যে, তাদেরই মত অসন্তোষ আমার প্রতিও প্রকাশ করতে থাকবে)। মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করলেন (এবং) বললেন, ইয়া পরওয়ারদিগার, আমার ত্রুটি (যদিও তা ইজতিহাদজনিত) ক্ষমা করে দাও। আর আমার ভাই হারুন (আ)-এর ত্রুটিও (ক্ষমা করে দাও, যা সেই মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে।) হয়তো ঘটেছে। (যেমন ঃ مَامَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا اَنْ لاَّ تَتَّبِعَنِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়।) আর আমাদের দু'জনকেই তোমার (বিশেষ) রহমতের (বা করুণার) অন্তর্ভুক্ত করে নাও। বস্তুত তুমিই সমস্ত করুণা প্রদর্শনকারীদের অপেক্ষা অধিক করুণাময় (সেজন্য আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা মঞ্জুরীর সর্বাধিক আশা করতে পারি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে সেসব লোককে বিমুখ বা বঞ্চিত করব, যারা পৃথিবীতে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও গর্বিত, অহংকারী হয়।"

এখানে 'অধিকার না থাকা" শব্দটি প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গর্বিত অহংকারীদের মুকাবিলায় প্রতি-অহংকার করা অন্যায় বা গোনাহ্ নয়। কারণ এক্ষেত্রে তা শুধু বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে অহংকার, প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। যেমন, প্রবাদ আছে المتكبر مع المتكبرين تواضع। অর্থাৎ অহংকারীদের সাথে প্রতি-অহংকারই হলো নম্রতা।—মাসায়েলে-সুলুক

অহংকার মানুষেকে সুষ্ঠু জ্ঞান ও ঐশী ইলম থেকে বঞ্চিত করে দেয় ঃ আর গর্বিত-অহংকারীদের স্বীয় নিদর্শনসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়ার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে এই যে, তাদের থেকে আল্লাহ্র নিদর্শন বা আয়াতসমূহ বোঝা বা উপলব্ধি করার এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য ও তওফীক তুলে নেয়া হয়। আর এখানে 'আল্লাহ্র নিদর্শন বা আয়াত' কথাটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যাতে তওরাত, যবুর ও কোরআনে বর্ণিত আয়াত বা নিদর্শনসমূহ যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ যা আসমান, যমীন ও তাতে অবস্থিত সৃষ্টির মাঝে বিস্তৃত। কাজেই আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, তাকাব্বুর, অর্থাৎ নিজেকে নিজে অন্যদের চাইতে বড় ও উত্তম মনে করা এমনই দূষণীয় ও জঘন্য যে, এতে যে পতিত হয়, তার সুষ্ঠু বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে না। সেজন্যই সে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। না থাকে কোরআনের আয়াত বুঝবার ক্ষমতা ও তওফীক, না আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যথার্থ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্র মা'রেফাত বা পরিচয় লাভ।

তফসীরে রূহুল-বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে একথাই বোঝা যায় যে, অহংকার ও গর্ব এমন এক মন্দ অভ্যাস, যা ঐশী জ্ঞান লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ আল্লাহ্র জ্ঞান লাভ হতে পারে একমাত্র আল্লাহ্রই রহমতে। আর আল্লাহ্র রহমত হয় একমাত্র বিনম্রতার মাধ্যমে। কাজেই হযরত মাওলানা রূমী যথার্থই বলেছেন ঃ

هرکجا پستی ست آب آنجارود
هرکجا مشکل جواب آنجارود

("যেদিকে ঢালু পানি যেদিকেই গড়ায়, যেখানে জটিলতা উত্তরও সেদিকেই যায়।)"

প্রথম দুই আয়াতে এ বিষয়টি আলোচনা করার পর পুনরায় হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলদের কাহিনী বর্ণনা করা হয় ঃ

হযরত মূসা (আ) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়ে ধ্যানে বসলেন এবং ইতিপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ হয়েছিল, সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব; সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যখন আরও দশ দিন ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তাঁর সম্প্রদায়ে 'সামেরী" নামে একটি লোক ছিল। তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বড় মোড়ল' বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনি ইসরাঈলের লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের

কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলঙ্কারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে; কাজেই এগুলো তোমাদের জন্য হালাল নয়। কারণ তখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল না। বনি ইসরাঈলরা তার কথামত সমস্ত অলংকার তার কাছে (সামেরীর কাছে) এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রূপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরি করল এবং হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবন ও জীবনীশক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সোনারূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে মাটি তাতে মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনীশক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার ভেতর থেকে গাভীর মত হাম্বা রব বেরোতে লাগল। এক্ষেত্রে عِجْلاً শব্দের ব্যাখ্যায় جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাচিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত হলো, তখন সে বনী ইসরাঈলদের কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, "এটাই হলো খোদা। মূসা (আ) তো আল্লাহ্র সাথে কথা বলার জন্য গেছেন তূর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ্ (নাউযুবিল্লাহ) সশরীরে এখানে এসে হাযির হয়ে গেছেন। মূসা (আ)-এর সত্যি ভুলই হয়ে গেল।" বনী ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং গাভীকে আল্লাহ্ মনে করে তারই উপাসনা-ইবাদতে প্রবৃত্ত হলো।

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে এ বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। কোরআন মজীদের অন্যত্র বিষয়টির আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে মূসা (আ)-এর সতর্কীকরণের পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বনী ইসরাঈলদের তওবার কথা বলা হয়েছে। এতে আরবী প্রবাদ অনুযায়ী سُقِطَ فِىْٓ اَيْدِيْهِمْ অর্থ হচ্ছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

পঞ্চম আয়াতে এ ঘটনারই বিস্তারিত বর্ণনা যে, হযরত মূসা (আ) যখন কুহেতূর থেকে তওরাত নিয়ে ফিরে এলেন এবং নিজের সম্প্রদায়কে বাছুরের পূজায় লিপ্ত দেখতে পেলেন, তখন তাঁর রাগের সীমা রইল না। আল্লাহ্ তা'আলা যদিও ইসরাঈলীদের এ গোমরাহীর কথা কুহেতূরেই ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শোনা এবং দেখার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। কাজেই তাদের এহেন গোমরাহী এবং বাছুরের পূজাপাঠ সচক্ষে দেখার পর অধিকতর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

তিনি প্রথমে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْۢ بَعْدِىْ অর্থাৎ তোমরা আমার অবর্তমানে এটা একান্তই মূর্খজনোচিত কাজ করেছ। اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি তোমাদের পরওয়ারদিগারের নির্দেশ আনার চেয়েও তাড়াহুড়া করলে ? অর্থাৎ অন্তত আল্লাহ্র কিতাব তওরাতের আসা পর্যন্তই নাহয় অপেক্ষা করতে— তোমরা তার চেয়েও তাড়াহুড়া করে এহেন গোমরাহী অবলম্বন করে নিলে ? এক্ষেত্রে কোন কোন মুফাসসির এ বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন যে, তোমরা তাড়াহুড়া করে কি এটাই সাব্যস্ত করে নিলে যে, আমার মৃত্যু ঘটে গেছে ?

অতঃপর হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-এর প্রতি এগিয়ে গেলেন যে, তাঁকে যখন নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই গোমরাহীর সময় কেন বাধা দিলেন না ? তাঁকে ধরার জন্য হাত খালি করার প্রয়োজন হলে তওরাতের তখতীগুলো যা হাতে করে নিয়েই এসেছিলেন, তাড়াতাড়ি রেখে দিলেন। কোরআন মজীদ এ কথাটিই এভাবে ব্যক্ত করেছে যে ঃ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ। اِلْقَاء শব্দের আভিধানিক অর্থ ফেলে দেওয়া। আর اَلْوَاحٌ হলো لَوْحٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ হলো তখতী। এখানে اِلْقَاء শব্দে সন্দেহ হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ) হয়তো রাগের বশে তওরাতের তখতীসমূহের অমর্যাদা করে ফেলে দিয়ে থাকবেন।

কিন্তু একথা সবারই জানা যে, তওরাতের তখতীসমূহকে অমর্যাদা করে ফেলে দেওয়া মহাপাপ। পক্ষান্তরে সমস্ত নবী-রাসূল (আ) যাবতীয় পাপ থেকে পবিত্র ও মা'সুম। কাজেই এক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম হলো এই যে, আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত হারূন (আ)-কে ধরার জন্য হাত খালি করা। আর রাগান্বিত অবস্থায় তাড়াতাড়িতে সেগুলোকে যেভাবে রাখলেন, তা দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো যেন সেগুলোকে বুঝি ফেলেই দিয়েছেন। কোরআন মজীদ একেই সতর্কতার উদ্দেশ্যে ফেলে দেওয়া শব্দে উল্লেখ করেছে।—বয়ানুল কোরআন

তারপর এই ধারণাবশত হযরত হারূন (আ)-কে মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন যে, হয়তো তিনি প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে থাকবেন। তখন হযরত হারূন (আ) বললেন, ভাই এক্ষেত্রে আমার কোন দোষ নেই। সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কথার কোনই গুরুত্ব দেয়নি। আমার কথা তারা শোনেনি। বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। কাজেই আমার সাথে এমন ব্যবহার করবেন না, যাতে আমার শত্রুরা খুশি হতে পারে। আর আমাকে এই পথভ্রষ্টদের সাথে রয়েছি বলেও ভাববেন না। তখন মূসা (আ)-এর রাগ পড়ে গেল এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন, رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ভাইকেও ক্ষমা করে দিন। আর আমাদের আপনার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যে সমস্ত করুণাকারীর মধ্যে সবচেয়ে মহান করুণাময়।

এখানে স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আ)-এর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা হয়তো এই জন্য করলেন যে, হয়তো বা সম্প্রদায়কে তাদের গোমরাহী থেকে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে কোন রকম ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। আর নিজের জন্য হয়তো এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাড়াহুড়ার মধ্যে তওরাতের তখতীগুলোকে এমনভাবে রেখে দেওয়া, যাকে কোরআন মজীদ 'ফেলে দেওয়া' শব্দে উল্লেখ করে তা ভুল হয়েছে বলে সতর্ক করেছে—তারই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। অথবা এটা প্রার্থনারই একটা রীতি যে, অন্যের জন্য দোয়া প্রার্থনা করার সময় নিজেকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় যাতে এমন বোঝা না যায় যে, নিজকে দোয়ার মুখাপেক্ষী মনে করা হয়নি।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوا
مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ
عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ج وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ
هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾ وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ج
فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ط
اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ج اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ط تُضِلُّ بِهَا مَنْ
تَشَآءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَآءُ ط اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ
الْغٰفِرِينَ ﴿١٥٥﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا
هُدْنَآ اِلَيْكَ ط قَالَ عَذَابِيٓ اُصِيبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ج وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ
شَيْءٍ ط فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِينَ هُمْ
بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ ج

(১৫২) অবশ্য যারা গো-বৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এভাবে আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপর তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদিগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়। (১৫৪) তারপর যখন মূসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সেই সমস্ত লোকের জন্য হিদায়েত ও রহমত যারা নিজেদের পরওয়ারদিগারকে ভয় করে। (১৫৫) আর মূসা বেছে নিলেন নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার, তুমি যদি ইচ্ছা করতে তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমাদেরকে

কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে ? এ সবই তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমিই তো আমাদের রক্ষক—সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী। (১৫৬) আর পৃথিবীতে এবং আখিরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার আযাব তারই উপর চাপিয়ে দিই যার উপর ইচ্ছা করি। বস্তুত আমার রহমত সবকিছুর উপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই বাছুরের উপাসনাকারীদের সম্পর্কে হযরত মূসা (আ)-কে বললেন,] যারা বাছুরের পূজা করেছে (তারা যদি এখনও তওবা না করে, তাহলে) শীঘ্রই তাদের উপর তাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও অপমান এসে পড়বে। আর (শুধু তাদের বেলায়ই নয়, বরং) আমি (তো) মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। (—তারা পার্থিব জীবনেই গযবে পতিত হয়ে লাঞ্ছিত-পদদলিত হয়ে যায়। তবে কোন কারণে সে গযবের প্রকাশ তাৎক্ষণিক না হয়ে দেরিতেও হতে পারে। সুতরাং তওবা না করার দরুন সামেরীর প্রতি সে গযব ও অপমান প্রকাশিত হয়েছিল, যা সূরা 'তোয়াহাতে বর্ণিত হয়েছে ঃ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسَ) আর যারা পাপের কাজ করেছে (যেমন, তাদের বাছুর পূজার মত গর্হিত কাজ হয়ে গেছে, কিন্তু) পরে তারা (অর্থাৎ সে পাপের কাজ করে ফেলার পর) তওবা করে নিয়েছে এবং (সে কুফরী পরিহার করে) ঈমান এনেছে; তোমাদের পরওয়ারদিগার এ তওবার পরে (তাদের) গোনাহ্ ক্ষমাকারী, (এবং তাদের অবস্থার প্রতি) দয়া প্রদর্শনকারী। (অবশ্য তওবার সম্পূর্ণতার জন্য اُقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ -এর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রকৃত রহমত বা দয়া হলো আখিরাতের দয়া। কাজেই যারা তওবা করেছে তাদের পাপ সেভাবেই খণ্ডিত হয়েছে।) আর [হারুন (আ)-এর এই ওযর-আপত্তি শুনে] যখন মূসা (আ)-এর রাগ পড়ে গেল, তখন সেই তখতীগুলো তুলে নিলেন। বস্তুত সেগুলোর বিষয়বস্তুতে সেসব লোকের জন্য হিদায়েত ও রহমত ছিল, যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করত (অর্থাৎ সে তখতীগুলোতে বর্ণিত নির্দেশাবলী যার অনুশীলন হিদায়েত ও রহমতের কারণ হতে পারে)। আর [বাছুরের ইতিবৃত্ত যখন সমাপ্ত হয়ে গেল, তখন হযরত মূসা (আ) নিশ্চিন্তে তওরাতের নির্দেশাবলী প্রচার করতে লাগলেন। যেহেতু তাদের স্বভাবই ছিল সন্দেহ-প্রবণ, কাজেই তারা তাতেও সন্দেহ-সংশয় খুঁজে বের করল যে, এটা যে আল্লাহ্রই নির্দেশ আমরা তা কেমন করে বুঝব ? আমাদের সাথে যদি আল্লাহ্ নিজে বলে দেন তাহলেই বিশ্বাস করা যায়। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিষয়টি নিবেদন করলেন। সেখান থেকে হুকুম হলো যে, যাদেরকে তারা বিশ্বস্ত বলে মনে করে, এমন কিছু লোককে বাছাই করে তূরে নিয়ে এসো—আমি নিজেই তাদেরকে বলে দেব যে, এগুলো আমারই

নির্দেশ। তখন তাদের নিয়ে আসার জন্য একটা সময় ধার্য করা হলো। সুতরাং] মূসা (আ) আমার নির্ধারিত সময়ে (তূরে নিয়ে আসার জন্য) সম্প্রদায়ের সত্তর জন লোককে নির্বাচিত করলেন। (সেখানে পৌছে যখন তারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনল, তখন তাদের মধ্য থেকে একদল বেরিয়ে গিয়ে বলল, আল্লাহ্‌ই জানে কে কথা বলছে! আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, যখন আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে নিজের চোখে দেখতে পাব। আল্লাহ্‌র ভাষায় لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً আল্লাহ্ তা'আলা এই ধৃষ্টতার শাস্তি দিলেন। নিচের দিক থেকে এল ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে শুরু হলো এমন ভয়াবহ বজ্র গর্জন যে, কেউ আর ফিরতে পারল না; সবাই সেখানেই স্তব্ধ হয়ে রয়ে গেল। সুতরাং) যখন তাদেরকে ভূমিকম্প (প্রভৃতি) এসে আঁকড়ে ধরল, [তখন মূসা (আ) মনে মনে ভয় করলেন যে, এমনিতেই বনী ইসরাঈল মূর্খ ও সন্দেহ-সংশয়গ্রস্ত তারা মনে করবে, হয়তো মূসাই কোথাও নিয়ে গিয়ে এভাবে কোন রকমে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। তখন সভয়ে] তিনি নিবেদন করলেন, হে পরওয়ারদিগার, (আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, তাদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ) এই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইতিপূর্বেই আপনি তাদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করে দিতেন। (কারণ এ মুহূর্তে তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অর্থ বনী ইসরাঈলদের হাতে আমারও ধ্বংস হয়ে যাওয়া। আপনার যদি এমনি উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে আগেও এমনটি করতে পারতেন, কিন্তু তা যখন করেন নি, তখন বুঝতে পেরেছি যে, তাদেরকে ধ্বংস করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ এতে আমার দারুণ বদনাম হবে এবং আমিও ধ্বংস হয়ে যাব। অতএব আমার বিশ্বাস ও আশা, আপনি আমাকে বদনামের ভাগী করবেন না। তাছাড়া) আপনি কি আমাদের কয়েকজন আহাম্মকের গর্হিত আচরণের দরুন সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন! (ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বোকামি করবে এরা; আর তাতে বনী ইসরাঈলদের হাতে আমিও ধ্বংস হবো। আমার একান্ত বিশ্বাস, আপনি তা করবেন না। সুতরাং বোঝা গেল যে, ভূমিকম্প ও বজ্র গর্জনের এ ঘটনাটি আপনার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা মাত্র।) এমন পরীক্ষার দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা গোমরাহীতে ফেলতে পারেন। (অর্থাৎ কেউ হয়তো এতে আল্লাহ্‌র প্রতি অভিযোগ এবং তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করতে পারে।) আবার আপনার যাকে ইচ্ছা তার রহস্য ও কল্যাণসমূহ (অনুধাবনের মাধ্যমে) হিদায়েতে অবিচল রাখতে পারেন। (কাজেই আমি আপনার অনুগ্রহ ও দয়ায় আপনি যে মহাজ্ঞানী রহস্যজ্ঞাত সে বিষয়ে জানি। সেজন্য এ পরীক্ষায় আমি নিশ্চিন্ত। তাছাড়া) আপনিই তো আমাদের অভিভাবক; আমাদের ক্ষমা করে দিন, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন। আর আপনি সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমাশীল। [সুতরাং তাদের পাপ ক্ষমা করে দিন। (এ প্রার্থনার পর) সবাই যথাপূর্ব জীবিত হয়ে ওঠে। সূরা বাকারায় এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।] আর (এ দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রহমত বা দয়ার বিশ্লেষণ হিসেবে এ দোয়াও করলেন যে, হে পরওয়ারদিগার,) আমাদের জন্য পার্থিব জীবনেও কল্যাণকর সচ্ছলতা লিখে দিন এবং (তেমনিভাবে) আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। (কেননা) আপনার প্রতি (আমরা একান্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সাথে) ফিরে এসেছি। আল্লাহ্ তা'আলা [মূসা (আ)-এর দোয়া কবূল করে নিয়ে] বললেন, (হে মূসা, একে তো আমার রহমত আমার গযবের চেয়ে অগ্রবর্তী,

কাজেই) আমি আমার আযাব (ও গযব) তারই উপর আরোপ করে থাকি, যার উপর ইচ্ছা করি। (যদিও প্রত্যেক না-ফরমান বা কৃতঘ্নই এর যোগ্য, কিন্তু তবুও সবার উপর তা আরোপ করি না; বরং বিশেষ বিশেষ লোকদের উপরই তা আরোপ করে থাকি, যারা সীমাহীনভাবে উদ্ধত ও কৃতঘ্ন হয়ে থাকে।) আর আমার রহমত (এমনই ব্যাপক যে,) তা যাবতীয় বিষয়কে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। (অথচ অনেক সৃষ্টি এমনও রয়েছে যারা তার অধিকারী হয় না। যেমন, উদ্ধত ও বিদ্বেষপরায়ণ লোক। কিন্তু তাদের প্রতিও এক রকম রহমত রয়েছে, তা সে রহমত যদিও পার্থিব মাত্র। সুতরাং আমার রহমত যখন তা পাবার অযোগ্যদের জন্যও ব্যাপক,) তখন সে রহমত তাদের জন্য তো (পরিপূর্ণভাবে) লিখবই যারা (প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, এর অধিকারী—) আল্লাহ্কে ভয় করে (যা মনের সাথে সম্পৃক্ত আমল), যাকাত দান করে (যা সম্পদের সাথে জড়িত কাজ) এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান স্থাপন করে (যা হলো বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যাপার। এসব লোক তো প্রথম পর্যায়েই রহমত পাবার যোগ্য। আপনি অনুরোধ না করলেও তারা তা পেত। তদুপরি এখন যখন আপনিও তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন যে, وَاكْتُبْ لَنَا ,ارْحَمْنَا। তখন আমি তা গ্রহণ করার সুসংবাদ দিচ্ছি। কারণ আপনি নিজে তো তেমন রয়েছেনই, আর আপনার জাতির মধ্যে যারা রহমতের অধিকারী হতে চাইবে, তাদেরকে এমনি গুণাবলীতে সুসজ্জিত হতে হবে যাতে তা লাভ করতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটা সূরা আ'রাফের ১৯তম রুকূ। এ রুকূর প্রথম আয়াতে গোবৎসের উপাসনাকারী এবং তারই উপর যারা স্থির ছিল সেসব বনী ইসরাঈলের অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আখিরাতে তাদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গযবের সম্মুখীন হতে হবে, যার পরে আর পরিত্রাণের কোন জায়গা নেই। তদুপরি পার্থিব জীবনে তাদের ভাগ্যে জুটবে অপমান ও লাঞ্ছনা।

কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায় : সামেরী ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তওবা করল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ পৃথিবীতে অপদস্থ-অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে মূসা (আ) নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে; সেও যাতে কাউকে না ছোঁয়, তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিভাবে জীব-জন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে, কোন মানুষ তার সংস্পর্শে আসতো না।

তফসীরে-কুরতুবীতে হযরত কাতাদাহ্ (রা)-র উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর এমন আযাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত।—(কুরতুবী)

তফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধরদের মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে : وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হযরত সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ (র) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিদ'আত অবলম্বন করে (অর্থাৎ ধর্মে কোন রকম কুসংস্কার

সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,) তারাও আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে।—(মাযহারী)

ইমাম মালিক (র) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেছেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিদ'আত বা কুসংস্কার আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখিরাতে আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হবে এবং পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ)-এর সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তওবা করে নিয়েছে এবং তওবার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে কঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তওবা কবূল হবে—তারা সে শর্তও পালন করল, তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবূল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেঁচে রয়েছে তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে যত বড় পাপই হোক, কুফরীও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবি অনুযায়ী নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তওবা করে নেওয়া একান্ত কর্তব্য।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ)-এর রাগ যখন প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়ি ফেলে রাখা তওরাতের তখতীগুলো আবার উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সে 'সংকলন'-এ হিদায়েত ও রহমত ছিল।

نسخه বা 'সংকলন' বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) রাগের মাথায় যখন তওরাতের তখতীগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন কিছুতে লেখা তওরাত দান করেছিলেন। তাকেই 'নোসখা' বা সংকলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্তর জন বনী-ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা ঃ চতুর্থ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্র কিতাব তওরাত নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলদের দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুঁতার দরুন বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহ্রই কালাম ? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসে থাকবেন। মূসা (আ) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদের তূরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের কালাম শুনিয়ে দেব। তাহলেই বিষয়টি তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। মূসা (আ) তাদের মধ্য থেকে সত্তর জনকে নির্বাচিত করে তূরে

নিয়ে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহ্‌র কালামও শুনল। এ প্রমাণও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তখন তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে, এ শব্দ আল্লাহ্‌রই, না অন্য কারও! আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, আল্লাহ্‌কে যখন প্রকাশ্যে আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ দাবি যেহেতু একান্তই হঠকারিতা ও মূর্খতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাদের উপর ঐশী রোষানল বর্ষিত হলো। ফলে তাদের নিচের দিক থেকে এল ভূকম্পন, আর উপর দিক থেকে শুরু হলো বজ্র গর্জন। যার দরুন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যত মৃতে পরিণত হলো। এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাকারায় এক্ষেত্রে صاعقه (সায়ে'কাহ্) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে رجفه (রাজফাহ্)। 'সায়েকা' অর্থ বজ্র গর্জন। আর 'রাজফাহ' অর্থ ভূকম্পন। কাজেই ভূকম্পন ও বজ্র গর্জন একই সাথে আরম্ভ হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

যাহোক, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃতের মত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যত মৃত বলেই মনে হতে পারে। এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কারণ একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা (বুদ্ধিজীবী) লোক, দ্বিতীয়ত জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দেবেন। তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, মূসা (আ) তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দেবে না; নির্ঘাৎ হত্যা করবে। সেজন্যই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া পরওয়ারদিগার, আমি জানি এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ তাই যদি হতো, তবে ইতিপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত; ফিরাউনের সাথে তাদের সলিল সমাধিও হতে পারত; কিংবা গোবৎস পূজার সময়ও সবার সামনে হত্যা করে দেওয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো শাস্তি দেওয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ই বা কেমন করে যে, আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন! এ ক্ষেত্রে 'নিজেকে নিজে ধ্বংস করা' এ জন্য বলা হয়েছে যে, এই সত্তর জনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি সম্প্রদায়ের হাতে মূসা (আ)-এর ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল।

অতঃপর নিবেদন এই যে, আমি জানি, এটা একান্তই আপনার পরীক্ষা, যাতে আপনি কোন কোন লোককে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ করে দেন, যার ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার না-শোকর বা কৃতঘ্ন হয়ে ওঠে। আবার অনেককে এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার তত্ত্ব ও কল্যাণসমূহকে উপলব্ধি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার এ পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট! তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত অভিভাবক—আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীর মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুত (এ প্রার্থনার পর) তারা যথাপূর্ব জীবিত হয়ে ওঠে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এই সত্তর জন লোক যাদের আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে এরা أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً (আল্লাহ্কে আমরা প্রকাশ্যে দেখতে চাই)-এর নিবেদনকারী ছিল না, যারা বজ্র গর্জনের দরুন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এরা ছিল সেইসব লোক, যারা গো-বৎসের উপাসনায় নিজেরা অংশগ্রহণ না করলেও জাতি বা সম্প্রদায়কে তা থেকে বিরত রাখারও চেষ্টা করেনি। এরই শাস্তি হিসাবে তাদের উপর নেমে এসেছে বজ্র গর্জন—যার দরুন তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। যাহোক, এরা সবাই মূসা (আ)-এর প্রার্থনায় পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে।

পঞ্চম আয়াতে হযরত মূসা (আ)-এর সে দোয়ার উপসংহারে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এই পার্থিব জীবনেও আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। কারণ আমরা আপনার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্য সহকারে ফিরে আসছি।

এরই প্রতিউত্তরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ عَذَابِيْ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ হে মূসা (আ)! একে তো আমার করুণা ও রহমত সাধারণভাবেই আমার গযব বা রোষানলের অগ্রবর্তী, কাজেই আমি আমার আযাব ও গযব শুধুমাত্র তাদের উপরই আরোপিত করে থাকি, যার উপর ইচ্ছা করি, যদিও সব কাফির বা কৃতঘ্নই এর যোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তথাপি সবাইকে এই আযাবে পতিত করি না, বরং তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ লোকদের উপরই আযাব আরোপ করি, যারা একান্তভাবেই চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে আমার রহমত এমনই ব্যাপক যে, তা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুতেই পরিবেষ্টিত, অথচ তাদের মধ্যেও বহু লোক রয়েছে, যারা এর যোগ্য নয়—যেমন, ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্ট—না-ফরমান। কিন্তু তাদের প্রতিও আমার একরকম রহমত রয়েছে, তা যদিও দুনিয়ার জন্য। কাজেই আমার রহমত অযোগ্যদের জন্যও ব্যাপক। তবে এই রহমত পরিপূর্ণভাবে তাদেরই জন্য নিশ্চিতভাবে লিখে দেব, যারা প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যেমন এর যোগ্য তেমনিভাবে আনুগত্যও পোষণ করে ; তারা আল্লাহ্কে ভয় করে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। এরা তো প্রথমাবস্থাতেই রহমতের অধিকারী। কাজেই আপনাকে আপনার দোয়া কবূল হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রতিউত্তরের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মুফাস্সিরীন মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তার কারণ, এক্ষেত্রে পরিষ্কার ভাষায় দোয়া কবূল হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়নি, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে ঃ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى অর্থাৎ হে মূসা (আ) আপনার প্রার্থনা পূরণ করে দেয়া হলো। আর অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا অর্থাৎ হে মূসা (আ) তোমাদের উভয়ের দোয়াই গৃহীত হয়েছে। এভাবে আলোচ্য ক্ষেত্রেও পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়নি। সে জন্য কোন কোন মনীষী এ আয়াতের এ মর্মই সাব্যস্ত করেছেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর প্রার্থনা যদিও তার উম্মতের বেলায় গৃহীত হয়নি, কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের জন্য গৃহীত হয়েছে–যার আলোচনা পরবর্তী

আয়াতসমূহে সবিস্তারে আসবে। কিন্তু তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে বর্ণিত প্রতিউত্তরের সঠিক বিশ্লেষণ এই যে, হযরত মূসা (আ) যে প্রার্থনা করেছিলেন, তার দুটি অংশ ছিল। একটি হলো এই যে, যাদের প্রতি আযাব ও অভিসম্পাত হয়েছিল, তাদের প্রতি ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা হোক। আর দ্বিতীয় দিকটি ছিল এই যে, আমার ও আমার সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ পরিপূর্ণভাবে লিখে দেয়া হোক। প্রথম অংশের প্রতিউত্তর এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশের প্রতিউত্তর দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক পাপের জন্য শাস্তি না দেয়াই আমার রীতি। অবশ্য (চরম ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার দরুন) শুধু তাদেরকেই শাস্তি দিই, যাদেরকে একান্তভাবেই শাস্তি দেয়া আমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—তাদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে না। তবে রইল রহমতের ব্যাপার! আমার রহমত তো সব কিছুতেই ব্যাপক—তা সে মানুষ হোক বা অমানুষ, মু'মিন হোক বা কাফির, অনুগত হোক বা কৃতঘ্ন। এমন কি পৃথিবীতে যাদেরকে কোন শাস্তি ও কষ্টের সম্মুখীন করা হয়, তারাও সম্পূর্ণভাবে আমার রহমত বর্জিত হয় না। অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই যে, যেটুকু বিপদে তাকে ফেলা হলো, তার চেয়েও বড় বিপদে ফেলা হয়নি, অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সে ক্ষমতাও ছিল।

মহামান্য ওস্তাদ আন্ওয়ার শাহ্ (র) বলেছেন যে, রহমতের ব্যাপকতর অর্থ হলো যে, রহমতের পরিধি কারো জন্যেই সংকুচিত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতিই রহমত হবে—যেমন ইবলীসে-মালাউন বলেছে যে, আমিও তো একটা বস্তু, আর প্রত্যেকটি বস্তুই যখন রহমতযোগ্য, কাজেই আমিও রহমতের যোগ্য। বস্তুত কোরআন মজীদের শব্দেই ইঙ্গিত রয়েছে, তা বলা হয়নি যে, প্রত্যেকটির বস্তুর প্রতিই রহমত করা হবে। বরং বলা হয়েছে, রহমত বা করুণা সংক্রান্ত আল্লাহ্র গুণ সংকুচিত নয়; অতি প্রশস্ত ও ব্যাপক। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করতে পারেন। কোরআন মজীদের অন্যত্র এর সাক্ষ্য এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিন যে, তোমাদের প্রতিপালক ব্যাপক রহমতের অধিকারী, কিন্তু যারা অপরাধী তাদের উপর থেকে তার আযাবকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। এখানে বাত্লে দেয়া হয়েছে যে, রহমতের ব্যাপকতা অপরাধীদের আযাব বা শাস্তির পরিপন্থী নয়।

সারকথা, মূসা (আ)-এর প্রার্থনা সেসব লোকের পক্ষে কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই কবূল করে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে ক্ষমাও করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি রহমতও করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় যে প্রার্থনায় দুনিয়া ও আখিরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ লিখে দেয়ার আবেদন করা হয়েছিল, তা কবূল করার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হলো। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সবার প্রতিই ব্যাপকভাবে রহমত হতে পারে, কিন্তু আখিরাত হলো ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের স্থান। সেখানে রহমত লাভের অধিকারী শুধুমাত্র তারাই হতে পারবে, যারা কয়েকটি শর্ত পূরণ করবে। আর তা হলো প্রথমত, তাদেরকে তাকওয়া ও

পরহিযগারী অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত যাবতীয় কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করবে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে নিজেদের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যাকাত বের করতে হবে। তৃতীয়ত, আমার সমস্ত আয়াত ও নির্দেশসমূহের প্রতি কোন রকম ব্যতিক্রম বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। বর্তমান আলোচ্য লোকগুলোও যদি এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করে নেয়, তাহলে তাদের জন্যও দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ লিখে দেয়া হবে।

কিন্তু এর পরবর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরিপূর্ণভাবে এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তারাই, যারা এদের পরবর্তী যুগে আসবে ও উম্মী নবীর অনুসরণ করবে এবং তার ফলে তারা পরিপূর্ণ কল্যাণের অধিকারী হবে।

হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেছেন, যখন رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন ইবলীস বলল, আমিও এ রহমতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরবর্তী বাক্যেই বাত্‌লে দেয়া হয়েছে যে, পরকালীন রহমত ঈমান প্রভৃতি শর্তসাপেক্ষ। এ কথা শুনে ইবলীস নিরাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু ইহুদী ও নাসারারা দাবি করল যে, আমাদের মধ্যে তো এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। অর্থাৎ পরহিযগারী, যাকাত দান এবং ঈমান। কিন্তু এর পরেই যখন নবীয়ে উম্মী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ঈমান আনার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা হলো, তখন তাতে সে সমস্ত ইহুদী খৃষ্টান পৃথক হয়ে গেল, যারা মহানবী (সা)-এর প্রতি ঈমান আনেনি।

যা হোক, অনন্য এই বর্ণনাভঙ্গির ভেতর দিয়েই হযরত মূসা (আ)-এর দোয়া মঞ্জুরির বিষয়টিও আলোচিত হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে মহানবী (সা)-এর উম্মতদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হলো।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ لا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ ع

(১৫৭) সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে

সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা এমন রাসূল নবীয়ে-উম্মীর অনুসরণ করে যাঁর সম্পর্কে নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা রয়েছে (যার এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে), তিনি তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখেন। আর পবিত্র বস্তু সামগ্রীকে তাদের জন্য হালাল ও বৈধ বলে বাতলে দেন (হয়তো-বা সেগুলো পূববর্তী শরীয়তে হারাম ছিল।) এবং অপবিত্র বস্তু সামগ্রীকে (যথারীতি) হারাম বলে অভিহিত করেন। আর (পূববর্তী শরীয়তের বিধান মতে) যা তাদের উপর বোঝা ও গলবেড়ি (হিসাবে চেপে) ছিল, (অর্থাৎ অতি কঠিন ও জটিল যেসব বিধানের অনুশীলনে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল,) সেগুলো অপসারণ করেন) অর্থাৎ এহেন জটিল ও কঠিন বিধানসমূহ তাঁর শরীয়তে রহিত হয়ে যায়)। অতএব, যারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনে, তাঁর সমর্থন ও সাহায্য করে এবং (সেই সঙ্গে) সে নূরেরও অনুসরণ করে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন, তাহলে) এমন লোকেরাই পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভের যোগ্য (এতে তারা অনন্ত আযাব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খাতিমুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য ঃ পূববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ার প্রতিউত্তরে বলা হয়েছিল যে, সাধারণত আল্লাহ্‌র রহমত তো সমস্ত মানুষ ও বিষয়-সামগ্রীতে ব্যাপক; আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নিয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা ঈমান, তাকওয়া-পরহিযগারী ও যাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করেন।

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, উল্লিখিত শর্তসমূহের যথার্থ পূরণকারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর যথাযথ অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনই নয়; বরং সেই সাথে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে শরীয়ত ও সুন্নাহ্‌র আনুগত্য-অনুসরণও একান্ত আবশ্যক।

اَلرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ এখানে মহানবী (সা)-এর দু'টি পদবী 'রাসূল' ও 'নবী'-র সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-রও উল্লেখ করা হয়েছে। اُمِّی (উম্মী) শব্দের অর্থ হলো নিরক্ষর। যে লেখাপড়া কোনটাই জানে না। সাধারণ আরবদের সে কারণেই কোরআন اُمِّیِّیْنَ (উম্মিয়্যীন)

বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল; তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কোন মানুষের জন্য প্রশংসনীয় গুণ নয়; বরং ত্রুটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রাসূলে-করীম (সা)-এর জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কেননা শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোন লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোন একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছাড়া আর কি হতে পারে—যা কোন প্রথম শ্রেণীর বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে মহানবী (সা)-এর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সবার সামনে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক অক্ষর পড়েনওনি লেখেনওনি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহসা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশের মতো একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁর উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত রাসূল হওয়ার এবং কোরআন মজীদের আল্লাহ্র কালাম হওয়ারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অতএব, উম্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কোন প্রশংসনীয় গুণ নয়, কিন্তু মহানবী হুযূরে আকরাম (সা)-এর জন্য একটি প্রশংসনীয় ও মহান গুণ এবং পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন মানুষের জন্য যেমন 'অহংকারী' শব্দটি কোন প্রশংসাবাচক গুণ নয় বরং ত্রুটি বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটি বিশেষভাবেই প্রশংসাবাচক সিফাত।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী (সা)-এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ ইহুদী নাসারারা) আপনার সম্পর্কে তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন মজীদ এ কথা বলেনি যে, 'আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহ তাতে লেখা পাবে'। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলে মহানবী (সা)-এর অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করা স্বয়ং হুযূর আকরাম (সা)-কে দেখারই শামিল। আর এখানে তওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, বনী ইসরাঈলরা এ দুটি গ্রন্থকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে মহানবী (সা)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 'যবুর' গ্রন্থেও রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন মূসা (আ)। এতে তাঁকে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার উম্মতের মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী নবী ও খাতিমুল আম্বিয়া আলায়হিস্সালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে।

তওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন ঃ বর্তমানকালের তওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি সাধনের ফলে বিশ্বাসযোগ্য রয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তাতে এমন সব বাক্য ও বর্ণনা রয়েছে, যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কোরআন মজীদ যখন

ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনসমূহ তওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন এ কথাটি যদি বাস্তবতা বিরোধী হতো, তবে সে যুগের ইহুদী ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে (সহজেই) কোরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না, তওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নবীয়ে উম্মী (সা) সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার ইহুদী বা নাসারারা কোরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন পাল্টা ঘোষণা করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূল করীম (সা)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব-নিশ্চুপ।

খাতিমুন্নাবিয়্যীন (সমস্ত নবীর শেষ নবী) (সা)-এর যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কোরআন মজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীর উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন সচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে হুযূরে আকরাম (সা)-এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন।

হযরত বায়হাকী (র) 'দালায়েলুন্নবুয়ত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন যে, কোন এক ইহুদী বালক নবী করীম (সা)-এর খিদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযূর (সা) তার অবস্থা জানার জন্য তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তওরাত তিলাওয়াত করছে। হুযূর (সা) বললেন ঃ হে ইহুদী, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সেই মহান সত্তার, যিনি মূসা (আ)-এর উপর তওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেয়েছ ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি (ছেলেটির পিতা) ভুল বলছেন। তওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর হুযূরে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার পিতার হাতে দেওয়া হবে না।-(মাযহারী)

আর হযরত আলী মুর্তযা (রা) বলেন যে, হুযূর আকরাম (সা)-এর নিকট জনৈক ইহুদীর কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার ঋণ চাইল। হুযূর (সা) বললেন, এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছু নেই; আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদী কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। হুযূর (সা) বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে-আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর হুযূর (সা) সেখানেই বসে পড়লেন এবং যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায সেখানেই আদায় করলেন। এমন কি পরের দিন ফজরের নামাযও সেখানেই পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কিরাম (রা) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন; আর ইহুদীকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন, যাতে সে হুযূর (সা)-কে ছেড়ে দেয়। হুযূর (সা) বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীদের বললেন, একি করছ ?

তখন তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে ? হুযূর (সা) বললেন, "আমাদের পরওয়ারদিগার কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি যুলুম করতে আমাকে বারণ করেছেন।" ইহুদী এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদী বলল ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَّاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রাসূল)। এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা করা যে, তওরাতে আপনার যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কি, নয়। আমি আপনার সম্পর্কে তওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি ঃ

> মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাযের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্যই নেই; আর আপনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল। আর এই হলো আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারেন। সে ইহুদী বহু ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ। (বায়হাকী কৃত 'দালায়েলুন্নবুয়ত' গ্রন্থের বরাত দিয়ে 'তফসীরে মাযহারীতে' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ইমাম বগভী (র) নিজ সনদে কা'আবে আহ্বার (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তওরাতে হুযূর আকরাম (সা) সম্পর্কে লেখা রয়েছে ঃ

> মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাযের লোক, না বাজে বক্তা। তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক নন। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করবেন না, বরং ক্ষমা করে দেবেন এবং ছেড়ে দেবেন। তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, আর হিজরতে হবে তাইবায়, তাঁর দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তাঁর উম্মত হবে 'হাম্মাদীন' অর্থাৎ আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যেকোন ঊর্ধ্বারোহণকালে তকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময় নামায পড়তে পারে। তিনি তাঁর শরীরের নিম্নাংশে 'তহবন্দ' (লুঙ্গি) পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওযূর মাধ্যমে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাঁদের আযানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহবান করবেন। জিহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে যেমন নামাযে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তিলাওয়াত ও যিকিরের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার শব্দ। –(মাযহারী)

ইবনে সা'আদ ও ইবনে আসাকির (র) হযরত সাহাল মওলা খাইসামা (রা) থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত সাহাল বলেন, আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মদ মুস্তফা

(সা)-এর গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি ঃ

তিনি খুব বেঁটেও হবেন না, আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দু'টি কেশ-গুচ্ছধারী হবেন। তাঁর দু'টি কাঁধের মধ্যস্থলে নবুয়তের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারী করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দুইয়ে নেবেন। তালি লাগানো জামা পরবেন। আর যারা এমন করে তারা অহঙ্কার মুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর হবেন। তাঁর নাম হবে আহ্‌মদ।

আর ইবনে সা'আদ, দারেমী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাব্‌কাত, মাস্‌নাদ ও 'দালায়েলুন্নবুয়ত' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন; যিনি ছিলেন ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আলিম এবং তওরাতের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ, তিনি বলেছেন যে, তওরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ঃ

হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়্যীন অর্থাৎ আরবদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাযীও নন, দাঙ্গাবাজও নন। হাটে-বাজারে হট্টগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে মৃত্যু দেবেন না, যতক্ষণ না আপনার মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই)-এর মন্ত্রে স্বীকৃত হয়ে যাবেন, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দেবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বন্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন।

এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্‌র ইবনে আস্ (রা) থেকে বোখারী শরীফেও উদ্ধৃত হয়েছে।

আর প্রাচীন গ্রন্থ-বিশারদ আলিম হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (রা) থেকে ইমাম বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন্নবুয়ত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা যবুর কিতাবের মধ্যে হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন যে, হে দাউদ, আপনার পরে একজন নবী আসবেন, যাঁর নাম হবে 'আহ্‌মদ'। আমি তাঁর প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হবো না এবং তিনি কখনও আমার না-ফরমানী করবেন না। আমি তাঁর গত-আগত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি। তাঁর উম্মত হলো দয়াকৃত উম্মত (উম্মতে মরহুমাহ্)। আমি তাদেরকে সে সমস্ত নফল বিষয় দান করছি, যা পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অপরিহার্য করেছিলাম। এমনকি তারা হাশরের দিনে আমার সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালামের নূরের মত হবে। হে দাউদ, আমি মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ছয়টি বিষয় দিয়েছি, যা অন্য কোন উম্মতকে দেইনি। ১. কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের কোন শাস্তি হবে না। ২. অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে যদি সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ৩.

যে মাল সে পবিত্র মনে আল্লাহ্র রাহে খরচ করবে, আমি দুনিয়াতেই তাকে তা থেকে বহুগুণ বেশি দিয়ে দেব। ৪. তাদের উপর কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে যদি তারা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে, তবে আমি তাদের জন্য এ বিপদকে করুণা ও রহমত এবং জান্নাতের দিকে পথনির্দেশে পরিণত করে দেব। (৫-৬) তারা যে দোয়া করবে আমি তা কবুল করব, কখনও যা চেয়েছে তাই দান করে, আর কখনও এই দোয়াকেই তাদের আখিরাতের পাথেয় করে দিয়ে।—(রূহুল মা'আনী)

শত শত আয়াতের মধ্যে এ কয়টি রেওয়ায়েত তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হলো। সমস্ত রেওয়ায়েত মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

তওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত শেষনবী (সা) ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলিম মনীষীবৃন্দ স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বর্তমান যামানায় হযরত মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কীরানভী মুহাজিরে-মক্কী (র) তাঁর গ্রন্থ 'ইযহারুল-হক'-এ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীল, যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত হয়েছে, তাতেও মহানবীর বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির উর্দূ অনুবাদ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

পূববর্তী আয়াতে মহানবী (সা)-এর সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের সবিস্তার আলোচনা ছিল যা তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুরে লেখা ছিল। আয়াতে হুযূরে আকরাম (সা)-এর কিছু অতিরিক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য আলোচিত হচ্ছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম গুণটি হলো, সৎ কাজের উপদেশ দান ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত করা। مَعْرُوْفٌ (মা'রূফ)-এর শব্দার্থ হলো জানাশোনা, প্রচলিত। আর مُنْكَرٌ (মুনকার) অর্থ অজানা, বহিরাগত, যা চেনা যায় না। এক্ষেত্রে 'মা'রূফ' বলতে সেসব সৎকাজকে বোঝানো হয়েছে, যা ইসলামী শরীয়তে জানাশোনা ও প্রচলিত। আর 'মুনকার' বলতে সেসব মন্দ ও অসৎ কাজ, যা শরীয়তবহির্ভূত।

এখানে সৎ কাজসমূহকে مَعْرُوْفٌ (মা'রূফ) এবং মন্দ ও অন্যায় কাজসমূহকে مُنْكَرٌ (মুনকার) শব্দের মাধ্যমে বোঝাতে গিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দীনে ইসলামের দৃষ্টিতে সৎ কাজ শুধু সেই সমস্ত কাজকেই বলা যাবে, যা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত ছিল এবং যা এরূপ হবে না, সেটাকে 'মুনকার' অর্থাৎ অসৎ কাজ বলা হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবেয়ীন (র) যেসব কাজকে সৎ কাজ বলে মনে করেন নি, সে সমস্ত কাজ যতই ভাল মনে হোক না কেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে সেগুলো ভাল কাজ নয়। এ জন্যই সহী হাদীসসমূহে সে সমস্ত কাজকেই কুসংস্কার ও বিদ'আত সাব্যস্ত করে গোমরাহী বলা হয়েছে—যার শিক্ষা মহানবী (সা) সাহাবায়ে কিরাম কিংবা তাবেইনদের কাছ থেকে আসেনি। আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটির অর্থ হলো এই যে, হুযূর (সা) মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেবেন এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবেন।

এ গুণটি যদিও সমস্ত নবী (আ)-এর মধ্যেই ব্যাপক এবং হওয়া উচিতও বটে—। কারণ প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে এ কাজের জন্যই পাঠানো হয়েছে যে, তাঁরা মানুষকে সৎকাজের প্রতি পথনির্দেশ করবেন এবং অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করবেন, কিন্তু এখানে রাসূলে করীম (সা)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এর বর্ণনা করাতে সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা)-কে এ গুণটিতে অন্যান্য নবী-রাসূল অপেক্ষা কিছুটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। আর এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার কারণ একাধিক। প্রথমত এ কাজের সেই বিশেষ প্রক্রিয়া যাতে প্রতিটি শ্রেণীর লোককে তাদের অবস্থার উপযোগী পদ্ধতিতে বোঝানো, যাতে করে প্রতিটি বিষয় তাদের মনে বসে যায়; কোন বোঝা বলে মনে না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এ বিষয়ে অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার অধিকারী করেছিলেন। আরবের যে মরুবাসীরা উট, আর ছাগল চরানো ছাড়া কিছুই জানত না, তাদের সাথে তিনি তাদের বোধগম্য আলোচনা করতেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানগত বিষয়কেও এমন সরল-সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন, যাতে অশিক্ষিত মূর্খজনেরও তা হৃদয়ঙ্গম করতে কোন অসুবিধা না হয়। আবার অপরদিকে কায়সার ও কিস্রা হেন অনারব সম্রাট এবং তাদের পাঠানো বিজ্ঞ ও পণ্ডিত দূতদের সাথে তাদেরই যোগ্য আলোচনা চলত। অথচ সবাই সমানভাবে তাঁর সে আলোচনায় প্রভাবিত হতো। দ্বিতীয়ত হুযূর আকরাম (সা) ও তাঁর বাণীর মাঝে আল্লাহ্-প্রদত্ত জনপ্রিয়তা এবং মানব মনের গভীরতম প্রদেশে প্রভাব বিস্তারের একটা মু'জিযাসুলভ ধারা ছিল। বড়র চেয়ে বড় শত্রুও যখন তাঁর বাণী শুনত, তখন প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারত না।

উপরে তওরাতের উদ্ধৃতিতে রাসূলে করীম (সা)-এর যে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান করবেন; আর বন্ধ অন্তরাত্মাকে খুলে দেবেন। রাসূলে করীম (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা امر بالمعروف (সৎ কাজের নির্দেশ দান) এবং نهى عن المنكر (অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা)-এর জন্য যে অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন এসব গুণও হয়ত তারই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা) মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন; আর পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন অর্থাৎ অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী যা শাস্তিস্বরূপ বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, রাসূলে করীম (সা) সেগুলোর উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন। উদাহরণত পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী ইসরাঈলদের অসদাচরণের শাস্তি হিসেবে হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, মহানবী (সা) সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ্য ও সমস্ত হারাম জন্তু অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় হারাম উপায়ের আয় যথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।—(আস্‌সিরাজুল-মুনীর) কোন কোন মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসকেও পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ মহানবী (সা) মানুষের উপর থেকে সেই বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন, যা তাদের উপর চেপে ছিল

" اصر " (ইসর) শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা, যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর اغلال (আগলাল) غُلٌّ -এর বহুবচন। 'গুল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যদ্দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে।

اِصْرٌ (ইসর) ও اَغْلَالٌ (আগলাল) অর্থাৎ অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, কাপড় নাপাক হয়ে গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনী ইসরাঈলদের জন্য যথেষ্ট ছিল না; বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফিরদের সাথে জিহাদ করে গনীমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না, বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। কোন অঙ্গ দ্বারা কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সেই অঙ্গটি কেটে ফেলা ছিল অপরিহার্য ওয়াজিব। কারো হত্যা, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, উভয় অবস্থাতেই হত্যাকারীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব, খুনের ক্ষতিপূরণের কোন বিধানই ছিল না।

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধান যা বনী ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কোরআনে সেগুলোকে 'ইস্‌র' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) এসব কঠিন বিধি-বিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধি-বিধান প্রবর্তন করবেন।

এক হাদীসে মহানবী (সা) এ বিষয়টিই বলেছেন, আমি তোমাদের একটি সহজ ও সাবলীল শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাতে না আছে কোন পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোন ভয়ভীতি।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, اَلدِّيْنُ يُسْرٌ অর্থাৎ ধর্ম সহজ। কোরআন করীম বলেছে ঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেন নি।

উম্মী নবী (সা)-এর বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছে ঃ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী (সা)-এর প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেওয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে–অর্থাৎ যারা কোরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হলো কল্যাণপ্রাপ্ত।

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমত মহানবী (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনা, দ্বিতীয়ত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়ত তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করা এবং চতুর্থত কোরআন অনুযায়ী চলা।

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বোঝাবার জন্য عَزَّرُوْهُ (আয্যারূহু) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تَعْـزِيْر থেকে উদ্ভূত। تَعْزِيْر (তা'যীর) অর্থ সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) عَزَّرُوْهُ (আযযারূহ)-এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় تعزير (তা'যীর)।

তার অর্থ, যারা মহানবী (সা)-এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ত্ববোধ-সহকারে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মুকাবিলায় তাঁর সহায়তা করবে, তারাই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম (সা)-এর জীবৎকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তাঁর সত্তার সাথে। কিন্তু হুযূর (সা)-এর তিরোধানের পর তাঁর শরীয়ত এবং তাঁর প্রবর্তিত দীনের সাহায্য-সমর্থনই হলো মহানবীর সাহায্য-সমর্থনের শামিল।

এ আয়াতে কোরআন করীমকে 'নূর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, 'নূর' বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই, বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনিভাবে কোরআন করীমও নিজেই আল্লাহ্র কালাম ও সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ যে, একজন একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালঙ্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোন উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং কোরআন করীমের আল্লাহ্র কালাম হওয়ারই প্রমাণ।

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং অন্ধকারকে আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কোরআন করীমও ঘোর অন্ধকারের আবর্তে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে।

কোরআনের সাথে সাথে সুন্নাহ্র অনুসরণও ফরয ঃ এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে ঃ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ এর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهُ -এর প্রথম বাক্যে 'উম্মী' নবীর অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কোরআনের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখিরাতের মুক্তি কোরআন ও সুন্নাহ্ দু'টিরই অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। কারণ উম্মী নবীর অনুসরণ তাঁর সুন্নাহ্র অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

শুধু রাসূলের অনুসরণই নয়; মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং মহব্বত থাকাও ফরয ঃ উল্লিখিত বাক্য দু'টির মাঝে عَزَّرُوْهُ وَنَصَـرُوْهُ শীর্ষক দু'টি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা) কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়, যেমন সাধারণত দুনিয়ার শাসকদের বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয় বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণই উদ্দেশ্য যা হবে মহত্ত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার ফলশ্রুতি অর্থাৎ অন্তরে

হুযূরে-আকরাম (সা)-এর মহত্ত্ব ও ভালবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধি-বিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রাসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একেতো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়ত তিনি হলেন প্রেমাস্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক।

এদিকে রাসূলে-করীম (সা) জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপনকারী একক মহত্ত্বের আধার ; আর সে তুলনায় সমগ্র উম্মত হচ্ছে একান্তই হীন ও অক্ষম।

আমাদের পেয়ারা নবী (সা)-এর মাঝে যাবতীয় মহত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, কাজেই তাঁর প্রতিটি মহত্ত্বের দাবি পূরণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্যকর্তব্য। রাসূল হিসেবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মনিব ও হাকেম হিসেবে তাঁর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসেবে তাঁর সাথে গভীরতর প্রেম ও ভালবাসা রাখতে হবে এবং নবুয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরয হওয়াই উচিত। কেননা এছাড়া নবী-রাসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের রাসূলে-মকবুল (সা) সম্পর্কে শুধু আনুগত্য অনুসরণের উপর ক্ষান্ত করেন নি; বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্যকর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কোরআনে-করীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রীতিনীতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতে عَـزَّرُوْهُ وَنَصَـرُوْهُ বাক্যে সেদিকেই হিদায়েত দান করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَتُعَـزِّرُوْهُ وَتُوَقِّـرُوْهُ অর্থাৎ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর। এ ছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে এই হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা)-এর উপস্থিতিতে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যা তাঁর স্বর হতে বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেও না, অর্থাৎ যদি মজলিসে হুযূর আকরাম (সা) উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাঁর আগে কোন কথা বলো না।

হযরত সাহ্‌ল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, হুযূর (সা)-এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোন কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে।

কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা)-কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে না, নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে ঃ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের বরখেলাফ কোন অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।

এ কারণেই সাহাবায়ে-কিরাম রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী (সা)-এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই

কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাঁদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) যখন মহানবী (সা)-এর খিদমতে কোন বিষয় নিবেদন করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন যেন কোন গোপন বিষয় আস্তে আস্তে বলছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারূকে আযম (রা)-এরও।—(শেফা)

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপেক্ষা আমার কোন প্রিয়জন সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি হুযূর আকরাম (সা)-এর আকার অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এ জন্য অপারক যে, আমি কখনও তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, সাহাবীদের মজলিসে যখন হুযূর আকরাম (সা) তশরীফ আনতেন তখনই সবাই নিম্নদৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রা) তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেন; আর তিনি তাঁদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন।

ওরওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য মদীনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে হুযূর (সা)-এর প্রতি এমন নিবেদিতপ্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল; "আমি কিস্‌রা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট নাজ্জাশীর সাথেও সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীদের যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মুকাবিলায় জয়ী হতে পারবে না।"

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হুযূর আকরাম (সা) যখন ঘরের ভিতর অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কিরাম বে-আদবী মনে করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে বেশি জোরে শব্দ না হয়।

মহানবী (সা)-এর তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে-নববীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দূরের কথা, কোন ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈঃস্বরে করা পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সাহাবী (রা)-র এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ হুযূর আকরাম (সা)-এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন।

এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তাঁরা নবুয়তী ফয়েয থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও এ কারণেই তাঁদেরকে আম্বিয়া (আ)-এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ

ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

(১৫৮) বলে দাও হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল,—সমগ্র আসমান ও যমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্র উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্র এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরলপথ প্রাপ্ত হতে পার। (১৫৯) বস্তুত মূসার সম্প্রদায়ের একটি দল রয়েছে যারা সত্যপথ নির্দেশ করে এবং সে মতেই বিচার করে থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, হে (দুনিয়া-জাহানের) মানুষ আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল যাঁর সাম্রাজ্য আকাশসমূহ ও পৃথিবীসমূহে (বিস্তৃত)। তাঁকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন। কাজেই আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর উম্মী নবীর প্রতিও (ঈমান আন)। তিনি নিজেও আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর নির্দেশাবলীর উপর ঈমান রাখেন। (অর্থাৎ এহেন মহান মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যখন আল্লাহ্ বিগত সমস্ত নবী-রাসূল ও কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনতে তাঁর এতটুকু সংকোচবোধ হয় না, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনতে তোমাদের এ অস্বীকৃতি কেন ?) আর তাঁর (অর্থাৎ নবীর) অনুসরণ কর, যাতে তোমরা (সরল) পথে আসতে পার। বস্তুত (কেউ কেউ যদিও তাঁর বিরোধিতা করেছে, কিন্তু) মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্য-সনাতন ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম)-এর সপক্ষে (মানুষকে) হিদায়েত করে এবং সে অনুযায়ীই (নিজেদের ও অন্যদের ব্যাপারে) বিচার-মীমাংসাও করে। (এর লক্ষ্য হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রিসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জ্বিন ও মানবজাতি তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক।

এ আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি মানুষকে বলে দিন আমি তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুয়ত লাভ ও রিসালত প্রাপ্তি বিগত নবীদের মত কোন বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য, বিশ্বের

প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য—কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত। আর মানব জাতি ছাড়াও এতে জ্বিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী (সা)-এর নবুয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই নবুয়তের ধারাও সমাপ্ত ঃ নবুয়ত সমাপ্তির এটাই হলো প্রকৃত রহস্য। কারণ মহানবী (সা)-এর নবুয়ত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নবী বা রাসূলের আবির্ভাবের না কোন প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে, না তার কোন অবকাশ আছে। আর এই হলো মহানবী (সা)-এর উম্মতের সে বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম (সা)-এর ভাষায় এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদের মুকাবিলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কোরআন-সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপনোদন করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তাপ্রাপ্ত হবে, যার ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে মহানবী (সা)-এর রিসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত—(নায়েব)।

ইমাম রাযী (র) كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এই উম্মতের মধ্যে 'সাদেকীন' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। তা না হলে বিশ্ববাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই দেওয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (র) সর্বযুগে ইজমায়ে-উম্মত বা মুসলমান জাতির ঐকমত্যকে শরীয়তের দলীল বলে প্রমাণ করেছেন। তার কারণ, সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোন ভুল বিষয় কিংবা কোন পথভ্রষ্টতায় সবাই ঐকমত্য বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেছেন যে, এ আয়াতে মহানবী (সা)-এর খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ হুযূর (সা)-এর আবির্ভাব ও রিসালত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নতুন রাসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। সেজন্যই শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আ) যখন আসবেন, তখন তিনিও যথাস্থানে নিজের নবুয়তে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা) কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তের উপরই আমল করবেন। [হুযূরে আকরাম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিজস্ব যে শরীয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত বলেই গণ্য করবেন।] বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দ্বারা তা-ই প্রতীয়মান হয়।

রাসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর রিসালত যে কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক, এ আয়াতটি তো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছেই—তাছাড়া কোরআন মজীদে আরও কতিপয় আয়াত তার প্রমাণ বহন করে। যেমন বলা হয়েছে ঃ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ অর্থাৎ আমার প্রতি এই কুরআন ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে আমি তোমাদের আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করি এবং তাদেরকেও ভীতিপ্রদর্শন করি যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছবে আমার পরে। [অর্থাৎ হুযূর (সা)-এর তিরোধানের পরে।]

মহানবী (সা)-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ ইবনে কাসীর মসনদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে-তাবুকের (তাবুক

যুদ্ধের) সময় রাসূলে করীম (সা) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তাঁরা হুযূর (সা)-এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হুযূর (সা) নামায শেষ করে ইরশাদ করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোন নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি। তার একটি হলো এই যে, আমার রিসালাত ও নবুওয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাঁদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত আমাকে আমার শত্রুর মুকাবিলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না। বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হতো। তাদের গনীমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে খাক করে দিয়ে যাবে। চতুর্থত আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামায যে কোন জমি, যে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোন বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের ইবাদত শুধু তাদের উপাসনালয়েই হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা মাঠে-ময়দানে তাদের নামায বা ইবাদত হতো না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্যও না থাকে তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোন রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেওয়াই পবিত্রতা ও অযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেন, আর পঞ্চমটির কথা তো বলতেই নেই, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক রাসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো আপনি কোন একটা দোয়া করুন। আমি আমার দোয়াকে আখিরাতের জন্য সংরক্ষিত করিয়ে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত لا إله إلا الله কলেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহ্মদ (র)-এর এক রিওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খৃষ্টান হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে।

আর সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আবূ দার্দা (রা)-র রিওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-র মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতবিরোধ হয়। তাতে হযরত উমর (রা) নারায হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবূ বকর (রা)-ও

তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত উমর (রা) কিছুতেই রাযী হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী (সা)-এর দরবারে গিয়ে হাযির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত উমর (রা) নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে যান এবং তিনিও ঘর থেকে বেরিয়ে মহানবী (সা)-এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবূ দার্দা (রা) বলেন যে, এতে রাসূলাল্লাহ্ (সা) অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রা) যখন লক্ষ্য করলেন যে, হযরত উমর (রা)-এর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, দোষ আমারই বেশি। রাসূলে করীম (সা) বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম ঃ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে, শুধু এই আবূ বকর (রা)-ই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রতিটি দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রতিটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী (সা)-এর ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হুযূরে আকরাম (সা)-এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না সে লোক কোন সাবেক শরীয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোন ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

আয়াতের শেষাংশে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, সমস্ত আসমান-যমীন যাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ একথা যখন জানা হয়ে গেছে যে, মহানবী (সা) সমস্ত বিশ্ব-সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত রাসূল, তাঁর আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় নেই, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনাও অপরিহার্য হয়ে গেছে, যিনি নিজেও আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান আনেন। আর তাঁরই আনুগত্য অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সঠিক পথে থাকতে পার।

আল্লাহ্র 'কালেমাত' বা বাণীসমূহ বলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র কিতাব তওরাত, ইঞ্জীল, কোরআন প্রভৃতি আসমানি গ্রন্থ। ঈমানের নির্দেশ দেওয়ার পর আবার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মহানবী (সা)-এর শরীয়তের আনুগত্য ছাড়া শুধুমাত্র ঈমান আনা কিংবা মৌখিক সত্যায়ন করাই হিদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য নবী করীম (সা) কর্তৃক বাতলানো পথ ছাড়া অন্য সমস্ত পথই বন্ধ।

হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল ঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে।

বিগত আয়াতসমূহে মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের অসদাচার, কূট তর্ক এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটিই এমন নয়; তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভাল রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব লোক, যারা তওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হিদায়েত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন (সা)-এর অবির্ভাব হয়, তখন তওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তার যথাযথ অনুসরণও করে। বনী ইসরাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কোরআন মজীদে বারংবারই করা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্যনিষ্ঠ, সারারাত ধরে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। অন্যত্র রয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ যাদেরকে মহানবী (সা)-এর পূর্বে কিতাব (তওরাত ও ইঞ্জীল) দান করা হয়েছিল, তারা মহানবী (সা)-এর উপর ঈমান আনে।

প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর (র) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জমাআত বা দল দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য, যারা বনী ইসরাঈলদের গোমরাহী, অসৎকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে অদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল, যারা নিজেদের জাতির কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদিগারে আলম ! আমাদের এদের থেকে সরিয়ে কোন দূর দেশে পুনর্বাসিত করে দিন, যাতে আমরা আমাদের দীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ্ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দেড়শ বছরের দূরত্বে দূর-প্রাচ্যের কোন ভূ-খণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানে তারা নির্ভেজাল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রাসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহ্র মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মি'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আ) হুযূর (সা)-কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা মহানবী (সা)-এর উপর ঈমান আনে। হুযূর আলাইহিসসালাতু ওয়াস্সালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি মাপজোখের কোন ব্যবস্থা আছে ? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল, আমরা জমিতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দিই। সেই স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপজোখের কোন প্রয়োজন পড়ে না। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে ? তারা নিবেদন করল, না। কারণ কেউ যদি তা করে, তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন,

তোমাদের সবার ঘরবাড়িগুলো একই রকম কেন ? নিবেদন করল, তা এজন্য যাতে কেউ কারোও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ ? নিবেদন করল, যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর হুযূর (সা) যখন মি'রাজ থেকে মক্কায় ফিরে এলেন তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ তফসীরে কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যতার কথাও লিখেছেন। ইবনে কাসীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে খণ্ডন করেন নি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবত এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়।

যাহোক, এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। তা তারা হুযূর (সা)-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনী ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্রই হোক, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর কোন বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে রেখেছেন, যেখানে যাওয়া অন্য কারোও পক্ষে সম্ভব নয়। (আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞানী।)

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى
اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ
الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾
وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ
شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطِيْٓئٰتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا
مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

(১৬০) আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বারজন পিতামহের সন্তানদের বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মূসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হলো বারটি প্রস্রবণ! প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া'। যে পরিচ্ছন্ন বস্তু জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। বস্তুত তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই। (১৬১) আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হলো যে, তোমরা এ নগরীতে বসবাস কর এবং খাও তা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা এবং বল, আমাদের ক্ষমা করুন। আর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর প্রণত অবস্থায়। তবে আমি ক্ষমা করে দেব তোমাদের পাপসমূহ। অবশ্য আমি সৎকর্মীদের অতিরিক্ত দান করব। (১৬২) অনন্তর জালিমরা এতে অন্য শব্দ বদলে দিল তার পরিবর্তে, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি আসমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি (একটা পুরস্কার বনী ইসরাঈলকে এই দান করেছি যে, তাদের সংশোধন ও ব্যবস্থাপনার জন্য) তাদের বারটি গোত্রে বিভক্ত করে সবার পৃথক পৃথক দল সাব্যস্ত করে দিয়েছি। (এবং প্রত্যেকের দেখাশোনার জন্য একজন সর্দার নিযুক্ত করে দিয়েছি যার আলোচনা সূরা মায়িদার তৃতীয় রুকূতে وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا আয়াতে করা হয়েছে)। আর (একটি পুরস্কার হলো এই যে,) আমি মূসা (আ)-কে তখন নির্দেশ দিলাম, যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কাছে পানি চাইল (এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করলেন,) তখন নির্দেশ হলো, আপন হাতের এই যষ্টির দ্বারা অমুক পাথরের উপর আঘাত করুন (তাহলেই তা থেকে পানি বেরিয়ে আসবে)। সুতরাং (আঘাত করার) সঙ্গে সঙ্গে পানির বারটি ধারা (তাদের বার গোত্রের সংখ্যানুপাতে) প্রবাহিত হলো। (বস্তুত) প্রত্যেকেই আপন আপন পানি পান করার স্থান চিনে নিল। আর (একটি পুরস্কার হলো এই যে,) আমি তাদের উপর মেঘমালাকে ছায়াদানকারী করেছি। আর (এক নিয়ামত এই যে,) তাদেরকে (গায়েবী ভাণ্ডার হতে) 'মান্না' ও 'সালওয়া' পৌঁছে দিয়েছি এবং অনুমতি দান করেছি যে, (সেই) উৎকৃষ্ট সামগ্রী থেকে খাও, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। (কিন্তু এতেও তারা নির্দেশবিরুদ্ধ একটি ব্যাপার করে বসল—) এবং তাতে তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি বরং নিজেদেরই ক্ষতি (সাধন) করছিল। (এসব ঘটনা 'তীহ' মরুদ্যানে ঘটেছিল যার বিস্তারিত বিশ্লেষণ 'মা'আরেফুল কোরআন'-এর প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।) আর (সে সময়ের কথা স্মরণ কর,) যখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তোমরা সে জনপদে গিয়ে বসবাস কর এবং ভক্ষণ কর সেখানকার (বস্তু-সামগ্রীর) মধ্য থেকে যেখানেই তোমাদের ভাল লাগে। আর (এ নির্দেশও দেওয়া হয় যে, যখন তোমরা ভেতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করবে, তখন) মুখে

বলতে থাকবে—তওবা করছি (তওবা করছি) এবং (নম্রতার সাথে) প্রণত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাহলেই আমি তোমাদের (বিগত) পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব। (মার্জনা তো সবারই জন্য। তবে) যারা সৎকাজ করবে তাদেরকে এর উপরেও অধিক পরিমাণ দান করব। অনন্তর সে জালিমরা সে বাক্যটিকে অন্য বাক্যের দ্বারা বদলে দিল যা ছিল সে বাক্যের বিপরীত যা তাদেরকে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে আমি তাদের উপর এক আসমানি বিপদ পাঠিয়েছি এ কারণে যে, তারা নির্দেশের অবমাননা করত।

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ

فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا

يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ

عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوْا

مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

بِعَذَابٍۭ بَـِٔيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا

عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾

---

(১৬৩) আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদী তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশ ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর; আর যেদিন শনিবার হতো না আসত না ; এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ তারা ছিল নাফরমান। (১৬৪) আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান—কঠিন আযাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়। (১৬৫) অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহ্গারদের নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না-ফরমানীর

দরুন। (১৬৬) তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি সেই (আপনার সমকালীন ইহুদী) লোকদের কাছে (সতর্কীকরণ স্বরূপ) সেই জনপদের (অধিবাসীদের) সে সময়ের অবস্থা জিজ্ঞেস করুন, যারা সাগরের নিকটবর্তী (অঞ্চলে) অবস্থিত ছিল। (সেখানকার ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর শনিবার দিন শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল।) যখন তারা (সে জনপদের অধিবাসীরা) শনিবার (সম্পর্কিত নির্দেশ)-এর ব্যাপারে (শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত) সীমালংঘন করছিল, যখন তাদের (নিকট) শনিবার দিনটি আসত, তখন (তাদের) সেই (সাগরের) মাছগুলো (পানির ভেতর থেকে মাথা তুলে তুলে) বেরিয়ে এসে (সাগরের পানিতে ভেসে) তাদের সামনে চলে আসত। আর যখন শনিবার হতো না, তখন (সেগুলো) তাদের সামনে আসত না (বরং সেখান থেকে দূরে সরে যেত)। আর তার কারণ ছিল এই যে, আমি এভাবে তাদের (সুকঠিন) পরীক্ষা করতাম (যে, তাদের মধ্যে কারা নির্দেশে অটল থাকে, আর কারা থাকে না। আর এই পরীক্ষাটির) কারণ (ছিল) এই যে, (তারা পূর্ব থেকে) নির্দেশ অমান্য করে চলত। (সে কারণেই এহেন কঠিন নির্দেশের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করছি। যারা আনুগত্যপরায়ণ, তাদের পরীক্ষা হয় দয়া, সামর্থ্য ও সমর্থন দানে সহজীকৃত।) আর (তখনকার অবস্থা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করুন) যখন তাদের একটি দল (যারা তাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে উপকারিতা ও কার্যকারিতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিল, এমন লোকদের কাছে যারা তখনও সদুপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং ততটা নিরাশও হয়ে পড়েনি—যেমন لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়।) একথা বলল যে, তোমরা কেন এমনসব লোককে সদুপদেশ দিয়ে যাচ্ছো যাদের (কাছ থেকে সে উপদেশ গ্রহণের কোন আশাই নেই এবং তাতে মনে হয়, যেন) আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন অথবা (ধ্বংস যদি নাও করেন, তবু) তাদেরকে (অন্য কোন রকম) কঠিন শাস্তি দেবেন। (অর্থাৎ এহেন মূর্খ, অপদার্থদের নিয়ে কেন খামাখা মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছেন?) তারা উত্তর করল যে, তোমাদের এবং আমাদের পালনকর্তার দরবারে অজুহাত দাঁড় করবার জন্যই (সদুপদেশ দিচ্ছি, যাতে আল্লাহ্র দরবারে বলতে পারি যে, হে আল্লাহ্, আমরা তো বলেই ছিলাম, কিন্তু তারা শোনেনি—আমরা অসহায়।) আর (তদুপরি) এজন্য যে, হয়তো তারা ভীত হয়ে পড়বে (এবং সৎকর্মে প্রবৃত্ত হবে। কিন্তু কবেই বা তারা সৎকাজ করেছিল!) যাহোক, (শেষ পর্যন্ত) যা কিছু তাদেরকে বোঝানো হতো তা থেকে যখন তারা দূরেই সরে রইল (অর্থাৎ তা পালন করল না), তখন আমি তাদের তো আযাব থেকে রক্ষা করেছি , যারা মন্দ কাজ থেকে বাধা দান করত (চাই সে সময় বাধা দান করে থাক কিংবা নিরাশজনিত অজুহাতে বিরত থেকে থাকুক)। আর যারা (উল্লিখিত নির্দেশের ব্যাপারে) বাড়াবাড়ি করত, তাদেরকে তাদের (অমান্যতার কারণে) এক কঠিন আযাবের মধ্যে পাকড়াও করেছি (অর্থাৎ যখন তারা নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করেছে। এই তো

গেল نسيان ماذكروا به-এর তফসীর) তখন আমি (রাগান্বিত হয়ে) বলে দিয়েছি, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও। (এই হলো عذاب بئيس-এর তফসীর।)

উল্লিখিত ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও মা'আরেফুল কোরআনের প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার তফসীরে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ
الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾
وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ؗ
وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ
وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ
لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ
يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

(১৬৭) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬৮) আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে; তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাল; আর কিছু অন্য রকম। তাছাড়া আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দের মাধ্যমে যাতে তারা ফিরে আসে। (১৬৯) তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ, যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে কিতাবের, তারা নিকৃষ্ট পার্থিব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুত এমনি ধরনের উপকরণ যদি আবারও তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও তুলে নেবে। তাদের কাছ থেকে কিতাবে কি অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহ্‌র প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না ? অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। বস্তুত আখিরাতের আলয় মুত্তাকীদের জন্য উত্তম—তোমরা কি তা বুঝ না !

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সে সময়টির কথা স্মরণ করা উচিত, যখন আপনার প্রতিপালক (বনী ইসরাঈলের নবীগণের মাধ্যমে) একথা বাতলে দিয়েছেন যে, তিনি ইহুদীদের উপর (তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার শাস্তি হিসেবে) কিয়ামত (নিকটবর্তী সময়) পর্যন্ত এমন (কোন না কোন) ব্যক্তিকে অবশ্যই চাপিয়ে রাখতে থাকবেন যে, তাদেরকে কঠিন (অপমান, লাঞ্ছনা ও পরাধীনতাজনিত) শাস্তি দিতে থাকবে। (সুতরাং সুদীর্ঘকাল যাবত ইহুদীরা কোন না কোন রাষ্ট্রের পরাধীনতা ও কোপানলে ভুগে আসছে।) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আপনার প্রতিপালক সত্যি সত্যিই (যখন ইচ্ছা) যথাশীঘ্র শাস্তি দেন এবং একথাও নিঃসন্দেহে সত্যি (যে, যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তাহলে) তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু (-ও) বটেন এবং আমি তাদেরকে দেশের মধ্যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিই। (অতএব,) তাদের মধ্যে কেউ কেউ সৎ প্রকৃতির (-ও) ছিল—আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল অন্য রকম (অর্থাৎ দুষ্কৃতকারী)। আর আমি (সেই দুষ্কৃতকারীদেরও স্বীয় অনুগ্রহ, অনুশীলন ও সংশোধনের উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে কখনও অসহায় ছেড়ে দিইনি। বরং সব সময়ই) তাদেরকে সচ্ছলতা (অর্থাৎ স্বাস্থ্যও প্রাচুর্য) এবং অসচ্ছলতা (অর্থাৎ ব্যাধি ও দারিদ্রের) দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি (এই উদ্দেশ্যে যে,) হয়তো বা (এতেই) তারা ফিরে আসবে। কারণ কখনও ভাল অবস্থার মাধ্যমে উৎসাহ দান হয়, আর কখনও মন্দ অবস্থার দ্বারা ভীতি প্রদর্শন হয়ে যায়। এই তো হলো তাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা।) অতঃপর তাদের (অর্থাৎ সেই পূর্বসূরিদের) পরে এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে কিতাব (তওরাত) তো প্রাপ্ত হয়েছে (বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এরা এমনই হারামখোর যে, কিতাবের নির্দেশাবলীর বিনিময়ে) এই নিকৃষ্ট পার্থিব জগতের ধন-সম্পদ (যাই পেয়েছে, তাই নির্দ্বিধায়) নিয়ে নিয়েছে আর (এরা এতই নির্ভয় যে, এ পাপকে একান্তই ক্ষুদ্র জ্ঞান করে) বলে যে, অবশ্যই আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে। (কারণ আমরা ابناء الله ও احباء الله অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র সন্তান এবং প্রিয়জন'। এ ধরনের পাপ আমাদের মকবুল বান্দাহ্‌ হওয়ার মুকাবিলায় কোন বিষয়ই নয়।) অথচ (নিজেদের নির্ভীকতা এবং পাপকে হাল্কা করার ব্যাপারে এরা এতই অটল যে,) তাদের কাছে (আরও) যদি তেমনি (ধর্ম বিক্রির বিনিময়ে) ধন-সম্পদ উপস্থিত হতে থাকে, তবে (নিঃশঙ্ক চিত্তে) তাও নিয়ে নেবে। (আর পাপকে ক্ষুদ্র মনে করা স্বয়ং কুফর—যার দরুন ক্ষমার কোন সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং এর প্রতি বিশ্বাস রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই পরবর্তীতে ইরশাদ হয়েছে,) তাদের কাছ থেকে কি এ কিতাবের এই বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেয়া হয়নি যে, ন্যায় ও সত্য কথা ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রতি অন্য কোন কথা জুড়ে দিও না। (অর্থাৎ কোন আসমানি গ্রন্থকে যখন মান্য করা হয়, তখন তার মর্ম এই হয় যে, আমরা তার যাবতীয় বিষয়ই মান্য করব।) আর প্রতিজ্ঞাও কোন মোটামুটি বা সংক্ষিপ্ত প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়নি, (যাতে এ সম্ভাবনা থাকতে পারে যে, হয়তো এ বিশেষ বিষয়টি কিতাবে বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে তাদের জানা ছিল না; বরং) একান্ত বিস্তারিত প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে। কাজেই তারা এ কিতাবে যা কিছু (লেখা) ছিল, তা পড়েও নিয়েছে (যার ফলে সে সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়ে গেছে। তথাপি তারা এমন বিরাট বিষয়ের দাবি করে যে, পাপকে ক্ষুদ্র মনে করা সত্ত্বেও পরকালীন মুক্তির ধারণা নিয়ে বসে আছে---যা কিনা আল্লাহ্ তা'আলার

প্রতি মিথ্যারোপেরই নামান্তর)। বস্তুত (তারা এসব ব্যাপারই করেছে দুনিয়ার জন্য। রইল (আখিরাতের অবস্থিতি—তাদের জন্য এ পৃথিবী থেকে) উত্তম, যারা (এই বিশ্বাস ও অসৎকর্ম) থেকে বেঁচে থাকে (হে ইহুদীরা) তবুও কি তোমরা (এ বিষয়টি) বুঝতে পার না ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ)-এর অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁর উম্মত (ইহুদী)-এর অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। এ আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে সে দু'টি শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে। আর তা হলো প্রথমত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে অবশ্য চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদীরা সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জানা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজের কোন ক্ষমতা, না আছে রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একান্ত শত্রুতারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদেরই একটা ঘাঁটি মাত্র। এর চেয়ে বেশী কোন গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদীরা তাদেরই অধীন ও আজ্ঞাবহ। যখনই এতদুভয় শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে, তখনই ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদীদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যা এই পৃথিবীতেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তা হলো এই যে, তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। কোথাও কোন এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا-এর মর্মও তাই। قَطَّعْنَا শব্দটি تَقْطِيعٌ থেকে নির্গত যার অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়া। আর اُمَمٌ হলো-اُمَّةٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণী। মর্ম হলো এই যে, আমি ইহুদী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।

এতে বোঝা গেল যে, কোন জাতি বিশেষের কোন এক স্থানে সমবেত জীবন যাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামত; পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এক রকম ঐশী আযাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র এ নিয়ামত সবসময়ই রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ্ থাকবেও কিয়ামত পর্যন্ত। তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটা সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। মদীনা থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ার বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ এর ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদীরা সবসময়ই বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি।

কয়েক বছর থেকে ফিলিস্তিনের একটি অংশে তাদের সমবেত হওয়া এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোঁকায় পড়া উচিত হবে না। শেষ যমানায় এখানে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ সদাসত্য রাসূল করীম (সা)-এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তাই ঘটবে। শেষ যমানায় ঈসা (আ) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খৃষ্টান মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদীদের সাথে জিহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহ্র অপরাধীকে সমন জারী করে এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে হাযির করা হবে না; বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করেন যাতে অপরাধী পায়ে হেঁটে বহু চেষ্টা করে নিজের বধ্যভূমিতে গিয়ে হাযির হবে। হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ ঘটবে সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদীদের সাথে তাঁর যুদ্ধও সেখানে সংঘটিত হবে, যাতে ঈসা (আ)-এর পক্ষে তাদেরকে নিধন করে দেওয়া সহজ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদাজনিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। অতঃপর শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আ)-এর জন্য সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধ্যভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের এই সমবেত হওয়া বর্ণিত আযাবের পরিপন্থী নয়।

রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুত এটা এমন একটা ধোঁকা, যার উপরে বর্তমান যুগের সভ্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর কারুকার্যময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ কোন ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোঁকা খেতে পারে না। কারণ অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের একটা যৌথ ছাউনির অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যেই বেঁচে আছে এবং এদের বশংবদ থাকার ভেতরেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের রহস্য। বলা বাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে অভিহিত করে দেওয়ায় এ জাতির কোন ক্ষমতালাভ ঘটে না। কোরআনে-করীম তাদের সম্পর্কে কিয়ামতকাল পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনাজনিত যে শাস্তির কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। প্রথম আয়াতটিতে তারই আলোচনা এভাবে করা হয়েছে ঃ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা যখন সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন এক শক্তিকে চাপিয়ে দেবেন, যা তাদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যেমন, প্রথমে হযরত সোলায়মান (আ)-এর হাতে, পরে বুখতানাসারের দ্বারা এবং অতঃপর মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে, আর বাদবাকী হযরত ফারুকে আযমের মাধ্যমে সব জায়গা থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদীদের বহিষ্কার করা একান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হলো এই ঃ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ অর্থাৎ "এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।" "অন্য রকম"-এর মর্ম হলো এই যে, কাফির দুষ্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়। কিছু সৎও আছে। এর অর্থ, যেসব লোক, যারা তওরাতের যুগে তওরাতের নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, আর না কোন রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।

এ ছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সেই সমস্ত লোক, যারা তওরাতকে আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহ্কাম বা বিধি-বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের পরকালকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি ভাল-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে। 'ভাল অবস্থার দ্বারা'—এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগবিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থা অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সেই অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোন কোন সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র। যাই হোক, সারমর্ম হলো এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দু'টিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো দান ও অনুগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যে, তারা দাতা ও অনুগ্রহকারীদের কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার ও সম্পাদন করে কিনা; দ্বিতীয়ত তাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন (করে পরীক্ষা) করা হয় যে, তারা নিজেদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের মন্দ ও অসদাচরণ থেকে তওবা করে কিনা।

কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের জন্য নিয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ। অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ হলেন ফকীর আর আমরা ধনী।) আর তাদেরকে যখন দারিদ্র ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে ঃ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ অর্থাৎ আল্লাহ্র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল যে, কোন জাতির একত্র বাস আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং তার বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হলো একটা শাস্তি। দ্বিতীয়ত, পার্থিব আরাম-আয়েশ, আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐশী পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহ্র আনুগত্যের পরীক্ষা নেয়া হয়। এখানকার যে দুঃখ-কষ্ট, তা তেমন একটা হা-হুতাশ বা কান্নাকাটির বিষয় নয়। তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও অহঙ্কারী হয়ে উঠার মত কোন উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধিমানের জন্য এতদুভয়ই লক্ষণীয় বিষয়।

نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے
بہ پیش ہمت ماہرچہ آمد بود مہمانے

তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ -এর প্রথম শব্দ خَلَفَ (খালাফা) خَلَافٌ

ধাতু থেকে নির্গত অতীতকাল বাচক বচন। এর অর্থ—'স্থলাভিষিক্ত কিংবা প্রতিনিধি হয়ে গেল'। আর দ্বিতীয় শব্দ خَلْفٌ হলো ধাতু যা স্থলাভিষিক্তি, প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একবচন ও বহুবচনে একইভাবে বলা যায়। خَلْفٌ (খালাফুন) লামের সাকিন (বা 'ল'-এর হসন্ত)-যোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অসৎ খলীফা বা প্রতিনিধি অর্থে! যারা কিনা নিজেদের বড়দের রীতিবিরুদ্ধভাবে অপকর্মে লিপ্ত হয় ! আর خَلَفٌ (খালাফুন) লামের ফাতাহ্ (বা 'ল'-এর আকার) যোগে হলে শব্দটি ব্যবহৃত হয় সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধির ক্ষেত্রে। যারা নিজেদের বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে এবং তাদের উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধন করে ! এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার তাই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হয়।

وَرِثُوا الْكِتٰبَ। শব্দটি وراثت [ওয়ারাসাত] ধাতু থেকে গঠিত। যে বস্তু বা সামগ্রী মৃতের পরে জীবিত ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয়, তাকেই বলা হয় 'মীরাস' বা 'ওয়ারাসাত'। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তওরাত গ্রন্থখানি নিজেদের বড়দের পক্ষ থেকে তারা প্রাপ্ত হয়েছে কিংবা তাদের মৃত্যুর পর তাদের হাতে এসেছে।

عَرَض (আরাদ) শব্দটি ব্যবহৃত হয় বস্তুসামগ্রী অর্থে, যা নগদ অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা যায়। আবার কখনও এ শব্দটি সাধারণভাবে বস্তুসামগ্রী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তা নগদ অর্থ হোক বা অন্যান্য সামগ্রী। তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, এখানে শব্দটি সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এখানে সাধারণ বস্তুসামগ্রীকে عَـــرَض শব্দে উল্লেখ করে এ ইঙ্গিতই করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পদ তা যতই হোক না কেন, একান্তই স্থায়ী। কারণ عَرَض (আরাদ) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে মৌল উপাদানের তুলনায় অল্প স্থায়ী বিষয়কে বোঝাবার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়, যার নিজস্ব কোন স্থায়ী অস্তিত্ব থাকে না, বরং সে তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সে কারণেই عَـــارِض (আরিদ) শব্দটি 'মেঘ' অর্থে বলা হয়। কারণ তার অস্তিত্বও স্থিতিশীল নয়। শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কোরআন করীমে এ অর্থেই বলা হয়েছে ঃ هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

هٰذَا الْاَدْنٰى-তে- اَدْنٰى—শব্দটি 'নৈকট্য' دُنُوٌّ ধাতু থেকে গঠিত বলেও বলা যায়। তখন اَدْنٰى (আদনা) অর্থ হবে 'নিকটতর'। এরই স্ত্রীলিঙ্গ হলো دُنْيَــــا (দুনইয়া) যার অর্থ নিকটবর্তী। আখিরাতের তুলনায় এ পৃথিবী মানুষের অধিক নিকটে বলেই একে اَدْنٰى বা دُنْيَـــا বলা হয়। এছাড়া 'তুচ্ছ' ও 'হীন' অর্থে ব্যবহৃত دَنَاءَةٌ থেকেও গঠিত হতে পারে। তখন অর্থ হবে হীন ও তুচ্ছ। দুনিয়া এবং তার যাবতীয় বিষয় সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় হীন ও তুচ্ছ বলেই তাকে اَدْنٰى ও دُنْيَا বলা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ এই যে, প্রথম যুগের ইহুদীদের মধ্যে দু'রকমের লোক ছিল—কিছু ছিল সৎ এবং তওরাতে বর্ণিত শরীয়তের অনুসারী, আর কিছু ছিল কৃতঘ্ন—পাপী। কিন্তু তারপরে এদের বংশধরদের মধ্যে যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসাবে তওরাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এমনি আচরণ অবলম্বন করেছে যে, আল্লাহ্র কিতাবকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করে

দিয়েছে, স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে আল্লাহ্র কালামকে তাদের মতলব অনুযায়ী বিকৃত করতে শুরু করেছে।

وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا তদুপরি এই ধৃষ্টতা যে, তারা বলতে থাকে, যদিও আমরা পাপ করে থাকি, কিন্তু আমাদের সে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এহেন বিভ্রান্তি সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে এভাবে সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন ঃ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ অর্থাৎ তাদের অবস্থা হলো এই যে, এখনও যদি আল্লাহ্র কালামের বিকৃতি সাধনের বিনিময়ে এরা কিছু অর্থ লাভ করতে পারে, তাহলে এরা এখনও তা নিয়ে কালামের বিকৃতি সাধনে বিরত থাকবে না। সারার্থ হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও মার্জনা যথাস্থানে সত্য ও নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা শুধুমাত্র সেই সব লোকের জন্যই নির্ধারিত, যারা নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে তা পরিহার করার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেবে—যার পারিভাষিক নাম হলো 'তওবা'।

এরা নিজেদের অপরাধে অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও মাগফিরাত বা ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করে, অথচ এখনও পয়সা পেলে কালামুল্লাহর বিকৃতি সাধনে এতটুকু দ্বিধা করবে না। পাপের পুনরাবৃত্তি করেও ক্ষমার আশা করতে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া তার আর কোনই তাৎপর্য থাকতে পারে না।

তারা কি তওরাতে এ প্রতিজ্ঞা করেছিল না যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আরোপ করে এমন কোন কথাই বলবে না, যা সত্য নয়। আর তারা এই প্রতিজ্ঞার বিষয়ে তওরাতে পড়েওছিল। এসবই হলো তাদের অদূরদর্শিতা। কথা হলো, শেষ বিচারের দিনেই যে পরহিযগারদের জন্য অতি উত্তম ও অন্তহীন সম্পদ রয়েছে তারা কি একথাটিও বুঝে না ?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا

مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾

---

(১৭০) আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে—নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব। (১৭১) আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপর সামিয়ানার মত এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (তাদের মধ্যে) যারা কিতাব (অর্থাৎ তওরাত)-এর অনুবর্তী [যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনারও নির্দেশ রয়েছে—সুতরাং মুসলমান হয়ে যাওয়াটাই অনুবর্তিতা] এবং

(বিশ্বাসের সাথে সাথে সৎকর্মের ব্যাপারেও নিষ্ঠাবান—কাজেই) নামাযের অনুবর্তিতা করে। আমি এসব লোকের সওয়াব বিনষ্ট করব না যারা (এভাবে) নিজের সংশোধন করবে। আর সে সময়টিও স্মরণযোগ্য—যখন আমি পাহাড়কে তুলে নিয়ে ছাদের মত তাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের) উপরে (সোজাসুজিভাবে) টাঙিয়ে দিই, এবং (তাতে) তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এখনই তাদের উপর পড়ল। অতঃপর (সে সময়) বলি যে, যে কিতাব আমি তোমাদের দিয়েছি (অর্থাৎ তওরাত, শীঘ্র) কবুল করে নাও (এবং একান্ত) দৃঢ়তার সাথে (কবূল কর)। আর মনে রেখো, যেসব বিধি-বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে, তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগার হয়ে যেতে পাবে। (যদি যথারীতি তার অনুশীলন কর।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষত বনী ইসরাঈলের আলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তওরাত সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে, এতে কোন রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান পরওয়ারদিগারের প্রতি অন্য কোন বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লিখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলের আলিমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তওরাতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য এই আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসেবে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের সব আলিমই এমন নয়—কোন কোন আলিম এমনও রয়েছে যারা তওরাতের বিধি-বিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে। এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজেরও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাযও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরয আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমত এই যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য যার আলোচনা ইতিপূর্বে এসে গেছে অর্থাৎ তওরাত। আর এও হতে পারে যে, এতে সমস্ত আসমানী কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন, তওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও কোরআন।

দ্বিতীয়ত এ আয়াতের দ্বারা বোঝা গেছে যে, আল্লাহ্র কিতাবকে একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্নসহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর অনুবর্তীও হতে হবে। আর এ কারণেই হয়তো এ আয়াতে কিতাবকে গ্রহণ করা কিংবা পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। অন্যথায় يَاْخُذُوْنَ কিংবা يَقْرَءُوْنَ শব্দ ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে يُمَسِّكُوْنَ—যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা অর্থাৎ তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানের অনুশীলন করা।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, এখানে তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছিল আর তওরাতের বিধিনিষেধ একটি দু'টি নয়, শত শত। সেগুলোর মধ্যে এখানে একটিমাত্র বিধান নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা

হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো নামায। তদুপরি নামাযের অনুবর্তিতা ঐশী বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন। আর এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক নামাযে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে লোক নামাযের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ হাদীসে রাসূলে করীম (সা)-এর ইরশাদ রয়েছে—"নামায হলো দীনের স্তম্ভ, যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে; যে ব্যক্তি এই স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।"

সে কারণেই এ আয়াতে وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ-এর পরে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ বলে এ কথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দৃঢ়তার সাথে কিতাব অবলম্বনকারী এবং তার অনুবর্তী, তাকেই বলা যাবে যে, সমুদয় শর্ত মুতাবিক নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায় করে। আর যে নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে, সে যত তসবীহ-ওযীফাই পড়ুক কিংবা যত মুজাহিদা-সাধনাই করুক না কেন আল্লাহ্‌র নিকট সে কিছুই নয়। এমনকি তার যদি কেরামত-কাশফও হয় তবু তার কোন গুরুত্ব আল্লাহ্‌র কাছে নেই।

এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি লংঘন এবং তওরাতের বিধি-নিষিধে তাদের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারে তাদের সতর্কীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। এরপর দ্বিতীয় আয়াতে বনী ইসরাঈলেরই একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, যা তওরাতের হুকুম-আহ্‌কামের অনুবর্তিতার জন্য তাদেরকে নানা রকম ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আদায় করে নেয়া হয়েছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারায় এসে গেছে।

এ আয়াতে نَتَقْنَا শব্দটি نَتْقٌ থেকে গঠিত, যার অর্থ হলো টেনে নেওয়া এবং উত্তোলন করা। সূরা বাকারায় এ ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে رَفَعْنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) نَتَقْنَا (নাতাকনা)-এর ব্যাখ্যা (রাফা'না) শব্দের দ্বারাই করেছেন।

رَفَعْنَا আর ظُلَّةٌ শব্দটি ছায়া অর্থে ظِلٌّ (যিল্লুন) থেকে গৃহীত। এর অর্থ সামিয়ানা। কিন্তু প্রচলিত অর্থে এমন বস্তুকেই সামিয়ানা বলা হয়, যার ছায়া মাথার উপর পড়ে, কিন্তু তা কোন খুঁটিতে টাঙ্গানো হয়। আর এ ঘটনায়–তাদের মাথার উপর পাহাড়কে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল—তা সামিয়ানার মতই ছিল না। সেই জন্যই বিষয়টি উদাহরণবাচক শব্দসহযোগে বলা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সে সময়টিও স্মরণ করার মত, যখন আমি বনী ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড়কে তুলে এনে টাঙ্গিয়ে দিলাম, যাতে তারা মনে করতে লাগল, এই বুঝি আমাদের উপর পাহাড়টি ছুটে পড়ল! এমনি অবস্থায় তাদেরকে বলা হলো ঃ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ আমি যেসব বিধি-বিধান তোমাদের দান করছি সেগুলোকে সুদৃঢ় হাতে ধর। আর তওরাতের হিদায়েতগুলো মনে রেখো, যাতে তোমরা মন্দ কাজ ও আচরণ হতে বিরত থাকতে পার।

ঘটনাটি হলো এই যে, বনী ইসরাঈলদের ইচ্ছা ও অনুরোধের ভিত্তিতে হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কিতাব ও শরীয়তপ্রাপ্তির আবেদন করলেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী এ ব্যাপারে তূর পাহাড়ে চল্লিশ রাত ই'তিকাফ করার পর আল্লাহ্‌র এ গ্রন্থ পেলেন এবং তা নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলদের শোনালেন, তখন তাতে এমন বহু বিধি-বিধান ছিল, যা ছিল তাদের মন-মানসিকতা ও সহজতার পরিপন্থী। সেগুলো শুনে তারা অস্বীকার করতে লাগল যে, আমাদের দ্বারা এসবের উপর আমল করা চলবে না। তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত জিবরাঈলকে হুকুম করলেন এবং তিনি গোটা তূর পাহাড়কে তুলে এনে সেই জনপদের উপর টাঙিয়ে দিলেন যেখানে বনী ইসরাঈলরা বাস করত। এভাবে তারা যখন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে মাথার উপর দাঁড়ানো দেখতে পেল, তখন সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তওরাতের যাবতীয় বিধি-বিধানে যথাযথ আমল করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বারবার তার বিরুদ্ধাচরণই করতে থাকল।

ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃত মর্ম ও কয়েকটি সন্দেহের উত্তর ঃ এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআন মজীদে পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তী বা বাধ্যবাধকতা নেই, যার ভিত্তিতে কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে সত্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। অথচ আলোচ্য এই ঘটনায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দীন কবূল করার জন্য বনী ইসরাঈলদের বাধ্য করা হয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোন অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে কোথাও কখনও বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে ইসলামী প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অনুবর্তী হয়ে যায় এবং তারপরে সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাহলে অবশ্যই তার উপর জবরদস্তী করা হবে এবং এই বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ইসলামী শাস্তি বিধানে এ ব্যাপারে বহুবিধ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতটির সম্পর্ক হলো অমুসলিমদের সাথে। তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে বা জবরদস্তী মুসলমান বানানো যাবে না। আর বনী ইসরাঈলদের এ ঘটনায় কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয়নি, বরং তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল বলেই তাদের উপর জবরদস্তী আরোপ করে অনুবর্তী করায় لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ-এর পরিপন্থী কিছুই হয়নি।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

(১৭২) আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, "আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ?" তারা বলল, "অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি।" আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। (১৭৩) অথবা বলতে শুরু কর যে, অংশীদারিত্বের প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী, সন্তান-সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদের ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে। (১৭৪) বস্তুত এভাবে আমি বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (তাদের কাছে তখনকার ঘটনা বর্ণনা করুন,) যখন আপনার পালনকর্তা [আত্মার জগতে আদম (আ)-এর ঔরস থেকে স্বয়ং তার সন্তান-সন্ততিকে এবং] আদম সন্তানদের ঔরস থেকে তাদের সন্তান-সন্ততিকে বের করেছেন এবং (অদেরকে বোধশক্তি দান করে) তাদের কাছ থেকে নিজের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তোমাদের প্রতিপালক কি আমি নই ? সবাই (আল্লাহ্র দেওয়া সেই বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত বিষয়টি বুঝে নিয়ে) উত্তর দিল যে, কেন নয়; (নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে যত ফেরেশতা ও সৃষ্টি উপস্থিত ছিল সবাইকে সাক্ষী করে, সবার পক্ষ থেকে বললেন,) আমরা সবাই (এ ঘটনার) সাক্ষী হচ্ছি। (বস্তুত এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ও সাক্ষী প্রভৃতি এজন্য হয়েছিল) যাতে তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা তওহীদ পরিহার এবং শিরক গ্রহণের জন্য) কিয়ামতের দিন (শাস্তি পাবে, তারা যেন না) বলতে শুরু করে যে, আমরা তো এই (তওহীদ) সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। অথবা একথা বলতে শুরু কর যে, (আসল) শিরক তো আমাদের বড়রা করেছিল আমরা তো হলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। (আর সাধারণত বংশধরগণ বিশ্বাস ও সংস্কারের ক্ষেত্রে তাদের আসল বা পূর্বপুরুষেরই অনুগামী হয়ে থাকে। কাজেই আমরা এ ব্যাপারে নির্দোষ। সুতরাং আমাদের এ কাজের জন্য আমরা শাস্তিযোগ্য হতে পারি না। যদি তাই হয়, তবে বড়দের কৃতকর্মের জন্য আমাদের পাকড়াও করাই সাব্যস্ত হয়।) বস্তুত এহেন ভুল-প্রন্থা অবলম্বনকারীদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদের ধ্বংসের সম্মুখীন করছেন। [অতএব এই প্রতিজ্ঞা ও সাক্ষী সাব্যস্তের পর তোমরা এই অজুহাত দাঁড় করাতে পার না। অতঃপর এই প্রতিজ্ঞাকারীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা পৃথিবীতে তোমাদের পয়গম্বরদের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং তাই হয়েছে। যেমন, এখানেও প্রথমে وَاِذْ اَخَذَ শব্দের তরজমা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, এ বিষয়টি আলোচনার জন্য হুযূর (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।] আর (শেষ দিকেও এই স্মারকেরই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে যে,) আমি এভাবেই (নিজের) আয়াতসমূহ পরিষ্কারভাবে বিবৃত করে

থাকি (যাতে সেই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তাদের অবগতি লাভ হয়) এবং যাতে (বিষয়টি অবগত হওয়ার পর শির্ক প্রভৃতি থেকে) তারা ফিরে আসে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'আলাস্ত' সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিস্তারিত গবেষণা ও বিশ্লেষণ ঃ এ আয়াতগুলোতে মহাপ্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং দাস ও মনিবের মাঝে সে সময় হয়েছিল, যখন এই দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি আসেওনি যাকে বলা হয় عهدا لست বা عهد ازل

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি। আকাশ ও ভূমণ্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যা কিছুই রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভুক্ত। তিনিই এসবের মালিক। না তার উপর কারো কোন বিধান চলতে পারে, আর নাইরা থাকতে পারে তাঁর কোন কাজের উপর কারোও কোন প্রশ্ন করার অধিকার।

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটা নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাঁদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে স্থায়ী সুখ ও শান্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধাচারী তাদের জন্যে রয়েছে সব রকমের আযাব ও শাস্তি।

তাছাড়া বিরুদ্ধাচারণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর নিজস্ব সর্বব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কাজকর্ম; এমনকি মনের গোপন ইচ্ছা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোন পরিদর্শক নিয়োগ করা, আমলনামা তৈরী করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেওয়া এবং সেজন্য সাক্ষী-সাবুদ দাঁড় করানোর কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

কিন্তু তিনিই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের দরুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোন লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে লিখিত-পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ তার সামনে এমনভাবে এসে যায় যেন সে নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নেয় এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে।

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য লেখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ এমন কোন বাক্য মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরিদর্শক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়নি। আরো বলা হয়েছে ঃ كُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ লিখিত রয়েছে।

অতঃপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করে মানুষের সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেওয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে আযাবে ধরা পড়বে।

এছাড়া মহাবিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন প্রত্যেকের কাজ-কর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কোন কোন অপরাধী সাক্ষীদের মিথ্যা বলে দাবি করবে, তখন তারই হাত-পা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে সত্য-সঠিক ঘটনা বাতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোন সুযোগই থাকবে না। তারা স্বীকার করবে।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের মত নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু তাদেরকে দিয়ে দেননি বরং আইনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন।

একজন অনন্যসাধারণ স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি তৈরী করেন যে, যে-ই এর বিরুদ্ধাচরণ করবে সে-ই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার (পিতার) স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয়ে বরং সবাই যেন সেই নিয়ম-পদ্ধতি মুতাবিক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকাল বেলা স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি করার জন্য সময়ের আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমত মাতা-পিতার দয়া ও করুণার চেয়ে বহু গুণ বেশি। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু আইন-কানুন ও শাস্তিবিধি হিসেবেই তৈরী করে দেননি; বরং একটি নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমনসব নিয়ম-পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

ঐশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সাথে পাঠিয়েছেন আসমানি নির্দেশনামা। এক বিরাটসংখ্যক ফেরেশতাকে সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সৎকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

এই ঐশী ব্যবস্থারই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান প্রতিপালককে স্মরণ করার জন্য—বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করে দেওয়া, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের নিজস্ব পরিমণ্ডলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত এমন সব নির্দেশ স্থাপন করে দেওয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বন করা যায়, তাহলে কোন সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছে : وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ যারা দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে)। তারপরেও কি তোমরা দেখছ না ?

তাছাড়া যারা গাফিল, তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সৎকাজে নিয়োজিত করার জন্য রাব্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থাও করেছেন যে, ব্যক্তি, দল ও জাতিসমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কোরআন মজীদের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রাসূলদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিসালাতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌঁছে দেন। এতে যেন কারো ভয়ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কোন আশঙ্কাই তাঁদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহ্র এই পবিত্র দল নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সবকিছু কোরবান করে দিয়েছেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক রাসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজ নিজ নবী-রাসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে। তারপর প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য—যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ পূরণ করেনি।

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতিটি, যা আমাদের রাসূল মকবুল (সা) সম্পর্কে সমস্ত নবী-রাসূলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা 'নবীয়ে-উম্মী' খাতামুল আম্বিয়া (সা)-এর অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করবেন যার আলোচনা নিম্নের আয়াতে করা হয়েছে ঃ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিই হলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরিপূর্ণ রহমতের বিকাশ। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানুষ যারা অত্যন্ত মনভোলা, প্রায়ই যারা নিজেদের কর্তব্য কর্ম ভুলে যায়, তাদেরকে বারবার এসব প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া, যাতে সেগুলোর বিরুদ্ধাচারণ করে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।

বায়'আত গ্রহণের তাৎপর্য ঃ নবী-রাসূল এবং তাঁদের প্রতিনিধি ওলামা ও মাশায়েখদের মাঝে বায়'আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তাও এই ঐশী রীতিরই অনুসরণ। স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-ও বিভিন্ন ব্যাপারে সাহাবী (রা)-দের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। সেসব বায়'আতের মধ্যে 'বায়'আতে রিদওয়ান'-এর কথা কোরআন করীমে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বিশেষ গাছের নিচে আপনার হাতে 'বায়'আত' নিয়েছেন।

হিজরতের পূর্বে মদীনার আনসারদের বায়'আতে 'আকাবা'-ও এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

বহু সাহাবীর কাছ থেকে ঈমান ও সৎকর্মে নিষ্ঠার ব্যাপারে বায়'আত নেওয়া হয়েছে। মুসলমান সূফী সম্প্রদায়ে যে বায়'আত প্রচলিত রয়েছে, তাও ঈমান ও সৎকর্মে নিয়মানুবর্তিতা

এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকারই আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ ও নবী-রাসূলদের সে রীতিরই অনুসরণ। আর সে কারণেই এতে বিশেষ বরকত রয়েছে। এতে মানুষ পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী যথাযথ পালনের সৎসাহস ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। বায়'আতের তাৎপর্য জানার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বর্তমানে যে ধরনের বায়'আত সাধারণভাবে অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কোন বুযুর্গের হাতে হাত রেখে দেয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে ধারণা করা হয়—তা সম্পূর্ণই মূর্খতা। বায়'আত হলো একটি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির নাম। তখনই এর উপকারিতা লাভ হবে, যখন এ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। না হলে এতে মহাবিপদের আশঙ্কা।

সূরা আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোতে সে প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টি লগ্নে নেওয়া হয়েছিল—যা সাধারণ ভাষায় عَهْدِ اَلَسْتُ (আহ্‌দে-আলাস্ত) বলে প্রসিদ্ধ।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ এ আয়াতগুলোতে আদম সন্তানদের বোঝাবার জন্য ذُرِّيَّتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্‌ফাহানী বলেন যে, এ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ذرء (যরউন্) থেকে গঠিত। যার অর্থ সৃষ্টি করা। কোরআন করীমে কয়েক জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا প্রভৃতি। কাজেই 'যুররিয়্যাৎ'-এর শব্দিক তরজামা হলো সৃষ্টি। এ শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রতিশ্রুতি সে সমস্ত মানুষেই ব্যাপক ও প্রসারিত যারা আদম (আ)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে।

হাদীসের রেওয়ায়েতে এই আদি প্রতিশ্রুতির আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যথা ঃ

ইমাম মালিক, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইমাম আহমদ (র) মুসলিম ইবনে ইয়াসারের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, কিছু লোক হযরত ফারুক আ'যম (রা)-এর কাছে এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁর কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তা হলো এই ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের কুদরতের হাত যখন তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর ঔরসে যত সৎ মানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁর পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত পাপী-তাপী মানুষ তাঁর ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দোযখে যাবার মতই কাজ করবে। সাহাবীদের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! প্রথমেই যখন

জান্নাতী ও দোযখী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্যে?' হুযূর (সা) বললেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাত-বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ্ যখন কাউকে দোযখের জন্য তৈরি করেন, তখন সে দোযখের কাজই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।"

অর্থাৎ মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ (র)-এর রেওয়ায়েতে এ বিষয়টিই হযরত আবূদ্দার্দা (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা আদম (আ)-এর ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ—যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ—যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে।

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মত যত আদম সন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল!

এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুররিয়াত'-এর আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ, কোরআনের শব্দে 'বনী-আদম' অর্থাৎ আদম সন্তানের ঔরসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, আদম (আ)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে, যারা সরাসরি আদম (আ)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যদের। এভাবে যে ধারায় এ পৃথিবীতে আদম সন্তানেরা জন্মাবার ছিল, সে ধারায়ই তাদেরকে পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার অর্থও এই যে, আদম থেকে তাঁর সন্তানদের, অতঃপর এই সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদের আনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়।

কোরআন মজীদে সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই আদম-সন্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমন্বয় ছিল যা শরীরের সূক্ষ্মতর অণু-পরমাণুর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। কারণ প্রতিপালক, বিদ্যমানতা এবং লালন-পালনের প্রয়োজন বেশির ভাগ সেই ক্ষেত্রই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ঘটে এবং যাকে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কাল বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দীপ্তির বর্ণনা

রয়েছে, তাতেও বোঝা যায় যে, সেগুলো শুধু অশরীরী আত্মাই ছিল না। রূহ্ বা আত্মার কোন রং বা বর্ণ নেই; শরীরের সাথেই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

এতেও বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জন্মাবার যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল ? কারণ হযরত আবূদার্দা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েও বিশ্লেষণ রয়ে গেছে যে, তখন যে আদম সন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না, যা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসবে। বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মত। তাছাড়া বিজ্ঞানে বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোন সমঝদার লোকের মনে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নেরই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় আকার-অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটা পিঁপড়ার আকৃতিতে কেমন করে বিকাশ লাভ করল। ইদানীং তো একটি অণুর ভেতরে গোটা সৌরমণ্ডলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বড়র চেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। কাজেই আল্লাহ্ যদি এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় সমস্ত আদম সন্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তা আর তেমন কঠিন হবে কেন ?

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এই আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত, এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেওয়া হয় যে, তখন একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোন মানুষের জন্মই হয়নি, তখন তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কেমন করে হলো, যাতে তারা আল্লাহ্‌কে চিনতে পারবে এবং তাঁর প্রতিপালক হওয়ার কথা স্বীকার করবে ? কারণ প্রতিপালকের কথা সে-ই স্বীকার করতে পারে, যে প্রতিপালক সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষান্তরে এই প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল—এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (র) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তা হলো এই যে, এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেওয়া হয়, যখন আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হলো, 'ওয়াদিয়ে নু'মান'—যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেছে। —তাফসীরে মাযহারী

থাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এই নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোন স্রষ্টা ও প্রতিপালক রয়েছেন ? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে।—এর উত্তর হলো এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অণুর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তখন প্রয়োজনানুপাতে তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি দেওয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল! আর প্রকৃতপক্ষে হয়েওছিল তাই। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জ্ঞানানুভূতি।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও কুদরতের এমন সব অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে যে লোক সামান্যও লক্ষ্য করবে, সে আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে গাফিল থাকতে পারে না। কোরআনে রয়েছে ঃ وَفِى الْأَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ বিজ্ঞজনদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের-সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে), তবুও কি তোমরা দেখছ না ?

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি (আহ্দে আলাস্তে) যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হোক না কেন, কিন্তু এ কথাটি তো অন্তত সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি কারোরই স্মরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হলো ?

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদম সন্তানদের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন যারা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্নুন মিসরী (র) বলেছেন, এই প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেন এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার আশেপাশে কারা কারা উপস্থিত ছিল সে কথাও আমার স্মরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন লোকের সংখ্যা একান্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বোঝার বিষয় হলো এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্ট্যগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা কারো স্মরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে আল্লাহ্-পরিচিতির একটা বীজ রোপণ করে দিয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে লালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জানা থাক কিংবা না থাক। আর এই বীজেরই ফুল-ফসল এই যে, প্রত্যেকটি মানুষের মনেই ঐশী প্রেম ও মহত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে—তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা ও সৃষ্টি-পূজার কোন ভ্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনভাবে। সেই কতিপয় হতভাগ্য, যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত-মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহ্র ধ্যান, তাঁর কল্পনা ও মহিমান্বিত অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা-বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোন গোমরাহ্ ও ভ্রষ্ট সমাজ-পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে عَلٰى هٰذِهِ الْمِلَّةِ (বুখারী, মুসলিম) অর্থাৎ প্রতিটি সন্তান স্বভাবধর্ম অর্থাৎ ইসলামের উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতামাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত করে দেয়। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন যে, আমি আমার বান্দাদের 'হানীফ' অর্থাৎ এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসীরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের পেছনে লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা রয়েছে যা এ পৃথিবীতে ও নবী-রাসূল (সা)-এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, স্মরণ রাখুক বা না রাখুক, সেগুলো কিন্তু যেকোন অবস্থাতেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে।

উদাহরণত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামত ও তকবীর বলার যে সুন্নতটি সব মুসলমানই জানে এবং (আলহামদুলিল্লাহ্) সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে—যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার পর স্মরণও থাকে না যে, তার কানে কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তা হলো এই যে, এতে করে সেই আদি প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, কিন্তু নিজকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একান্তই খারাপ মনে করে। এমনিভাবে যারা কোরআনের ভাষা জানে তাদের প্রতিও কোরআন-তিলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয়তো এই যে, এতে করে অন্তত এই গোপন উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব হয়।

সেজন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ অর্থাৎ এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোন অব্যাহতি থাকবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কিয়ামতের দিন এমন কোন ওযর-আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাঁটি–অখাঁটি, ভুল-শুদ্ধ কোনটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে আমরাও তাই গ্রহণ করেছি। অতএব বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে কেন ? আল্লাহ্ তা'আলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক জ্ঞান ও দর্শনের বীজ রোপণ করে দেয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কোন কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আগুন, পানি, বৃক্ষ অথবা কোন মানুষ প্রভৃতির কোন একটিও এমন নয়, যাকে কোন মানুষ নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি এমনিভাবে আমার নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে

যদি কেউ সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই আদি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছিল ; অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করবে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ
فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى
الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ
اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾ سَآءَ مَثَلَا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾

(১৭৫) আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সেই লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। (১৭৬) অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হলো সেসব লোকের উদাহরণ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। (১৭৭) তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদেরকে (শিক্ষা গ্রহণের জন্য) সে ব্যক্তির অবস্থা পড়ে শোনান যাকে আমি নিজের নিদর্শন দান করেছি (অর্থাৎ বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান দিয়েছি) তারপর সেসব (নিদর্শন) থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেছে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগেছে। বস্তুত সে পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে তাকে সে নিদর্শনসমূহের (চাহিদা অনুযায়ী আমল করার) বদৌলতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম। (অর্থাৎ সে যদি সে সমস্ত আয়াতের উপর আমল করত যেগুলো নিয়তি ও ভাগ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিষয়টি

সর্বজনবিদিত, তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যেত।) কিন্তু সে তো পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে এবং (এ আকর্ষণের দরুন) নিজের রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে (এবং আয়াত ও নিদর্শনসমূহের উপর আমল করা পরিহার করেছে)। সুতরাং (আয়াতসমূহ বর্জন করে যে পেরেশানী ও লাঞ্ছনা তার ভাগ্যে জুটেছে সে অনুযায়ী) তার অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেছে যে, তুমি যদি তাকে তাড়া কর (এবং মেরে বের করে দাও) তবুও হাঁপাবে কিংবা তাকে (যদি সে অবস্থাতেই) ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। (কোন অবস্থাতেই তার স্বস্তি নেই। এমনি করে এ লোক লাঞ্ছনার দিক দিয়ে তো কুকুরসদৃশ আছেই, পেরেশানী এবং অস্থিরতায়ও কুকুরের সে গুণেরই অংশীদার হয়েছে। সুতরাং তার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে (এমনি অবস্থা সেসব লোকেরও যারা আমার আয়াতসমূহকে (যা তওহীদ ও রিসালতের নিদর্শনস্বরূপ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (সত্য-সনাতন বিষয়ের বিকাশের পর শুধুমাত্র কামনা-বাসনার তাড়নায় সত্যকে বর্জন করছে।) কাজেই আপনি এই অবস্থাটি বলে দিন, হয়তো এসব লোক (তা শুনে) কিছুটা ভাববে। (প্রকৃতপক্ষে) তাদের অবস্থাও (একান্তই) মন্দ, যারা আমার (তওহীদ ও রিসালাত প্রমাণকারী) আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর (মিথ্যারোপের কারণে) তারা নিজেদের (-ই) ক্ষতিসাধন করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে বনী ইসরাঈলের জনৈক বড় আলিম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির জ্ঞান দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছার পর সহসা গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি নিদর্শনমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ বিবৃত করা হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল, যা আল্লাহ্ তা'আলা আদি লগ্নে সমস্ত আদম-সন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহুদী-নাসারা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতি-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন, ইহুদীরা—খাতিমুন্নাবিয়্যীন (সা)-এর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আকার-অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং তিনি যে সত্য নবী তাও প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বিরত থাকে।

বনী ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলিমের পথভ্রষ্টতার নিদর্শনমূলক ঘটনা : এ আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা পড়ে শুনিয়ে দিন, যাতে বনী ইসরাঈলের একজন বিরাট আলিম ও আরিফ এবং প্রখ্যাত নেতার এমনি উত্থানের পর পতন ও হিদায়েতের পর গোমরাহীর কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মা'রেফাত হাসিল করার পর, যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান-গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হলো।

কোরআন মজীদে সে লোকের নাম বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তফসীরবিশারদ, সাহাবী ও তাবেঈনদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলিমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হযরত ইবনে মারদুইয়াহ্ (র) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বাল্‌'আম ইবনে বাউ'রা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেন্‌আনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহ্‌র কোন কোন কিতাবের ইল্‌ম তার ছিল। তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআন করীমে যে الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا বলা হয়েছে, তাতে সে ইল্‌মের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ফিরাউনের জলমগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর তখন হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলদের 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম হলো এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, মূসা (আ) সমগ্র বনী ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌঁছে গেছেন—পক্ষান্তরে তাদের মুকাবিলায় ফিরাউন সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তখন তাদের ভয় হলো। তারা সবাই মিলে বাল্‌'আম ইবনে বাউ'রার কাছে সমবেত হয়ে বলল, মূসা (আ) অতি কঠিন লোক, তদুপরি তাঁর সাথে সৈন্যও বিপুল—তারা এসেছে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মুকাবিলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বাল্‌'আম ইবনে বাউ'রা ইস্‌মে আযম জানত এবং সেই ইস্‌মের মাধ্যমে যে দোয়া করত তাই কবূল হতো।

বাল্‌'আম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা এ কি বলছ! তিনি হলেন আল্লাহ্‌র নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি! আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া-আখিরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

জাব্বারীনরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বাল'আম বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি আমার প্রতিপালকের নিকট জেনে নেই এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা। সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য ইস্তেখারা কিংবা অন্য কোন আমল করল। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে বলে দেওয়া হলো, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রদায়কে বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় তাকে একটা বিরাট উপঢৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচ বিশেষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি এ কাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে মূসা (আ) এবং বনী ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহূর্তে আল্লাহ্র মহা কুদরতের এক আশ্চর্য বিস্ময় দেখা দেয়—মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চীৎকার করে উঠল—তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বাল্'আম বলল, এটা আমার ইচ্ছকৃত নয়—আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়।

ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাযিল হলো! আর বাল্'আমের শাস্তি হলো এই যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে দুনিয়া-আখিরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। তবে আমি তোমাদের একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

তা হলো এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদের সাজিয়ে বনী ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী ইসরাঈলদের লোকেরা তাদের সাথে যা-ই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোন রকম বাধ যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয়তো বা এরা এ ব্যবস্থায় হারামকারীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্র নিকট হারামকারী অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, অবশ্য তাতে গযব ও অভিসম্পাত নাযিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না।

বাল্'আমের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হলো এবং সেমতেই কাজ করা হলো। বনী ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। কিন্তু সে বিরত হলো না; বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনী ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এমনকি যে লোক অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখল যাতে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্লেগ দমিত হলো।

কোরআন মজীদে উল্লিখিত এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, فَانْسَلَخَ مِنْهَا অর্থাৎ আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান-পরিচয় সে লোককে দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। اِنْسِلاَخٌ (ইন্সিলাখুন্) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভেতর থেকে কিংবা সাপের ছলমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানেও আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে পড়েছে। فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ (শয়তান তার পেছনে লেগে গেছে।) অর্থাৎ যে পর্যন্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহ্র স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত তার উপর শয়তান কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্তু যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল। فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (অতঃপর সে হয়ে গেল গোমরাহ্দের অন্তর্ভুক্ত)। অর্থাৎ শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰهُ ‌ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে اَخْلَدَ শব্দটি اِخْلَادٌ ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে, যার অর্থ হলো কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোন স্থানকে আঁকড়ে ধরা। আর اَرْضٌ-এর প্রকৃত অর্থ হলো ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যা কিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, আর না হয় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাখো-কোটি বস্তুসামগ্রী, যার উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েশ নির্ভরশীল। সুতরাং ارض। (আরদ) শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হলো প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

এই বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ لَهْثٌ - اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো জিহ্বা বের করে জোরে শ্বাস নেওয়া।

প্রতিটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভিতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার মাধ্যমে ভিতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহ্ তা'আলাও প্রতিটি জীবের জন্য এ কাজটি এতই সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোন ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের রন্ধ্র দিয়ে ভিতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভিতরে আসা-যাওয়া করছে। এতে না কোন শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে।

জীব-জন্তুর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব, যাকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে জিহ্বা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোন বিপদের সম্মুখীন হয়।

কোরআন করীম সে ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার কারণ আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মত হাঁপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করুক আর না-ই করুক, সে যেকোন অবস্থায় শুধু হাঁপাতেই থাকত।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا অর্থাৎ এই হলো সে সমস্ত জাতির উদাহরণ, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এর মর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, এরাই হলো সেই সমস্ত মক্কাবাসী, যারা কোন একজন পথপ্রদর্শকের আগমন কামনা করত, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাবেন এবং আনুগত্যের সঠিক পন্থা বাতলে দেবেন। কিন্তু যখন সেই পথপ্রদর্শক আগমন করলেন এবং এমন সব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে এলেন যাতে তাঁর

সত্যতা ও সঠিকতার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশও থাকতে পারে না, তখন তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অমান্য করতে থাকে।

কোন কোন তফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, এতে উদ্দেশ্য হলো, বনী ইসরাঈল, যারা মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে তাঁর নিদর্শন ও লক্ষণাদি এবং তাঁর গুণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তওরাতে পাঠ করে মানুষকে বলতো এবং তারা নিজেরাও তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তাঁর আগমনের পর তারাই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা ও শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয় এবং তওরাতের বিধি-বিধান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যায়, যেমন করে বেরিয়ে গিয়েছিল বাল'আম ইবনে বাউরা।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ অর্থাৎ আপনি সে সমস্ত লোকের কাহিনী তাদেরকে শুনিয়ে দিন। হয়তো তাতে তারা কিছুটা চিন্তা করবে এবং এ ঘটনার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে—আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের অবস্থা একান্তই নিকৃষ্ট। আর এসব লোক নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করছে, অন্য কারোরই কিছু অনিষ্ট করছে না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং তাতে বিবৃত ঘটনায় চিন্তাশীলদের জন্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

প্রথমত কারো পক্ষে নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং ইবাদত-উপাসনার ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরী হয় না। যেমন হয়েছিল বাল্'আম ইবনে বাউরার পরিণতি। ইবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহ্র শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত এমন সব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, বিশেষ করে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়ত অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কারণ ভ্রান্ত লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই বাল্'আম ইবনে বাউরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

চতুর্থত অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হলো নিজ জাতিকে যথাশক্তি অশ্লীলতার প্রকোপ হতে বিরত রাখা। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলার আযাবকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চমত আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচারণ করলে মানুষ আযাবে পতিত হয় এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ্ তা'আলা দীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

(১৭৮) যাকে আল্লাহ্ পথ দেখাবেন, সে-ই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (১৭৯) আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফিল শৈথিল্যপরায়ণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

য়াকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়েত করেন, সে-ই হয় হিদায়েতপ্রাপ্ত। (পক্ষান্তরে) যাকে পথভ্রষ্ট করেন সে লোকই হয় (অনন্ত) ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন। (এরপরে তাদের কাছ থেকে হিদায়েতের আশা করা কিংবা তাদের হিদায়েত না হওয়ার কারণে দুঃখিত হওয়ার কোন অর্থ নেই।) আর (তারা যখন নিজেদের ধারণক্ষমতাকে কাজে লাগাতে রাযী নয়, তখন হিদায়েতপ্রাপ্ত হবেই বা কেমন করে ? কাজেই তাদের ভাগ্যে তো দোযখই থাকবে।) আমি এমন বহু জিন ও মানুষকে দোযখের জন্যই (অর্থাৎ সেখানে অবস্থানের জন্যই) তৈরি করেছি। তাদের অন্তর (রয়েছে বটে, কিন্তু তা) এমন, যার দ্বারা (সত্য কথাকে) উপলব্ধি করে না। (কারণ তারা তার ইচ্ছাই করে না।) আর তাদের (নামেমাত্র) চোখ রয়েছে (কিন্তু তা) এমন, যাতে (প্রামাণ্য দৃষ্টিতে কোন বস্তুকে) দেখতে পারে না এবং তাদের (নামে মাত্র) কান রয়েছে (কিন্তু তা এমন) যাতে (নিবিষ্টতার সাথে কোন সত্য কথা) শোনে না। (বস্তুত) এরা (আখিরাত সম্পর্কে অমনোযোগিতার দিক দিয়ে) চতুষ্পদ জন্তুর মত ; বরং (যেহেতু চতুষ্পদ জীব-জন্তুকে আখিরাতের প্রতি লক্ষ্য করার জন্য আদেশ করা হয়নি, কাজেই তাদের সেদিকে লক্ষ্য না করা কোন অন্যায় নয়, কিন্তু এ সমস্ত লোককে আখিরাতের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলা সত্ত্বেও অনীহা প্রদর্শন করে। এই হিসাবে (তারা চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও বেশি পথভ্রষ্ট। (কারণ) এসব লোক (আখিরাতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেওয়া সত্ত্বেও) গাফিল হয়ে আছে (পক্ষান্তরে চতুষ্পদ জন্তুর অবস্থা তেমন নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু হলো এই যে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক পথের হিদায়েত দান করেন, সে-ই হলো হিদায়েতপ্রাপ্ত। আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন সে হলো ক্ষতিগ্রস্ত।

এ বিষয়টি কোরআন মজীদের বহু আয়াতে বারবার আলোচিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হিদায়েত ও গোমরাহী, কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ভাল ও মন্দের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। তিনি মানুষের সামনে ভাল-মন্দ কিংবা সঠিক ও বেঠিক উভয় পথই মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বিশেষ এক ক্ষমতাও দিয়ে দিয়েছেন। সে তার এই ক্ষমতাকে যদি ভাল ও সঠিক পথে ব্যয় করে, তবে পুণ্য ও জান্নাতের অধিকারী হবে, মন্দ ও বেঠিক পথে ব্যয় করলে আযাব ও জাহান্নাম হবে তার বাসস্থান।

এ ক্ষেত্রে একথাটিও লক্ষণীয় যে, হিদায়েতপ্রাপ্তদের একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যারা পথভ্রষ্ট-গোমরাহ, তাদের উল্লেখ করা হয়েছে বহুবচনে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হিদায়েতের পথ শুধুমাত্র একটি। তা হলো সত্য-দীন, যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে খাতেমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূল (আ)-এরই পথ ছিল। সবার মূলনীতিই এক ও অভিন্ন। কাজেই যারা সত্যনিষ্ঠ তারা যে যুগেই হোক না কেন, যে নবীরই উম্মত হোক না কেন এবং যে আসমানি ধর্ম কিংবা দীনেরই অনুসারী হোক না কেন, সবাই মূলত এক এবং একই ধর্মের অনুসারী বলে গণ্য।

পক্ষান্তরে পথভ্রষ্টতার জন্য রয়েছে হাজারো ভিন্ন ভিন্ন পন্থা। সেজন্যই পথভ্রষ্টদের উল্লেখ প্রসঙ্গে বহুবচন ব্যবহার করে বলা হয়েছে ঃ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

এ আয়াতে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যারা গোমরাহী অবলম্বন করে, তাদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে যারা হিদায়েতপ্রাপ্ত তাদের জন্য কোন বিশেষ দান-প্রতিদানের কথা বলা হয়নি; বরং এতটুকু বলেই যথেষ্ট করা হয়েছে যে, তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হিদায়েতই এমন এক মহান নিয়ামত যা দীন-দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামত ও রহমতকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। এ পৃথিবীতে সৎজীবন এবং আখিরাতে জান্নাত প্রাপ্তির মত নিয়ামতসমূহও হিদায়েতের সাথেই সম্পৃক্ত। এ দিক দিয়ে হিদায়েত নিজেই এক বিরাট নিয়ামত ও মহা দান, যার পরে অন্যান্য নিয়ামত পৃথকভাবে গণনা করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না, যা হিদায়েতের প্রতিদানে পাওয়া যাবে। এর উদাহরণ অনেকটা এমন—কোন বিরাট রাজ্য ও রাজক্ষমতার অধিকারী কোন লোককে যেন বলে দিলেন যে, তুমি আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ লোক। আমরা তোমার কথা শুনব এবং মানব। এমতাবস্থায় যেকোন লোক বুঝতে পারে যে, এর চেয়ে বড় কোন পদমর্যাদা কিংবা কোন সম্পদই সে লোকের জন্য আর থাকতে পারে না।

তেমনিভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যদি কাউকে হিদায়েতপ্রাপ্ত বলে আখ্যায়িত করেন, তবে সে দীন-দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের অধিকারী হয়ে যায়। সেজন্য পরবর্তী মনীষীরা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-উপাসনা নিজেই তার প্রতিদান এবং বৃহত্তর দান। যে লোক আল্লাহ্র যিকিরে নিয়োজিত থাকে, সে তখনই আল্লাহ্র দান নগদে পেয়ে যায়। তদুপরি তার জন্য পরকালে নির্ধারিত থাকে জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামত। এতেই কোরআন মজীদের এ আয়াতের মর্ম বোঝা যায়, যাতে বলা হয়েছে ঃ جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً এতে একই বস্তুকে প্রতিদান ও দান দুই-ই বলা হয়েছে, অথচ এ দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। প্রতিদান হয় কোন কিছুর বিনিময়ে, আর দান হয় বিনিময় ছাড়া।

এতে দান ও প্রতিদানের তাৎপর্য বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে প্রতিদান এবং কোন কর্মের বিনিময় বলে ভাবছ, প্রকৃতপক্ষে তাও আমারই দান ও উপহার। কারণ তোমরা যে কর্মের বিনিময়ে এই প্রতিদান লাভ করলে সে কাজটি নিজেই ছিল আমার দান।

দ্বিতীয় আয়াতেও এ বিষয়টিরই অধিকতর বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, হিদায়েত ও পথভ্রষ্টতা উভয়টিই আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাধীন। তিনি যাকে হিদায়েত দিতে চান, সে হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়। যেসব কাজ সে করে তা সবই হিদায়েতের চাহিদা অনুযায়ী সংঘটিত হয়।—

خود چوں دفتر تلقین کشاید
زمن آں دروجود أیدکه باید

বস্তুত যে লোক পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়, তার সব কাজই সেমত হতে থাকে।

কাজেই বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّايَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّايَسْمَعُوْنَ بِهَا অর্থাৎ আমি অনেক জ্বিন ও মানুষ তৈরি করেছি জাহান্নামের জন্য, যাদের লক্ষণ হলো এই যে, উপলব্ধি করার জন্য তাদের অন্তর রয়েছে, দেখার জন্য রয়েছে চোখ এবং শোনার জন্য রয়েছে কান; এক কথায় সবই তাদের রয়েছে; সেগুলোর সদ্ব্যবহার করলে সরল-সঠিক পথ পেতে পারে এবং মঙ্গলামঙ্গল ও লাভ-ক্ষতি সবই বুঝতে পারে। কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, তারা না অন্তর দিয়ে কোন বিষয়কে উপলব্ধি করে, না চোখের দ্বারা কোন কিছু দেখে; আর নাই-বা কানের দ্বারা কোন কিছু শোনে।

এতে প্রসঙ্গক্রমে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর বা নিয়তি যদিও অতি গোপন রহস্য এবং যদিও কেউ এ পৃথিবীতে তা জানতে পারে না কিন্তু লক্ষণাদির দ্বারা তার কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। যারা জাহান্নামবাসী তাদের লক্ষণ হলো এই যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্যকে সঠিক কাজে ব্যয় করবে না, সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে বুদ্ধি-বিবেচনা ও চোখ-কান দিয়েছেন, সেগুলোকে তারা যথাস্থানে ব্যবহার করে না এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য যার দ্বারা অশেষ ও চিরস্থায়ী, আনন্দ ও সম্পদ অর্জিত হতে পারে সেদিকে মনোনিবেশ করে না।

কাফিরদের না বোঝা, না দেখা ও না শোনার তাৎপর্য ঃ এ আয়াতে সেসব লোকের বোঝা, দেখা ও শোনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা কিছুই বোঝে না, কোন কিছু দেখেও না এবং শোনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উন্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারেনা। অন্ধ নয় যে, কিছু দেখবে না কিংবা কালাও নয় যে, কোন কিছু শুনবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর।

কিন্তু কথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টিসমূহের মধ্যে প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজন অনুপাতে তার জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধি ও উপলব্ধি ক্ষমতা দান করেছেন। যেসব জিনিসকে আমরা বুদ্ধি-বিবর্জিত ও অনুভূতিহীন বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি বিবর্জিত নয়। অবশ্য এসব বিষয় সেগুলোর মাঝে সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে যেটুকু তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট। সবচেয়ে কম বুদ্ধি ও

চেতনা-উপলব্ধি রয়েছে মাটি, পাথর প্রভৃতি জড় পদার্থের মাঝে, যাদের না আছে প্রবৃদ্ধি, না স্বস্থান থেকে কোথাও যাওয়া কিংবা চলাফেরার প্রয়োজন। কাজেই এতে সেই শক্তি-সামর্থ্য এতই ক্ষীণ যে, তাদের জীবনীশক্তির আন্দাজ করাও কঠিন। এগুলোর চাইতে সামান্য বেশি রয়েছে উদ্ভিদের মধ্যে, যার অস্তিত্বের লক্ষ্যের মাঝে প্রবৃদ্ধি এবং ফল দান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে বুদ্ধি-উপলব্ধিও সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে। তারপর আসে পশুর নম্বর; যাদের জীবনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবর্ধন ও চলাফেরা করে খাবার আহরণ করা, ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা, আর বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে যে বুদ্ধি, চেতনা ও অনুভূতি দেওয়া হয়েছে তা অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বেশি। কিন্তু ততটুকু বেশি যাতে তারা নিজেদের পানাহার, উদরপূর্তি ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারে, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এ সবের পরে আসে মানুষের নম্বর, যার অস্তিত্বের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলো নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা চেনা, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলা, তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া। সমগ্র বস্তুজগতের পরিণতি ও ফলাফলকে উপলব্ধি করা, আসল ও মেকী যাচাই করে যা ভাল, মঙ্গল, কল্যাণকর সেগুলোকে গ্রহণ করা, আর যা কিছু মন্দ, অকল্যাণকর সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। এ কারণেই মানবজাতি এমন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়েছে, জীবনের উন্নতি লাভের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। মানুষ উন্নতি লাভ করে ফেরেশতাদের কাতার থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। একমাত্র মানুষের মাঝে এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তার কর্মের জন্য ভালমন্দ প্রতিদান রয়েছে। যে কারণে তাদেরকে বুদ্ধিজ্ঞান এবং চেতনা-উপলব্ধিও দেওয়া হয়েছে সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অধিক, যাতে করে সাধারণ জীবের স্তরের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মুতাবিক কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ বুদ্ধি, চেতনা ও উপলব্ধিকে এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তিকে যেন সেমত কাজে নিয়োগ করে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসে যাবার পর একজন মানুষের বোঝা, তার দর্শন ও শ্রবণ অন্যান্য জীব-জন্তুর বোঝা, শোনা ও দেখা থেকে ভিন্ন রকম হওয়াই উচিত। মানুষও যদি নিজেদের দর্শন, শ্রবণ ও বিবেচনাশক্তিকে তেমনি কাজে নিয়োগ করে, যেমন কাজে অন্য জীবজন্তুরা নিয়োগ করে থাকে এবং মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকা, কল্যাণ ও মঙ্গলকর বিষয়কে গ্রহণ করা প্রভৃতি যেসব কাজ নির্ধারিত ছিল, সেগুলোর প্রতি যদি লক্ষ্য না রাখে, তবে বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্বোধ বলা হবে, চোখ থাকা সত্ত্বেও তাকে অন্ধ এবং কান থাকা সত্ত্বেও তাকে বধির বলেই আখ্যায়িত করা হবে। সেজন্যই কোরআন করীম অন্যত্র এ ধরনের লোকদেরকে صُمٌّ بُكْمٌ ও عُمْىٌ অর্থাৎ কালা, বোবা ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছে।

এতে একথা বিবৃত করা হয়নি যে, তারা নিজেদের পানাহার, থাকা-পরা ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কেও বুঝে না কিংবা জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখতে বা শুনতে পায় না; বরং স্বয়ং কোরআন করীম তাদের সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছে

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ "তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু আখিরাত সম্পর্কে একান্ত গাফিল।" আর ফিরাউন, হামান এবং তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছে ঃ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ 'তারা একান্তভাবেই বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল।' কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দর্শনক্ষমতার ব্যবহার যেহেতু শুধুমাত্র সে পর্যায়েই সীমিত ছিল, যে পর্যায়ে সাধারণ জীবজন্তুর থাকে–অর্থাৎ শুধু পেট ও শরীরের সেবা করা, আত্মার সেবা কিংবা তার তৃপ্তি সম্পর্কে কোন কিছুই না ভাবা বা না দেখা–সেহেতু তারা এই বৈষয়িকতা ও সামাজিকতায় যত উন্নতি-অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন, চন্দ্র ও মঙ্গলের অভিযানে যত বিজয়ই অর্জন করুক না কেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহে সমগ্র নভোমণ্ডলকে ভরে দিক না কেন, কিন্তু এসব পেট ও শরীরেরই সেবা, তার চেয়ে অধিক কিছু নয়। আত্মার স্থায়ী শান্তি ও তৃপ্তির জন্য এগুলোতে কিছুই নেই। কাজেই কোরআন তাদেরকে অন্ধ-বধির বলেছে। এ আয়াতে তাদের উপলব্ধি, দর্শন ও শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বোঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যা কিছু তাদের শোনা উচিত ছিল তা তারা শোনেনি। আর যা কিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শুনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীবজন্তুর পর্যায়ের বোঝা, দেখা ও শোনা, যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান।

এ জন্যই উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত, শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। রুটি আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছে بَلْ هُمْ اَضَلُّ (অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট।) তার কারণ চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার শরীয়তের বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত নয়। তাদের জন্য কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট, এতটুকুই তাদের জন্য যথার্থ। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেজন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বসা জীব-জন্তুর চেয়েও অধিক নির্বুদ্ধিতা। তাছাড়া জীব-জানোয়ার নিজের প্রভু ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পরওয়ারদিগারের আনুগত্যে ত্রুটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুষ্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশি নির্বোধ ও গাফিল প্রতিপন্ন হয়। কাজেই বলা হয়েছে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ অর্থাৎ এরাই হলো প্রকৃত গাফিল।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

---

(১৮০) আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ভাল ভাল সব নাম (নির্ধারিত) রয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য। কাজেই তোমরা সেসব নামেই আল্লাহ্‌কে অভিহিত করো। আর (অন্য কারো জন্য এসব নাম ব্যবহার করো না। বরং) এমন লোকদের সাথে সম্পর্কও রেখো না, যারা তাঁর (উল্লিখিত) নামের ব্যাপারে (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এসব নাম প্রয়োগ করে)। বাঁকা পথে চলে (যেমন, তারা গায়রুল্লাহ্‌কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আকীদার সাথেই উপাস্য বলে অভিহিত করতো)। তারা যা কিছু করছে, তার শাস্তি অবশ্যই পাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সে সমস্ত জাহান্নামবাসীর আলোচনা ছিল, যারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেতনা-অনুভূতিকে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের দর্শন, শ্রবণ কিংবা উপলব্ধি করার কাজে ব্যয় করেনি এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী ও অন্তহীন জীবনের জন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করেনি। ফলে আল্লাহ্ প্রদত্ত তার জ্ঞান-বুদ্ধিও বিনষ্ট হয়ে গেছে–আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও কল্যাণ লাভে তারা গাফিল হয়ে পড়েছে এবং চতুষ্পদ জীবজন্তু অপেক্ষাও অধিক গোমরাহী আর নির্বুদ্ধিতার অভিশাপে পতিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের উপসর্গের উপশম ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও দোয়ার আধিক্যই হলো এ রোগের চিকিৎসা। وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ সব উত্তম নাম আল্লাহ্‌রই জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।

'আসমায়ে-হুসনা' বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ ঃ উত্তম নাম বলতে সেই সমস্ত নামকে বোঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলা বাহুল্য, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর, যার উর্ধ্বে আর কোন স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যেকোন পূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি পূর্ণতর এবং জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হতে পারে। فَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ-এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয় কাজেই فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ –এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহ্‌কে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহবান করা হলো 'দোয়া' শব্দের অর্থ। আর 'দোয়া' শব্দটি কোরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হলো আল্লাহ্‌র যিকির, প্রশংসা ও তসবীহ-তাহ্‌লীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হলো নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوْهُ بِهَا শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হলো এই যে, হাম্‌দ, সানা, গুণ ও প্রশংসাকীর্তন, তসবীহ-তাহ্‌লীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে। আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা আল্লাহ্‌র নাম বলে প্রমাণিত।

দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা ঃ এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনা বিষয়ে দু'টি হিদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমত আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যেকোন শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহ পরবশ হয়ে আমাদের সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন, যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। সেই সাথে এ সমস্ত শব্দেই তাঁকে ডাকার জন্য আমাদের বাধ্য করে দিয়েছেন, যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি। কারণ আল্লাহ্‌র গুণ-বৈশিষ্ট্যে সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের ঊর্ধ্বে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (র) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম পাঠ করে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা হয়, তা কবূল হয়। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন ঃ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।' উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য জন্য দোয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা এমন নেই, যাতে কোন না কোন ক্ষতির আশংকা থাকবে না এবং ফল লাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোন ক্ষতির আশংকা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হলো এই যে, দোয়া যে একটি ইবাদত তার সওয়াব দোয়াকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থাৎ দোয়া হলো ইবাদতের মগজ। যে উদ্দেশ্যে মানুষ দোয়া করে, অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে সে দোয়াকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর।

আর আল্লাহ্র হামদ ও সানার মাধ্যমে যিকির করা হলো ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মানুষের মুহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখকষ্ট উপস্থিত হলেও শীঘ্রই সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোক চিন্তাভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এরূপ ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ - لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ -

'মুসতাদরাকে হাকিম', হযরত আনাস (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) হযরত ফাতিমা যাহ্রা (রা)-কে বলেন, আমার ওসীয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে! সে ওসীয়তটি হলো এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ে নেবে ঃ

يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ-

এ আয়াতটি সমস্ত মকসুদ ও জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তুলনাহীন।

সারকথা হলো এই যে, উল্লিখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দু'টি হিদায়েত দান করা হয়েছে। একটি হলো এই যে, যেকোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যেকোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্কে ডাকবে ; কোন সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হলো এই যে, তাঁকে সে নামেই ডাকবে, যা আল্লাহ্ তা'আলার নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; তার শব্দের কোন পরিবর্তন করবে না।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ সেসমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে-হুস্নার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামির প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী اَلْحَادٌ। (ইলহাম) অর্থ ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া। এ কারণেই বগলী কবরকে لحد বলা হয়। কারণ তাও মধ্য থেকে সরে থাকে। কোরআনের পরিভাষায় الحاد। বলা হয় কোরআনের সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক-সেদিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জুড়ে দেওয়াকে।

এ আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-কে হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকেরা সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে হুস্নার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে থাকে।

আল্লাহ্র নামের বিকৃতি সাধনের নিষেধাজ্ঞা এবং তার কয়েকটি দিক ঃ আল্লাহর নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন কোন নাম ব্যবহার করা, যা কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সত্যপন্থী ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কারোরই এমন কোন অধিকার নেই যে, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণকীর্তন করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক, যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে আল্লাহ তা'আলার নাম কিংবা গুণবাচক হিসাবে উল্লিখিত রয়েছে। যেমন আল্লাহকে 'করীম' বলা যাবে কিন্তু 'সখী' বা 'দাতা' বলা যাবে না। 'নূর' বলা যাবে, কিন্তু 'জ্যোতি' বলা যাবে না। 'শাফী' বলা যাবে, কিন্তু 'তবীব' বা 'চিকিৎসক' বলা যাবে না। কারণ এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কোরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

ইসলামে বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থা হলো আল্লাহর যে সমস্ত নাম কোরআন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবি বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বোঝা যায়।

কোন লোককে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্ধারিত নামে সম্বোধন করা জায়েয নয় ঃ তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোন লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে-হুস্‌নাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কোরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো জন্য ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রাহীম, রাশীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো জন্য যেসব নামের ব্যবহার কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লিখিত 'ইলহাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং নাজায়েয ও হারাম। যেমন, রাহ্‌মান, সুবহান, রাযযাক, খালেক, গাফ্‌ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি।

তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রাযযাক মনে করা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফর। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বোঝার দরুন কাউকে খালেক, রায্‌যাক, রাহমান কিংবা সুবহান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শিরিকীসুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে।

পরিতাপের বিষয়, ইদানীং সাধারণভাবেই মুসলমানরা এই ভুলে নিপতিত। কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা ইসলামী নাম রাখাই ছেড়ে দিয়েছে। তাদের আকার-অবয়ব ও স্বভাব-চরিত্রে তাদেরকে মুসলমান বলে বোঝা এমনিতেই কঠিন হয়ে পড়েছিল, যা-ও নামের দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল, তাও ইংরেজি কায়দায় নতুন নাম রাখা হচ্ছে। মেয়েদের নাম ইসলামী মহিলাদের নাম খাদীজা, আয়েশা, ফাতেমার পরিবর্তে নাসীম, শামীম, শাহনায, নাজমা, পারভীন হয়ে যাচ্ছে। আরো বেশি আফসোসের ব্যাপার এই যে, যাদের ইসলামী নাম আবদুর রাহমান, আবদুর রায্‌যাক, আবদুল গাফ্‌ফার, আবদুল কুদ্দুস প্রভৃতি রাখা হয়েছে বা হচ্ছে তাতে সংক্ষেপনের

এই ভুল পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যে, এসব নামের শুধুমাত্র শেষ অংশটুকুতে তাকে পূর্ণ নামের বদলে সম্বোধন করা হয়–রাহ্‌মান, খালেক, রায্‌যাক আর গাফ্‌ফারের খেতাব দেয়া হয় মানুষকে। এর চাইতেও গজবের ব্যাপার হলো যে, 'কুদরতুল্লাহ্'কে আল্লাহ সাহেব আর কুদরতেখোদাকে খোদা সাহেব নামেও ডাকা হয়। বস্তুত এ সবই নাজায়েয, হারাম এবং মহাপাপ বা কবীরা গোনাহ্। এসব শব্দ (এসব ক্ষেত্রে) যতবার ব্যবহার করা হয়, ততবারই কবীরা গোনাহ্ হয় এবং যে শুনে সেও পাপমুক্ত থাকে না।

এ সমস্ত স্বাদ ও লাভহীন পাপকে আমাদের হাজার হাজার মুসলমান ভাই দিন-রাত্রির নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত করে রেখেছে অথচ চিন্তাও করছে না যে, এই সামান্য বিষয়টির পরিণতি কত ভয়াবহ। এরই প্রতি উল্লিখিত আয়াতের سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ বাক্যের সতর্কতা উচ্চারণ করা হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের বদলা শীঘ্রই দেওয়া হবে। সে বদলা নির্ধারণ করা হয়নি। আর এই নির্ধারণ করাতেই কঠিন আযাবের ইঙ্গিত বোঝা যায়।

যে সমস্ত পাপে কোন পার্থিব স্বাদ ও আয়েশ কিংবা উপকারিতা বিদ্যমান, সেগুলোর ব্যাপারে হয়তো বা কেউ বলতে পারে আমি আমার কামনা-বাসনা কিংবা প্রয়োজনের কারণে এগুলো করতে বাধ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীংকালে মুসলমানরা এমন বহু নিরর্থক পাপেও নিজেদের মূর্খতা কিংবা শৈথিল্যের কারণে লিপ্ত রয়েছে যাতে না আছে কোন পার্থিব লাভ, না আছে সামান্যতম আনন্দ বা স্বাদ। তার কারণ হচ্ছে এই যে, হালাল-হারামের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্য থাকেনি (নাউযুবিল্লাহি মিন্‌হু)।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ
مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾
اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ
وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ ۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾

(১৮১) আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। (১৮২) বস্তুত যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না। (১৮৩) বস্তুত আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল অতি পাকা। (১৮৪) তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, তাদের সঙ্গী লোকটির মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি নেই ? তিনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী প্রকৃষ্টভাবে। (১৮৫) তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যা কিছু সৃষ্টি

করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা বস্তু সামগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে ? বস্তুত এরপর কিসের উপর ঈমান আনবে ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমার সৃষ্ট জিন ও ইনসানের মধ্যে (সবাই গোমরাহ্) নয়, বরং তাদের মধ্যে একটি দল এমন রয়েছে, যারা সত্য ধর্ম (ইসলাম) অনুযায়ী (মানুষকে) হিদায়েত (-ও) করে থাকে এবং সে অনুযায়ী (নিজের ও অন্যদের বিষয়ে) ন্যায়সংগত ইনসাফও করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাচ্ছি এমনিভাবে যে, তারা টেরও পাচ্ছে না। আর (পৃথিবীতে আযাব আরোপ করা থেকে) তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি। নিঃসন্দেহে আমার ব্যবস্থা সুদৃঢ়। তারা কি এ ব্যাপারে চিন্তা করেনি যে, যার সাথে তাদের পালা পড়েছে তাঁর মাথায় এটুকুও বিকৃতি নেই ? তিনি শুধু পরিষ্কার (আযাবের ব্যাপারে) ভীতি দর্শনকারী (যা মূলত পয়গম্বরদেরই কাজ)। আর তারা কি আসমান ও যমীনের বিশাল জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করেনি এবং এর অন্যান্য জিনিসের সম্পর্কে যা আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন (যাতে তাদের তওহীদ সম্পর্কে প্রামাণিক জ্ঞান লাভ হতে পারে ? আর এ ব্যাপারে চিন্তা করেনি) যে, হয়তো শেষ সময় (অর্থাৎ মৃত্যুকাল) সন্নিকটে এসে পৌঁছেছে? (তাহলে তারা আযাবের আশংকা থেকে ভয় পেতে পারত এবং তা থেকে অব্যাহতি লাভের চিন্তা করত—আর এভাবে পেতে পারত সত্য ধর্মের সন্ধান। বস্তুত মৃত্যুর আশংকা সর্বক্ষণই রয়েছে। আর কোরআন যে প্রবল ভাষায় এ বিষয়টি ব্যক্ত করছে, তাতেও যদি তাদের চিন্তা ও অনুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি না হয়, তাহলে) আর কোরআনের পর কোন্ বিষয়ের উপর তারা ঈমান আনবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে জাহান্নামবাসীদের অবস্থা ও দোষ-গুণ এবং তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সামর্থ্যসমূহকে যথার্থ ব্যবহার করেনি, সেগুলোকে সঠিক কাজে না লাগিয়ে বিনষ্ট করে দিয়েছে। অতঃপর তাদের এ অবস্থার প্রতিকার বলা হয়েছে আসমায়ে হুসনা ও আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে। আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম আয়াতে তাদের মুকাবিলায় যারা ঈমানদার, যারা সত্যপন্থী, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ্যকে সঠিক কাজে ব্যবহার করে সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা ন্যায়ের ভিত্তিতে হিদায়েত করে অর্থাৎ মানুষকে সরল পথের দিশা দেয়। আর যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাদ কিংবা মামলা-মুকদ্দমা দেখা দেয়, তখন তারা নিজেদের সে বিবাদের মীমাংসাও আল্লাহ্র ন্যায়ানুগ আইনের ভিত্তিতেই করে নেয়।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে জারীর নিজের সনদে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর বললেন, এ আয়াতে যে উম্মতের কথা বলা হয়েছে সে উম্মত হলো আমার উম্মত, যারা নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করবে ন্যায়ের ভিত্তিতে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আইন মুতাবিক। আর যাবতীয় লেনদেনের ব্যাপারে ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

আবদ্ ইবনে হুমাইদের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ আয়াতটি তোমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তোমাদের পূর্বেও একটি উম্মতকে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর উম্মতের মধ্যেও একটি দল এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। তারাও মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন এবং নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ব্যাপারে ন্যায়ের অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করত। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতকেও আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যে অনন্য করে দিয়েছেন।

এর সার-সংক্ষেপ হলো দুটি চরিত্র। একটি হলো অন্যান্য লোকের নেতৃত্ব দান, পথ প্রদর্শন কিংবা পরামর্শ দানে শরীয়তের অনুসরণ করা। দ্বিতীয়টি হলো পরস্পরের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হলে শরীয়তের আইন অনুসারে তার মীমাংসা করা।

লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এ দুটি চরিত্রই এমন যা কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের মঙ্গল, সুখ-সাচ্ছন্দ্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের যমীন হতে পারে যে, শান্তি ও যুদ্ধ আর মৈত্রী ও শত্রুতা যেকোন অবস্থায়ই তাদের নীতি হবে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ। বন্ধু হোক আর প্রতিপক্ষ হোক, যাকেই যে পরামর্শ দেবে, যে কর্মপন্থা বাতলাবে, তাতে ন্যায়েরই অনুসরণ করবে। আর প্রতিপক্ষের সাথে বিবাদের ক্ষেত্রেও ন্যায়ের সমর্থনে নিজের যাবতীয় ধ্যান-ধারণা ও কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে দেবে। এরই সার-সংক্ষেপ হলো সত্যনিষ্ঠা।

এই সত্যনিষ্ঠাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের মর্যাদা অন্য সমস্ত উম্মত অপেক্ষা অধিক হওয়ার রহস্য এবং তাদের বৈশিষ্ট্য। যারা সত্যিকারভাবে উম্মতে মুহাম্মদী তারা নিজের সমগ্র জীবনকে ন্যায়ের অনুগামী করে দেয়। যে দল বা পার্টির নেতৃত্ব দেয় তাও একান্ত নির্ভেজাল ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতেই দিয়ে থাকে। নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা কামনা-বাসনা এবং বংশগত কিংবা জাতীয় আচার আচরণের কোন প্রভাব তাতে থাকতে দেয় না। আর পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রেও সবসময় ন্যায়ের সামনে মস্তক অবনত করে দেয়। কাজেই সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবেঈন (রা)-এর সমগ্র ইতিহাস এই চরিত্রেরই বিকাশ।

পক্ষান্তরে যখনই এ উম্মতের উল্লিখিত দুটি চরিত্রে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে, তখন থেকেই শুরু হয়েছে অবনতি ও বিপর্যয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজ এই সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ উম্মতই নির্ভেজাল রিপুর পূজারীতে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের কোন দল বা জামাত গঠিত হলে তা একান্ত আত্মস্বার্থ এবং নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ পার্থিব লাভালাভের ভিত্তিতেই গঠিত হয়। একে অপরকে যে সমস্ত বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতার আমন্ত্রণ জানায়, তাও রৈপিক কামনা-বাসনা অথবা বংশীয় আচার প্রথার

ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। কিন্তু সত্য ও শরীয়তের অনুগমনের জন্য কোথাও কোন সংগঠন হয়ও না, কেউ এ ব্যাপারে চলার জন্য আমন্ত্রণও জানায় না। এমনকি শরীয়ত ও সত্যের বিরুদ্ধাচরণ দেখে কারো মনে সামান্য ভাবান্তরও হয় না।

এমনিভাবে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ এবং বিবদমান মামলা-মুকদ্দমার ক্ষেত্রে সামান্য কয়েকদিনের কাল্পনিক মোহের খাতিরে আল্লাহ্‌র কানুনকে পরিহার করে পৈশাচিক আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে বিচার মীমাংসায় রাযী হয়ে যায়।

এরই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে স্থানে স্থানে, দেশে দেশে। সবখানেই এই উম্মতকে দেখা যায় লাঞ্ছিত, পদদলিত। তারা আল্লাহ্ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে—আর সেজন্যই আল্লাহ্ও তাদের সাহায্য-সহায়তা থেকে ফিরে গেছেন।

ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার পরিবর্তে রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়েও কোন কোন লোক যে পার্থিব লাভ হাসিল করতে পেরেছে, প্রকৃতপক্ষে তা হলো তার উপর এক মগ্নতার আবরণ। কিন্তু এ যে গোটা জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চিত ধ্বংসেরই পরিণতি, সেদিকে লক্ষ্য করার কেউ নেই। সমগ্র জাতির কল্যাণ যদি কাম্য হয়, তাহলে এই কোরআনী নীতিমালাকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। নিজেকেও সে অনুয়ায়ী আমল করতে হবে এবং অপরকেও আমল করাতে ও তার নিয়ামানুবর্তী হতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে এই সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, জাতীয় উন্নতি যখন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং ন্যায়বিচারের অনুসরণের উপর নির্ভরশীল, তখন অন্যান্য অমুসলিম জাতি-সম্প্রদায়, যারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরে রয়েছে, তাদেরকে কেন পৃথিবীতে উন্নত ও বিকশিত দেখা যায়? তার উত্তর হচ্ছে এই : وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমার আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আমি স্বীয় হিকমত ও রহমতের ভিত্তিতে তাদেরকে সহসাই পাকড়াও করি না। বরং ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করি যা তারা টেরও পায় না। সুতরাং এ পার্থিব জীবনে কাফির ও পাপিষ্ঠদের সচ্ছলতা এবং মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। কারণ তাদের জন্য সেটি কোন কল্যাণকর বিষয় নয়, বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য استدراج (অবকাশ দান)। আর ইস্‌তিদরাজ অর্থ হলো পর্যায়ক্রমে ধীর ধীরে কোন কাজ করা। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় ইস্‌তিদরাজ বলা হয় বন্দীর পাপাচার সত্ত্বেও দুনিয়াতে তার উপর কোন বিপদাপদ আরোপিত না হওয়া—বরং যতই সে পাপ করতে থাকবে পার্থিব ধন-সম্পদেরও বৃদ্ধি ততই ঘটবে। যার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, তার অসৎ কর্মের ব্যাপারে সে কখনও সতর্ক হতে পারে না এবং গাফলতির চোখও খুলে না, নিজের অপকর্ম তার কাছে মন্দ বলেই ধরা পড়ে না, ফলে সে তা থেকে বিরত হওয়ার কথাও ভাবতে পারে না।

মানুষের এ অবস্থার উদাহরণ সেই চিকিৎসাহীন রোগীর মত যে রোগকেই আরোগ্য এবং বিষকেই প্রতিষেধক মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলে কখনও দুনিয়াতেই সহসা কোন আযাবে ধরা পড়ে আবার কখনও মৃত্যু পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তার নেশাগ্রস্ততা ও অজ্ঞানতার অবসান করে দেয়। আর চিরন্তন আযাবেই হয় তার ঠিকানা।

কোরআন করীম বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে এই পর্যায়ক্রমিকতার আলোচনা করেছে। বলা হয়েছে ঃ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ অর্থাৎ তারা যখন সে বিষয় বিস্মৃত হয়ে বসেছে, যা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য সব ব্যাপারে দরজা খুলে দিয়েছি। এমনকি তারা তাদের প্রাপ্ত ধন-দৌলতের কারণে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। আর আমি তাদেরকে হঠাৎ আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করেছি। আর তখন তারা অব্যাহতি লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে।

এই যে 'ইসতিদরাজ' এটা কাফিরদের সাথেও ঘটে থাকে এবং পাপী মুসলমানের সাথেও। সে কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং পূর্ববর্তী মহাত্মা মনীষীদের যখনই কোন পার্থিব নিয়ামত বা ধন-দৌলত আল্লাহ্ তা'আলা দান করতেন, তখন তাঁরা ভীতি বিহ্বলতার দরুন ইস্তিদরাজের ভয় করতেন যে, পার্থিব এই দৌলতই না আবার আমাদের জন্য ইস্তিদরাজের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় আয়াতে এই ইস্তিদরাজ তথা পর্যায়ক্রমিক অবকাশ দানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ وَاُمْلِيْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ অর্থাৎ আমি গোনাহ্গারদের অবকাশ দিতে থাকি। আমার ব্যবস্থা বড়ই কঠিন।

চতুর্থ আয়াতে রয়েছে, কাফিরদের সেই অর্থহীন ধারণা-কল্পনার খণ্ডন যে (নাউযুবিল্লাহ্) মহানবী (সা) মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভুগছেন। বলা হয়েছে ঃ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ তারা কি চিন্তাভাবনা করে দেখে না যে, যার সাথে তাদের পালা পড়েছে তাঁর সামান্যতমও মস্তিষ্ক বিকৃতি নেই। তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনার সামনে তো সমগ্র পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীর চিন্তাশীলতা পর্যন্ত অবাক ও বিস্মিত। তাঁর সম্পর্কে বিকৃতির ধারণা করা তো নিজেরই মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। মহানবী (সা) তো পরিষ্কার ও প্রকৃষ্ট তথ্যসমূহ বর্ণনা করে থাকেন এবং আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেন।

পঞ্চম আয়াতে এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অসংখ্য বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা। দ্বিতীয়ত নিজের জীবনকাল আর কর্মবিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টি সম্পর্কে সামান্য মনোনিবেশ সহ্কারে চিন্তা করলে একজন স্থূলবুদ্ধি মানুষও আল্লাহ্ তা'আলার মহা কুদরতের পরিচয় ও দর্শন লাভে সমর্থ হতে পারে। আর যারা কিছুটা সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন তারা তো বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণুকে মহা শক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তস্বীহ ও প্রশংসা-কীর্তনে নিয়োজিত দেখতে পায়। যে দর্শনের পর আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা এবং বিশ্বাস স্থাপন করা একটি অতি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়।

আর নিজের জীবনকালে চিন্তা-ভাবনা করার ফল হয় এই যে, যখন মানুষ একথা উপলব্ধি করতে পারে যে, মৃত্যুর সময়টি যখন নির্দিষ্ট করে জানা নেই, তখন সে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সমাধা করার ব্যাপারে যেকোন শৈথিল্য থেকে বিরত হয়ে যায় এবং একান্ত একাগ্রতার সাথে কাজ করতে আরম্ভ করে। মৃত্যুর ব্যাপারে গাফলতিই মানুষকে বাজে কাজ আর অপরাধপ্রবণতায় প্রবৃত্ত করে। পক্ষান্তরে মৃত্যুকে সর্বক্ষণ উপস্থিত জ্ঞান করাই এমন এক বিষয়, যা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ-প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। সে জন্যই মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتُ ঃ অর্থাৎ "তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে বেশি পরিমাণে স্মরণ কর, যা সমস্ত ভোগ-বিলাস স্পৃহাকে নিঃশেষ করে দেয়। আর তা হলো মৃত্যু।"

কাজেই উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَاخَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ وَّاَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ــــ مَلَكُوْتِ শব্দটি রাজ্য অর্থে ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য বলা হয়ে থাকে। তার অর্থ সেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে কি তারা চিন্তা-ভাবনা করেছে, যা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী এবং অসংখ্য বস্তু-সামগ্রীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, 'হয়তো মৃত্যু অতি নিকটেই রয়েছে, যা এসে যাবার পর ঈমান বা আমলের অবকাশ শেষ হয়ে যাবে।'

আয়াত শেষে বলা হয়েছে ঃ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ যারা কোরআন হাকীমে এহেন প্রকৃষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও ঈমান আনে না, তারা আর কোন্ বিষয়ের প্রেক্ষিতে ঈমান আনবে?

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٦﴾

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا

لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔؕ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ

كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾

---

(১৮৬) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের দুষ্টামিতে মত্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন। (১৮৭) আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে ? বলে দিন–এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহ্র নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথে আনতে পারে না (কাজেই আক্ষেপ করা বৃথা)। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত ছেড়ে দিয়ে থাকেন (যাতে একত্রেই পূর্ণ শাস্তি প্রদান করতে পারেন)। লোকেরা আপনার কাছে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, কখন তা অনুষ্ঠিত হবে। আপনি বলে দিন যে, এর (অনুষ্ঠান সংক্রান্ত) জ্ঞান (অর্থাৎ কখন তা অনুষ্ঠিত হবে তা) শুধু আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে (অন্য কেউ এ ব্যাপারে জানে না)। এর নির্ধারিত সময়ে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ একে প্রকাশ করবেন না। (আর প্রকাশের অবস্থা হবে এমন যে, যখন তার অনুষ্ঠান হবে, তখন সবাই জানতে পারবে। নির্ধারিত সময়ের আগে কারও অনুরোধে তা প্রকাশ করা হবে না। কারণ) সেটা হবে আসমানসমূহ এবং যমীনসমূহের জন্য অতি কঠিন ও বিরাট ঘটনা। (কাজেই) তা তোমাদের উপর (তোমাদের অজান্তে) একান্ত দৈবাৎ এসে উপস্থিত হবে। (ফলে সেটা দেহকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করে দেওয়ার ব্যাপারে যেমন কঠিন হবে, তেমনিভাবে অন্তরের পরেও তার কঠিন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে। বস্তুত পূর্ব থেকে বাতলে দেওয়া হলে এমনটা হতো না। আর তাদের জিজ্ঞেস করাটাও একান্ত মামুলি প্রশ্ন নয়; বরং) তারা আপনার নিকট এমনই (পীড়াপীড়ি ও প্রবলতার) সাথে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি যেন এ বিষয়ে তদন্ত-গবেষণা করে নিয়েছেন (আর এই তদন্ত-গবেষণার পর আপনি তার ব্যাপক জ্ঞানও লাভ করে নিয়েছেন)। আপনি বলে দিন যে, (বর্ণিত) এ ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ বিষয়ে) জানে না [যে, কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজের কাছেই সংরক্ষণ করে রেখেছেন। নবী-রাসূলদেরও সে ব্যাপারে বিস্তারিত সংবাদ দেননি। সুতরাং এই না জানার দরুন কোন নবীর কিয়ামতের সঠিক সময় সম্পর্কিত অজ্ঞতাকে (নাউযুবিল্লাহ্) নবী না হওয়ার প্রমাণ মনে করে–তা এভাবে যে, নবুয়ত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এই ইলম অপরিহার্য, আর অপরিহার্য বিষয়ের অনুপস্থিতি তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়েরও অনুপস্থিতির প্রমাণ। অথচ প্রথম পর্বটিই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুফ্ফার ও মুনকেরীনদের হঠকারিতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহা কুদরতের প্রকৃষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ঈমান না আনার আলোচনা ছিল। আর বর্তমান বিষয়টি রাসূলে করীম (সা)-এর জন্য উম্মত এবং সাধারণ সৃষ্টির সাথে তাঁর অসাধারণ প্রীতি ও দয়ার কারণে তাঁর চরম মনোবেদনা ও দুঃখের কারণ হতে পারত বলে আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলা হয়েছে–যাদেরকে আল্লাহ্ নিজে পথভ্রষ্ট করে দেবেন, তাদেরকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের লোকদের পথভ্রষ্টতায় উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়ই ছেড়ে দেন।

সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণ্ন না হন। কারণ সত্য বিষয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর

নির্ধারিত দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বও শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হলো একান্ত ভাগ্য সংক্রান্ত। এতে তাঁর কোন হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত হবেন।

এ সূরার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক. তওহীদ। দুই. রিসালত, তিন. আখিরাত। আর এই তিনটি বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তওহীদ ও রিসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখিরাত ও কিয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। তাই তফসীরে ইমাম ইবনে জরীর (র) এবং আবদ্ ইবনে হুমাইদ (র) হযরত কাতাদাহ (রা)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশরা হুযূরে আকরাম (সা)-এর নিকট ঠাট্টা বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কিয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন—এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কিয়ামত কোন্ সনের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারি। আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার দাবিও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদের বিষয়টি আপনি বলতে না চান, তবে অন্তত আমাদের বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই নাযিল হয় يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ আয়াতটি।

এখানে উল্লিখিত سَـــاعَـــةٌ শব্দটি আরবী ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোন বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় سَاعَةٌ (সাআত) যাকে বাংলায় ঘন্টা নামে অভিহিত করা হয়। কোরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সেই দিবসকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সে দিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। اَيَّانَ (আইয়ানা) অর্থ কবে। আর مُرْسٰى (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া।

لَا يُجَلِّيْهَا শব্দটি تَجْلِيَه থেকে গঠিত। এর অর্থ প্রকাশিত এবং খোলা। بَغْتَةً (বাগ্‌তাতান) অর্থ অকস্মাৎ। حَفِىٌّ (হাফিয়্যুন) অর্থ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে 'হাফী' বলা হয়, যে প্রশ্ন করে করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে।

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে ? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার প্রতিপালকেরই আছে। এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না। কিয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরা টুকরা হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাগাদা। তা না

হলে যারা বিশ্বাসী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকির তারা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে : لَاتَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ কিয়ামত তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবেই এসে উপস্থিত হবে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) কিয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদার) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউস মেরামত করতে থাকবে—তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয়তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে। —রূহুল-মা'আনী

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কিয়ামতকেও, যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতেই বিশ্বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ঔদ্ধত্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সেজন্যই হিকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন-ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে যে, কোন একদিন কিয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহ্‌র সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাশ নেওয়া হবে, যার ফলে হয় জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনন্ত নিয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের সেই কঠিন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোন বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবি হলো বয়সের অবকাশকে গনীমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরি হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ লংঘন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে : يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদের তার যথাযথ ও সঠিক তারিখ, দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিপ্রসূত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো এর নির্দিষ্টতা সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী

প্রতি মুহূর্তে আখিরাতের আযাবের ভয় করে নেক-আমল অবলম্বন করার এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়।

আর এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো তাদের একথা বোঝা যে, মহানবী (সা) অবশ্যই কিয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে এ বিষয়ে অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে সে কথা বলছেন না। সেজন্যই নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আমাদের কিয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ হয়েছে ঃ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ। অর্থাৎ আপনি লোকদের বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূলদেরও জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়টি অনেকেই জানে না যে, বহু জ্ঞান আল্লাহ্ শুধুমাত্র নিজের জন্যই সংরক্ষণ করেন, যা কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূল পর্যন্ত জানতে পারেন না। মানুষ নিজেদের মূর্খতাবশত মনে করে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা রাসূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিত আবিষ্কার করে যে, মহানবী (সা)-এর যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ইল্‌ম নেই, কাজেই এটা তাঁর নবী না হওয়ারই লক্ষণ (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু উপরোল্লিখিত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সারকথা হলো এই যে, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা বড়ই বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না জানে তার অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি।

তবে হ্যাঁ, মহানবী (সা)-কে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, এখন তা নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী (সা) বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-"আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু'টি আঙ্গুল।"-তিরমিযী

কোন কোন ইসলামী কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা হুযূর আকরাম (সা)-এর কোন হাদীস নয় বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেয়া বিষয়।

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতরা আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোরআনের কোন আয়াত কিংবা কোন বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোন বিরোধ ঘটে না। ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত ঢুকিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যই হয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা, যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ এক হাদীসে রাসূলে করীম (সা) স্বয়ং স্বীয় উম্মতকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন যে, "পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন, যেন এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।" এতে যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, হুযূর (সা)-এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেয ইবনে হায্ম উন্দুলুসী বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না; তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তারই রয়েছে।-মুরাগী

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛۚ اِنْ اَنَا اِلَّا
نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا
فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ
مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۸۹﴾ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ
فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾ اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿۱۹۱﴾
وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۲﴾ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ
اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿۱۹۳﴾

(১৮৮) আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (১৮৯) তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে আর তা থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন সে গর্ভবতী হলো; অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকলো। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহ্‌কে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব। (১৯০) অতঃপর তাদেরকে যখন সুস্থ ও ভাল দান করা হলো, তখন দানকৃত বিষয় তাঁর অংশীদার তৈরী করতে লাগল। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা থেকে বহু উর্ধ্বে। (১৯১) তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি ; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। (১৯২) আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। (১৯৩) আর তোমরা যদি

তাদেরকে আহ্বান কর সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহ্বান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহ্বান জানানো কিংবা নীরব থাকা দুই-ই তোমাদের জন্য সমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলে দিন যে, আমি নিজে আমার নির্দিষ্ট সত্তার জন্যও কোন (সৃষ্টি সংক্রান্ত) কল্যাণ সাধনের অধিকার সংরক্ষণ করি না (অপরের জন্য তো দূরের কথা।) আর না (সৃষ্টি সংক্রান্ত কোন) ক্ষতি (প্রতিরোধের অধিকার আমার রয়েছে।) তবে এতটুকুই (করতে পারি) যতটা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ আমাকে অধিকার দান করবেন। আর যে ব্যাপারে অধিকার দেননি, তাতে অনেক সময় লাভ নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্ষতি সাধিত হয়। একটি তো গেল এই বিষয় ঃ) আর (দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এই যে,) আমি যদি গায়েবের বিষয় জেনে থাকতাম (ঐচ্ছিক ব্যাপারগুলোতে), তাহলে আমি (নিজের জন্য) বহু কল্যাণ লাভ করে নিতে পারতাম এবং কোন অকল্যাণই আমার উপর পতিত হতে পারত না। (কারণ গায়েব সম্পর্কিত ইল্‌মের দ্বারা জেনে নিতাম যে, অমুক বিষয় আমার জন্য নিশ্চিত মঙ্গলজনক হবে; তখন তাই গ্রহণ করে নিতাম। আর জানতে পারতাম যে, অমুক বিষয়টি আমার জন্য নিশ্চিত ক্ষতিকর, তখন তা থেকে বিরত থাকতাম। পক্ষান্তরে এখন যেহেতু ইলমে-গায়েব নেই, সেহেতু অনেক সময় কল্যাণ সম্পর্কে জানাই থাকে না যে, তা গ্রহণ করব। তেমনিভাবে ক্ষতি সম্পর্কেও জানা থাকে না যে, তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বরং অনেক সময় উপকারীকে অপকারী এবং অপকারীকে উপকারী বলে মনে করে নেয়া হয়। এ যুক্তির সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইল্‌মে-গায়েবের পক্ষে ইষ্ট-অনিষ্ট উভয়টির উপর ক্ষমতা লাভ হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এতে স্পষ্টরূপে বোঝা গেল যে, আমি এ রকম ইলমে গায়েব অবগত নই।

যাই হোক, আমার এমন বিষয়ের জ্ঞান নেই; আমি শুধু (শরীয়তের বিধি-বিধান বাতলিয়ে তার সওয়াব সম্পর্কে) সুসংবাদদাতা এবং (আযাব সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শনকারী-(সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা) ঈমানের অধিকারী।-(সারার্থ এই যে, নবুয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে পরিবেষ্টিত করা নয়। কাজেই সে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানপ্রাপ্তিও নবীর জন্য অপরিহার্য নয়, যাতে কিয়ামত নির্ধারণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। অবশ্যই নবুয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের প্রচুর জ্ঞান। বস্তু তা আমার রয়েছে।) সেই আল্লাহ্ এমনই (ক্ষমতাশীল ও কল্যাণদাতা), তিনি তোমাদের একটি মাত্র দেহ (অর্থাৎ আদম দেহ) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার জোড়া তৈরী করেছেন (অর্থাৎ হযরত হাওয়াকে তৈরী করেছেন। এর বর্ণনা সূরা নিসার তফসীর প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে)। যাতে সে তার সেই জোড়ার দ্বারা আকর্ষণ লাভ করতে পারে। (সুতরাং তিনি যখন স্রষ্টাও এবং অনুগ্রহকারী দাতাও, তখন ইবাদত লাভও একমাত্র তাঁরই অধিকার।) অতঃপর (পরবর্তীতে আদমের সন্তান-সন্ততি বেড়েছে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু তাদের কারো কারো অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে,) যখন স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, তখন তার গর্ভ সঞ্চারিত হয়েছে (যা প্রথমদিকে) ছিল সামান্য ও হালকা, ফলে সে তা পেটে নিয়ে (নির্বিঘ্নে) চলাফেরা করেছে, (কিন্তু) পরে যখন সে গর্ভ (বৃদ্ধির কারণে) ভারী হয়ে যায় (এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মনেই বিশ্বাস জন্মে যে, এটা

অবশ্যই সন্তানের গর্ভ,) তখন (তাদের মনে নানা রকম কল্পনা ও আশংকা হতে থাকে। সুতরাং) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বীয় মালিক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া-প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে যে, তুমি যদি আমাদিগকে সুস্থ-সঠিক সন্তান দান কর তাহলে আমরা (তোমার) অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। (যেমন, সাধারণ অভ্যাস রয়েছে যে, যখনই মানুষ বিপদে পড়ে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বড় বড় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি দান করে) তেমনিভাবে আল্লাহ্ যখন তাদেরকে সুস্থ সন্তান দান করলেন তখন তারা উভয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে বিভিন্ন শরীক সাব্যস্ত করতে লাগল। [কেউ এমন বিশ্বাস পোষণের মাধ্যমে যে, এ সন্তান অমুক জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তি দিয়েছে। আবার কেউ কার্যকলাপের মাধ্যমে, তাদের নামে নযর-নিয়ায মানত করে কিংবা শিশুকে নিয়ে শরীককৃত বস্তুর সামনে মাথা ঠেকিয়ে অথবা কথার মাধ্যমে—তার দাসত্বের সাথে যুক্ত করে আব্‌দে শামস্ (সূর্যদাস) বান্দায়ে-আলী প্রভৃতি তাদের অন্যান্য উপাস্য দেব-দেবীর সাথে যুক্ত করে নাম রাখার মাধ্যমে। অথচ আল্লাহ্ পাক যে তাদের সন্তান দান করেন তার কৃতজ্ঞতা তাঁরই দরবারে নিবেদন করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা নিবেদন করল অন্য বাতিল মা'বুদের নিকট।) বস্তুত আল্লাহ্ স্বীয় শরীক বা অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। (এ পর্যন্ত ছিল আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর উল্লেখ, যা তাঁর মা'বুদ বা উপাস্য হওয়ারই পরিচায়ক। পরবর্তীতে মিথ্যা উপাস্যসমূহের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সেগুলোর উপাস্য হওয়ার অযোগ্যতার পরিচায়ক। বলা হচ্ছে,) তোমরা কি (আল্লাহ্ তা'আলার সাথে) এমন সব বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করছ, যা কোন কিছু তৈরী করতে পারে না এবং (অবশ্যই যা অন্যের দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে ? এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, পৌত্তলিকরা নিজেরাই মূর্তি নির্মাণ করে নেয়।) তাছাড়া (কোন কিছু তৈরী করা তো দূরের কথা,) সেগুলো এতই অক্ষম যে, এর চেয়ে কোন সহজ কাজও করতে পারে না। যেমন পারে না তাদেরকে সামান্য সাহায্য করতেও। আর (শুধু তাই নয়,) তারা নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারে না। তাদের উপর যদি কোন দুর্ঘটনা এসে উপস্থিত হয়, (সেগুলোকে যদি কেউ ভেঙ্গে-চুরে দিতে আরম্ভ করে) এবং (এমনকি) তোমরা যদি কোন কথা শোনার জন্য তাদেরকে আহ্বান কর, তবে তারা তোমাদের আহ্বানে (সাড়া দিতেও) এগিয়ে আসতে পারে না। (এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমত এই যে, তোমরা যদি তাদেরকে কোন বিষয় বাতলে দিতে বল, তবে তারা তা বাতলে দিতে পারে না। আর দ্বিতীয়ত তোমরা যদি তাদেরকে ডাক যে, এসো আমরাই তোমাদের কিছু বলে দিই, তাহলে তারা তোমাদের সে ডাকে সাড়া দেয় না। অর্থাৎ তোমাদের কথামত কাজ করতে পারে না। সে যা হোক, যখন তারা শোনে না, তখন) তাদেরকে ডাকা অথবা চুপ করে থাকা তোমাদের পক্ষে দুই-ই সমান। (চুপ করে থাকার ক্ষেত্রে শোনার তো প্রশ্নই ওঠে না। সারমর্ম হলো এই যে, কোন কথা বলার জন্য ডাকলে তা শুনে নেয়ার মত এমন সহজ কাজটিও যখন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তখন এর চাইতে কঠিন কাজ আত্মরক্ষা কিংবা তার চেয়েও কঠিন কাজ অন্যের সাহায্য করা অথবা আরও কঠিন কোন কিছু সৃষ্টি করার মত কাজ করা তো কিছুতেই সম্ভব নয়। এরা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। কাজেই এহেন অক্ষম কোন বস্তু কেমন করে উপাস্য হতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে, যা তারা নবী-রাসূলদের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তাঁরা গায়েবী বিষয়েও অবগত রয়েছে। তাঁদের জ্ঞানও আল্লাহর মতই সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁরা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান কিংবা যার জন্য ইচ্ছা অকল্যাণ করার ক্ষমতাও তাদেরই হাতে।

এ বিশ্বাসের দরুনই তারা রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট কিয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখ জানতে চাইত। এ বিষয়ের আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

এ আয়াতে তাদের এই শিরকী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইল্মে গায়েব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইল্ম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফেরেশতাই হোক আর নবী রাসূলগণই হোক, শিরকী এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শিরকী। বস্তুত এই শিরকী বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডন করার জন্যই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলে মকবুল (সা)-এর আবির্ভাব ঘটেছে।

কোরআনে করীম তার অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে, ইলমে-গায়েব এবং ব্যাপক জ্ঞান, যে জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা; অর্থাৎ যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-লোকসান সবই যার অন্তর্ভুক্ত তাও আল্লাহর একক গুণ। এতে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শির্ক।

এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নই, অন্যের লাভ-ক্ষতি তো দূরের কথা।

এভাবে তিনি যেন এ কথাও ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে-গায়েব নই যে, যাবতীয় বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়েবী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনও কোন ক্ষতি আমার ধারে কাছে পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রাসূলে করীম (সা) আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেন নি। তাছাড়া বহু দুঃখকষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হুযূর (সা) এহরাম বেঁধে সাহাবায়ে-কিরামের সাথে ওমরা করার উদ্দেশ্যে হেরেমের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হেরেম শরীফে প্রবেশ কিংবা ওমরা করা তখনও সম্ভব হতে পারেনি, সবাইকে এহরাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে।

তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সা) আহত হন এবং মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী (সা)-এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

আর এমনসব ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয়তো এই ছিল, যাতে মানুষের সামনে কার্যত এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া যায় যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি, কিন্তু তবুও তাঁরা খোদায়ী জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী নন। এভাবে সুস্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যও এই, যাতে মানুষ এমন কোন বিভ্রান্তিতে পতিত না হয় যে, নবী-রাসূলরা আল্লাহর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী। যেমন, ইহুদী-খৃস্টানরা এমনিভাবে নিজেদের রাসূলদের সম্পর্কে আল্লাহর গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার বিশ্বাস করে শির্ক ও কুফরে পতিত হয়েছিল।

এ আয়াত এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবী-রাসূলরা সর্বশক্তিমানও নন এবং ইল্‌মে-গায়েবেরও মালিক নন, বরং তাঁরা জ্ঞান ও কুদরতের ততটুকুরই অধিকারী হয়েছিলেন, যতটা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দান করেছিলেন। অবশ্য এতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তাঁদেরকে জ্ঞানের যতটা অংশ দান করা হয়েছে, তা সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিগত জ্ঞানের চাইতেও বহু বেশি। বিশেষ করে আমাদের রাসূলে করীম (সা)-কে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত নবী-রাসূলের যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে সে সমুদয় এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশি জ্ঞান দান করা হয়েছিল। আর এই দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত-সহস্র গোপন বা সাধারণভাবে অজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যার সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে পারে যে, রাসূলে করীম (সা)-কে লক্ষ লক্ষ গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কিন্তু একে কোরআনের পরিভাষায় ইলমে গায়েব বলা হয় না, কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জ্ঞানকে ইলমে-গায়েব বলা যেতে পারে না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ মহানবী (সা) যেন এ ঘোষণাও করে দেন যে, আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব হলো অসৎকর্মীদের আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদের মহা-দানের সুসংবাদ শোনানো।

দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের সর্ববৃহৎ মৌলিক বিশ্বাস, তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের কথা আলোচিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গেই এসেছে শিরকের অযৌক্তিকতা ও অসারতার বিস্তারিত বিবরণ।

আয়াতের প্রারম্ভে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন স্বীয় অসীম ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শন হযরত আদম ও হাওয়ার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا অর্থাৎ এটা আল্লাহ তা'আলারই কুদরত, যিনি সমস্ত আদম সন্তানকে একটিমাত্র সত্তা আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রী হাওয়াকেও। যার উদ্দেশ্য ছিল, হযরত আদম যেন সমপর্যায়ের সঙ্গিনীর মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'আলার এই আশ্চর্য সৃষ্টির দাবি ছিল, যাতে আদম সন্তানরা সবসময় তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে এবং কোন সৃষ্টিকেই যেন তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীতে অংশীদার

সাব্যস্ত না করে। কিন্তু গাফিল মানবজাতি করেছে তার বিপরীত। তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্য এবং তার পরবর্তী আয়াতে। বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۔ فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔

অর্থাৎ আদম সন্তানরা নিজেদের গাফলতি ও অকৃতজ্ঞতার দরুন এ বিষয়ে এমন কাজ করেছে যে, যখন নারী-পুরুষের সংমিলনের ফলে গর্ভসঞ্চারিত হয়েছে, তখন প্রথম দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত গর্ভের কোন বোঝা অনুভূত হয়নি, ততক্ষণ নারী একান্ত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ যখন তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সে গর্ভের পরিচর্যার ব্যবস্থা করে তাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তার বোঝা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে, তখন পিতা-মাতা উভয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে এবং শংকা অনুভব করতে শুরু করেছে যে, এ গর্ভ থেকে না জানি কেমন সন্তানের জন্ম হবে! কারণ কোন কোন সময় মানুষের পেট থেকে অদ্ভুত ধরনের সৃষ্টিরও জন্ম হতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হয়। এই আশংকার কারণে পিতামাতা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে, ইয়া পরওয়ারদিগার, আমাদের সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ, অবিকলাঙ্গ সন্তান দান কর। সঠিক ও পরিপূর্ণ সন্তান হলে আমরা কৃতজ্ঞ হবো।

কিন্তু আল্লাহ্ যখন তাদের দোয়া কবুল করে নিয়ে পরিপূর্ণ, অবিকলাঙ্গ সন্তান দান করলেন, তখন কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এই সন্তানই হলো তাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ। আর এই লিপ্ততা বিভিন্নভাবেই হতে পারে। কখনও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় এবং মনে করে বসে যে, এ সন্তান কোন ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিই দান করেছেন। কখনও এ শিশুকে কোন জীবিত বা মৃত ওলী-দরবেশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে তার নামে নযর-নিয়ায দিতে শুরু করে কিংবা শিশুকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে তার মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে দেয় (যাকে ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা হয়)। আবার কখনও শিশুর নাম রাখতে গিয়ে শিরকী পদ্ধতি অবলম্বন করে—আবদু, আবদুল ওয্যা, আবদে শামস কিংবা বন্দে আলী প্রভৃতি নাম রেখে দেয়, যাতে বোঝা যায় যে, এ সন্তান আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে সে দেব-দেবী কিংবা দরবেশ-সন্ন্যাসীদের সৃষ্ট বান্দা বা দাস। এ সবই হলো, শিরকী বিশ্বাস ও কাজ, যা আল্লাহর দানের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতারই বিভিন্ন রূপ।

তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে এহেন লোকদের বিপথগামিতা ও পথভ্রষ্টতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ তারা যে শিরক অবলম্বন করেছে, তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র।

উল্লিখিত আয়াতের এ তফসীর বা বিশ্লেষণের দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে হযরত আদম ও হাওয়ার উল্লেখ করে আদম সন্তানদের তাঁর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর পরবর্তী বাক্যগুলোতে পরবর্তীকালে আগত আদম সন্তানদের পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বনের পরিবর্তে শিরক বা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, শিরক অবলম্বনকারীদের বিষয়টি আদম কিংবা হাওয়ার সঙ্গে আদৌ সম্পর্কযুক্ত নয়, যার ফলে হযরত আদম (আ)-এর পবিত্রতা সম্পর্কে কোন সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। বরং তার সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবেই আগত বংশধরদের কার্যকলাপের সাথে। এ প্রসঙ্গে আমরা যা ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি, তফসীরে দুররে মনসুরেও হযরত ইবনে মুন্যির ও ইবনে আবী হাতেম (র)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মুফাস্সিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাই উদ্ধৃত রয়েছে।

তিরমিযী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে শয়তান কর্তৃক হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে ধোঁকা দেয়া বা প্রতারণা করার যে কাহিনী বর্ণিত রয়েছে, কোন কোন মনীষী তাকে ইসরাঈলী মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করে ও সেগুলোকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু অনেক মুহাদ্দিস্ সেগুলোকে অনুমোদনও করেছেন। আলোচ্য তফসীর প্রসঙ্গে যদি সেগুলোকে সত্য বলে ধরে নেয়া যায়, তাতেও আয়াতের তফসীরে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

যা হোক, এ আয়াত থেকে কয়েকটি বিধান ও জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়—

প্রথমত এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষের জোড়াকে একই উপাদানে তৈরি করেছেন, যাতে তাদের মধ্যে স্বভাবগত সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি সাধিত হতে পারে এবং বৈবাহিক জীবনের সাথে সাথে বিশ্ব গঠনের যে স্বার্থ জড়িত তাও যেন যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হয়।

দ্বিতীয়ত বৈবাহিক বা দাম্পত্য জীবনের যে সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর উপর আরোপিত হয়, সে সবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো শান্তি লাভ। পৃথিবীর আধুনিক সামাজিকতা ও প্রথা-প্রচলনের যেসব বিষয় মানসিক স্বস্তিকে ধ্বংস করে দেয়, সেগুলো বৈবাহিক সম্পর্কের জাতশত্রু। তাছাড়া বর্তমান সভ্য পৃথিবীতে সাধারণত বৈষয়িক জীবনে যেসব তিক্ততা পরিলক্ষিত হয় এবং চারদিকে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের যে ছড়াছড়ি দেখা যায়, তার সবচাইতে বড় কারণ হচ্ছে এই যে, বর্তমানে সমাজে সাধারণত এমন কিছু বিষয়কে কল্যাণকর মনে করে নেয়া হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে জীবনে শান্তি ও স্বস্তিকে বরবাদ করে দেয়। নারী স্বাধীনতার নামে তাদের বেপর্দা চলাফেরাও যে বিশ্বময় লজ্জাহীনতার ঝড় উঠেছে, দাম্পত্য জীবনের শান্তিকে ধ্বংস করার কাজে তার বিপুল দখল রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারী সমাজের মাঝে পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতার মত দ্রুত ব্যাপ্তি ঘটছে, সে গতিতেই বৈষয়িক শান্তিও তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত, সন্তান-সন্ততির এমন ধরনের নামকরণ করা, যাতে শির্কী অর্থ নেয়া যায়। নামকরণকারীদের তেমন উদ্দেশ্য না থাকলেও তা শিরকী প্রথা হওয়ার কারণে মহাপাপ। যেমন, আবদে শাম্স (সূর্য দাস), আবদুল ওয্যা প্রভৃতি নাম রাখা।

চতুর্থত, সন্তানদের নাম রাখার ক্ষেত্রেও কৃতজ্ঞতাসূচক পন্থা হলো, আল্লাহ ও রাসূলের নামের সাথে যুক্ত করে নাম রাখা। সে কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্, আবদুর রহমান প্রভৃতি নাম পছন্দ করেছেন।

পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীং মুসলমানদের মধ্য থেকেও এই রীতি-পদ্ধতি শেষ হয়ে যাচ্ছে। একে তো অনৈসলামিক নাম রাখা হয়ই, তদুপরি দৈবাৎ কোন পিতামাতা ইসলামী নাম

রাখলেও সেগুলোতে কোন ইংরেজি বর্ণ যোগে সংক্ষেপিত করে তার স্বকীয়তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আকার-আকৃতি দেখে একজনকে মুসলমান বলে মনে করার বিষয়টি তো ইতিপূর্বেই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল, নামের এই নয়া পদ্ধতির প্রচলন হওয়ায় মুসলমানিত্বের বাদবাকি লক্ষণটিও বিদায় হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের দীনের জ্ঞান এবং ইসলামের মহব্বত দান করুন।—আমীন।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا
أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾
إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾
وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

(১৯৪) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। অতএব তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত–যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক ? (১৯৫) তাদের কি পা আছে, যদ্দারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যদ্দারা তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে যদ্দারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যদ্দারা তারা শুনতে পায় ? বলে দাও তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদের, অতঃপর আমার অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। (১৯৬) আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। (১৯৭) আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে, যাদেরকে ডাক—তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। (১৯৮) আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহবান কর তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদেরকে দেখছই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যা হোক, বস্তুতই) তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করছ, তারাও তোমাদেরই মত (আল্লাহর অধিকারভুক্ত) গোলাম (অর্থাৎ তোমাদের চেয়ে বড় বা বিশেষ কিছু নয়; বরং নিকৃষ্টও হতে পারে।) কাজেই (আমরা তোমাদের তখনই সত্যবাদী বলে মেনে নেব) যখন তোমরা তাদের ডাকবে, অতঃপর তোমাদের প্রার্থনা অনুযায়ী তারাও তোমাদের কার্য সম্পাদন করে দেবে। যদি তোমরা (তাদেরকে প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করার ব্যাপারে) সত্য হয়ে থাক। (পক্ষান্তরে তারা তোমাদের আবেদন কি পূরণ করবে? কথা বা দাবি পূরণ করার জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন, তাও যে তাদের নেই। দেখেই নাও) তাদের কি কোন পা আছে, যাতে করে তারা চলতে পারে? কিংবা তাদের কি কোন হাত আছে, যাতে তারা কোন জিনিস ধরতে পারে? অথবা তাদের কি চোখ আছে, যাতে তারা দেখবে? কিংবা তাদের কি কোন কান আছে, যাতে তারা শুনবে? (তাদের মধ্যে যখন কোন কারিকাশক্তিই নেই, তখন তাদের দ্বারা কোন কাজ কেমন করে সংঘটিত হবে? আর) আপনি (এ কথাও) বলে দিন যে, (যেভাবে তারা নিজের ভক্তবৃন্দের কোন প্রকার উপকার সাধনে অপারক, তেমনিভাবে তারা নিজেদের বিরোধীদের ক্ষতিসাধনেও অপারক—যেমন তোমরা বলে থাক যে, "আমাদের দেব-দেবীদের বেআদবি করো না, তাহলে তারা তোমাদের উপর কোন অকল্যাণ অবতীর্ণ করবে।" এ বিষয়টি 'লুবাব' গ্রন্থে يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুর রায্যাক থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর যদি তোমরা মনে কর যে, এরা আমার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, তাহলে) তোমরা (তোমাদের বাসনা চরিতার্থ কর এবং) নিজেদের সমস্ত শরীকদের ডেকে আন (এবং) অতঃপর সবাই মিলে আমার ক্ষতিসাধনের চেষ্টা-তদবীর কর। তারপর (যখন তোমাদের সে প্রচেষ্টা সম্পাদিত হবে, তখন) আর আমাকে মুহূর্তের অবকাশও দিও না, (বরং সাথে সাথে আমার উপর তা বাস্তবায়িত করো ঃ দেখি তাতে কি হয়। বস্তুত ছাইও হবে না। কারণ সেসব শরীক বা অংশীদার তো একেবারেই বেকার। অবশ্য তোমরা যারা হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পার; তোমরাও আমার কিছুই করতে পারবে না এ জন্য যে,) নিশ্চিত আমার সহায় হলেন আল্লাহ তা'আলা। (তাঁর প্রকাশ্য সহায়-সঙ্গী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি আমার উপর) এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন (যা অতি পবিত্র এবং ইহ-পরকালের জন্য ব্যাপক। তাছাড়া তিনি যদি আমার সহায়-সঙ্গীই না হবেন, তবে এমন মহান নিয়ামত কেন দান করবেন!) আর (এই বিশেষ প্রমাণ ছাড়াও একটি সাধারণ নিয়মও রয়েছে যাতে তাঁর সাহায্যকারী হওয়া বোঝা যায়। তা হলো এই যে,) তিনি (সাধারণত) সৎকর্মশীল বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন। (বস্তুত নবী-রাসূলরা হচ্ছেন নেক বান্দাদের মধ্যে পরিপূর্ণ পুরুষ। আর আমিও যখন একজন নবী, তখন আমাকেও অবশ্যই তিনি সাহায্য করবেন।

সুতরাং সারকথা হলো এই যে, তোমরা আমাকে যাদের অমঙ্গলের ভয়-দেখাও তারা হলো অক্ষম। আর যিনি আমাকে যাবতীয় অকল্যাণ-অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন তিনি হলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই আশংকা কিসের?) আর (তাদের অক্ষমতা যথার্থভাবে প্রমাণিত হলেও যেহেতু সে ক্ষেত্রে অক্ষমতা বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং সেখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর অধিকারকে খণ্ডন করা, কাজেই পরবর্তীতে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই

অক্ষমতার বর্ণনা করেছেন যে,) তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের (উপাস্য সাব্যস্ত করে) উপাসনা করছ তারা (তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায়–যেমন আমি রয়েছি) তোমাদের কোনই সাহায্য করতে পারবে না এবং তাদের (নিজেদের জন্য আমার মত শত্রুর মুকাবিলায়) নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারবে না। (সাহায্য করা তো অনেক বড় কথা,) তাদের যদি কোন বিষয় বলার জন্য আহবান করা হয়, তবে তাও তারা শুনতে পারবে না। (এর অর্থও দু'রকম হতে পারে।) আর (তাদের কাছে যেমন শোনার উপকরণ নেই, তেমনি নেই দেখার উপকরণও। তবে তাদের মূর্তি নির্মাণ করতে গিয়ে যে চোখ বানিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলো হলো নামের চোখ, কাজের নয়। অতএব) সে মূর্তিগুলোকে আপনি যখন দেখেন, তখন মনে হবে, যেন তারাও আপনাকে দেখছে। (কারণ সেগুলোর আকার যে চোখেরই মত হয়ে থাকে।) কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তারা কিছুই দেখে না (কাজেই এহেন অক্ষমের ভয় কি দেখাও)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ وَلِيِّـۦَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ - وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ.

এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী, সাহায্যকারী। আর 'কিতাব' অর্থ কোরআন। 'সালেহীন' অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ভাষায় সেই সমস্ত লোক, যাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে সমান করে না। এতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় আমার এ কারণে নেই যে, আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ, যিনি আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত গুণের মধ্যে বিশেষভাবে কোরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদের কোরআনের শিক্ষা দিই এবং কোরআনের প্রতি আহবান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কোরআন নাযিল করেছেন, তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আমার কি চিন্তা?

অতঃপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলদের মর্যাদা তো বহু ঊর্ধ্বে, সাধারণ সৎ মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য করেন বলেই কোন শত্রুর শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করে দেয়া হয়। আর যদি কখনও কোন বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। কারণ সৎকর্মশীল মু'মিনের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি কোন কারণে পার্থিব জীবনে অকৃতকার্যও হন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। বস্তুত এটাই হলো সত্যিকার কৃতকার্যতা।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

(১৯৯) আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাক। (২০০) আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (২০১) যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। (২০২) পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে) সাধারণ দৃষ্টিতে (তাদের আমল-আখলাকের মধ্যে) যে আচরণ (যুক্তিসঙ্গত ও সঙ্গত বলে মনে হয়, সেগুলো) গ্রহণ করে নেবেন। (সেগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব-তথ্য অনুসন্ধান করতে যাবেন না। বরং বাহ্যিক ও সাধারণ দৃষ্টিতে কারও পক্ষ থেকে ভাল কোন কাজ অনুষ্ঠিত হলে তাকে কল্যাণকর বলেই আখ্যায়িত করুন। আর আভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন। কারণ সত্যিকার নিঃস্বার্থতা এবং তদুপরি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার যাবতীয় শর্ত পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারা অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপার। সারকথা হলো এই যে, সামাজিক আচার-আচরণের ব্যাপারে সহজ হোন, কড়াকড়ি করবেন না। এ সমস্ত আচার-আচরণ তো গেল ভাল ও সৎকাজের ব্যাপারে।) আর (যেসব কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতেও মন্দ, সেগুলোর ব্যাপারে আপনার আচরণ হবে এই যে,) আপনি সৎকাজের শিক্ষা দিয়ে দেবেন (এবং কঠিনভাবে সেগুলোর পেছনে পড়বেন না।) আর যদি (কখনও ঘটনাচক্রে তাদের মূর্খতার দরুন) শয়তানের পক্ষ থেকে আপনার মনে (রাগ করার) প্ররোচনা আসতে আরম্ভ করে (যাতে কল্যাণবিরুদ্ধ কোন কথা বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে,) তবে (এমতাবস্থায় সাথে সাথে) আল্লাহর শরণাপন্ন হবেন। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী এবং যথেষ্ট পরিমাণে অবগত। (তিনি আপনার শরণবিষয়ক প্রার্থনা শোনেন, আপনার উদ্দেশ্যের বিষয় জানেন। তিনি আপনাকে তা থেকে আশ্রয় দান করবেন এবং শরণাপন্ন হওয়া ও তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা যেমন আপনার জন্য কল্যাণকর তেমনিভাবে সমস্ত আল্লাহভীরু লোকদের জন্যও তা কল্যাণকর। সুতরাং এ কথা একান্ত) নিশ্চিত যে, যে সমস্ত লোক আল্লাহভীরু তাদের

জন্য (রাগ-রোষ কিংবা অন্য কোন বিষয়) যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোন শঙ্কা দেখা দেয়, তখন (সঙ্গে সঙ্গে) তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করতে আরম্ভ করে। যেমন আশ্রয় প্রার্থনা, দোয়া করা, আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব, তাঁর আযাব ও সওয়াব প্রভৃতির স্মরণ করা। সুতরাং সহসাই তাদের দৃষ্টি খুলে যায় (এবং বিষয়ের তাৎপর্য তাদের সামনে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে, যার ফলে সে আশঙ্কা কার্যকর হতে পারে না।) আর (এরই বিপরীতে যারা শয়তানের দোসর সে (অর্থাৎ, শয়তান) তাদেরকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার প্রতি টানতে থাকে, আর তারা (এই পথভ্রষ্টতার অনুগমন) থেকে ফিরে আসতে পারে না। (না তারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে, না নিরাপদ থাকতে পারে। কাজেই এই মুশরিকরা যখন শয়তানের অনুগত, তখন কেমন করে এরা ফিরে আসবে ? সুতরাং তাদের প্রতি রাগান্বিত হওয়া নিরর্থক)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনী চরিত্রের একটি ব্যাপক হিদায়েতনামা ঃ আলোচ্য আয়াতগুলো কোরআনী চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও ব্যাপক হিদায়েতনামাস্বরূপ। এর মাধ্যমে রাসূলে করীম (সা)-কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে 'মহান চরিত্রবান' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চালচলন, হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এই আয়াতগুলোতে তার বিপরীতে মহানবী (সা)-কে সর্বোত্তম চরিত্রের হিদায়েত দেওয়া হয়েছে। তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য خُذِ الْعَفْوَ। আরবী অভিধান মোতাবেক عَفْوٌ (আফ্‌বুন)-এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সবক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তফসীরবিদ আলিমদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তা হলো এই যে, عَفْوٌ বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে ! অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবি করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন, নামাযের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবারে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাযীর মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব, এ আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না। বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে, তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত—যাকাত, রোযা, হজ্ব এবং সাধারণ আচার-আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ

যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে।

সহীহ্ বুখারী শরীফেও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর (রা)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে উল্লেখিত আয়াতের এই অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াতটি নাযিল হলে হুযূর (সা) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবূল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব।–(ইবনে কাসীর)

তফসীরশাস্ত্রের ইমামদের এক বিরাট জামাত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লেখিত অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

عَفْو -এর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। তফসীরকার আলিমদের একদল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে জরীর (র) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন মহানবী (সা) হযরত জিবরাঈল আমীনকে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী (সা)-কে জানান যে, এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে [অর্থাৎ হুযূর (সা)-কে] নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়াহ্ (র) সা'দ উবাদাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, গয্ওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন হুযূর (সা)-এর চাচা হযরত হামযা (রা)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী (সা) লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযা (রা)-র সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে হুযূর (সা)-কে বাতলে দেয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

এ বিষয়ের সমর্থন সে হাদীসেও পাওয়া যায়, যাতে ইমাম আহমদ উকবাহ্ (র) ইবনে আমের (রা)-এর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তাঁদেরকে অর্থাৎ সাহাবীদের মহানবী (সা) যে মহান চরিত্রের প্রশিক্ষণ দান করেছেন তা ছিল এই যে, তোমরা সে লোককে ক্ষমা করে দাও, যে তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, যে লোক তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তোমরা তার সাথে মেলামেশা করতে থাক এবং যে লোক তোমাদের বঞ্চিত করে, তাকে দান-খয়রাত কর।

হযরত আলী (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে ইমাম বায়হাকী (র) উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের স্বভাবচরিত্র অপেক্ষা উত্তম স্বভাব ও চরিত্রের শিক্ষা দিচ্ছি। তা হলো এই, যে লোক তোমাদের বঞ্চিত করে, তোমরা তাকে দান কর, যে লোক তোমাদের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন করে, তোমরা তাকে ক্ষমা করে দাও; যে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তোমরা তার সাথে মেলামেশা কর।

عَفْوٌ শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে যদিও পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয় অর্থের মূল বক্তব্যই এক। তাহলো এই যে, মানুষের হালকা ও অগভীর আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারীকেই গ্রহণ করে নিন; অধিকতর যাচাই-অনুসন্ধানের পেছনে পড়বেন না এবং তাদের কাছ থেকে অতি উচ্চস্তরের আনুগত্যও কামনা করবেন না। তাছাড়া তাদের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিন। অত্যাচারের প্রতিরোধ অত্যাচারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে যাবেন না। সুতরাং মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম ও মহান স্বভাব সর্বদা এ ছাঁচেই ঢেলে সাজানো ছিল। আর তারই বিকাশ ঘটেছিল সে সময় যখন মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে তাঁর প্রাণের শত্রুরা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে হাযির হয়েছিল। তখন তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিশোধ তো দূরের কথা, আজ আমি তোমাদের বিগত দিনের আচার-ব্যবহারের জন্য তোমাদের ভর্ৎসনাও করছি না।

আলোচ্য হিদায়েতনামার দ্বিতীয় বাক্যটি হলো : وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ مَعْرُوْفٌ ও عُرْفٌ অর্থে বলা হয় যেকোন ভাল ও প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়, বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

তৃতীয় বাক্যটি হলো وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -এর অর্থ হলো এই যে, যারা জাহেল বা মূর্খ তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না; বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খজনোচিত কথাবার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মত ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হিদায়েতও বর্জন করতে হবে। কারণ এটা রিসালত ও নবুয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

সহীহ্ বুখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা হলো এই যে, হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফত আমলে উয়ায়নাহ্ ইবনে হিসন একবার মদীনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের

মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়েস ছিলেন সেই সমস্ত বিজ্ঞ আলিমের একজন, যাঁরা হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়ায়নাহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুরকে বলল, তুমি তো আমীরুল মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে কায়েস (রা) ফারূকে আযম (রা)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়ায়নাহ্ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু উয়ায়নাহ্ ফারূকে আযম (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যে, "আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।" হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে কায়েস নিবেদন করলেন, ইয়া আমরিল মু'মিনীন, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ "আর এ লোকটিও জাহিলদের একজন।" এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছুই বললেন না। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি ছিল كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ।

যা হোক, এ আয়াতটি বলিষ্ঠ ও সচ্চারিত্রিকতা সম্পর্কে একটি অতি ব্যাপক আয়াত। কোন কোন আলিম এর সারমর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষ দু'রকম। (এক) সৎকর্মশীল এবং (দুই) অসৎকর্মশীল। এই আয়াত উভয় শ্রেণীর সাথেই সদ্ব্যবহার করার হিদায়েত দিয়েছে যে, যারা নেক কাজ করে, তাদের বাহ্যিক নেকীকে কবুল করে নাও, তাদের ব্যাপারে বেশি তদন্ত অনুসন্ধান করতে যেও না কিংবা অতি উচ্চমানের সৎকর্ম তাদের কাছে দাবি করো না; বরং যতটুকু সৎকর্ম তারা সহজভাবে করতে পারে, তাকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করো। আর যারা বদ্‌কার বা অসৎকর্মী তাদের ব্যাপারে এ আয়াতের হিদায়েত হলো এই যে, তাদেরকে সৎকাজের শিক্ষাদান কর এবং কল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে থাক। যদি তারা তা গ্রহণ না করে নিজেদের গোমরাহী ও ভ্রান্তিতে আঁকড়ে থাকে এবং মূর্খজনোচিত কথাবার্তা বলতে থাকে, তবে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং তাদের সেসব মূর্খতাসুলভ কথার কোন উত্তরই দেবে না। এতে হয়তোবা কখনও তাদের চেতনার উদয় হবে এবং নিজেদের ভুল থেকে ফিরে আসতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আপনার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ওয়াস্‌ওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তাহলে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ এতে হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানবপ্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভাল মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সেজন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া

হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবে শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হলো আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'জন লোক মহানবী (সা)-এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থা দেখে হুযূর (সা) বললেন, 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হলো এই ঃ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ। সে লোক হুযূর (সা)-এর কাছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল।

বিস্ময়কর উপকারিতা

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (র) এ প্রসঙ্গে এক আশ্চর্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। তা হলো এই যে, সমগ্র কোরআন মজীদে বলিষ্ঠ ও উচ্চতর চারিত্রিক শিক্ষাদানকল্পে তিনটি ব্যাপকভিত্তিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ তিনটির শেষেই শয়তান থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পানাহ্ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার একটি হলো, সূরা আ'রাফের আলোচ্য আয়াত, দ্বিতীয়টি সূরা মু'মিনুনের আয়াত ঃ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ অর্থাৎ "অকল্যাণকে কল্যাণের দ্বারা প্রতিহত কর। আমি ভাল করেই জানি, যা কিছু তারা বলে থাকে। আর আপনি এভাবে দোয়া করুন যে, হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি আপনার নিকট শয়তানের প্ররোচনার চাপ থেকে আশ্রয় কামনা করি। আর হে আমার পালনকর্তা, শয়তান আমার নিকট আসবে—আমি এ ব্যাপারেও আপনার নিকট পানাহ্ চাই।"

তৃতীয় সূরা হা-মীম-সাজ্দার আয়াত ঃ

وَلَاتَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ - اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ. وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ - وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

অর্থাৎ নেকী আর বদী, ভাল ও মন্দ সমান হয় না। আপনি নেকীর মাধ্যমে বদী প্রতিহত করুন। তাহলে আপনার মধ্যে এবং যে লোকের মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান সহসাই সে এমন হয়ে যাবে, যেমন হয় একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এ বিষয়টি সে সমস্ত লোকের ভাগ্যেই জোটে, যারা একান্ত স্থিরচিত্ত হয়ে থাকে এবং বিষয়টি যারই ভাগ্যে জোটে সে লোক বড়ই ভাগ্যবান। আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনার মনে কোন রকম সংশয় বা ওয়াস্ওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তবে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নিন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা এবং অত্যন্ত জ্ঞানী।

এই তিনটি আয়াতেই সেসব লোকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং মন্দের বিনিময় কল্যাণের মাধ্যমে দেয়ার হিদায়েত দেয়া হয়েছে, যাদের আচরণ রাগের সঞ্চার করে। আর সাথে সাথে

শয়তানের প্রতারণা থেকে পানাহ্ চাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ঝগড়া-বিবাদের সাথে শয়তানেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেখানেই বিবাদ-বিসংবাদের সুযোগ দেখা দেয়, শয়তান সে স্থানটিকে নিজের রণক্ষেত্র বানিয়ে নেয় এবং বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককেও ক্রোধান্বিত করে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত করতে প্রয়াস পায়।

এর প্রতিকার এই যে, যখন দেখবে—রাগ প্রশমিত হচ্ছে না, তখন বুঝবে শয়তান আমার উপর জয়ী হয়ে যাচ্ছে এবং তখনই আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে তাঁর কাছে পানাহ্ চাইবে। তবেই চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জিত হবে। সে জন্যই পরবর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে শয়তান থেকে পানাহ্ চাওয়ার হিদায়েত দেওয়া হয়েছে।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

(২০৩) আর যখন আপনি তাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে না যান, তখন তারা বলে, আপনি নিজের পক্ষ থেকে কেন অমুকটি নিয়ে আসলেন না, তখন আপনি বলে দিন আমি তো সে মতেই চলি যে হুকুম আমার নিকট আসে আমার পরওয়ারদিগারের কাছ থেকে। এটা ভাববার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে এবং হিদায়েত ও রহমত সেই সব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে। (২০৪) আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন আপনি (তাদের শত্রুতাসুলভ ফরমায়েশী মু'জিযাসমূহের মধ্য থেকে) কোন মু'জিযা তাদের সামনে প্রকাশ করেন না (এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে সে মু'জিযা সৃষ্টিই করেন নি) তখন তারা (রিসালতকে অস্বীকার করার মানসে আপনাকে) বলে যে, আপনি (যদি নবীই হয়ে থাকেন, তবে) অমুক অমুক মু'জিযা (প্রকাশ করার জন্য) কেন নিয়ে এলেন না! আপনি বলে দিন, (নিজের ইচ্ছায় কোন মু'জিযা নিয়ে আসাটা আমার কাজ নয়। বরং আমার প্রকৃত কাজ হলো এই যে,) আমি তারই অনুসরণ করি যা আমার উপর আমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। (এতে তবলীগও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য মু'জিযা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কাজেই তার আগমনও ঘটেছে। বস্তুত এগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় একটি মু'জিযা হলো স্বয়ং এই কোরআন, যার গৌরব এই যে,) এটা (নিজেই যেন) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বহু দলীলস্বরূপ। (কারণ, প্রতিটি সূরা পরিমাণ অংশই একেকটা মু'জিযা। কাজেই এই হিসাবে সমগ্র কোরআন যে বহু দলীল তা একান্ত যুক্তিসঙ্গত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।) আর (এর বাস্তব ও

কার্যকর উপকারিতা হলো বিশেষভাবে তাদের জন্য যারা একে মানে। সুতরাং এটা) হিদায়েত ও রহমত প্রাপ্ত সেই সমস্ত লোকের জন্য যারা (এর উপর) ঈমান এনেছে। আর (আপনি তাদেরকে এ কথাও বলে দিন,) যখন কোরআন পাঠ করা হয় [উদাহরণত রাসূলে করীম (সা) যখন এর তবলীগ বা প্রচার করেন], তখন তার প্রতি কান লাগিয়ে রাখ এবং নীরব থাক (যাতে এর মু'জিযা হওয়ার বিষয়টি এবং এর শিক্ষাকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পার—), তাহলেই আশা করা যায়, তোমাদের উপর (নতুন নতুন ও অধিক পরিমাণে) রহমত বর্ষিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-এর সত্য রাসূল হওয়ার প্রমাণ এবং এর বিরোধীদের সন্দেহের উত্তর প্রদান করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের কয়েকটি হুকুম-আহকামেরও আলোচনা করা হয়েছে।

রিসালত বা নবুয়ত প্রমাণ করার লক্ষ্যে সমস্ত নবী-রাসূলকেই মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল। সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও একই কারণে মু'জিযা দেওয়া হয়েছে এবং অধিক পরিমাণে দেয়া হয়েছে, যা বিগত নবী ও রাসূলদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ও উৎকৃষ্ট।

রাসূলে করীম (সা)-এর যেসব মু'জিযা কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত সেগুলোর সংখ্যাও বিপুল; আলিমরা এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র) রচিত 'খাসায়েসে কুবরা' এ বিষয়ের উপর রচিত বিরাট দুই খণ্ডের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

কিন্তু রাসূলে করীম (সা)-এর অসংখ্য মু'জিযা মানুষের সামনে আসা সত্ত্বেও বিরোধীরা নিজেদের জেদ ও হঠকারিতাবশত নিজের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে নতুন নতুন মু'জিযা দেখাবার দাবি জানাতে থাকে। আলোচ্য সূরার প্রথমদিকেও সে বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে তাদেরকে একটা নীতিগত উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, পয়গম্বরের মু'জিযা হলো তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের একটি সাক্ষ্য ও প্রমাণ। বস্তুত বাদীর দাবি যখন কোন বিশ্বস্ত ও নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষও যখন তার উপর কোন জেরা বা প্রতিবাদ করে না, তখন তাকে পৃথিবীর কোন আদালতই এমন অধিকার দান করে না যে, সে বাদীর নিকট এমন কোন দাবি পেশ করবে যে, অমুক অমুক বিশেষ বিশেষ লোকের সাক্ষী উপস্থিত করলেই আমরা তা মেনে নেব, অন্যথায় নয়। বর্তমান সাক্ষী- প্রমাণের উপর কোন প্রকার জেরা আরোপ ব্যতীত আমরা মেনে নেব না। অতএব বহুবিধ প্রকাশ্য ও প্রকৃষ্ট মু'জিযা প্রত্যক্ষ করার পর বিরোধীদের একথা বলা যে, অমুক প্রকার মু'জিযা যদি দেখাতে পারেন, তবেই আমরা আপনাকে রাসূল বলে মেনে নেব—এটা একান্তই বিদ্বেষমূলক দাবি, যা কোন আদালতই যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারে না।

কাজেই প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন আপনি তাদের নির্ধারিত কোন বিশেষ মু'জিযা না দেখান, তখন তারা আপনার রিসালতকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বলে, আপনি অমুক মু'জিযাটি দেখালেন না কেন। অতএব, আপনি তাদেরকে এ উত্তর দিয়ে দিন যে, নিজের ইচ্ছামত কোন রকম মু'জিযা প্রদর্শন করা আমার কাজ নয়। বরং আমার আসল কাজ হলো সে সমস্ত আহকামের অনুসরণ করা যা আমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে আমার উপর ওহীর

মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, যাতে তবলীগ বা প্রচার-প্রসারও অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আমি আমার আসল কাজেই নিয়োজিত রয়েছি। তাছাড়া রিসালত প্রমাণের জন্য অন্যান্য মু'জিযাও যথেষ্ট, যা তোমরা সবাই স্বচক্ষে দেখেছ। সেগুলো দেখার পর কোন বিশেষ মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করা একটা বিদ্বেষমূলক দাবি বৈ নয়। এটা লক্ষণীয় হতে পারে না।

আর যে সমস্ত মু'জিযা দেখানো হয়েছে, তন্মধ্যে স্বয়ং কোরআন করীম এমন একটি বিরাট মু'জিযা যাতে সমগ্র বিশ্ব-চরাচরকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, আমার মত কিংবা আমার একটি ছোট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে দেখাও। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব প্রচুর সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও তার উদাহরণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটাই প্রমাণ যে, কোরআন কোন মানুষের বাণী নয়; বরং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অনন্য কালাম।

তাই বলা হয়েছে ঃ هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ এই কোরআন তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও মু'জিযার এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহ্র কালাম ; এতে কোন সৃষ্টিরই কোন হাত নেই। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এই কোরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলীল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত ও হিদায়েত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার অবলম্বনও বটে!

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন মু'মিনদের জন্য রহমত। কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এ হুকুমটি কি নামাযের কোরআন পাঠসংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কোরআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কোরআন পাঠের বেলায়; তা নামাযেই হোক অথবা অন্য যেকোন অবস্থায় হোক। অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক। কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল ব্যতীত যেকোন অবস্থায় কোরআন পাঠের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ব্যাপক।

সে কারণেই হানাফী মাযহাবের আলিমরা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় মুকতাদীদের জন্য কিরাআত পড়া বিধেয় নয়। পক্ষান্তরে যেসব ফোকাহা মুক্তাদীদের (ইমামের পেছনে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও) সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বলেছেন যে, ফাতিহা পড়লেও তা ইমামের কিরাআতের ফাঁকে ফাঁকে পড়বে। যা হোক, এটা এই আলোচনার বিষয় নয়। এ প্রসঙ্গে আলিমরা স্বতন্ত্র ছোট-বড় গ্রন্থ লিখে রেখেছেন; এ ব্যাপারে সেগুলো পর্যালোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, কোরআন করীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সে জন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কোরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর কোরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে।

কোরআন পাঠ শ্রবণ করা এবং তার হুকুম-আহকামের উপর আমল করার চেষ্টা করা দুই কান লাগিয়ে রাখার অন্তর্ভুক্ত–(মাযহারী ও কুরতবী)। আয়াত শেষে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআনের রহমত হওয়া উল্লিখিত আদবসমূহের অনুবর্তিতার উপর নির্ভরশীল।

কোরআন তিলাওয়াতের সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি মাসায়েল ঃ একথা একান্তই সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কোরআন-করীমের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তবে সে রহমতের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র গযব ও রোষানলের অধিকারী হবে।

নামাযের মধ্যে কোরআনের দিকে কান লাগানো এবং নিশ্চুপ থাকার বিষয়টি মুসলমান মাত্রেরই জানা রয়েছে। তবে অনেক সময় অমনোযোগিতার কারণে এমনও ঘটে যায় যে, অনেকে একথাও বলতে পারে না যে, ইমাম কোন্ সূরাটি পাঠ করেছেন। তাদের পক্ষে কোরআনের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া এবং শোনার জন্য মনোনিবেশ করা কর্তব্য। জুম'আ কিংবা ঈদের খুতবার হুকুমও তাই। এই আয়াত ছাড়াও রাসূলে করীম (সা) বিশেষ করে খুতবার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন ঃ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ অর্থাৎ ইমাম যখন খুতবার জন্য এসে উপস্থিত হন, তখন না নামায পড়বে, না কোন কথা বলবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তখন কোন লোক অপর কাউকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একথাও বলবে না যে, 'চুপ কর'। (অগত্যা যদি বলতেই হয়, তবে হাতে ইশারা করে দেবে,) যাহোক, খুত্‌বা চলাকালে কোন রকম কথাবার্তা, তস্‌বীহ-তাহলীল, দোয়া-দরূদ কিংবা নামায প্রভৃতি জায়েয নয়।

ফিকাহ্‌বিদরা বলেছেন যে, জুম'আর খুতবার যে হুকুম, ঈদ কিংবা বিয়ে প্রভৃতির খুত্‌বার হুকুমও তাই। অর্থাৎ তখন মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকা ওয়াজিব।

অবশ্যই নামায এবং খুত্‌বা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় কেউ যখন আপন মনে কোরআন তিলাওয়াত করতে থাকে, তখন অন্যদের কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব কি নয়, এ ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মনীষী এমতাবস্থায়ও কান লাগানো এবং নীরব থাকাকে ওয়াজিব বলেছেন; আর এর বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেজন্যই যেসব স্থানে মানুষ নিজ নিজ কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে কিংবা বিশ্রাম করতে থাকে, সেসব জায়গায় কারও পক্ষে সরবে কোরআন পাঠ করাকে তাঁরা অবৈধ বলেছেন এবং যে লোক এমন জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠ করবে, তাকে গোনাহ্‌গার বলেছেন। 'খুলাসাতুল-ফতাওয়া' প্রভৃতি গ্রন্থেও তাই লেখা রয়েছে।

কিন্তু কোন কোন ফকীহ্ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কান লাগানো এবং শোনা শুধুমাত্র সে সমস্ত জায়গায়ই ওয়াজিব, যেখানে শোনাবার উদ্দেশ্যেই কোরআন তিলাওয়াত করা হয় যেমন, নামায ও খুতবা প্রভৃতিতে। আর যদি কোন লোক নিজের ভাবে তিলাওয়াত করতে থাকে, কিংবা কয়েকজন কোন এক স্থানে নিজ নিজ তিলাওয়াতে নিয়োজিত থাকে, তাহলে অন্যের আওয়াজের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব নয়। তার কারণ, সহীহ্ ও বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) রাত্রি বেলায় নামাযে সরবে কোরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আয্‌ওয়াজে মুতাহ্‌হারাত তখন ঘুমোতে থাকতেন। অনেক সময় হুজরার বাইরেও হুযূর (সা)-এর আওয়ায শোনা যেত।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, হযূরে আকরাম (সা) কোন এক সফরের সময় রাতে এক জায়গায় অবস্থান করার পর ভোরে বললেন, আমি আমার আশ্‌আরী সফরসঙ্গীদের তাদের তিলাওয়াতের আওয়াজের দ্বারা রাতের অন্ধকারেও চিনে ফেলেছি যে, তাদের তাঁবুগুলো কোন্ দিকে এবং কোথায় অবস্থিত রয়েছে, যদিও দিনের বেলায় তাদের অবস্থান সম্পর্কে আমার জানা ছিল না।

এ ঘটনায়ও রাসূলে করীম (সা) সেই আশ্‌আরী সঙ্গীদের এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি যে, কেন তোমরা সশব্দে কিরাআত পড়লে ? আর যারা ঘুমোচ্ছিলেন তাদেরও এই হিদায়েত দিলেন না যে, যখন কোরআনের তিলাওয়াত হয় তোমরা সবাই উঠে বসবে এবং তা শুনবে।

এ ধরনের রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে ফোকাহাগণ নামাযের বাইরের তিলাওয়াতের ব্যাপারে কিছুটা অবকাশ রেখেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামাযের বাইরেও যখন কোথাও কোরআন তিলাওয়াত হয় এবং তার আওয়ায আসে, তখন সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকা সবারই মতে উত্তম। সেজন্যই যেখানে মানুষ ঘুমোবে কিংবা নিজেদের কাজকর্মে নিয়োজিত থাকবে, সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয় নয়।

এ আলোচনার দ্বারা সে সমস্ত লোকের ভুল ধরা পড়ছে, যারা কোরআন তিলাওয়াতের সময় এমনসব জায়গায় অথবা ভিড়ে রেডিও খুলে দেয়, যেখানে মানুষ (নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে এবং) তা শোনার প্রতি মনোনিবেশ করে না। তেমনিভাবে রাতের বেলায় লাউড স্পীকার লাগিয়ে মসজিদসমূহে এমনভাবে কোরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নয়, যাতে তার শব্দের দরুন মানুষের ঘুম কিংবা কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র) লিখেছেন, ইমাম যখন নামাযে কিংবা খুতবায় বেহেশত দোযখ সংক্রান্ত কোন বিষয় পড়তে কিংবা বলতে থাকেন, তখন জান্নাত লাভের দোয়া কিংবা দোযখ থেকে মুক্তি কামনা করাও জায়েয নয়। কারণ আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের ওয়াদা সে সমস্ত লোকের জন্যই করেছেন, যারা তিলাওয়াতের সময় নীরব-নিশ্চুপ থাকবে না, এ ওয়াদা তাদের জন্য নয়। অবশ্য নফল নামাযে এ ধরনের আয়াতের তিলাওয়াত শেষে সংগোপনে দোয়া করে নেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সওয়াবের কারণ।—(মাযহারী)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾

(২০৫) আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় প্রতিপালককে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। (২০৬) নিশ্চয় যারা তোমার পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্যে রয়েছেন,

তারা তাঁর বন্দেগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করেন না এবং স্মরণ করেন তাঁর পবিত্র সত্তাকে, আর তাঁকেই সিজদা করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (আপনি সবাইকে এ কথাও বলে দিন যে,) হে মানুষ, স্বীয় পরওয়ারদিগারকে স্মরণ করতে থাক (কোরআন পাঠ কিংবা তস্‌বীহ্‌-তাহ্‌লীলের মাধ্যমে) নিজের মনে, একান্ত বিনয়ের সাথে (সে স্মরণ চাই মনে অর্থাৎ নীরবেই হোক অথবা) চিৎকার অপেক্ষা কম স্বরেই হোক। (এমনি বিনয় ও ভীতির সাথে) সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ নিয়মিতভাবে স্মরণ কর)। আর (নিয়মিতভাবে স্মরণ করার অর্থ এই যে,) শৈথিল্যপরায়ণদের মধ্যে পরিগণিত হবে না (যে, নির্ধারিত ও বিধিবদ্ধ যিকির-আয্‌কারও পরিহার করে থাকবে)। নিশ্চয়ই যে সমস্ত ফেরেশতা তোমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট (সান্নিধ্যপ্রাপ্ত) রয়েছেন, তারা তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে (যার মূল হলো আকীদা বা বিশ্বাস) অহঙ্কার করে না এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে (যা মুখের ইবাদত,) আর তাঁকে সিজদা করে (যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কোরআন মজীদ শোনার এবং তার রীতিনীতি সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। বর্তমান দু'টি আয়াতে অধিকাংশের মতে সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র যিকির এবং তার আদব-কায়দা বা রীতিনীতির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এতে অবশ্য কোরআন তিলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত। আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে আলোচ্য এ আয়াতটি কোরআন তিলাওয়াত সংক্রান্ত এবং এতেও কোরআন তিলাওয়াতের আদব সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কিন্তু এটা কোন মতপার্থক্য নয়। কারণ কোরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্যান্য যিকির-আযকারের বেলায়ও যে এই হুকুম ও আদব রয়েছে এ ব্যাপারে সবাই একমত।

সারকথা, এ আয়াতে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও যিকির-আযকারের বিধি-বিধান এবং সেই সঙ্গে তার সময় ও আদব-কায়দা বাতলে দেয়া হয়েছে।

নীরব ও সরব যিকিরের বিধি-বিধান ঃ যিকিরের প্রথম আদব হলো নিঃশব্দ যিকির কিংবা সশব্দ যিকিরসংক্রান্ত। এ আয়াতে কোরআনে করীম নিঃশব্দ যিকির কিংবা সশব্দ যিকির—দু'রকম যিকিরেরই স্বাধীনতা দিয়েছে। নিঃশব্দ যিকির সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ অর্থাৎ স্বীয় পরওয়ারদিগারকে স্মরণ কর নিজের মনে। এরও দু'টি উপায় রয়েছে। এক. জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহ্‌র 'যাত' (সত্তা) ও গুণাবলীর ধ্যান করবে, যাকে 'যিকিরে ক্বল্‌বী' (আত্মিক যিকির) বা 'তাফাক্কুর' (নিবিষ্ট চিন্তা) বলা হয়। দুই. তৎসঙ্গে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ্ তা'আলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হলো যিকিরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর উপায় যে, যে বিষয়ের যিকির করা হচ্ছে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্যান করবে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ এভাবে অন্তরের সাথে মুখেও যিকিরে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, মুখে কোন অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতে যথেষ্ট সওয়াব রয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর হলো শুধু মুখে মুখে যিকির করা, অন্তরাত্মার তা থেকে বিমুখ থাকা। এমনি যিকির সম্পর্কে

মাওলানা রুমী বলেছেন ঃ

برزبان تسبیح ودردل گاؤخر
این چنین تسبیح کے دارد اثر

অর্থাৎ মুখে মুখে জপতপ, আর অন্তরে গাধা-গরু; এহেন জপতপে কেমন করে আছর হবে।

এতে মাওলানা রুমীর উদ্দেশ্য হলো এই যে, গাফেল মনে যিকির করাতে যিকিরের পরিপূর্ণ ক্রিয়া ও বরকত হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে, এই মৌখিক যিকিরও পুণ্য ও উপকারিতা বিবর্জিত নয়। কারণ অনেক সময় এই মৌখিক যিকিরই আন্তরিক যিকিরের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, মুখে বলতে বলতেই এক সময় মনেও তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া অন্তত একটি অঙ্গ তো যিকিরে নিয়োজিত থাকেই। তাই তাও পুণ্যহীন নয়। অতএব, যিকির-আযকারে যাদের মন বসে না এবং ধ্যানের মাঝে আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রতিফলিত করা যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তারাও এই মৌখিক যিকিরকে নিরর্থক ভেবে পরিহার করবেন না, চালিয়ে যাবেন এবং মনে তার প্রতিফলন ঘটতে চেষ্টা করতে থাকবেন।

দ্বিতীয় যিকিরের পন্থা ঃ এ আয়াতেই বলা হয়েছে ঃ وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ সুউচ্চ স্বরের চাইতে কম স্বরে। অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করবে তার সশব্দ যিকির করারও অধিকার রয়েছে, তবে তার আদব হলো এই যে, অত্যন্ত জোরে চিৎকার করে যিকির করবে না। মাঝামাঝি আওয়াজে করবে যাতে আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য থাকে। অতি উচ্চৈঃস্বরে যিকির বা তিলাওয়াত করাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার উদ্দেশ্যে যিকির করা হচ্ছে, তাঁর মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্‌র সাধারণ যিকিরই হোক, কিংবা কোরআনের তিলাওয়াতই হোক, যখন আওয়াজের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশি উচ্চৈঃস্বরে না হতে পারে।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্‌র যিকির বা কোরআন তিলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমত, আত্মিক যিকির। অর্থাৎ কোরআনের মর্ম এবং যিকিরের কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই যা সীমিত থাকবে, যার সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। দ্বিতীয়ত, যে যিকিরে আত্মার চিন্তা-কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। কিন্তু বেশি উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শুনবে। এ দু'টি পদ্ধতিই আল্লাহ্‌র বাণী وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো অন্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিতি ও ধ্যান করার সাথে সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হলো আওয়াজকে অধিক উচ্চ না করা। মাঝামাঝি সীমার বাইরে যাতে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যিকিরের এ পদ্ধতিটিই وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ আয়াতে শেখানো হয়েছে। কোরআনের আরও একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا— এতে রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কিরাআত পড়তে গিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরেও পড়া না হয় এবং একেবারে মনে মনেও নয়। বরং কিরাআতে যেন মাঝামাঝি আওয়াজ অবলম্বন করা হয়।

নামাযের মাঝে কোরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী (সা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ও হযরত ফারূককে আযম (রা)-কে এ হিদায়েতই দিয়েছেন।

সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রাসূলে করীম (সা) শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি নামায পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে অর্থাৎ শব্দহীনভাবে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি [হুযূর (সা)] সেখান থেকে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করছেন। অতঃপর ভোরে যখন উভয়ে হুযূরে আকরাম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতের বেলায় আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম, আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াযে কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যে সত্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শুনে নিয়েছেন, তাই যথেষ্ট নয় কি ? তেমনিভাবে হযরত ফারূককে আযম (রা)-কে লক্ষ্য করে হুযূর (সা) বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তিলা-ওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কিরাআত পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম না আসে এবং শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতঃপর হুযূরে আকরাম (সা) মীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রা)-কে কিছুটা জোরে এবং হযরত ফারূককে আযম (রা)-কে কিছুটা আস্তে তিলাওয়াত করতে বললেন।—(আবূ-দাউদ)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, কিছু লোক হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট হুযূর আকরাম (সা)-এর তিলাওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি কি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতেন, না আস্তে আস্তে। উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, কখনও জোরে, আবার কখনও আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করতেন।

রাত্রিকালীন নফল নামাযে এবং নামাযের বাইরে তিলাওয়াতে কোন কোন মনীষী জোরে তিলাওয়াত করাকে পছন্দ করেছেন আর কেউ কেউ আস্তে পড়াকে পছন্দ করেছেন। সে জন্যই ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র) বলেছেন যে, যে লোক তিলাওয়াত করবে তার যে-কোনভাবে তিলাওয়াত করার অধিকার রয়েছে। তবে সশব্দে তিলাওয়াত করার জন্য সবার মতেই কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত রয়েছে। প্রথমত তাতে নাম-যশ এবং রিয়াকারী বা লোক-দেখানোর কোন আশংকা থাকবে না। দ্বিতীয়ত তার শব্দে অন্য লোকদের ক্ষতি কিংবা কষ্ট হবে না। অন্য কোন লোকের নামায, তিলাওয়াত কিংবা কাজকর্মে অথবা বিশ্রামে কোন রকম ব্যাঘাত যেন না হয়। যেখানে নাম-যশ ও রিয়াকারী কিংবা অন্যান্য লোকের কাজ-কর্ম অথবা আরাম-বিশ্রামের ব্যাঘাত সৃষ্টির আশংকা থাকবে, সে ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করাই সবার মতে উত্তম।

আর কোরআন তিলাওয়াতের যে হুকুম, অন্যান্য যিকির-আযকার ও তসবীহ্ তাহলীলেরও একই হুকুম। অর্থাৎ আস্তে আস্তে কিংবা শব্দ করে উভয়ভাবে পড়াই জায়েয রয়েছে। অবশ্য আওয়ায এমন উচ্চ হবে না যা বিনয়, নম্রতা ও আদবের খেলাফ হবে। তাছাড়া তার সে আওয়াযে অন্য লোকের কাজকর্ম কিংবা আরাম-বিশ্রামেরও যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

তবে সরব ও নীরব যিকিরের মধ্যে কোনটি বেশি উত্তম, তার ফয়সালা ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কারো জন্য জোরে যিকির করা উত্তম; আর কারো জন্য আস্তে করা

উত্তম। কোন সময় জোরে যিকির করা উত্তম আবার কোন সময় আস্তে করা উত্তম। —(তফসীরে মাযহারী, রূহুল বয়ান প্রভৃতি)

তিলাওয়াত ও যিকিরের দ্বিতীয় আদব হলো, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে যিকির করা। তার মর্ম এই যে, মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও মহিমা উপস্থিত থাকতে হবে এবং যা কিছু যিকির করা হবে, তার অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।

আর তৃতীয় আদব আলোচ্য আয়াতের خِيْفَةً শব্দের দ্বারা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তিলাওয়াত ও যিকিরের সময়ে মানব মনে আল্লাহ্র ভয়-ভীতির অবস্থা সঞ্চারিত হতে হবে। ভয় এ কারণে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও মহত্ত্বের পুরোপুরি হক আদায় করতে পারছি না, আমাদের দ্বারা না জানি বে-আদবী হয়ে যায়! তাছাড়া স্বীয় পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র আযাবের ভয়; শেষ পরিণতি কি হয়, কোন্ অবস্থায় না জানি আমাদের মৃত্যু ঘটে। যা হোক, যিকির ও তিলাওয়াত এমনভাবে করতে হবে, যেমন কোন ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি করে থাকে।

দোয়া-প্রার্থনার এ সমস্ত আদব-কায়দাই উক্ত সূরা আ'রাফের প্রারম্ভে اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً আয়াতে আলোচিত হয়েছে। তাতে خِيْفَةً -এর পরিবর্তে خُفْيَةً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ হলো নীরবে বা নিঃশব্দে যিকির করা। এতে বোঝা যায় নিঃশব্দে এবং আস্তে আস্তে যিকির করাও যিকিরের একটি আদব। কিন্তু এ আয়াতে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যদিও সশব্দে যিকির করা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে করবে না এবং এমন উচ্চৈঃস্বরে করবে না, যাতে বিনয় ও নম্রতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে যিকির ও তিলাওয়াতের সময় বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তা হবে সকাল ও সন্ধ্যায়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, দৈনিক অন্তত দু'বেলা, সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র যিকিরে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। আর এ অর্থও হতে পারে যে, সকাল-সন্ধ্যা বলে দিবা-রাত্রির সব সময়কে বোঝানো হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম বলে যেমন সারা দুনিয়াকে বোঝানো হয়। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সর্বদা, সর্বাবস্থায় যিকির ও তিলাওয়াতে নিয়মানুবর্তী হওয়া মানুষের একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হুযূরে আকরাম (সা) সর্বদা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণে নিয়োজিত থাকতেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্র স্মরণ ত্যাগ করে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও না। কারণ এটি বড়ই ক্ষতিকারক।

দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের শিক্ষা ও উপদেশের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নৈকট্য লাভকারীদের এক বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেছে তারা তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে গর্ব বা অহঙ্কার করে না। এখানে আল্লাহ্ নিকটে থাকা অর্থ আল্লাহ্র প্রিয় হওয়া। এতে সমস্ত ফেরেশতা, সমস্ত নবী-রাসূল এবং সমস্ত সৎকর্মশীল লোকই অন্তর্ভুক্ত। আর তাকাব্বুর বা অহংকার না করা অর্থ হলো এই যে, নিজে নিজেকে বড় মনে করে ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি না করা। বরং নিজেকে অসহায়, মুখাপেক্ষী মনে করে সর্বক্ষণ আল্লাহ্র স্মরণে ও ইবাদতে নিয়োজিত থাকা, তসবীহ-তাহলীল করতে থাকা এবং আল্লাহ্কে সিজদা করতে থাকা।

এতে এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সার্বক্ষণিক ইবাদত ও আল্লাহ্কে স্মরণ করার তওফীক যাদের ভাগ্যে হয়, তারা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র কাছে রয়েছে এবং তাদের আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য হাসিল হয়েছে।

সিজদার কতিপয় ফযীলত ও আহকাম ঃ এখানে নামায সংক্রান্ত ইবাদতের মধ্য থেকে শুধু সিজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাযের সমগ্র আরকানের মধ্যে সিজদার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন এক লোক হযরত সাওবান (রা)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন, যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। হযরত সাওবান (রা) নীরব রইলেন, কিছুই বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রশ্নটিই রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে করেছিলোম। তিনি আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সিজদা করতে থাক। কারণ তোমরা যখন একটি সিজদা কর, তখন তার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রী বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্ মাফ করে দেন।

লোকটি বললেন, হযরত সাওবান (রা)-এর সাথে আলাপ করার পর আমি হযরত আবুদ্দার্দা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় পরওয়ারদিগারের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সিজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সিজদারত অবস্থায় খুব বেশি করে দোয়া প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবূল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সিজদা হিসাবে কোন ইবাদত নেই। কাজেই ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র)-র মতে অধিক পরিমাণে সিজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়া। নফল যত বেশি হবে সিজদাও ততই বেশি হবে।

কিন্তু কোন লোক যদি শুধু সিজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আর সিজদারত অবস্থায় দোয়া করার হিদায়েত শুধু নফল নামাযের সাথেই সম্পৃক্ত; ফরয নামাযে নয়।

সূরা আ'রাফ শেষ হলো। এর শেষ আয়াতটি হলো আয়াতে সিজদা। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কোন আদম সন্তান যখন কোন সিজদার আয়াত পাঠ করে, অতঃপর সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সিজদার হুকুম হলো আর সে তা আদায়ও করলো, ফলে তার ঠিকানা হলো জান্নাত, আর আমার প্রতিও সিজদার হুকুম হয়েছে, কিন্তু আমি তার না-ফরমানী করেছি বলে আমার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

سورة الانفال

সূরা আন্‌ফাল

মদীনায় অবতীর্ণ । ৭৫ আয়াত, ১০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ①

।। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি ।।

(১) আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গনীমতের মাল হলো আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর—যদি ঈমানদার হয়ে থাক।

সূরার বিষয়বস্তু

সূরা আন্‌ফাল এখন যা আরম্ভ হচ্ছে, এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এর পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরিকীন (অংশীবাদী) এবং আহলে-কিতাবের মূর্খতা, বিদ্বেষ, কুফরী ও ফিতনা-ফাসাদ সংক্রান্ত আলোচনা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল।

বর্তমান সূরাটিতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই গয্ওয়াযে বদর বা বদরের যুদ্ধকালে সেই কাফির, মুশরিক ও আহলে-কিতাবের অশুভ পরিণতি, তাদের পরাজয় ও অকৃতকার্যতা এবং তাদের মুকাবিলায় মুসলমানদের কৃতকার্যতা সম্পর্কিত, যা মুসলমানদের জন্য ছিল একান্ত কৃপা ও দান এবং কাফিরদের জন্য ছিল আযাব ও প্রতিশোধস্বরূপ।

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সবচাইতে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রারম্ভেই তাক্ওয়া, পরহিযগারী এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য, যিকির ও ভরসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এসব লোক আপনার নিকট গনীমতের মাল সম্পর্কিত হুকুম জানতে চায়। আপনি জানিয়ে দিন যে, যাবতীয় গনীমত আল্লাহ্র (অর্থাৎ সেগুলো আল্লাহ্র মালিকানা ও অধিকারভুক্ত। তিনি এ সম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দেবেন) এবং (এগুলো এ অর্থে) রাসূল (সা)-এর (যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে হুকুম পেয়ে তা জারি করবেন। অর্থাৎ গনীমতের মাল-আসবাবসমূহের ব্যাপারে তোমাদের কোন মতামত কিংবা প্রস্তাবের কোন সুযোগ নেই। বরং তার ফয়সালা হবে শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী।) অতএব, তোমরা (পার্থিব লোভ করো না; আখিরাতের অন্বেষায় থাক। তা এভাবে যে,) আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন করে নাও (যাতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষা না থাকে)। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত তফসীরের আগে সে-ঘটনাটি সামনে রাখা হলে এর তফসীর বুঝতে একান্ত সহজ হয়ে যাবে বলে আশা করি।

ঘটনাটি হলো এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বণ্টন নিয়ে সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটে যা নিঃস্বার্থতা, ইখলাস ও ঐক্যের সেই সুউচ্চ মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে-কিরাম (রা)-এর গোটা জীবন ঢেলে সাজানো ছিল। সেজন্য সর্বাগ্রে এ আয়াতে তার সমাধান করে দেয়া হয়, যাতে করে এই পূত-পবিত্র এবং নিষ্কলুষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কোন বিষয় থাকতে না পারে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মসনদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লিখিত أَنْفَالُ (আনফাল) শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনীমতের মালামাল বিলিবণ্টন ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ হয়ে গিয়েছিল, যাতে আমাদের পবিত্র চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলে করীম (সা)-এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রাসূলে করীম (সা) বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমানভাবে সেগুলো বণ্টন করে দেন।

ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, বদরের যুদ্ধে আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন

করেন, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাফিরদের পরিত্যক্ত গনীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রাসূলে করীম (সা)-এর পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু মহানবী (সা)-এর উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধশেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যাঁরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারও ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশি অধিকারী নও। কারণ আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি, যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা মহানবী (সা)-এর হিফাযতকল্পে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জিহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুযূরে আকরাম (সা)-এর হিফাযতের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এসব কথাবার্তা হুযূর (রা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলে পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ্ তা'আলার; একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত এর অন্য কোন মালিক বা অধিকারী নেই, শুধু তাঁকে ছাড়া যাঁকে রাসূলে করীম (সা) দান করেন। সুতরাং মহানবী (সা) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন।–(ইবনে-কাসীর)। অতঃপর সবাই আল্লাহ্ ও রাসূলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাযী হয়ে যান এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেজন্য সবাই লজ্জিত হন।

এ ছাড়া মসনদে আহমদ এ আয়াতের শানে-নুযূলের ব্যাপারে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে অপর একটি ঘটনা উদ্ধৃত রয়েছে। তিনি বলেন যে, গযওয়ায়ে ওহুদে আমার ভাই ওমাইর (রা) শাহাদত বরণ করেন। আমি প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে মুশরিকদের মধ্য থেকে সাইদ ইবনুল আ'সকে হত্যা করে ফেলি এবং তার তলোয়ারটি তুলে নিয়ে মহানবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হই। এই তলোয়ারটি যাতে আমি পেতে পারি তাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু মহানবী (সা) নির্দেশ দিলেন, এটি গনীমতের মালের সাথে জমা করে দাও। নির্দেশ পালনে আমি বাধ্য হলাম, কিন্তু আমার মন এতে কঠিন বেদনা অনুভব করছিল যে, আমার ভাই শহীদ হলেন এবং তার বিনিময়ে আমি একটি শত্রুকে হত্যা করে তার তলোয়ার লাভ করলাম, অথচ তাও আমার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হলো ! কিন্তু তা সত্ত্বেও হুকুম তামিলার্থ মালে-গনীমতে জমা দেয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম। আমি খুব একটা দূরে না যেতেই হুযূর (সা)-এর উপর সূরা আনফালের এ আয়াতটি নাযিল হলো এবং তিনি আমাকে ডেকে তলোয়ারটি দিয়ে দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে একথাও রয়েছে যে, হযরত সা'দ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নিবেদনও করেছিলেন যে, তলোয়ারটি আমাকে দিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু তিনি বললেন, এটা আমার জিনিস না যে কাউকে দিয়ে দেব, আর না এতে তোমার কোন মালিকানা

রয়েছে। কাজেই এটা অন্যান্য গনীমতের মালের সাথে জমা করে দাও। এর ফয়সালা আল্লাহ্ তা'আলা যা করবেন তাই হবে।-(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

এতদুভয় ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং উভয় ঘটনার প্রত্যুত্তরেই এ আয়াতটি নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়।

اَنْفَالْ শব্দটি نَفْلٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামায, রোযা, সদকা প্রভৃতিকে 'নফল' বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশিতেই করে থাকে। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় نفل (নফল ও اَنْفَالْ আন্‌ফাল) গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাফিরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়। তবে কোরআন মজীদে এতদর্থে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—১. আন্‌ফাল ২. গনীমত এবং ৩. ফায়। اَنْفَالْ শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غنيمة (গনীমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فيء এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ ... ... প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনীমতের মাল' অর্থে ব্যবহার করা হয়। اَنْفَالْ (গনীমত) সাধারণত সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فى (ফায়) বলা হয় সে মালকে, যা কোন রকম যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই কাফিরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফিররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাযী হোক। আর نفل ও اَنْفَالْ (নফল ও আনফাল) শব্দটি অধিকাংশ সময় আনআম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নায়ক কোন বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসাবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তফসীরে ইবনে জরীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)। আবার কখনও 'নফল' ও 'আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনীমতের মালকেও বোঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ তফসীরকার এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ (اَنْفَالْ) শব্দটি সাধারণ, অসাধারণ—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুত এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হলো সেটাই, যা ইমাম আবু ওবাইদ (র) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আম্‌ওয়াল'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মালসামান কাফিরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না। বরং গনীমতের মালের ক্ষেত্রে আইন ছিল এই যে, তা কারো জন্য হালাল ছিল না; সমস্ত গনীমতের মালামাল কোন এক জায়গায় জমা করা হতো। অতঃপর আসমান থেকে এক অনল-বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিত। আর এটাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জিহাদ কবূল হওয়ার নিদর্শন। পক্ষান্তরে গনীমতের মালামাল একত্রিত

করে রাখার পর যদি আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে না জ্বালাত, তবে তা-ই ছিল জিহাদ কবূল না হওয়ার লক্ষণ। এতে বোঝা যেত, এ জিহাদ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে গনীমতের সে মালসামানকেও প্রত্যাখ্যাত ও অলক্ষুণে মনে করা হতো এবং সেগুলো কোন প্রকার ব্যবহারে আনা হতো না।

রাসূলে করীম (সা) থেকে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সা) বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতকে দেওয়া হয়নি। সে পাঁচটির একটি হলো— احلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى অর্থাৎ আমার জন্য গনীমতের মালকে হালাল করা হয়েছে, অথচ আমার পূর্ববর্তী কারও জন্য তা হালাল ছিল না।

উল্লিখিত আয়াতে আনফাল-এর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এবং রাসূলে করীম (সা) হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি-বন্টন করবেন।

সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ইকরিমাহ (রা) এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ তফসীরবিদের এক বিরাট দল মত প্রকাশ করেছেন যে, এই হুকুমটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের, যখন গনীমতের মালসামান বিলি-বন্টনের ব্যাপারে কোন আইন অবতীর্ণ হয়নি। আলোচ্য সূরার পঞ্চম রুকূতে এ বিষয়টিই আলোচিত হবে। এ আয়াতে গনীমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি মহানবী (সা)-এর কল্যাণ-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি-বিধান এসেছে, তাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, গনীমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগ বায়তুলমালে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাকি চার ভাগ বিশেষ নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সূরা আনফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোন 'নাসেখ-মনসূখ' অর্থাৎ রহিত কিংবা রহিতকারী নেই, বরং সংক্ষেপণ ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য 'ফায়'-এর মালামাল—যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রাসূলে করীম (সা)-এর অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا অর্থাৎ আমার রাসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক।

এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনীমতের মাল হলো সে সমস্ত মালামাল, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে হস্তগত করা হয়। আর 'ফায়' হলো সে সমস্ত মালামাল যা কোন রকম

লড়াই এবং জিহাদ ছাড়াই হাতে আসে। আর انفال (আনফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন।

এ প্রসঙ্গে সাথীদেরকে পুরস্কার দেওয়ার চারটি রীতি মহানবী (সা)-এর যুগ থেকে প্রচলিত রয়েছে। এক. একথা ঘোষণা করে দেওয়া যে, যে লোক কোন বিরোধী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে—যে সামগ্রী তার সাথে থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী গনীমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না। দুই. বড় কোন সৈন্যদল থেকে কোন দলকে পৃথক করে কোন বিশেষ দিকে জিহাদ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া এবং এমন নির্দেশ দিয়ে দেওয়া যে, এদিক থেকে যেসব গনীমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লিখিত বিশেষ দলের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যারা সে অভিযানে অংশগ্রহণ করবে। তবে এতে শুধু এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনে বায়তুলমালে জমা করতে হবে। তিন. বায়তুলমালে গনীমতের যে এক-পঞ্চমাংশ জমা করা হয়, তা থেকে কোন বিশেষ গাযী (জয়ী)-কে তার কোন বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসাবে আমীরের কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। চার. সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে নিয়ে সেবাজীবী লোকদের মধ্যে পুরস্কারস্বরূপ দান করা, যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতির দেখাশোনা করে এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। −(ইবনে কাসীর)

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়াল এই যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, আপনার নিকট লোকেরা 'আন্‌ফাল' সম্পর্কে প্রশ্ন করে—আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 'আনফাল' সবই হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অর্থাৎ নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তাঁর রাসূল (সা) এগুলোর ব্যাপারে যে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা-ই কার্যকর হবে।

মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্যের ভিত্তি তাকওয়া বা পরহিযগারী এবং আল্লাহ্-ভীতি ঃ এ আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এতে সাহাবায়ে-কিরামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে ভাল রাখ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই ঘটনার প্রতি, যা বদর যুদ্ধে গনীমতের মালামালের বিলি-বন্টনসংক্রান্ত ব্যাপারে সাহাবায়ে-কিরামের মাঝে ঘটে গিয়েছিল। এতে পারস্পরিক তিক্ততা এবং অসন্তুষ্টির সৃষ্টির আশংকা বিদ্যমান ছিল। কাজেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং গনীমতের মালামালের বিলি-বন্টনের বিষয় এ আয়াতের দ্বারা পরে মীমাংসা করে দিয়েছেন। তারপর তাঁদের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর করার উপায় বলা হয়েছে যার কেন্দ্রবিন্দু হলো তাকওয়া বা পরহিযগারী এবং আল্লাহ্‌ভীতি।

একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা সপ্রমাণিত যে, যখন মানুষের মনে তাকওয়া, পরহিযগারী, আল্লাহ ও কিয়ামত আখিরাতের ভয়নীতি প্রবল থাকে, তখন বড় বড় বিবাদ-বিসংবাদও মুহূর্তের মধ্যে

নিষ্পত্তি হয়ে যায়। পারস্পরিক বিদ্বেষের পাহাড়ও ধূলার মত উড়ে যায়। মওলানা রূমীর ভাষায় পরহিযগারদের অবস্থা হয় এরূপ ঃ

خود چه جائے جنگ وجدل نیك وبد
کیس الـم از صلحها میـرمـد

অর্থাৎ "কোন রকম বিবাদ-বিসংবাদে তাদের সম্পর্ক কি থাকবে, তাদের কাছে যে মানুষের কল্যাণ ও সংস্কার সাধন করেই অবসর নেই।' ক্বারণ যে মন-মানস আল্লাহ্‌র মহব্বত, ভয় এবং স্মরণে ব্যাকুল, তাদের পক্ষে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার অবসরই বা কোথায়। সুতরাং—

بسـودایء جانـاں زجاں مشتـغـل
بـذکـر حبیـب ازجهاں مشتـغـل

সে জন্যই এ আয়াতে তাকওয়ার উপায় বাতলাতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ তাকওয়া ও পরহিযগারীর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর। এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে ঃ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি মু'মিনই হবে, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য কর। অর্থাৎ ঈমানের দাবিই হলো আনুগত্য। আর আনুগত্যের ফল হলো তাকওয়া। কাজেই মানুষ যখন এ বিষয়গুলো লাভ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, লড়াই-ঝগড়া আপনা থেকেই তিরোহিত হয়ে যায় এবং শত্রুতার স্থলে অন্তরে সৃষ্টি হয় প্রেম ও সৌহার্দ্য।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ
حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤

---

(২) যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়, তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। (৩) সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে–(৪) তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বস্তুত) ঈমানদার তো তারাই হয় যে, (তাদের সামনে) যখন আল্লাহ্‌র (বিষয়) আলোচনা করা হয়, তখন (তাঁর মহত্ত্বের উপস্থিতির দরুন) তাদের মন-প্রাণ ভীত (সন্ত্রস্ত) হয়ে ওঠে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত আয়াত তাদের ঈমানকে আরো বেশি (সুদৃঢ়) করে দেয় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের উপর নির্ভর করে। (আর) যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী-রোযগার দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে, তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে বিরাট বিরাট মর্যাদা তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট এবং (তাদের জন্য) রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মু'মিনের বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য : এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মু'মিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মু'মিন নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মু'মিনের গুণাবলীতে মণ্ডিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে, কিংবা থাকলেও তা একান্ত দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র ভয় : আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে : الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ তাদের সামনে যখন আল্লাহ্‌র আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে ওঠে। অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবি হলো ভয় ও ভীতি। কোরআন করীমের অন্য এক আয়াতে তারই আলোচনাক্রমে আল্লাহ্-প্রেমিকদের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ (হে নবী,) সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদের, যাদের অন্তর তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আলোচনা করা হয়। এতদুভয় আয়াতে আল্লাহ্‌র আলোচনা ও স্মরণে একটা বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; তা হলো ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র যিকিরের এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে ওঠে। বলা হয়েছে : اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থী নয়, যেমন হিংস্র জীবজন্তু কিংবা শত্রুর ভয় মানুষের মনের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্‌র যিকিরের দরুন অন্তরে সৃষ্ট ভয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْفٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। وَجَلٌ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ ভয় নয়; বরং এমন ভয়, যা বড়দের মহত্ত্বের কারণে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, এখানে আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কোন পাপ

কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করছিল, তখনই আল্লাহ্‌র কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইল। এ ক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আযাবের ভয়।—(বাহরে মুহীত)

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি ঃ মু'মিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আলিম, তফসীরবিদ ও হাদীসবিদদের সর্বসম্মত মতে ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সৎ কাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোন এক কবি ছান্দিক ভাষায় এভাবে বলেছেন ঃ

واذا حلت الحلاوة قلبا - نشطت فى العبادة الاعضاء

অর্থাৎ অন্তরে যখন ঈমানের মাধুর্য বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাঝে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করতে আরম্ভ করে।

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ মুসলমানেরা যেভাবে কোরআন পাঠ করে এবং শোনে, যাতে না থাকে কোরআনের আদর ও মর্যাদাবোধের কোন খেয়াল, না থাকে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরনের তিলাওয়াত উদ্দেশ্যও নয় এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে পুণ্য বিবর্জিত নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ঃ মু'মিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হলো অবস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলার উপর। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সা) বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, স্বীয় প্রয়োজনের জন্য জড়-উপকরণ এবং চেষ্টা-চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো এই যে, বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে, বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ্ তা'আলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুত হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اجملوا فى الطلب وتوكلوا عليه অর্থাৎ স্বীয় যিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্বেষণ এবং জড়-উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন-মস্তিষ্ককে শুধুমাত্র স্থূল প্রচেষ্টা ও জড়-উপকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখো না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নামায প্রতিষ্ঠা করা ঃ মু'মিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে নামায প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এখানে 'নামায' পড়ার কথা নয়, বরং নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। اقامت শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা দাঁড় করানো। কাজেই اقامت صلوة-এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাযের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতিনীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন করে রাসূলে করীম (সা) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা ও শর্তাশর্তের কোন রকম ত্রুটি হলে তাকে নামায পড়া বলা গেলেও নামায প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কোরআন মজীদে নামাযের যেসব উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা হয়েছে—যেমন, اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (অর্থাৎ নামায লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে) তা এই নামায প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাযের আদবসমূহে যখন কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাযকে জায়েয বলা হলেও ত্রুটির পরিণাম হিসাবে নামাযের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দেবে। কোন কোন অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা ঃ মর্দে মু'মিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাকে যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহ্র রাহে খরচ করবে। আল্লাহ্র রাহে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরীয়তনির্ধারিত যাকাত-ফিতরা প্রভৃতি, নফল দান-খয়রাতসহ মেহমানদারী, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব রকমের দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত।

মর্দে মু'মিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا অর্থাৎ এমন সব লোকই হলো সত্যিকার মু'মিন যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐকবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللّٰهِ বললেও তাদের অন্তরে না থাকে তওহীদের রং, আর না থাকে রাসূলের আনুগত্য। তাদের কার্যধারা তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সত্যটিও লাভ হয় না।

কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র)-র নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবূ সাঈদ! আপনি কি মু'মিন ? তখন তিনি বললেন, ভাই, ঈমান দু'প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর এবং বেহেশত, দোযখ, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না ? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মু'মিন। পক্ষান্তরে সূরা আনফালের আয়াতে যে মু'মিনে কামিল বা পরিপূর্ণ মু'মিনের কথা বলা হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আমি তেমন মু'মিন কি না ? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কি না। সূরা আনফালের আয়াত বলতে সে আয়াতগুলোই উদ্দেশ্য যা আপনারা এই মাত্র শুনলেন।

আয়াতগুলোতে সত্যিকার মু'মিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ —এতে মু'মিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে ঃ (১) সুউচ্চ মর্যাদা (২) মাগফিরাত বা ক্ষমা এবং (৩) সম্মানজনক রিযিক।

তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম। (১) সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন, ঈমান, আল্লাহ্‌ভীতি, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা, (২) যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন, নামায, রোযা প্রভৃতি (৩) যার সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে। যেমন, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক গুণাবলীর জন্য 'সুউচ্চ মর্যাদা'। সে সমস্ত আমল বা কাজকর্মের জন্য 'মাগফিরাত' বা ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহের সাথে। যেমন নামায, রোযা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাযে পাপসমূহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। আর 'সম্মানজনক রিযিক'-এর ওয়াদা দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করার জন্য। মু'মিন এ পথে যা ব্যয় করবে, আখিরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশী প্রাপ্ত হবে।

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۠ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٥ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦

(৫) যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদিগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। (৬) তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কোন কোন লোকের মনে কষ্টবোধ হলেও গনীমতের মালামাল নিজের ইচ্ছামত বিলি-বন্টন না করে, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা বণ্টিত হওয়ার বিষয়টি বহুবিধ কল্যাণের কারণে যথেষ্ট মঙ্গলকর। বিষয়টি যদিও প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কিন্তু বহুবিধ বিষয়ে কল্যাণকর হওয়ার দরুন এটি এমনি বিষয়) যেমন আপনার পালনকর্তা আপনাকে নিজের বাড়িঘর (ও জনপদ) থেকে কল্যাণের ভিত্তিতে (বদর প্রান্তরের দিকে) পরিচালিত করেছেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদের একটি দল (নিজেদের সংখ্যা ও যুদ্ধের উপকরণ বা সাজসরঞ্জামের স্বল্পতার দরুন প্রকৃতিগতভাবে) এ

(বিষয়টি)-কে ভারী মনে করছিল। তারা এই শুভকর্মে (অর্থাৎ জিহাদ এবং সৈন্যদের সম্মুখ সমরের ব্যাপারে) তা প্রকাশিত হয়ে যাবার পরেও (আত্মরক্ষার জন্য পরামর্শচ্ছলে) আপনার সাথে এমনভাবে বিবাদ করছিল যেন তাদেরকে কেউ মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারা (যেন মৃত্যুকে) প্রত্যক্ষ করছে। (কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলও শুভই হয়েছে। ইসলামের বিজয় এবং কুফুরের পরাজয় সূচিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূরা আন্‌ফালের অধিকাংশ বিষয়ই হলো কাফির-মুশরিকদের আযাব ও প্রতিশোধ এবং মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ ও পুরস্কার সম্পর্কিত। এতে উভয় পক্ষের জন্যই শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয় এবং বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, সংখ্যাধিক্য ও প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও মুশরিকীনরা জানমালের বিপুল ক্ষতিসহ পরাজয় বরণ করেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সর্বপ্রকার স্বল্পতা এবং নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও বিজয়ের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এ সূরায় রয়েছে বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ। আলোচ্য আয়াত থেকেই তার আরম্ভ।

প্রথম আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধের সময় কোন কোন মুসলমান জিহাদের অভিযান পছন্দ করেনি; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রাসূলে করীম (সা)-কে জিহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তাঁরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন, যাঁরা ইতিপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করেছিলেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআন করীম এমন সব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমত এই যে, আয়াতটি আরম্ভ করা হয়েছে كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ বাক্য দিয়ে। এতে كَمَا এমন একটি বাক্যাংশ, যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অতএব লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হচ্ছে। তফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিন্ন বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হাইয়্যান (র) এ ধরনের পনেরটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনটি সম্ভাবনা প্রবল।

এক—এই তুলনার উদ্দেশ্য এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত গনীমতের মালামাল বন্টন করার সময় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক সবাই মহানবী (সা)-এর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন এবং তাঁর বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ জিহাদের প্রারম্ভে কারো কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল ও উত্তম পরিণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লেষণকে ফাররা ও মুবাররাদ-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল-কোরআনেও এ বিশ্লেষণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

দুই—দ্বিতীয়ত এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার মু'মিনদের জন্য আখিরাতের সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতির অবশ্যম্ভাবিতা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে,

আখিরাতের প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্তু বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে, তেমনিভাবে আখিরাতের ওয়াদাও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।—(কুরতুবী)

তিন—তৃতীয়ত এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আবূ হাইয়্যান (র) মুফাস্‌সিরীনদের পনেরটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির কোনটির উপরেই আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একদিন আমি এ আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে বললাম, আমি কখনও এমন জটিলতার সম্মুখীন হইনি, যেমনটি এ আয়াতের ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোন একটি শব্দ উহ্য রয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে, এখানে نَصَرَكَ (নাসারাকা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ মনঃপূত ও পছন্দ হলো এবং যার সাথে তর্ক করছিলাম সেও পছন্দ করলো। ঘুম থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। কারণ এ ক্ষেত্রে كَمَا শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না, বরং কারণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বদর যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বিশেষ সাহায্য-সহায়তা নবী করীম (সা)-এর প্রতি হয়েছিল, তার কারণ ছিল এই যে, এই জিহাদে তিনি যা কিছু করেছিলেন, তার কোন কিছুই নিজের মতে করেন নি, বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রেক্ষিতে। তাঁরই হুকুমে তিনি নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহ্‌র সাহায্য সহায়তা পাওয়া যায়।

যা হোক, আয়াতে বর্ণিত এই বাক্যটিতে উল্লিখিত তিনটি অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে এবং তিনটিই যথার্থও বটে। অতঃপর লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই তাঁকে বের করেছেন। এতে রাসূলে করীম (সা)-এর আনুগত্যের পরিপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর প্রতিটি কাজকর্ম প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ, যা তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন, এক হাদীসে-কুদ্‌সীতে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, 'মানুষ যখন আনুগত্য ও সেবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে বলেন যে, আমি তার চোখ হয়ে যাই; সে যা কিছু অবলোকন করে, আমারই মাধ্যমে অবলোকন করে। আমি তার কান হয়ে যাই; সে যা কিছু শোনে আমারই মাধ্যমে শোনে। আমি তার হাত-পা হয়ে যাই; সে যা কিছু ধরে; আমারই মাধ্যমে ধরে; যে দিকে যায় আমারই মাধ্যমে যায়। সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সাহায্য সহায়তা তখন তার নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়। বাহ্যত তার চোখ-কান ও হাত-পা দ্বারা যে কাজ সম্পাদিত হয়, তাতে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও কর্মক্ষমতাই সক্রিয় থাকে।

رشتـــهٔ درگـردنـم افگنده دوسـت
مـيبرد هرجاكے خاطر خواه دوسـت

বস্তুত اَخْـرَجَكَ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জিহাদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা)-এর যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই যাত্রা ছিল, যা হুযূরের মাধ্যমে বাস্তবতা লাভ করেছে বা প্রকাশ পেয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখানে اَخْـرَجَكَ رَبُّكَ বলা হয়েছে, যাতে আল্লাহর উল্লেখ এসেছে 'রব' গুণবাচক নামে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর এ জিহাদ যাত্রা ছিল পালনকর্তা ও লালনসুলভ গুণেরই দাবি। কারণ এতে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং অত্যাচারী, দাম্ভিক কাফিরদের জন্য আযাবের বিকাশই ছিল উদ্দেশ্য।

مِنْ بَيْـتِكَ-এর অর্থ হলো আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই 'ঘর' বলতে মদীনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা মদীনাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান করছিলেন। কারণ বদরের ঘটনাটি হিজরী দ্বিতীয় বর্ষেই সংঘটিত হয়েছিল। এই সঙ্গে بِالْحَقِّ শব্দ ব্যবহার করে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র বা সরকারের মত রাজ্য বিস্তারের লোভ কিংবা রাজন্যবর্গের রাগ-রোষের প্রেক্ষিতে ছিল না। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ অর্থাৎ মুসলমানদের কোন একটি দল এ জিহাদ কঠিন মনে করছিল এবং পছন্দ করছিল না। সাহাবায়ে কিরামের মনে এই কঠিনতাবোধ কেমন করে এল, সেকথা উপলব্ধি করার জন্য এবং পরবর্তী অন্যান্য আয়াত যথাযথভাবে বোঝার জন্য প্রথম গয্ওয়ায়ে বদরের প্রাথমিক অবস্থা ও কারণগুলো জেনে নেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং প্রথম বদর যুদ্ধের পূর্ব ঘটনাটি লক্ষ্য করুন।

ইবনে আকাবাহ্ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট মদীনায় এ সংবাদ পৌঁছে যে, আবূ সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার কুরাইশ অংশীদার। ইবনে আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোন কুরাইশ নারী বা পুরুষ ছিল না, যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক মিস্‌কাল (সাড়ে চার মাশা) পরিমাণ সোনা থাকলে সেও তা এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এই কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দীনার ছিল। দীনার হলো একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের বর্তমান দর অনুযায়ী এর মূল্য হয় বায়ান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়, বরং চৌদ্দ'শ বছর পূর্বেকার ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমানে ছাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশি হতে পারে। এই বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ের জন্য সত্তর জন কুরাইশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানী।

ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের রিওয়ায়েত মতে বগভী (র) উল্লেখ করেছেন যে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চল্লিশজন ঘোড়সওয়ার সর্দার, যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মাখরামাহ ইবনে নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কুরাইশদের এই বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রাসূলে করীম (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই হুযূর (সা) যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মুকাবিলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেওয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে কিরামদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমযানের মাস। যুদ্ধেরও কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং হুযূর (সা)-ও সবার উপর এ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক হিসাবে সাব্যস্ত করলেন না ; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাঁদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাঁরা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যাঁরা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হলো, যাঁদের কাছে এ মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদে যেতে চান, শুধু তাঁরাই যাবেন। বাইরে থেকে সওয়ার আনিয়ে নেবার মত সময় এখন নেই। কাজেই হুযূর (সা)-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরি হতে পারলেন। বস্তুত যাঁরা এই জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল, তা এই যে, মহানবী (সা) এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেন নি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী নয় যার মুকাবিলা করার জন্য রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদের খুব বেশি পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহিদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেন নি।

মহানবী (সা) 'বি'রে সুক্ইয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন কায়েস ইবনে সা'সা'আ (রা)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। মহানবী (সা) এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ তালুতের সৈন্য সংখ্যাও এই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কিরামের সাথে মোট উট ছিল সত্তরটি। প্রতি তিনজনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারী করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর সাথে অপর দু'জন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবূ লুবাবাহ ও হযরত আলী (রা)। যখন হুযূর (সা)-এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো তখন তারা বলতেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহ্মাতুল্লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত ঃ না তোমরা আমার চাইতে বেশি বলিষ্ঠ, আর না আখিরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে আমার সওয়াবের সুযোগটি তোমাদের দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী (সা)-ও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে-যোরকায়' পৌছে কোন এক লোক কুরাইশ কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানকে এ সংবাদ জানিয়ে দিল যে রাসূলে করীম (সা) তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন, তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবূ সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হিজাযের সীমানায় গিয়ে পৌছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দম্দম্ ইবনে উমরকে (ضمضم ابن عمر) কুড়ি মিসকাল সোনা অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার টাকা মজুরি দিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মুকাররমায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌছে দেবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে কিরামের আক্রমণ-আশংকার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

দম্দম্ ইবনে উমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশংকার ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনের ও পিছনের অংশ ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালে ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ-চৈ পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে পড়ল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোন কারণে অপারক ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত, তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরনের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুন তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করছিলেন, তাঁদেরকে এবং বনূ হাশিম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি এমন ধারণা হতো যে, এরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাঁদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকের মধ্যে মহানবী (সা)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) এবং আবূ তালিবের দুই পুত্র তালিব ও আকীলও ছিলেন।

যা হোক, এভাবে সব মিলিয়ে এই বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দু'শ ঘোড়া, ছ'শ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদীদল তাদের বাধ্যযন্ত্রাদি সহ বদর অভিমুখে রওনা হলো। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবার জন্য দশটি করে উট জবাই করা হতো।

অপরদিকে রাসূলে করীম (সা) শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেরার মুকাবিলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমযান শনিবার মদীনা তাইয়্যেবা থেকে রওনা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌছে দু'জন সাহাবীকে আবূ সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন।—(মাযহারী)

সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবূ সুফিয়ানের কাফেলা মহানবীর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। -(ইবনে কাসীর)

বলা বাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রাসূলে করীম (সা) সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মুকাবিলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিওনি। তখন হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলের নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মিক্‌দাদ (রা) উঠে নিবেদন করলেন ঃ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মূসা (আ)-কে। তারা বলেছিল ঃ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ অর্থাৎ যান, আপনি ও আপনার রব (পালনকর্তাই) গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুলগিমাদ' নামক স্থান পর্যন্ত নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব।"

মহানবী (সা) হযরত মিকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হুযূরে আকরাম (সা)-এর সাথে আনসারদের যে সহযোগিতা-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী (সা) সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জিহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কিনা ? এই সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসাররা। হযরত সা'দ ইবনে মু'আয আনসারী (রা) হুযূর (সা)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি কি আমাদের জিজ্ঞেস করছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সা'দ ইবনে মু'আয (রা) বললেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমারা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে, যেকোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে দীনে-হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদের শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র নামে আমাদের যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।"

এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত খুশি হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহ্‌র নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দু'টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি দল বলতে, একটি হলো আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি।

(এ সমুদয় ঘটনা তফসীরে ইবনে কাসীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানার পর আলোচ্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথম আয়াতে وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ মুসলমানদের একটি দল এই জিহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে জিহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ আয়াতে। অর্থাৎ এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে।

সাহাবায়ে কিরাম যদিও কোন রকম নির্দেশ লংঘন করেন নি, বরং পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র পছন্দ ছিল না। কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ
الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨﴾ اِذْ
تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
مُرْدِفِيْنَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ
اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

(৭) আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক

নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ্ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফিরদের মূল কর্তন করে দিতে, (৮) যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়। (৯) তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (১০) আর আল্লাহ্ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তির অধিকারী, হিকমতওয়ালা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা স্মরণ কর সেই সময়টির কথা, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সে দু'টি দল (অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাফেলা ও কুরাইশ বাহিনী)-এর মধ্য থেকে একটি (দল) সম্পর্কে ওয়াদা করছিলেন যে, তা (অর্থাৎ সে দল) তোমাদের হস্তগত হবে। [অর্থাৎ পরাজিত হয়ে পড়বে। মুসলমানদের সাথে এ ওয়াদাটি করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে ওহীযোগে। আর তোমরা কামনা করছিলে নিরস্ত্র দলটি (অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাফেলাটি) যেন তোমাদের হস্তগত হয়। অথচ আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল স্বীয় আহকামের দ্বারা সত্যকে (কার্যকরভাবে বিজয় দান করে) সত্য হিসাবে প্রমাণ করে দেয়া এবং (তাঁর ইচ্ছা ছিল সে সমস্ত) কাফিরদের মূল কেটে দিয়ে সত্যের সত্যতা ও মিথ্যার অসারতা (বাস্তব ক্ষেত্রে) প্রমাণ করে দেয়া। তা এই অপরাধীরা (অর্থাৎ পরাজিত কাফিররা একে যতই) অপছন্দ করুক না কেন। সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে (নিজেদের সংখ্যা ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের স্বল্পতা এবং শত্রুদের আধিক্য দেখে ফরিয়াদ) করছিলে তখন আল্লাহ্ তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিলেন (এবং ওয়াদা করলেন) যে তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতার দ্বারা সাহায্য করবেন যা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা এই সাহায্য করেছিলেন শুধুমাত্র এই হিকমতের ভিত্তিতে, যাতে তোমরা (বিজয় লাভের) সুসংবাদ পেতে পার এবং যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হয় (অর্থাৎ যেহেতু মানুষের মানসিক স্বস্তি উপকরণ এবং সাজসরঞ্জামের মাধ্যমেই হতে পারে সেজন্য তাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।) বস্তুত (প্রকৃতপক্ষে কৃতকার্যতা ও বিজয় শুধুমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে যিনি পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে গয্ওয়ায়ে বদরের ঘটনা এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সাহায্য ও বিশেষ অনুগ্রহ মুসলমানদের প্রতি হয়েছিল, তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন এই সংবাদ জানতে পারেন যে, কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে, তখন মুসলমানদের সামনে ছিল দু'টি দল। একটি হলো বাণিজ্যিক কাফেলা যাকে হাদীসে عير (ঈর) বলা হয়েছে এবং অপরটি ছিল

সুসজ্জিত সেনাদল যাকে نفير (নাফীর) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সা) এবং তাঁর সাথে যুক্ত সমস্ত মুসলমানের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, এ দু'টি দলের কোন একটির উপর তোমাদের পরিপূর্ণ দখল লাভ হবে। ফলে তাদের ব্যাপারে যা খুশী তা করতে পারবে।

বলা বাহুল্য যে, বাণিজ্যিক কাফেলাটি হস্তগত করা ছিল সহজ ও ভয়হীন। আর সশস্ত্র বাহিনী হস্তগত করা ছিল কঠিন ও আশংকাপূর্ণ। কাজেই এহেন অস্পষ্ট ওয়াদার কথা শুনে অনেক সাহাবার কাম্য হয়, যে দলটির উপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে সেটি যেন নিরস্ত্র বাণিজ্যিক দলই হয়। কিন্তু আল্লাহ্র ইঙ্গিতে রাসূলে করীম (সা) ও অন্যান্য বড় বড় সাহাবীর বাসনা ছিল যে সশস্ত্র দলটির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই উত্তম হবে।

এ আয়াতে নিরস্ত্র দলের উপর বিজয় বা অধিকার প্রত্যাশী মুসলমানদের অবহিত করা হয়েছে যে, তোমরা তো নিজেদের আরামপ্রিয়তা ও আশংকামুক্ততার প্রেক্ষিতে নিরস্ত্র দলের উপর অধিকার লাভ করাই পছন্দ করছ, কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ইসলামের আসল উদ্দেশ্য অর্জন। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের যথার্থতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং কাফিরদের মূল কর্তন। বলা বাহুল্য এটা তখনই হতে পারত, যখন সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মুকাবিলা এবং তাদের উপর মুসলমানদের বিজয় ও পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা হতো।

এর সারমর্ম হলো মুসলমানদের এ বিষয়ে জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা যে দিকটি পছন্দ করছ তা একান্ত কাপুরুষতা, আরামপ্রিয়তা ও সাময়িক লাভের বিষয়। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়টিকে আরো কিছুটা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার খোদায়ী ক্ষমতার আওতা থেকে কোন কিছু মুক্ত ছিল না; তিনি ইচ্ছা করলে বাণিজ্যিক কাফেলার উপরেও মুসলমানদের বিজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করে বিজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকেই রাসূলে করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের উচ্চ মর্যাদার উপযোগী বিবেচনা করেছেন, যাতে সত্যের ন্যায়সঙ্গতা ও মিথ্যার অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে,আল্লাহ্ তা'আলা তো মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত এবং সর্ব কর্মের আদ্যোপান্ত সম্পর্কে অবগত। কাজেই তাঁর পক্ষ থেকে এহেন অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির মাঝে এমন কি কল্যাণ নিহিত ছিল যে, দুটি দলের যেকোন একটির উপর মুসলমানদের বিজয় ও অধিকার লাভ হবে? তিনি তো যেকোন একটির ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে বলতে পারতেন যে, অমুক দলের উপর অধিকার লাভ হয়ে যাবে?

এই অস্পষ্টতার কারণ আল্লাহ্ই জানেন। তবে মনে হয়– এতে সাহাবায়ে কিরামকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা সহজ কাজটিকে পছন্দ করেন, নাকি কঠিন কাজকে। তাছাড়া এতে তাঁদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতারও অনুশীলন ছিল। এভাবে তাঁদেরকে সৎসাহস ও উচ্চতর উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টায় কোন রকম ভয় বা আশংকা না করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে রয়েছে সেই ঘটনার বিবরণ, যা সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমর সাব্যস্ত হয়ে যাবার পর ঘটেছিল। রাসূলে করীম (সা) যখন লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গী মাত্র তিনশ তের জন, তাও আবার অধিকাংশই নিরস্ত্র, অথচ তাদের মুকাবিলায় রয়েছে এক হাজার জওয়ানের সশস্ত্র বাহিনী, তখন তিনি আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর দরবারে সাহায্য ও সহায়তার জন্য প্রার্থনার হাত ওঠালেন। তিনি দোয়া করছিলেন আর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলে যাচ্ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-এর প্রার্থনার নিম্নলিখিত বাক্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

'ইয়া আল্লাহ্, আমার সাথে যে ওয়াদা আপনি করেছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন। ইয়া আল্লাহ্, মুসলমানদের এই সামান্য দলটি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না (কারণ গোটা বিশ্ব কুফরী ও শিরকীতে ভরে গেছে। এই কয়েকজন মুসলমানই আছে যারা ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদন করে থাকে)।

মহানবী (সা) অনর্গল এমনিভাবে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দোয়ায় তন্ময় হয়ে থাকেন। এমনকি তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রা) এগিয়ে গিয়ে সে চাদর তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেন এবং নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি বিশেষ চিন্তা করবেন না, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই আপনার দোয়া কবূল করবেন এবং যে ওয়াদা তিনি করেছেন, তা অবশ্যই পূরণ করবেন।

আয়াতে اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ বাক্যের দ্বারা এ ঘটনাই উদ্দেশ্য। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেই সময়ের কথা মনে রাখার মত, যখন আপনি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট প্রার্থনা করছিলেন এবং তাঁর সাহায্য কামনা করছিলেন। এই প্রার্থনাটি যদিও রাসূলে করীম (সা)-এর পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামও যেহেতু তাঁর সাথে 'আমীন আমীন' বলছিলেন, তাই সমগ্র দলের সাথেই একে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

অতঃপর এ প্রার্থনা মঞ্জুরীর বিষয়টি এমনভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করব, যারা একের পর এক করে কাতারবন্দী অবস্থায় আসবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাগণকে যে অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন তার কিছুটা অনুমান করা যায় সেই ঘটনার দ্বারা, যা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে উল্টে দেয়ার সময় ঘটেছিল। জিবরাঈল (আ) একটি মাত্র পাখার (ঝাপ্টার) মাধ্যমে তা উল্টে দিয়েছিলেন। কাজেই এহেন অনন্যসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতাদের এত বিপুল সংখ্যককে এ মুকাবিলার জন্য পাঠানোর কোনই প্রয়োজন ছিল না। একজনই যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থই অবগত, তারা সংখ্যার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই প্রতিপক্ষের সংখ্যানুপাতেই সমসংখ্যক ফেরেশতা পাঠানোর ওয়াদা করেছেন, যাতে তাঁদের মন পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ আয়াতেও একই বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র এ জন্য করেছেন, যাতে তোমরা সুসংবাদ প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়ে যায়।

গয্ওয়ায়ে বদরের সময় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যেসমস্ত ফেরেশতা সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল, এখানে তাদের সংখ্যা এক হাজার ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সূরা আলে-ইমরানে তিন হাজার এবং পাঁচ হাজারেরও উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনটি ওয়াদার বিভিন্নতা, যা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। প্রথম ওয়াদাটি ছিল এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণের, যার কারণ ছিল মহানবী (সা)-এর দোয়া এবং সাধারণ মুসলমানদের ফরিয়াদ। দ্বিতীয় ওয়াদা, যা তিন হাজার ফেরেশতার ব্যাপারে করা হয় এবং যা ইতিপূর্বে সূরা আলে-ইমরানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সেই সময় করা হয়েছিল, যখন মুসলমানদের কাছে এই সংবাদ এসে পৌছে যে, কুরাইশ বাহিনীর জন্য আরও বর্ধিত সাহায্য আসছে। রূহুল মা'আনী গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনযির কর্তৃক শা'বীর উদ্ধৃতিক্রমে উল্লেখ রয়েছে যে, বদরের দিনে মুসলমানদের কাছে এই সংবাদ এসে পৌছে যে কুর্য ইবনে জাবের মুহারেবী মুশরিকীনদের সহায়তার উদ্দেশ্যে আরো সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছে। এ সংবাদে মুসলমানদের মাঝে এক ত্রাসের সৃষ্টি হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আলে-ইমরানের আয়াত اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ অবতীর্ণ হয়। এতে তিন হাজার ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যকল্পে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করার ওয়াদা করা হয়।

আর তৃতীয় ওয়াদা ছিল পাঁচ হাজারের। তা ছিল এই শর্তযুক্ত যে, বিপক্ষ দল যদি প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসে, তবে পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্য পাঠানো হবে। আর তা আলে-ইমরানে উল্লেখিত আয়াতের পরবর্তী আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ – অর্থাৎ যদি তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তাকওয়ার উপর স্থির থাক এবং যদি প্রতিপক্ষীয় বাহিনী তোমাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তোমাদের পরওয়ারদিগার তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে, যাঁরা বিশেষ চিহ্নে অর্থাৎ উর্দিতে সজ্জিত থাকবে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এ ওয়াদার শর্ত ছিল তিনটি। (এক) দৃঢ়তা অবলম্বন, (দুই) তাকওয়ার উপর স্থির থাকা এবং (তিন) প্রতিপক্ষের ব্যাপক আক্রমণ। প্রথম দুটি শর্ত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এমনিতেই বিদ্যমান ছিল এবং তাঁদের এই আশায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতটুকু পার্থক্য আসেনি। কিন্তু তৃতীয় শর্তটি অর্থাৎ ব্যাপক আক্রমণের ব্যাপারটি সংঘটিত হয়নি। কাজেই পাঁচ হাজার ফেরেশতা আগমনের প্রয়োজন হয় নি।

আর সে জন্যই বিষয়টি এক হাজার ও তিন হাজারের মাঝেই সীমিত থাকে। এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। (এক) তিন হাজার বলতে উদ্দেশ্য হলো প্রথমে প্রেরিত এক হাজারের সঙ্গে অতিরিক্ত দু'হাজারকে অন্তর্ভুক্ত করে তিন হাজারে বর্ধিত করে দেওয়া কিংবা (দুই) প্রথমোক্ত এক হাজারের বাইরে তিন হাজার পাঠানো।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, উক্ত তিনটি আয়াতে ফেরেশতাদের তিনটি দল প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি দলের সাথেই একেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। সূরা আন্‌ফালের যে আয়াতে এক হাজারের ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে مُرْدِفِيْنَ শব্দ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো পেছনে লাগোয়া। হয়তো এতে এই ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে যে, এদের পেছনে আরও ফেরেশতা আসবে। পক্ষান্তরে সূরা আলে-ইমরানের প্রথম আয়াতে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য مُنْزَلِيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ সমস্ত ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হবে। এতে একটি গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্ব থেকে যেসব ফেরেশতা পৃথিবীতে অবস্থান করছেন, তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করার পরিবর্তে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এ কাজের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হবে। বস্তুত সূরা আলে ইমরানের দ্বিতীয় আয়াতে পাঁচ হাজারের কথা উল্লেখ রয়েছে, তাতে ফেরেশতাদের مُسَوِّمِيْنَ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা হবেন বিশেষ চিহ্ন এবং বিশেষ পোশাকে ভূষিত। হাদীসের বর্ণায় তাই রয়েছে যে, বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের পাগড়ি ছিল সাদা, আর হুনাইনের যুদ্ধে সাহায্যর জন্য আগত ফেরেশতাদের পাগড়ি ছিল লাল।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে– وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ এতে মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনখান থেকে যে সাহায্যই আসুক না কেন, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপন, সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। তাঁরই আয়ত্তে রয়েছে ফেরেশতাদের সাহায্যও। সবই তাঁর আজ্ঞাবহ। অতএব, তোমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই ওয়াহ্দাহু লা-শরীক সত্তার প্রতিই নিবদ্ধ থাকা কর্তব্য। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমতাশীল, হিকমতওয়ালা ও সুকৌশলী।

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً
لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْ
بِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١١﴾ اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ
فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ
فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

(১১) যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা'গুলো। (১২) যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদের তোমাদের পরওয়ারদিগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। (১৩) যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুত যে লোক আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (১৪) আপাতত বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর তন্দ্রা আরোপ করেছিলেন নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তি দানের উদ্দেশ্যে এবং যখন তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছিলেন, যেন সেই পানির দ্বারা তোমাদেরকে (অযু-গোসলহীন অবস্থা থেকে) পাক (পবিত্র) করে দেন এবং (তদ্দ্বারা যেন) তোমাদের মন থেকে শয়তানি কুমন্ত্রণাকে দূর করে দেন। আর (তাতে যেন) তোমাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করে দেন এবং (যেন) তোমাদের অবস্থানকে মজবুত করে দেন (অর্থাৎ তোমরা যেন বালুতে ধ্বসে না যাও)। সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার রব (সেই) ফেরেশতাদের (যারা সাহায্যের জন্য অবতরণ করেছিল) নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদের সৎসাহস বৃদ্ধি কর। আমি সহসাই কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিচ্ছি। তোমরা কাফিরদের গর্দানের উপর (অস্ত্রের) আঘাত হান এবং তাদের জোড়ায় জোড়ায় হত্যা কর। এটা তারই শাস্তি যে, তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। বস্তুত যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহ্ (তাকে) কঠিন শাস্তি দান করেন (তা দুনিয়াতে কোন বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে কিংবা আখিরাতে সরাসরি অথবা উভয় লোকে)। অতএব (কার্যত বর্তমানে) এই শাস্তিটি আস্বাদন কর এবং জেনে রাখ যে, কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আযাব তো নির্ধারিত রয়েছেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আন্‌ফালের শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার সে সমস্ত নিয়ামতের আলোচনা চলছে যা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে। গযওয়ায়ে বদরের ঘটনাগুলোও সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। গযওয়ায়ে বদরে যেসব নিয়ামত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে দান করা হয়েছে তার প্রথমটি ছিল এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা وَاِذْ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতে

বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নিয়ামত হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা, যা اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নিয়ামত দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। আর তারই আলোচনা করা হয়েছে اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ আয়াতে। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দুটি নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ করে দেওয়া।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্বপ্রথম এই সমর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফির বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌঁছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয়, যা উপরের দিকে ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম সেখানে পৌঁছলে তাঁদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। কোরআনে করীম এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা এ সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে এভাবে বিবৃত করেছে ঃ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى –এর সবিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে।

রাসূলে করীম (সা) প্রথম যেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুন্‌যির (রা) স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোন অধিকার নেই, না কি শুধুমাত্র নিজের মত ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন ? হুযূর আকরাম (সা) বললেন, না, এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ নয়, এতে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে মুন্‌যির (রা) নিবেদন করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কী সর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। মহানবী (সা) তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানির জায়গাটি মুসলমানদের অধিকারে নিয়ে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা) নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আপনার জন্য কোন একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারীগুলিও আপনার কাছেই থাকবে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ্ যদি আমাদিগকে বিজয় দান করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি খোদানাখাস্তা অন্য কোন অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের সাথে গিয়ে মিশবেন, যাঁরা মদীনা তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ আমার ধারণা, তাঁরাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আপনার মদীনা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও পেছনে থাকতেন না। আপনি মদীনায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা হবেন আপনার সহকর্মী। মহানবী

(সা) তার এই বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন এবং তাঁর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। তাতে মহানবী (সা) এবং সিদ্দিকে আকবর (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত মু'আয (রা) তাঁদের হিফাযতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিন'শ তের জন নিরস্ত্র লোকের মুকাবিলা নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ প্রায় এক হাজার সশস্ত্র লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও ওদের দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানী ও চিন্তা-দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল; কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি কর এবং এখনও আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যাপৃত রয়েছ। অথচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভাল অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোন প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদস্তি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হাফেয হাদীস আবূ ইয়ালা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আলী মুর্তযা (রা) বলেছেন, বদর যুদ্ধের এই রাতে এমন কেউ ছিল না, যে ঘুমায় নি। শুধু রাসূলে করীম (সা) সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে নিয়োজিত থাকেন।

ইবনে কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদ নামাযে নিয়োজিত ছিলেন তখন তাঁর চোখেও সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেন, হে আবূ বকর! সুসংবাদ শুন; এই যে জিবরাঈল (আ) টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি– سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যাবে। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবূ জাহ্‌লের হত্যা স্থান, এটা অমুকের, সেটা অমুকের। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে।—(তফসীরে-মাযহারী) আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি-পরিশ্রান্তি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

সুফিয়ান সওরী (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রিওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাযের সময় ঘুম আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।—(ইবনে কাসীর)

এ রাতে মুসলমানরা দ্বিতীয় যে নিয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাঙ্গনের চেহারাই পাল্টে যায়। কুরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল

দুষ্কর। বৃষ্টি এখানে অল্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেওয়া হয়।

উল্লিখিত আয়াতে এ দু'টি নিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে। ১. নিদ্রা ও ২. বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের মন থেকে সে সমস্ত শয়তানি ওয়াসওয়াসা ধুয়ে মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বে পরাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ শত্রুরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি-সামর্থ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদের প্রশান্তি দান করার জন্য; আর তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন, যেন তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানি ওয়াসওয়াসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদের মনকে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের সমরাঙ্গনে মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে। তা'হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদের সাহস দান করতে থাক। আমি এখনই কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুত তোমরা কাফিরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান। তাদের মার দলে দলে।

এভাবে ফেরেশতাদের দু'টি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমত মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করবে। এ কাজটি ফেরেশতা কর্তৃক মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করা কিংবা তাঁদের সাথে মিশে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের দৈব ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও হতে পারে। যা হোক, তাঁদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফেরেশতারা নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফিরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতারা উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের মনে দৈব ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধি করেছেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কতিপয় হাদীসের বর্ণনার দ্বারাও হয়, যা তফসীরে দুররে-মনসুর ও মাযহারীতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ ছিল কুফ্ফার কর্তৃক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ্ তা'আলার সুকঠিন আযাব। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর নাযিল হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজি, অপরদিকে কাফিরদের উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আযাব নাযিল করে তাদেরই অসদাচরণের যৎসামান্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিন শাস্তি হবে আখিরাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে ঃ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ

النَّارِ। অর্থাৎ এটা হলো আমার যৎসামান্য আযাব; এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এর পরে কাফিরদের জন্য আরো আযাব আসবে, যা হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۠ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾

(১৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (১৬) আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য সে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহ্‌র গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান। সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। (১৭) আর তুমি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শ্রবণকারী ; পরিজ্ঞাত। (১৮) এটা তো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ্ নস্যাৎ করে দেবেন কাফিরদের সমস্ত কলা-কৌশল। (১৯) তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌঁছে গেছে। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই কর, তবে আমিও তেমনি করব। বস্তুত তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশিই হোক। জেনে রেখো, আল্লাহ্ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফিরদের সাথে (জিহাদ করতে গিয়ে) মুখোমুখি হয়ে যাও, তখন তা থেকে পশ্চাদপসরণ করো না (অর্থাৎ জিহাদ থেকে পালিয়ে যাবে না)। আর যে ব্যক্তি এমন সময়ে (অর্থাৎ মুকাবিলার সময়ে) পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা নিজের দলের কাছে আশ্রয় নিতে আসার কথা স্বতন্ত্র। বাকি অন্যান্য যারা এমনটি করবে তারা আল্লাহ্র কোপানলে পতিত হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান। [- فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ আয়াতেও একটি কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো এই যে, বদরের দিনে একমুঠো কাঁকর তুলে নিয়ে মহানবী (সা) কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন, যার কণা সমস্ত কাফিরের চোখে গিয়ে পড়ে এবং তারা পরাজিত হয়ে যায়। তাছাড়া সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের আসার বিষয়টি তো উপরে বলাই হলো। সে প্রসঙ্গেই বলা হচ্ছে যে, যখন এমন আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী ঘটে গেছে, যা আপনার ক্ষমতা বহির্ভূত] তখন (এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত ফলশ্রুতির প্রেক্ষাপটে) আপনি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) হত্যা করেন নি; বরং আল্লাহ্ তা'আলা হত্যা করেছেন। তেমনি আপনি কাঁকর নিক্ষেপ করেন নি—অবশ্য (বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নিশ্চয়ই) আল্লাহ্ তা'আলা তা নিক্ষেপ করেছেন (এবং প্রকৃত ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার হওয়া সত্ত্বেও হত্যার চিহ্নসমূহকে যে বান্দার ক্ষমতার উপর চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তার তাৎপর্য হলো,) যাতে তিনি মুসলমানদের নিজের পক্ষ থেকে (তাদের কর্মের জন্য প্রচুর) প্রতিদান দিতে পারেন। (আর আল্লাহ্র রীতি অনুযায়ী কোন কাজের প্রতিদান প্রাপ্তি নির্ভর করে সে কাজটি কর্তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার উপর)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা (সেই মু'মিনদের কথোপকথন) যথাযথ শ্রবণকারী (এবং তাদের কার্যকলাপ ও অবস্থা সম্পর্কে) যথার্থ পরিজ্ঞাত। (সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যেসব কথা তারা বলেছে, যুদ্ধকর্ম ও দুশ্চিন্তাজনক পরিস্থিতিতে তাদেরকে যে ক্লান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে, আমি সে সমস্তই অবগত। আমি সেজন্য তাদেরকে প্রতিদান দেব)। এই তো গেল এক কথা। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল কাফিরদের কলা-কৌশলগুলোকে নস্যাৎ করে দেয়া। (বস্তুত অধিক দুর্বলতা তখনই প্রকাশ পায়, যখন নিজের সমকক্ষতা সম্পন্ন কিংবা দুর্বলের হাতে পরাভূত হতে হয়। আর তাও মু'মিনদের হাতে পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশের উপর নির্ভরশীল। অন্যথায় বলতে পারত যে, আমাদের কৌশল তো দৃঢ়ই ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার দৃঢ়তর কৌশলের সামনে টিকতে পারেনি। এতে করে পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে তাদের সাহস দুর্বল হতো না। কারণ তারা তাদেরকে দুর্বল বলেই মনে করত।) যদি তোমরা মীমাংসা কামনা কর, তবে সে মীমাংসা তো তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েই গেছে—(তা হলো এই যে যারা ন্যায়ের উপর ছিল, তাদের বিজয় হয়েছে।) আর যদি (এখন সত্য বিষয়টি প্রকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তোমরা রাসূলে করীম (সা)-এর বিরোধিতা থেকে) বিরত হয়ে যাও, তবে তা তোমাদের পক্ষে খুবই উত্তম। পক্ষান্তরে (এখনো যদি বিরত না হও ; বরং) তোমরা পুনরায় সে কাজই কর (অর্থাৎ বিরোধিতা), তবে আমি আবার এ কাজই করব (অর্থাৎ তোমাদের পরাজিত করব এবং মুসলমানদের জয়ী করব।) আর (যদি তোমাদের মনে তোমাদের সংগঠনের জন্য কোন

অহংকার থাকে যে, এবার এর চেয়েও বেশি পরিমাণে সমাবেশ করব, তবে মনে রেখো) তোমাদের সংগঠন তোমাদের এতটুকু কাজে লাগবে না, তা যতই হোক না কেন। আর প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, (আসলে) আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের সাথে রয়েছেন (অর্থাৎ তিনি তাদেরই সাহায্যকারী। অবশ্য কখনও কোন উপসর্গের দরুন তাদের বিজয়ের বিকাশ না ঘটলেও বিজয়দানের প্রকৃত পাত্র এরাই। কাজেই তাদের সাথে মুকাবিলা করা নিজেদের ক্ষতি সাধনের নামান্তর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতের প্রথম দু'টিতে ইসলামের একটি সমরনীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে زحف শব্দের মর্মার্থ হলো, উভয় বাহিনীর মুকাবিলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে এই হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং না-জায়েয পন্থায় পালনকারীদের সুকঠিন আযাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

দু'টি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে ঃ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ। অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েয রয়েছে। প্রথমত, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র একটি যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কাবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হলো اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ -এর অর্থ। কারণ تَحَرُّف অর্থ হয় কোন একদিকে ঝুঁকে পড়া।—(রূহুল মা'আনী)

দ্বিতীয়ত, বিশেষ কোন অবস্থা—যাতে সমরক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তা হলো এই যে, নিজেদের উপস্থিত সৈন্যদের দুর্বলতা বোধ করে সেজন্য পেছনের দিকে সরে আসা যাতে মুজাহিদরা অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয়। اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ -এর অর্থ তাই। কারণ, تَحَيُّز -এর আভিধানিক অর্থ হলো মিলিত হওয়া এবং فِئَةٌ অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গণ থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয।

এই স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এই স্বতন্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ —

অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যারা পালিয়ে যায়, তারা আল্লাহ্ তা'আলার গযব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর সেটি হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।

এ আয়াত দু'টির দ্বারা এই নির্দেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যত বেশিই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য তাদের মুকাবিলা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হারাম, দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হলো এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের

উদ্দেশ্যে হবে না; বরং তা হবে পাঁয়তারা, পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুনরাক্রমণের উদ্দেশ্যে।

বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখ্যার সাথে প্রতিপক্ষের কোন তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ তের জনকে মুকাবিলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। তারপরে অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আন্‌ফালের ৬৫ ও ৬৬তম আয়াত নাযিল করা হয়। ৬৫তম আয়াতে বিশজন মুসলমানকে দু'শ কাফিরের সাথে এবং একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফিরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। তারপর ৬৬তম আয়াতে তা আরো শিথিল করার জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয় ঃ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ... ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ অর্থাৎ এখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমান যদি একশ হয় তবে তারা দুশ' কাফিরের উপর জয়ী হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েয রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মুকাবিলা থেকে পালিয়ে যায়, তার পলায়ন পলায়ন নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি দু'জনের মুকাবিলা থেকে পালায় সে-ই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে।-(রূহুল বায়ান)। এখন এই হুকুমই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরীয়তের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গোনাহে কবীরা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলে বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গযওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে কিরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কোরআনে করীম একটি শয়তানি পদস্খলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলীল। ইরশাদ হয়েছে ঃ - اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ

তাছাড়া তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদীনায় এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। মহানবী (সা) অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেন ঃ بل انتم العكارون وانا فئتكم অর্থাৎ "তোমরা পলাতক নও; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি।" এতে মহানবী (সা) এ বাস্তবতাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তাঁদের

পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত, যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গন ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ভীতি ও মহত্ত্ব-জ্ঞানের যে সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি এই বাহ্যিক পশ্চাদপসরণেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেজন্যই নিজেকে অপরাধী হিসাবে মহানবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত করেছিলেন।

তৃতীয় আয়াতে গযওয়ায়ে বদরের অপরাপর ঘটনা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দুর্বলের অলৌকিক বিজয়কে তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফসল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সত্তার প্রতি লক্ষ্য কর, যাঁর সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইবনে জরীর, তাবারী, হযরত বায়হাকী (র) প্রমুখ মনীষী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিনে যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী টিলার পেছন দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়। সে সময় রাসূলে করীম (সা) দোয়া করেন, "ইয়া আল্লাহ্, আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন।" –(রূহুল বয়ান)। তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আপনি একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে হাতেম হযরত ইবনে যায়েদের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) তিনবার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি শত্রু বাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা তিন মুষ্ঠি কাঁকরকে আল্লাহ্ একান্ত ঐশীভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকি ছিল না, যার চোখে অথবা মুখমণ্ডলে এই ধুলি ও কাঁকর পৌঁছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রু বাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এই সুযোগে মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে; ফেরেশতারা পৃথকভাবে তাঁদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন।–(মাযহারী, রূহুল বয়ান)

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দী আর বাকি সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে।

সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে মুসলমানরা এই মহান বিজয় লাভে সমর্থ হলো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের কাছে নিজের নিজের কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ আয়াত। এতে তাঁদেরকে হিদায়েত দান করা হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়! বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের

হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তাদেরকে হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রাসূলে করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেন নি, স্বয়ং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন। সারমর্ম হচ্ছে যে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

مارميت اذ رميت گفت حق
كارما بركارها دارد سبق

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জিহাদে বিজয় লাভের চাইতেও অধিক মূল্যবান ছিল এই হিদায়েতটি, যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণত বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا অর্থাৎ আমি মু'মিনদের এই মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশ্যে। بَلَاءً শব্দের শব্দগত অর্থ হলো পরীক্ষা। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা কখনো বিপদাপদের সম্মুখীন করে, আবার কখনো ধন-দৌলত ও সাহায্য-বিজয় দানের মাধ্যমে হয়। بلاء حسن বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আয়েশ-আরাম, ধনসম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেয়া হয়। এতে দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলেকে বরবাদ করে দেয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কারও গর্বাহংকারের কোন অবকাশ নেই। মওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

فهم وخاطر تيز كردن نيست راه
جز شكسته مى نگيرد فضل شاه

চতুর্থ আয়াতে এর পাশাপাশি এই বিজয়ের আরও একটি উপকারিতার কথা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ মুসলমানদের এ বিজয় এ কারণেও দেয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফিরদের পরিকল্পনা ও কলা-কৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেয়া যায় এবং যাতে কাফিররা এ কথা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই। এবং কোন কলা-কৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে পরাজিত কুরাইশী কাফিরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশী বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কুরাইশ কাফিরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেবার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী-প্রধান আবূ জেহেল প্রমুখ বায়তুল্লাহ্‌র পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দোয়া করেছিল ঃ

"ইয়া আল্লাহ্ ! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশি হিদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশি ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান করো।"—(মাযহারী)

এই নির্বোধরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হিদায়েতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দোয়ার মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা এ কথা জানত না যে, এই দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক-দোয়া করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কোরআনে করীম তাদের বাতলে দিল ঃ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاۤءَكُمُ الْفَتْحُ অর্থাৎ তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ আর যদি তোমরা এখনও কুফরীজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ আর তোমরা যদি আবারো নিজেদের দুষ্টামি ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাব। وَلَنْ تُغْنِىَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ অর্থাৎ তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহ্‌র সাহায্যের মুকাবিলায় তা তোমাদের কোন কাজেই লাগবে না। وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোন দল তোমাদের কিই-বা কাজে লাগতে পারে ?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ

تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ

مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

(২০) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (২১) আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা বলে যে আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনেনা; (২২) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না। (২৩) বস্তুত আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা দেখতেন; তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে। (২৪) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের যে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালনে বিমুখতা অবলম্বন করো না। আর তোমরা (বিশ্বাসগতভাবে) তো শোনই, (অর্থাৎ বিশ্বাসগতভাবে শোন, সেমতে আমলও করতে থেকো)। আর তোমরা (আনুগত্য পরিহারের ক্ষেত্রে) সে সমস্ত লোকের মত হয়ো না, যারা দাবি করে যে, আমরা শুনেছি, (যেমন কাফিররা সাধারণভাবে এবং মুনাফিকরা বিশ্বাসগতভাবে শুনেছে বলে দাবি করছিল) অথচ তারা কিছুই শুনছিল না। (কারণ উপলব্ধি ও বিশ্বাস উভয়টিরই উদ্দেশ্য হলো ফলশ্রুতি। অর্থাৎ শোনার ফল হলো সেমত আমল বা কাজ করা। কাজেই যে শ্রবণের সাথে আমলের সমন্বয় হয় না, তা কোন কোন কারণে বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে না শোনারই তুল্য হয়ে যায়—যাকে তোমরা নিজেরাও অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মনে কর। আর একথা নিশ্চিত যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে শুনে আমল না করে এবং একজন বিশ্বাস ভক্তি ব্যতীত শ্রবণকারী যা না শোনারই তুল্য, এতদুভয়ের মন্দ হওয়ার দিক দিয়ে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। কেননা একজন কাফির এবং একজন পাপী সমান নয়। সুতরাং) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিকৃষ্টতর সৃষ্টি সে সমস্ত লোকই, যারা (সত্য ও ন্যায়কে সবিশ্বাসে শোনার ব্যাপারে) বধির (এবং সত্য কথা বলার ব্যাপারে) মূক। (পক্ষান্তরে) যারা (সত্য ও ন্যায় বিষয়ক একটুও উপলব্ধি করে না, আর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যারা সেমতে আমল করতে গিয়ে শৈথিল্য পোষণ করে তারা নিকৃষ্টতর না হলেও নিকৃষ্ট অবশ্যই। অথচ নিকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়)। আর (যাদের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা বিশ্বাস সহকারে শোনে না, তার

কারণ হলো এই যে, তাদের মধ্যে সৎ জ্ঞানের একটা বিরাট অভাব রয়েছে, আর তা হলো সত্যানুসন্ধিৎসা। কারণ বিশ্বাসের উৎসমূল হলো অনুসন্ধান ও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। এ মুহূর্তে যদি বিশ্বাস নাও থাকে, কিন্তু অন্ততপক্ষে মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা থাকতে হবে। পরে এই উৎকণ্ঠা ও প্রাপ্তির স্পৃহার বরকতেই এক সময় তা যে সত্য ও ন্যায়, তা প্রতিভাত হয়ে যায় এবং সেই উৎকণ্ঠা বিশ্বাসে পরিণত হয়। এরই উপর শ্রবণের উপকারিতা নির্ভরশীল। সুতরাং তাদের মধ্যে এই সৎগুণটির অভাব রয়ে গেছে। বস্তুত) আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে কোন রকম সৎগুণ দেখতেন (অর্থাৎ তাদের মধ্যে উল্লিখিত সৎগুণ বিদ্যমান থাকত; কারণ, সৎগুণের উপস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলার অবগতি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এখানে অপরিহার্য বিষয়টির উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। 'যদি কোন সৎগুণ থাকত' কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, এমন কোন সৎগুণ যখন নেই যার উপর নাজাত তথা আখিরাতের মুক্তি নির্ভরশীল, তখন যেন কোন গুণই নেই। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি সত্য ও ন্যায়ের অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান থাকত) তাহলে (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে (বিশ্বাস সহকারে) শোনার তওফীক দান করতেন। (যেমন, ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে।) আর যদি (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে বর্তমান অবস্থাতেই (অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসার অবর্তমানেই) শুনিয়ে দেন, (যেমন, কখনো কখনো বাহ্যিক কানে শুনে নেয়) তবে অবশ্যই তারা অনীহাভরে তা অমান্য করবে (অর্থাৎ চিন্তা-বিবেচনার পর ভুল প্রকাশিত হওয়ার দরুন অমান্য করেছে এমন নয়। কারণ এখানে ভুলের কোন নাম-নিশানাই নেই। বরং বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এরা এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। আর) হে ঈমানদারগণ, (উপরে তোমাদেরকে হুকুম মান্য করার ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছি, মনে রেখো তাতে তোমাদেরই মঙ্গল নিহিত। সেটা হলো অনন্ত জীবন। কাজেই) তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম মান্য করো যখন রাসূল (যাঁর হুকুম বা বাণী আল্লাহ্রই বাণী) তোমাদের জীবন দানকারী বিষয়ের (অর্থাৎ যে দীনের মাধ্যমে অনন্ত জীবন লাভ হয় তার) প্রতি আহবান করেন। (আর তাতে যখন তোমাদেরই লাভ তখন সেমতে আমল না করার কোনই কারণ থাকতে পারে না।) আর এ প্রসঙ্গে (দু'টি বিষয় আরো) জেনে রাখ—(এক) আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান (দুইভাবে। প্রথমত মু'মিনের অন্তরে ইবাদত-বন্দেগীর বরকতে কুফরী ও পাপকে আসতে দেন না। দ্বিতীয়ত কাফিরদের অন্তরে তার বিরোধিতার অশুভ পরিণতিতে ঈমান ও ইবাদতকে আসতে দেন না। এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, ইবাদতের নিয়মানুবর্তিতা অত্যন্ত উপকারী; আর বিরোধিতা ও হঠকারিতা একান্ত ধ্বংসাত্মক ব্যাপার।) আরো (জেনে রাখ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের সমবেত হতে হবে (তখন আনুগত্যের জন্য প্রতিদান এবং বিরোধিতার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। এতেও আনুগত্যের উপকারিতা ও বিরোধিতার অপকারিতা প্রমাণিত হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বদর যুদ্ধের যে সমস্ত ঘটনা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মুসলমান ও কাফির উভয়ের জন্যই বহু তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ঘটনার মধ্যভাগে সেগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদাহরণত বিগত আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও অপমানের বিবরণ দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান-যমীনের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও গায়েবী শক্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র স্থূল ও জড়-উপকরণ এবং শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে কিংবা আল্লাহর না-ফরমানী করা সত্ত্বেও তাঁর সাহায্য লাভের ভ্রান্ত আশার মাধ্যমে নিজের সাথে প্রতারণা করে।

উল্লিখিত আয়াতে এরই দ্বিতীয় আরেকটি দিক মুসলমানদের সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা হলো এই যে, মুসলমানরা তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই যে সাহায্য, এটা হলো আল্লাহর প্রতি তাঁদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ "ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাতে স্থির থাক।" অতঃপর এ বিষয়টির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ কোরআন ও সত্যের বাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য বিমুখ হয়ো না।

শুনে নেবার অর্থ সত্য বিষয়টি শুনে নেওয়া। শোনার চারটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। (১) কোন কথা কানে নিল সত্য, কিন্তু না বুঝতে চেষ্টা করল, না বুঝল এবং নাই-বা তাতে বিশ্বাস করল আর না সেমত আমল করল; (২) কানে শুনল এবং তা বুঝলও, কিন্তু না করল তাতে বিশ্বাস, না করল আমল; (৩) শুনল, বুঝল এবং বিশ্বাসও করল, কিন্তু তাতে আমল করল না; (৪) শুনল, বুঝল, বিশ্বাস করল এবং সেমতে আমলও করল।

বলা বাহুল্য, শোনার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয় শুধুমাত্র চতুর্থ পর্যায়ে যা পরিপূর্ণ মু'মিনদের স্তর। বস্তুত প্রাথমিক তিনটি পর্যায়ে শ্রবণ থাকে অসম্পূর্ণ। কাজেই এ রকম শোনাকে একদিক দিয়ে না শোনাও বলা যেতে পারে, যা পরবর্তী আয়াতে আলোচিত হবে। যা হোক, তৃতীয় পর্যায়ে শ্রবণ, যাতে সত্যকে শোনা, বোঝা এবং বিশ্বাস বর্তমান থাকলেও তাতে আমল নেই। এতে যদিও শোনার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না, কিন্তু বিশ্বাসেরও একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তা সম্পূর্ণভাবে বেকার যাবে না, এই স্তরটি হলো গোনাহগার মুসলমানদের স্তর। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে যাতে শুধু শোনা ও বোঝা বিদ্যমান, কিন্তু না আছে তাতে বিশ্বাস, না আছে আমল—এটা মুনাফিকদের স্তর। এরা কোরআনকে শুনে, বুঝে এবং প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাস ও আমলের দাবিও করে, কিন্তু বাস্তবে তা বিশ্বাস ও আমলহীন। আর প্রথম পর্যায়ের শ্রবণ হলো কাফির-মুশরিকদের, যারা কোরআনের আয়াতগুলো কানে শুনে সত্যই, কিন্তু কখনও তা বুঝতে কিংবা তা নিয়ে চিন্তা করার প্রতি লক্ষ্য করে না।

উল্লিখিত আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা তো সত্য কথা শুনছ, বুঝছ এবং তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসও রয়েছে, কিন্তু তারপর তাতে পুরোপুরিভাবে আমল করো, আনুগত্যে অবহেলা করো না। তাই শ্রবণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়েই অধিকতর তাগিদ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মুখে একথা বলে সত্য যে, আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই শোনেনি। সে সমস্ত লোক বলতে উদ্দেশ্য হলো সাধারণ কাফিরকুল, যারা শোনার দাবি করে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে বলে দাবি করে না এবং এতে মুনাফিকও উদ্দেশ্য যারা শোনার সাথে সাথে বিশ্বাসেরও দাবিদার। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং সঠিক উপলব্ধি থেকে এতদুভয় সম্প্রদায়ই বঞ্চিত। কাজেই তাদের এই শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলমানদের এদের অনুরূপ হতে বারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত লোকের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে, যারা সত্য ও ন্যায়ের বিষয় গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শ্রবণ করে না এবং তা কবূলও করে না। এহেন লোককে কোরআনে করীম চতুষ্পদ জীবজন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

اَلدَّوَابُّ শব্দটি دَابَّةٌ-এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী যমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি বস্তুকেই دَابَّةٌ বলা হয়। কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও পরিভাষায় دَابَّةٌ বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীব তুল্য, যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মূক। বস্তুত মূক ও বধিরদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধি থাকলেও তারা ইঙ্গিত-ইশারায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং অন্যের কথা উপলব্ধি করে নেয়। অথচ এরা মূক ও বধির হওয়ার সাথে সাথে নির্বোধও বটে। বলা বাহুল্য, যে মূক-বধির বুদ্ধি বিবর্জিতও হবে, তাকে বুঝবার এবং বোঝাবার কোনই পথ থাকে না।

এ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষকে যে أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (সুগঠিত অঙ্গ সৌষ্ঠব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বের বরেণ্য করা হয়েছে এই যাবতীয় ইন'আম ও কৃপা শুধু সত্যের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়কে শুনতে, উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন এই সমুদয় পুরস্কার ও কৃপা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তার ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

তফসীরে রূহুল-বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক দিয়ে সমস্ত জীব-জানোয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যবসায়, আমল ও সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয় তখন নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম হয়ে যায়।

চতুর্থ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা

দেখতেন, তবে তাদেরকে বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন। কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে।

এখানে কল্যাণকর দিক বা সৎচিন্তা বলতে সত্যানুরাগ বোঝানো হয়েছে। কারণ অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে যায় এবং এতেই বিশ্বাস ও আমলের সামর্থ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে যার মাঝে সত্যানুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা নেই, তাতে যেন কোন রকম কল্যাণ নেই। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি কোন রকম কল্যাণ থাকত, তবে তা আল্লাহ্ তা'আলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ্ তা'আলার জানামতে তাদের মধ্যে কোন কল্যাণের চিন্তা তথা সৎচিন্তা নেই, তখন এ কথাই প্রতীয়মান হলো যে, প্রকৃতপক্ষেই তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এই প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি চিন্তা-ভাবনা ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়, তবে তারা কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করবে না, বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়েই নেবে। অর্থাৎ তাদের এই বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দীনের মধ্যে কোন আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয়ে কোন লক্ষ্যই করেনি।

এই বিবৃতির দ্বারা সেই তার্কিক সন্দেহটি দূর হয়ে যায়, যা শিক্ষিত লোকদের মনে উদয় হয়। তা হলো এই যে, একটা কিয়াসের শেক্লে-আউয়াল। এর মধ্য থেকে হদ্দে আওসাতকে ফেলে দিলে ভুল ফলোদয় হয়। তার উত্তর এই যে, এখানে হদ্দে আওসাতের পুনরাবৃত্তি নেই। কারণ এখানে প্রথমোক্ত لَاَسْمَعَهُمْ এবং দ্বিতীয় اَسْمَعَهُمْ-এর মর্ম পৃথক পৃথক। প্রথমোক্ত سماع (শ্রবণ) বলতে গ্রহণসহ শ্রবণ ও উপকারী শ্রবণ উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় سماع (শ্রবণ) বলতে শুধু নিষ্ফল শ্রবণ বোঝানো হয়েছে।

পঞ্চম আয়াতে পুনরায় ঈমানদারদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ পালন ও তাঁদের আনুগত্যের প্রতি এক বিশেষ ভঙ্গিতে হুকুম করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের যেসব বিষয়ের প্রতি আহবান জানান, তাতে আল্লাহ্ ও রাসূলের নিজস্ব কোন কল্যাণ নিহিত নেই; বরং সমস্ত হুকুমই তোমাদের কল্যাণ ও উপকারার্থে হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছেঃ اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা মান, যখন রাসূল তোমাদের এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানান, যা তোমাদের জন্য সঞ্জীবক।

এ আয়াতে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে, তাতে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই কারণেই তফসীরকার আলিমরা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন। আল্লামা সুদ্দী (র) বলেছেন, সেই সঞ্জীবক বস্তুটি হলো ঈমান। কারণ কাফিররা হলো মৃত। হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেছেন, সেটি কোরআন, যাতে দুনিয়া এবং আখিরাতে জীবন ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুজাহিদের মতে তা হলো সত্য। ইবনে ইসহাক বলেন যে, সেটি হচ্ছে 'জিহাদ' যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। বস্তুত এ সমুদয় সম্ভাবনাই স্ব-স্ব স্থানে যথার্থ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অর্থাৎ 'ঈমান', 'কোরআন' অথবা 'সত্যানুগত্য' প্রভৃতি এমনই বিষয় যদ্দ্বারা মানুষের আত্মা সঞ্জীবিত হয়। আর আত্মার জীবন

হলো বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে শৈথিল্য ও রিপু প্রভৃতির যে সমস্ত যবনিকা অন্তরায় থাকে সেগুলো সরে যাওয়া এবং যবনিকার তমসা কেটে গিয়ে নূরে-মা'রেফাতে নূর-এর স্থান লাভ।

তিরমিযী ও নাসায়ী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন রাসূলে করীম (সা) উবাই ইবনে কা'আব (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তখন উবাই ইবনে কা'আব (রা) নামায পড়ছিলেন। তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে হুযূর (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাযির হলেন। হুযূর (সা) বললেন, আমার ডাক সত্ত্বেও আসতে দেরি করলে কেন ? হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) নিবেদন করলেন, আমি নামাযে ছিলাম। হুযূর (সা) বললেন, তুমি কি اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীটি শোননি ? উবাই ইবনে কা'আব (রা) নিবেদন করলেন, আগামীতে এরই অনুসরণ করব, নামাযের অবস্থায়ও যদি আপনি ডাকেন, সঙ্গে সঙ্গে হাযির হয়ে যাব।

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে কোন কোন ফুকাহা বলেছেন, রাসূলের হুকুম পালন করতে গিয়ে নামাযের মধ্যে যে কোন কাজই করা হোক, তাতে নামাযে ব্যাঘাত ঘটে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদিও নামাযের পরিপন্থী কাজ করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরে তা কাযা করতে হবে, কিন্তু রাসূল যখন কাউকে ডাকেন, তখন সে নামাযে থাকলেও তা ছেড়ে রাসূলের হুকুম তা'মীল করবেন।

এই হুকুমটি তো বিশেষভাবে রাসূল (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু অপরাপর এমন কোন কাজ যাতে বিলম্ব করতে গেলে কোন কঠিন ক্ষতির আশংকা থাকে, তখনও নামায ছেড়ে দেওয়া এবং পরে কাযা করে নেওয়া উচিত। যেমন, নামাযে থেকে যদি কেউ দেখতে পায় যে, কোন অন্ধ ব্যক্তি কুয়ায় পড়ে যাবার কাছাকাছি চলে গেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে নামায ছেড়ে তাকে উদ্ধার করা কর্তব্য।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ অর্থাৎ জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেলো। এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান করো। কারণ কোন কোন সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ্ নির্ধারিত কাযা বা নিয়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে না। কোন রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ একথা কারোই জানা নেই, কাল কি হবে।

من نمی گویم زیاں کن یا بفکر سود باش
اے زفرصت بے خبر در ہر چہ باشی زود باش

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াত ঃ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -এ আল্লাহ্ তা'আলা যে মানুষের জীবন-শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, মানবাত্মা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোন বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তাঁর অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারও ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। সে কারণেই রাসূলে করীম (সা) অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন ঃ يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك অর্থাৎ হে অন্তরসমূহের ওলট-পালটকারী, আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ পালনে আদৌ বিলম্ব করো না এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করে তৎক্ষণাৎ তা বাস্তবায়িত করে ফেল। একথা কারোরই জানা নেই যে, অতঃপর সৎকাজের এই প্রেরণা ও আগ্রহ বাকি থাকবে কি না।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ
فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

---

(২৫) আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক, যা বিশেষত তাদের উপর পতিত হবে না; যারা তোমাদের মধ্যে জালিম এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র আযাব অত্যন্ত কঠোর। (২৬) আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে; ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদের আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদের শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (২৭) হে ঈমানদারগণ, খেয়ানত করো না আল্লাহ্র সাথে ও রাসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের

পারস্পরিক আমানতে জেনেশুনে। (২৮) আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুত আল্লাহ্র নিকট আছে মহা সওয়াব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর [যেভাবে তোমাদের পক্ষে নিজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে আনুগত্য করা ওয়াজিব, তেমনিভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের সংশোধনকল্পে 'আমর-বিল মা'রূফ' ও 'নাহী আনিল মুন্কার' (তথা সৎকর্মের প্রতি আহ্বান ও অসৎকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখা)-এর নীতি অনুযায়ী সক্রিয়ভাবে অথবা মৌখিকভাবে কিংবা অসৎ লোকদের সাথে মেলামেশা বর্জন অথবা মনে মনে ঘৃণার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানোও ওয়াজিব। অন্যথায় সে অসৎ কর্মের আযাব যেমন এসব অসৎ কর্মীদের উপর বর্তাবে, তেমনি কোন না কোন পর্যায়ে মৌনতা অবলম্বনকারীদের উপরও পড়বে। কাজেই] তোমরা এহেন বিপদ থেকে বাঁচো, যা বিশেষত সেই সমস্ত লোকের উপরই আসবে না, যারা তোমাদের মধ্যে সে সমস্ত পাপে লিপ্ত হয়েছে। (বরং সেসব পাপানুষ্ঠান দেখেও যারা মৌনতা অবলম্বন করেছে, তারাও তাতে অংশীদার হয়ে পড়বে। আর তা থেকে বাঁচা এই যে, পাপানুষ্ঠান বা অসৎ কর্ম করতে দেখে মৌনতা অবলম্বন করো না।) আর এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ সুকঠিন শাস্তিদানকারী (তাঁর শাস্তির প্রতি ভীত হয়ে মৌনতা থেকে বিরত থাক)। এবং (যেহেতু নিয়ামত ও দানের কথা স্মরণ করলে দাতার আনুগত্যের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহকে, বিশেষ করে) সে অবস্থার কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা (কোন এক সময় অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে সংখ্যায়ও) ছিলে অল্প এবং (শক্তির দিক দিয়েও মক্কা) নগরীতে দুর্বল বলে পরিগণিত হতে। (আর চরম এই দুর্বলতার দরুন তোমরা) শঙ্কিত থাকতে যে, (তোমাদের প্রতিপক্ষ না জানি) তোমাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। বস্তুত (এমনি অবস্থায়) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শান্তিপূর্ণভাবে মদীনায় বসবাস করার স্থান দিয়েছেন এবং তোমাদের স্বীয় সাহায্য-সহায়তার মাধ্যমে (সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়ে এবং জনসংখ্যা বাড়িয়েও) শক্তি দান করেছেন (যাতে তোমাদের সংখ্যাল্পতা, মানসিক দুর্বলতা এবং ছিন্নভিন্নতা প্রভৃতি সমস্ত ভয়ভীতি দূর হয়ে গেছে। আর তিনি যে তোমাদের বিপদই শুধু দূর করে দিয়েছেন তাই নয়, বরং তোমাদের দান করেছেন উচ্চ পর্যায়ের সচ্ছলতা। শত্রুদের উপর তোমাদের বিজয় দানের মাধ্যমে) তোমাদের উত্তম উত্তম বস্তুসামগ্রী দান করেছেন, যাতে তোমরা (এই নিয়ামতসমূহের জন্য) শুকরিয়া আদায় কর (বস্তুত বড় শুকরিয়া হচ্ছে আনুগত্য)। হে ঈমানদারগণ, (আমি বিরোধিতা ও পাপ থেকে এ কারণে বারণ করছি যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্ ও রাসূলের কিছু হক রয়েছে, যার লাভালাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসে। পক্ষান্তরে পাপ ও কৃতঘ্নতায় সে সমস্ত হক বিঘ্নিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেটা তোমাদের লাভের জন্যই ক্ষতিকর। অতএব) তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের হক (বা অধিকার)-এর ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করো না। আর (এসবের পরিণতির প্রেক্ষাপটে বিষয়টি এভাবে বলা যেতে পারে যে, তোমরা) নিজেদের হিফাযতযোগ্য বিষয় (যা তোমাদের জন্য লাভজনক এবং যা কর্মের উপর নির্ভরশীল হয়) বিঘ্ন সৃষ্টি করো না। তাছাড়া তোমরা তো (তার অপকারিতা সম্পর্কে) অবগত রয়েছ। আর (অধিকাংশ সময় ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির প্রীতি ও ভালবাসা আনুগত্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই তোমাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা এ বিষয়টি জেনে রাখ

তোমাদের ধন-দৌলত ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি একটা পরীক্ষার বিষয় যাতে প্রতীয়মান হয়ে যায়, কারা এগুলোকে অগ্রাধিকার দেয় আর কারা আল্লাহ্‌র ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়। অতএব তোমরা এগুলোর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিও না) অগত্যা (যদি এগুলোর লাভালাভের প্রতি লোভই হয়, তবে তোমরা) এ কথাটিও জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট (সে সমস্ত লোকের জন্য) অতি মহান প্রতিদান রয়েছে। (যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং যাদের নিকট আল্লাহ্-প্রীতির তুলনায় এই ধ্বংসশীল লাভালাভের কোন গুরুত্ব নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনে করীম গযওয়ায়ে বদরের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে মুসলমানদের প্রতি নাযিলকৃত এন'আমসমূহের কথা উল্লেখের পর তা থেকে অর্জিত ফলাফল এবং অতঃপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছে। يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত থেকে তা আরম্ভ হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে এমন সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে হিদায়েত করা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আযাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তফসীরবিদ ওলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কোন কোন মনীষী বলেন, 'আম্‌র বিল্ মা'রূফ' তথা সৎ কাজের নিদর্শন দান এবং 'নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার করাই হলো এই পাপ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজের এলাকায় কোন অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ্ স্বীয় আযাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে না বাঁচতে পারে কোন গোনাহ্গার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে 'নিরপরাধ' বলতে সেসব লোককেই বোঝানো হচ্ছে, যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আম্‌র বিল মা'রূফ' বর্জন করার পাপে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোন সন্দেহ করার কারণ নেই যে, একজনের পাপের জন্য অন্যের উপর আযাব করাটা অবিচার এবং কোরআনী সিদ্ধান্ত لَا تَزِرُوْا وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى-এর পরিপন্থী। কারণ এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এবং নিরপরাধরা তাদের 'আম্‌র বিল মা'রূফ' থেকে বিরত থাকার পাপের দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কাঁধে চাপানো হয়নি।

ইমাম বগভী (র) 'শরহুস্‌সুন্নাহ' ও 'মা'আলিন' নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর রিওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নির্দিষ্ট দলের পাপের আযাব সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে তা বাধাদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয়নি। তবেই আল্লাহ্‌র আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।

তিরমিযী ও আবূ দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোন অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের সবার উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা)-এর রিওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যারা আল্লাহ্র কানূনের সীমালংঘনকারী গোনাহগার এবং যারা তাদের দেখেও মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণীর উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মত, যাতে দু'টি শ্রেণী রয়েছে এবং নীচের শ্রেণীর লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নিচের লোকেরা এমন অবস্থা দেখে জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন কাণ্ড দেখেও বারণ করে না। এতে বলাই বাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর তাতে নিচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না।

এসব রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে অনেক তফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে فـتـنـه (ফিতনাহ) বলতে এই পাপ অর্থাৎ "সৎ কাজে নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান" বর্জনকেই বোঝানো হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এই বলার উদ্দেশ্য হলো জিহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকা, যখন আমিরুল মু'মিনীন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জিহাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং ইসলামী 'শেয়ার'-সমূহের হিফাযতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তখন জিহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জিহাদ বর্জনকারীদের উপরই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাফিরদের বিজয়ের ফলে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে পরিণত হয়। তাদের জানমাল বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 'আযাব' অর্থ হবে পার্থিব বিপদাপদ।

এই ব্যাখ্যা ও তফসীরের সামঞ্জস্য হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে জিহাদ বর্জনকারীদের প্রতি ভর্ৎসনা করা হয়েছে ঃ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ এবং يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ প্রভৃতি পরবর্তী আয়াতগুলোও এরই বর্ণনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

গযওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন কতিপয় মুসলমানের পদস্খলন হয়ে যায় এবং ঘাঁটি ছেড়ে নিচে নেমে আসেন, তখন তার বিপদ শুধু তাদের উপরই আসেনি, বরং সমগ্র মুসলিম বাহিনীর উপরই আসে। এমনকি স্বয়ং মহানবী (সা)-কেও সে যুদ্ধে আহত হতে হয়।

দ্বিতীয় আয়াতেও আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্যকে সহজ করার জন্য এবং তাঁর প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের তাদের বিগত দিনের দুরবস্থা, দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব

এবং পরে স্বীয় অনুগ্রহ ও নিয়ামতের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেরকে শক্তি ও শান্তিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, তোমরা সে অবস্থার কথা স্মরণ কর, যা হিজরতের পূর্বে মক্কা মুআয্যমায় ছিল। তখন তোমরা সংখ্যায় যেমন অল্প ছিলে তেমনি শক্তিতেও। সর্বক্ষণ আশংকা লেগেই থাকত যে, শত্রুরা তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মদীনায় উত্তম অবস্থান দান করেছেন। শুধু অবস্থান বা আশ্রয় দান করেন নি ; বরং স্বীয় সমর্থন ও সাহায্যের মাধ্যমে তাদেরকে দান করেছেন শক্তি, শত্রুর উপর বিজয় এবং বিপুল মালামাল। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থার এহেন পরিবর্তন, আল্লাহ্র উপঢৌকন এবং নিয়ামতরাজি দানের উদ্দেশ্য হলো, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশও তাঁর নির্দেশ বা হুকুম-আহকাম পালনের উপরেই নির্ভরশীল।

তৃতীয় আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার হকসমূহ কিংবা পারস্পরিকভাবে বান্দার হকসমূহের খেয়ানত করো না; হক আদায়ই করবে না কিংবা আদায় করলেও অন্য কোন রকম শৈথিল্যের সাথে আদায় করবে এমন যেন না হয়। আয়াতের শেষ ভাগে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ বলে এ কথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তো খেয়ানতের অপকারিতা ও বিপদ সম্পর্কে জানই। তারপরেও সেদিকে পদক্ষেপ নেওয়া মোটেই বুদ্ধিমত্তার কথা নয়। আর যেহেতু আল্লাহ্ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফলতি ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণত মানুষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ এ কথা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমদের জন্য ফিতনা।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমন সব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয়, যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিন অর্থেই 'ফিতনা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোন কোন সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আযাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমত ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃতজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই তেমাদের জন্য আযাব হয়ে দাঁড়াবে। কোন সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিকে আযাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় এ কথাটি অপরিহার্য যে, যে ধন-সম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহকামের

বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে কিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখিরাতে তার জন্য সাপ, বিচ্ছু ও আগুনের পোড়ার কারণ হবে। যেমন কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু-সামগ্রী আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে গাফিল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম-আহ্‌কামের প্রতি অমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আযাবের কারণ হয়ে যায়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে ঃ "وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ" অর্থাৎ এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

এ আয়াতের বিষয়বস্তু সমস্ত মুসলমানের জন্যই ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ মনীষীর মতে আয়াতটি গয্ওয়ায়ে 'বনু কুরায়যা'-র ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত আবূ লুবাবা (রা)-এর কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিল। মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম বনু কুরায়যার দুর্গটিকে দীর্ঘ একুশ দিন যাবত অবরোধ করে রেখেছিলেন। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা দেশ ত্যাগ করে শাম দেশে (সিরিয়া) চলে যাবার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু তাদের দুষ্টুমির প্রেক্ষিতে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন এবং বলে দেন যে, সন্ধির একটি মাত্র উপায় আছে যে, সা'দ ইবনে মুআয (রা) তোমাদের ব্যাপারে যে ফয়সালা করবেন তোমরা তাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করবে। তারা আবেদন জানাল, সা'দ ইবনে মুআয (রা)-এর পরিবর্তে বিষয়টি আবূ লুবাবা (রা)-এর উপর অর্পণ করা হোক। তার কারণ, আবূ লুবাবা (রা)-এর আত্মীয়স্বজন ও কিছু বিষয়-সম্পত্তি বনু কুরায়যার মধ্যে ছিল। কাজেই তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি আমাদের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন। যা হোক, হুযূর আকরাম (সা) তাদের আবেদনক্রমে হযরত আবূ লুবাবা (রা)-কেই পাঠিয়ে দিলেন। বনু কুরায়যার সমস্ত নারী-পুরুষ তাঁর চারদিকে ঘিরে কাঁদতে আরম্ভ করল এবং জিজ্ঞেস করল, যদি আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর হুকুমমত দুর্গ থেকে নেমে আসি, তাহলে তিনি আমাদের ব্যাপারে কিছুটা দয়া করবেন কি ? আবূ লুবাবা (রা) এ বিষয়ে অবগত ছিলেন যে, তাদের এ ব্যাপারে সদয়াচরণের কোন পরিকল্পনা নেই। কিন্তু তিনি তাদের কান্নাকাটিতে এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনের মায়ায় কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং নিজের গলায় তলোয়ারের মত হাত ফিরিয়ে ইঙ্গিতে বললেন, তোমাদের জবাই করা হবে। এভাবে মহানবী (সা)-এর পরিকল্পনার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়া হলো।

ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসায় এ কাজ তিনি করে বসলেন বটে, কিন্তু সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে অনুভব করলেন যে, তিনি খেয়ানত করে ফেলেছেন। সেখান থেকে যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন লজ্জা ও অনুতাপ তাঁর উপর এমন কঠিনভাবে চেপে বসে যে, হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার পরিবর্তে সোজা গিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লেন এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে নিজেকে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেন। তারপর এরূপ কসম খেয়ে নেন যে, যতক্ষণ না আমার তওবা কবূল হবে, এভাবে বাঁধা অবস্থায় থাকব; এভাবে যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তবুও। সুতরাং এভাবে সাত দিন পর্যন্ত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তাঁর দেখাশোনা করেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং নামাযের সময় হলে বাঁধন খুলে দিতেন, আর তা

থেকে ফারেগ হওয়ার পর আবার বেঁধে দিতেন। কোন রকম খানাপিনার ধারে কাছেও যেতেন না। এমন কি ক্ষুধায় একেক সময় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন।

প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন বললেম, সে যদি প্রথমেই আমার কাছে চলে আসত, তবে আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করতাম। কিন্তু এখন তাঁর তওবা কবূলের নির্দেশের জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।

অতএব, সাতদিন অন্তে শেষ রাতে তাঁর তওবা কবূল হওয়ার ব্যাপারে হুযূর (সা)-এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। কোন কোন লোক তাঁকে এ সুসংবাদ জানান এবং বাঁধন খুলে দিতে চান। তাতে তিনি (আবূ লুবাবা) বলেন, যতক্ষণ না স্বয়ং মহানবী (সা) নিজ হাতে আমাকে বাঁধনমুক্ত করবেন, আমি মুক্ত হতে চাই না। অতএব, হুযূর (সা) ভোরে যখন নামাযের সময় মসজিদে তশরীফ আনেন, তখন স্বহস্তে তাঁকে মুক্ত করেন। উল্লিখিত আয়াতে খেয়ানত ও ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির মায়ার সামনে নতি স্বীকার করার যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, এ ঘটনাটিই ছিল তার কারণ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (২৯) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (৩০) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ
سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَ
وَّلِينَ (৩১) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (৩২) وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ (৩৩)

(২৯) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, তবে তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ্র অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান। (৩০) আর কাফিররা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে

বের করে দেয়ার জন্য, তখন তারা যেমন চক্রান্ত করত তেমনি আল্লাহ্ও কৌশল করতেন। বস্তুত আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (৩১) আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি ; এ তো পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩২) তাছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ভ করে যে, ইয়া আল্লাহ্, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য দীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাযিল কর। (৩৩) অথচ আল্লাহ্ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ্ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আর) হে ঈমানদারগণ, (আনুগত্যের আরও বরকতের কথা শুন। তা হলো এই যে,) যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ভীত (থেকে তাঁর আনুগত্য করতে) থাক তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একটি মীমাংসাপূর্ণ বস্তু দান করবেন। (এতে হিদায়েত ও মনের জ্যোতি, যার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে জ্ঞানগত পার্থক্য স্থাপিত হয় এবং শত্রুর উপর বিজয় ও আখিরাতের নাজাতের বিষয় যাতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কার্যকর পার্থক্য সূচিত হয়, সবকিছুই এসে যায়।) আর তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন মহান অনুগ্রহের অধিকারী। (কাজেই আল্লাহ্ যে তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে আরও কি কি দান করবেন তার ধারণা কল্পনাও করা যায় না।) আর (হে মুহাম্মদ, নিয়ামতরাজির আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমানদের নিকট এ বিষয়েও আলোচনা করুন যে, আপনার সম্পর্কে) কাফিররা যখন (নানা রকম হীন) পরিকল্পনা নিচ্ছিল যে, আপনাকে (কি) বন্দী করে রাখবে, না হত্যা করে ফেলবে, নাকি স্বদেশ থেকে বের করে দেবে, তখন তারা অবশ্য নিজ নিজ পরিকল্পনা নিচ্ছিল, কিন্তু (সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে সুনিপুণ ব্যবস্থাপক। (তাঁর ব্যবস্থার সামনে তাদের যাবতীয় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং আপনি পরিপূর্ণ হিফাযতে রয়েছেন এবং অক্ষত অবস্থায় মদীনায় এসে পৌঁছেছেন। এভাবে তাঁর অব্যাহতি লাভ যেহেতু মু'মিনদের পক্ষে অশেষ সৌভাগ্যের চাবিকাঠি ছিল, কাজেই এ ঘটনাটি ব্যক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।) আর (সে কাফিরদের অবস্থা হলো এই যে,) তাদের সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন বলে, আমরা (এগুলো) শুনেছি (এবং অনুধাবন করেছি যে, এগুলো কোন মু'জিযা নয়, কারণ) ইচ্ছা করলে আমরাও এমন সব কথা বলতে পারি। (কাজেই) এটি (অর্থাৎ কোরআন) তো (আল্লাহ্র কোন কালাম বা মু'জিযা প্রভৃতি) কোন কিছুই নয়; শুধুমাত্র সনদহীন এমন কিছু কথা যা পূর্ব থেকেই কথিত হয়ে আসছে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বীরাও এমনি একত্ববাদ ও রিসালাত প্রভৃতি দাবি করে আসছিল। তাদেরই কথিত বিষয়বস্তু আপনিও উদ্ধৃত করেছেন। আর তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য অবস্থা হলো এই যে,) যখন তারা (নিজেদের গণ্ডমূর্খতার চরমাবস্থা প্রকাশ করতে গিয়ে এ কথাও) বলল যে, হে আল্লাহ্, এই কোরআন যদি বাস্তবিকই তোমার পক্ষ থেকে এসে

থাকে, তবে (একে অমান্য করার কারণে) আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর (অন্য কোন) বেদনাদায়ক আযাব নাযিল করে দাও (যা অস্বাভাবিকতার দিক দিয়ে প্রস্তর বর্ষণের মতই কঠিন হবে। কিন্তু এ ধরনের কোন আযাব নাযিল না হওয়ার দরুন কাফিররা নিজেদের সত্যতার উপর গর্ব করতে আরম্ভ করে) এবং (এ কথা উপলব্ধি করে না যে, তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করার পরেও বিশেষ কোন বাধার ফলেই তাদের উপর সেরূপ আযাব অবতীর্ণ হচ্ছে না। বস্তুত সে বাধা এই যে,) আল্লাহ্ এমন করবেন না যে, তাদের মাঝে আপনার সত্তা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর (এমন) আযাব দেবেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের ক্ষমা প্রার্থনার অবস্থায় (এমন) আযাব দেবেন না। [যদিও এই ক্ষমা প্রার্থনা তাদের ঈমান না থাকার দরুন আখিরাতে লাভজনক হবে না, তথাপি তা যেহেতু একটি সৎ কাজ, সুতরাং পার্থিব জীবনে কাফিরদের জন্যও তা লাভজনক হয়ে থাকে। মোদ্দাকথা, এ সমস্ত অস্বাভাবিক আযাবের পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হিসাবে রয়েছে। এক. মক্কা নগরীতে কিংবা পৃথিবীতে হুযূর আকরাম (সা)-এর বর্তমান থাকা এবং দুই. তাওয়াফ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাদের غفر انك (হে পরওয়ারদিগার, আমাদের ক্ষমা কর) বলা যা হিজরত ও ওফাতের পরেও প্রচলিত ছিল। তাছাড়া হাদীসে আরও একটি প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ রয়েছে যে, তাদেরও হুযূর (সা)-এর উম্মতের মধ্যে হওয়া যদিও ঈমান গ্রহণ না করে। এই প্রতিবন্ধকতা কিংবা অস্বাভাবিক আযাবের পথে এই অন্তরায় কারও ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা না করা সত্ত্বেও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ই বস্তুত আযাবের পথে অন্তরায়। অবশ্য কোন কোন অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও কোন কোন অস্বাভাবিক আযাব বিশেষ কোন কল্যাণের ভিত্তিতে এসে যেতে পারে। যেমন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে চেহারার বিকৃতি প্রভৃতি আযাবের কথা হাদীসসমূহে উল্লেখ রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি ফিতনা-বিশেষ। অর্থাৎ এগুলো সবই পরীক্ষার বিষয়। কারণ এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণত আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি গাফিল হয়ে পড়ে। অথচ এই মহানিয়ামতের যৌক্তিক দাবি ছিল, আল্লাহ্র এহেন মহা অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া।

আলোচ্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করবে—যাকে কোরআন ও শরীয়তের ভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয়—তাহলে সে এর বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে। (১) ফুরকান, (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৩) মাগফিরাত বা পরিত্রাণ।

فرقان ও فرق দু'টি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে فرقان (ফুরকান) এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয়, যা দু'টি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে দেয়। সেজন্যই কোন বিষয়ের মীমাংসাকে ফুরকান বলা হয়। কারণ তা হক ও না-হকের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যকেও ফুরকান বলা হয়। কারণ এর দ্বারাও সত্যপন্থীদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার

পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কোরআনে করীমে গযওয়ায়ে বদরকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে বর্ণিত 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফুরকান' দান করা হবে—কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাস্‌সির মনীষীর মত এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হিফাযত করেন। কোন শত্রু তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

هرکه ترسید ازحق وتقوی گزید

ترسد ازوے جن وانس وهرکه دید

তফসীরে মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত আবূ লুবাবা (রা) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যে পদস্খলন ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, পরিবার-পরিজনের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পন্থা। তা হলেই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সবই আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযতে চলে আসত। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন যে, এ আয়াতে ফুরকান বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি-মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাঁড়ায় এই যে, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করেন, আল্লাহ্ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভাল-মন্দের পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তা হলো পাপের মোচন। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় দুনিয়াতে সেগুলোর কাফ্‌ফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। অর্থাৎ এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তৌফিক তার হয়, যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রবল হয়ে পড়ে। তাকওয়ার প্রতিদানে তৃতীয় যে জিনিসটি লাভ হয়, তা হলো আখিরাতের মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, আমলের যে প্রতিদান তা তো আমলের পরিমাণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এখানেও তাকওয়ার প্রতিদানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা তারই বদলা বা প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহ্ হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহ ও ইহসানের অধিকারী। তাঁর দান ও দয়া কোন পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও ইহসানের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আরও বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ এক অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা রাসূলে মকবুল (সা), সাহাবায়ে কিরাম তথা সমগ্র বিশ্বের উপরই হয়েছে। তা হলো এই যে, হিজরত-পূর্বকালে মহানবী (সা) যখন কাফিরদের দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন এবং তারা তাঁকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন

তাদের এ অপবিত্র হীন চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে দেন এবং মহানবী (সা)-কে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে দেন।

তফসীরে ইবনে কাসীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহ্মদ ও ইবনে জরীর (র) প্রমুখের রিওয়ায়েতক্রমে এই ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদীনা থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদীনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন, তখন এঁদের একটি কেন্দ্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এঁরা যেকোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (সা)-ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুন-নদ্ওয়াত'-এ এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন-নদওয়া' ছিল মসজিদে-হারাম সংলগ্ন কুসাই ইবনে কিলাবের বাড়ি। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়িটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামী আমলে এটিকে মসজিদে-হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবুয-যিয়াদাতই' সে স্থান যাকে তৎকালে 'দারুন-নদওয়া' বলা হতো।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরাইশ নেতৃবর্গ দারুন-নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিলেন, যাতে আবূ জাহ্ল, নযর ইবনে হারেস, উমাইয়া ইবনে খালফ, আবূ সুফিয়ান প্রমুখসহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মুকাবিলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

পরামর্শ সভা আরম্ভ হতে যাচ্ছিল। এমন সময় ইবলীসে লাঈন এক বর্ষীয়ান আরব শেখের রূপ ধরে 'দারুন-নদওয়া'র দরজায় এসে দাঁড়াল। উপস্থিত লোকেরা জানতে চাইল যে, তুমি কে এবং এখানে কেন এসেছ। সে জানাল, আমি নজদের অধিবাসী। আমি জানতে পেরেছি, আপনারা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পরামর্শ করছেন। কাজেই প্রবল সহানুভূতির কারণে আমিও এসে উপস্থিত হয়েছি। হয়তো এ ব্যাপারে আমিও কোন উপকারী পরামর্শ দিতে পারব।

একথা শোনার পর তাকেও ভেতরে ডেকে নেয়া হয়। তারপর যখন পরামর্শ আরম্ভ হয়—সুহায়লীর রিওয়ায়েত অনুযায়ী—তখন আবুল বুখতারী ইবনে হিশাম এই প্রস্তাব উত্থাপন করে যে, তাঁকে অর্থাৎ মহানবী (সা)-কে লোহার শিকলে বেঁধে কোন ঘরে বন্দী করে এমনভাবে তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হোক, যাতে তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) নিজে নিজেই মৃত্যুবরণ করেন। একথা শুনে নজদী শেখ ইবলীসে লাঈন বলল, এ মত যথার্থ নয়। কারণ তোমরা যদি এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কর, তবে বিষয়টি গোপন থাকবে না; দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাঁর সাহাবী ও সঙ্গী-সাথীদের আত্মনিবেদনমূলক কীর্তি সম্পর্কে তো তোমরা সবাই অবগত। হয়তোবা তারা সবাই সমবেত হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণই করে বসবে এবং তাদের

বন্দীকে মুক্ত করে নেবে। চারদিক থেকে সমর্থনের আওয়ায উঠল, নজদী শেখ যথার্থ বলেছেন। তারপর আবূ আসওয়াদ মত প্রকাশ করল যে, তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হোক। তিনি বাইরে গিয়ে যা খুশী তাই করুন। তাতে আমাদের শহর তার ফিতনা-হাঙ্গামা থেকে বেঁচে থাকবে এবং আমাদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহেরও ঝুঁকি নিতে হবে না।

এ কথা শুনে নজদী শেখ আবার বলল, এ মতটিও সঠিক নয়। তিনি যে কেমন মিষ্টভাষী তোমরা কি সে কথা জান না ? মানুষ তাঁর কথা শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। তাঁকে এভাবে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হলে অতিশীঘ্রই তিনি এক শক্তিশালী দল সংগঠিত করে ফেলবেন এবং আক্রমণ চালিয়ে তোমাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলবেন। এবার আবূ জাহ্‌ল বলল, করার যে কাজ তোমাদের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারনি। একটি কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তা হলো এই যে, আমরা সমস্ত আরব গোত্র থেকে একেক জন যুবককে বেছে নেব এবং তাদেরকে একটি করে উত্তম ও কার্যকর তলোয়ার দিয়ে দেব। আর সবাই মিলে সমবেত হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে আমরা তাঁর ফিতনা-হামলা থেকে প্রথমে অব্যাহতি লাভ করি। তারপর থাকল তাঁর গোত্র বনু আবদে মানাফ-এর দাবি-দাওয়া, যা তারা তাঁর হত্যার কারণে আমাদের উপর আরোপ করবে। বস্তুত এককভাবে যখন তাঁকে কেউ হত্যা করেনি; বরং সব গোত্রের একেক জন মিলে করেছে, তখন কিসাস অর্থাৎ জানের বদলা জান নেয়ার দাবি তো থাকতেই পারে না। শুধু থাকবে হত্যার বিনিময়ের দাবি। তখন তা আমরা সব কবীলা বা গোত্র থেকে জমা করে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেব এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যাব।

নজদী শেখ তথা ইবলীসে লাঈন একথা শুনে বলল, ব্যাস, এটাই হলো শত কথার এক কথা, মতের মত মত। আর এছাড়া অন্য কোন কিছুই কার্যকর হতে পারে না। অতঃপর গোটা বৈঠক এ মতের পক্ষেই সমর্থন দান করে এবং আজকের রাতের ভেতরেই নিজেদের ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ়সংকল্প করে নেয়।

কিন্তু নবী-রাসূলদের গায়েবী শক্তি সম্পর্কে এই মূর্খের দল কেমন করে জানবে ! সেদিকে হযরত জিবরাঈল (আ) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা)-কে অবহিত করে এই ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। সেই সাথে এ কথাও জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কুরাইশী নওজওয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু'আলম (সা)-এর বাড়িটি অবরোধ করে ফেলে। রাসূলে করীম (সা) বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আলী (রা) এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবী (সা)-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, হুযূর (সা) এই অবরোধ ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে! বস্তুত স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এক মু'জিযার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তা হলো এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে মহানবী (সা) একমুঠো মাটি হাতে

নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি ; অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর কোন এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ ? তারা জানাল, মুহাম্মদ (সা)-এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন্ স্বপ্নে পড়ে রয়েছ; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গিয়েছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গিয়েছেন! তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল। সবার মাথায় মাটি পড়েছিল।

হযরত আলী (রা) মহানবী (সা)-এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মদ (সা) নন। কাজেই তাঁকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এই রাত এবং এতে রাসূলে করীম (সা)-এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রা)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

কুরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী (সা) সম্পর্কে যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল, সে সবকটিই কোরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْيَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ অর্থাৎ সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দেবে।

কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

আরবী অভিধানে مكر শব্দের অর্থ হলো কোন ছল-কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের লোককে তার উদ্দেশ্য সাধনে বিরত রাখা। বস্তুত এ কাজ যদি কোন সদুদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অসৎ মতলবে করা হলে দূষণীয় এবং মন্দ কাজ। কাজেই এ শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমনসব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা কিংবা তুলনার মাধ্যমে দূষণীয় ছলনার কোন অবকাশ থাকতে না পারে। যেমনটি এখানে হয়েছে। (মাযহারী)

এখানে এ কথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতের শেষাংশে যেসব শব্দ বলা হয়েছে তা বর্তমান-ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ অর্থাৎ তারা ঈমানদারদেরকে কষ্ট দানের জন্য কলাকৌশল করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ তাদের সে কলাকৌশলকে ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে থাকবেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা-তদবীর করাটা কাফিরদের চিরাচরিত বৃত্তি থাকবে। আর তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতাও সর্বকালেই সত্যিকার মুসলমানদের উপর থেকে তাদের সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিতে থাকবে।

একত্রিশ ও বত্রিশতম আয়াতে সেই 'দারুন-নদওয়ার' জনৈক সদস্য নযর ইবনে হারিসের এক অহেতুক সংলাপ এবং ত্রিশতম আয়াতে তার জওয়াব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নযর ইবনে হারিস ব্যবসায়ী লোক ছিল এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে ইহুদী-নাসারাদের গ্রন্থ ও তাদের ইবাদত-উপাসনা বারবার দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই সে যখন কোরআনে করীমে বিগত উম্মতসমূহের অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ শুনল তখন বলল ঃ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ "এসব তো আমাদের শোনা কথাই। আমরা ইচ্ছা করলে এমন কথা বলতে পারি। এগুলো তো বিগত লোকদেরই ইতিকথা" তারপর কোন কোন সাহাবী যখন তাকে লা-জওয়াব করে দিলেন যে, যদি বলতেই পার, তবে বলছ না কেন ? কোরআন যে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধান করে দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জও করে দিয়েছে যে, এর বিরোধিতা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোরআনের ছোট একটি সূরার অনুরূপই একটি সূরা উপস্থাপন করে দেখাক। অথচ বিরোধিতায় যারা জানের বাজি লাগিয়েছিল, যারা ধন-দৌলত আর সন্তানসন্ততিকে পর্যন্ত কুরবান করেছিল তাদের সবাই মিলে কোরআনের মুকাবিলায় ছোট একটি সূরাও পেশ করতে পারেনি। তাহলে এ কথা বলা যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে আমরাও এমন কালাম বলতে পারি,—এমন একটি কথা যা লাজ-লজ্জার অধিকারী কোন লোকই বলতে পারে না। তারপর নযর ইবনে হারিসের সামনে সাহাবায়ে কিরাম এই কালামের সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, তখন সে স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদের উপর তার দৃঢ়তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল ঃ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ হে আল্লাহ্, এই কোরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন আযাব নাযিল করে দিন।

স্বয়ং কোরআন করীম এর উত্তর দিয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা), আপনার মক্কায় থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না। কারণ সমস্ত নবী-রসূলের ব্যাপারেই আল্লাহ্র নীতি এই যে, তাঁরা যে জনপদে থাকেন তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আযাব নাযিল করেন না, যতক্ষণ না স্বীয় পয়গম্বরদের সেখান থেকে সরিয়ে নেন। যেমন হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ) ও হযরত লূত (আ)-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যতক্ষণ তাঁরা নিজেদের জনপদে অবস্থান করছিলেন, আযাব আসেনি। কিন্তু যখন তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে গেছেন, তখনই আযাব এসেছে। বিশেষ করে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া, যাঁকে সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের জন্য রহমত নামে অভিহিত করা হয়েছে, তাঁর কোন জনপদে অবস্থান করা সত্ত্বেও সেখানকার অধিবাসীদের উপর আযাব আসা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী।

এ উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমরা তো কোরআন ও ইসলামের বিরোধিতার কারণে পাথর বর্ষণেরই যোগ্য, কিন্তু মহানবী (সা)-এর মক্কায় অবস্থান এর অন্তরায়। ইমাম ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতের এ অংশটি সে সময় নাযিল হয়েছিল, যখন হুযূর (সা) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তারপর মদীনায় হিজরত করার পর আয়াতের দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়। وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না, যখন তারা ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর মর্ম এই যে, মহানবী (সা)-এর মদীনা চলে যাবার পর যদিও ব্যাপক আযাবের পথে যে অন্তরায় ছিল তা দূর হয়ে গেছে, অর্থাৎ তাঁর সেখানে বর্তমান থাকা, কিন্তু তারপরেও আযাব আসার পথে আরেকটি বাধা রয়ে গেছে তা হলো এই যে, অনেক দুর্বল মুসলমান যারা হিজরত করতে পারছিলেন না, সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে ইস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরই খাতিরে মক্কাবাসীদের উপর আযাব নাযিল করা হয়নি।

অতঃপর এ সমস্ত মুসলমানও হিজরত করে যখন মদীনায় পৌঁছে যান, তারপরে আয়াতের এই বাক্যটি নাযিল হয় : وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দেবেন না তা কেমন করে হয়, অর্থাৎ তারা রাসূলকে মসজিদে হারামে গিয়ে ইবাদত করতে বাধা দান করে।

অর্থাৎ আযাব আসার পথের দু'টি অন্তরায়ই এখন দূর হয়ে গেছে। এখন মক্কাতে না আছেন মহানবী (সা), না আছেন ক্ষমা প্রার্থনাকারী মুসলমানগণ। অতএব আযাব আসতে এখন আর কোন বাধাই অবশিষ্ট নেই। বিশেষত তাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা ছাড়াও আরেকটি অপরাধ সংযোজিত হয়েছে যে, তারা নিজেরা তো ইবাদত-উপাসনার যোগ্য ছিলই না, তদুপরি যেসব মুসলমান ইবাদত, ওমরা ও তওয়াফের উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে আসতে চায়, তাদেরকেও বাধাদান করতে শুরু করেছে। অতএব, এখন তাদের শাস্তি প্রাপ্তির বিষয়টি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ; সুতরাং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপর আযাব নাযিল করা হয়।

মসজিদে হারামে ঢোকার পথে বাধাদানের ঘটনাটি ঘটেছিল গযওয়ায়ে হুদায়বিয়ার সময় যখন মহানবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে নিয়ে ওমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল এবং হুযূরকে ও সঙ্গী সাহাবায়ে কিরামকে ইহ্রাম খুলে ফেলতে এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। ঘটনাটি ৬ষ্ঠ হিজরী সালের। এরই দু'বছর পর হিজরী অষ্টম সালে মক্কা বিজয় হয়ে যায়। আর এভাবেই তাদের উপর মুসলমানদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব নাযিল হয়।

এ আয়াতে যে তফসীর ইবনে জরীর (র) করেছেন, তা মহানবী (সা)-এর মক্কায় অবস্থানকে আযাব না আসার কারণ বলে সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, মহানবী (সা)-এর এ পৃথিবীর বুকে বর্তমান থাকাটাই আযাবের পথে অন্তরায় ছিল। যে পর্যন্ত তিনি দুনিয়ায় বর্তমান থাকবেন, তাঁর জাতির উপর আযাব আসতে পারে না। আর তার হেতু

একান্তই স্পষ্ট যে, তাঁর অবস্থা অন্যান্য নবী-রাসূলের মত নয়। কারণ তাঁরা অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ বিশেষ বিশেষ স্থান, জনপদ, জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কাজেই সেখান থেকে বেরিয়ে যখন তাঁরা অন্য কোন এলাকায় চলে যেতেন, তখনই তাঁদের জাতি বা উম্মতের উপর আযাব চলে আসত। পক্ষান্তরে সাইয়্যেদুল-আম্বিয়া (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালাত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বিস্তৃত। সারা বিশ্ব তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের আওতাভুক্ত। সুতরাং যতক্ষণ তিনি দুনিয়ার বুকে যেকোন অংশে বর্তমান থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কওমের উপর আযাব আসতে পারে না।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মর্ম হবে এই যে, মক্কাবাসীদের কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে তাদের উপর পাথর বর্ষণই উচিত, কিন্তু দু'টি বিষয় এ আযাবের অন্তরায় হয়। প্রথমত মহানবী (সা)-এর পৃথিবীতে আগমন এবং দ্বিতীয়ত মক্কাবাসীদের ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। কারণ তারা কাফির হওয়া সত্ত্বেও কা'বার তওয়াফ প্রভৃতি অনুষ্ঠানকালে غفرانك غفرانك বলত এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত। তাদের এই ইস্তেগফার কুফরী ও শিরকীর দরুন আখিরাতে লাভজনক না হলেও পার্থিব জীবনে এতটুকু লাভ তারা অর্জন করেছে যে, দুনিয়াতে আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা কারো কোন আমল বিনষ্ট করে দেন না। কাফির ও মুশরিকরা যদি নেক আমল করে, তবে তার প্রতিদান ইহজগতেই তাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়।

তারপরের বাক্য যে, "এমনটি কেমন করে হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আযাব দান করবেন না, অথচ তারা মুসলমানদের মসজিদে হারামে গিয়ে ইবাদত করতে বাধা দান করে। এর মর্ম এ ক্ষেত্রে এই হবে যে, পার্থিব জীবনে তাদের উপর আযাব না আসায় তাদের গর্বিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়া উচিত নয় যে, আমরা অপরাধী নই, কিংবা আমাদের উপর আদৌ আযাব হবে না। দুনিয়াতে না হলেও আখিরাতের আযাব থেকে তাদের কোনক্রমেই অব্যাহতি নেই। এই ব্যাখ্যা মতে مَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمْ বাক্যে আযাব বলতে আখিরাতের আযাবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। প্রথমত এই যে, যে জনপদে লোকেরা ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, তাতে আযাব নাযিল করেন না।

দ্বিতীয়ত রাসূলের বর্তমানে তাঁর উম্মতের উপর তা তারা মুসলমান হোক কিংবা কাফির—আযাব আসবে না। অর্থাৎ এমন ব্যাপক কোন আযাব নাযিল হবে না, যাতে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যেমনটি ঘটেছিল নূহ, লূত ও শো'আয়েব (আ) প্রমুখ নবীর উম্মতগণের সাথে যে, তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত মিটে গেছে। তবে কোন ব্যক্তি বা নির্ধারিত কিছুর উপর আযাব আসাটা এর পরিপন্থী নয়। যেমন স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মতে 'খসফ' ও 'মসখ'-এর আযাব আসবে। 'খসফ' অর্থ মাটিতে পুঁতে যাওয়া। আর 'মসখ' অর্থ আকৃতি বিকৃত হয়ে বানর কিংবা শূকরে পরিণত হয়ে যাওয়া। এর মর্ম হলো এই যে, উম্মতের কোন কোন লোকের উপর এমন আযাব আসবে।

আর মহানবী (সা) পৃথিবীতে অবস্থান বা বর্তমান থাকা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কারণ তাঁর রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত সময়েরই জন্য। তাছাড়া মহানবী (সা) এখনও জীবিত

রয়েছেন, যদিও এই জীবনের প্রকৃতি পরবর্তী জীবন থেকে ভিন্নতর। যা হোক, এতদুভয় জীবনের পার্থক্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এর উপর না উম্মতের কোন ধর্মীয় কিংবা পার্থিব কাজ নির্ভর করছে, আর না স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম এহেন নিষ্প্রয়োজন আলোচনা পছন্দ করতেন বরং এসব বিতর্ক থেকে বারণ করতেন।

সারকথা, হুযূর (সা)-এর স্বীয় রওযায় জীবিত থাকা এবং তাঁর রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকাটাই এর প্রমাণ যে, কিয়ামত পর্যন্ত তিনি দুনিয়াতে অবস্থান করছেন। আর সে কারণেই এই উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ (৩৪) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً
وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (৩৫) اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۬ؕ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ (৩৬) لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ
وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ
فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (৩৭) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا
يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ (৩৮)

(৩৪) আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব দান করবেন না! অথচ তারা মসজিদে হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। (৩৫) আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। অতএব এবার নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা ব্যয় করে

নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহ্‌র পথে। বস্তুত এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফির, তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৩৭) যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ্‌ অপবিত্র নাপাককে পবিত্র পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তূপে পরিণত করেন এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত। (৩৮) তুমি বলে দাও কাফিরদেরকে যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতার দরুন অস্বাভাবিক রকমের কোন আযাব না আসার কারণে সম্পূর্ণভাবেই আযাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। কারণ উল্লিখিত বিষয়গুলো যেসব আযাবের প্রতিবন্ধক তেমনি তাদের আচার-আচরণগুলো আযাবের উপযোগী বটে। সুতরাং প্রতিবন্ধকসমূহের কার্যকারিতা অস্বাভাবিক আযাবের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে, আর আযাবের উপযোগিতার প্রতিক্রিয়া পরবর্তীতে প্রকাশ পাবে। তাদের উপর অস্বাভাবিক আযাব নাযিল হবে। অতএব, উপযোগিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে,) তাদের কি যোগ্যতা রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন তাদেরকে (একেবারে সাধারণ) শাস্তিটুকুও না দেন ? অথচ (তাদের এ সমস্ত আচার-আচরণ সবই শাস্তিযোগ্য। যেমন,) তারা [রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম তথা মুসলমানদের] মসজিদে হারামে (যেতে; সেখানে নামায পড়তে এবং তার তওয়াফ করতে) বাধাদান করে। (যেমন, বাস্তব বাধাদান করেছে হুদায়বিয়ার সময়, যার ইতিবৃত্তান্ত সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। আর মক্কায় অবস্থানকালে পরিস্থিতিগতভাবে বাধাদান করেছে। এমন জ্বালাতন করেছে যে, শেষ পর্যন্ত স্বদেশ ত্যাগ করে হিজরত করার প্রয়োজন পড়েছে)। অথচ তারা এই মসজিদের মুতাওয়াল্লী (হওয়ারও যোগ্য) নয়। (তাছাড়া ইবাদতকারীদের বাধা দেয়া তো দূরের কথা, সে অধিকার তো মুতাওয়াল্লীদেরও নেই।) এর মুতাওয়াল্লী (হওয়ার যোগ্য) তো মুত্তাকীদের ছাড়া (যারা ঈমানদার) আর কেউই নয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (নিজেদের অযোগ্যতা সম্পর্কেও) জ্ঞান রাখে না। (জ্ঞান না থাকা কিংবা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার উপর আমল না করা অজ্ঞতারই অনুরূপ। যাহোক, যথার্থই যারা নামাযী ছিলেন তাদেরকে তো মসজিদ থেকে এভাবে বাধা দিয়েছে।) আর (নিজেরা যে মসজিদের হক কতটা আদায় করেছে এবং তাতে কি উত্তম নামাযটি পড়েছে, তার বর্ণনা এই যে,) খানায়ে কা'বা (অর্থাৎ উল্লিখিত মসজিদে হারাম)-এর নিকট তাদের নামায শুধুমাত্র শিস দেওয়া ও তালি বাজানই ছিল। (অর্থাৎ নামাযের পরিবর্তে সেখানে তাদের এ সমস্ত মূর্খজনোচিত আচার-অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হতো।) অতএব (তাদের এহেন কার্যকলাপের আবশ্যিক দাবি হলো তাদের উপর কোন না কোন আযাব আসা। সাধারণ ও স্বাভাবিক হলেও তা নাযিল করে তাদেরকে বলে দেয়া যে,) এবার নিজেদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ কর (যার একটির প্রতিক্রিয়া হলো لَوْنَشَاءُ বাক্যে এবং আরেকটি প্রতিক্রিয়া

مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً-এর কাজ আরেক প্রতিক্রিয়া يَصُدُّوْنَ-এর কাজ আরেক প্রতিক্রিয়া اِنْ كَانَ هٰذَا বাক্যে, আরেক প্রতিক্রিয়া কাজ। সুতরাং বিভিন্ন যুদ্ধে এই শাস্তি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেমন এই সূরার দ্বিতীয় রুকূতে ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ الخ বলা হয়েছে ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا الخ-এর পরে। আয়াতের এ পর্যন্ত তো ছিল তাদের কথা ও দৈহিক কাজকর্মের আলোচনা, তারপর আসছে তাদের আর্থ-কর্মের বিবরণ। বলা হচ্ছে—) নিঃসন্দেহে এই কাফিররা নিজেদের অর্থ-সম্পদ এজন্য ব্যয় করে চলছে, যাতে আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ দীন) থেকে (মানুষকে বাধাদান করতে পারে। [বস্তুত হুযূরে আকরাম (সা)-এর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য এবং তাঁর বিরোধিতাকল্পে সেসব উপকরণ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় করা হতো তার উদ্দেশ্যও যে তাই ছিল, তা বলাই বাহুল্য।] অতএব, এরা তো নিজেদের অর্থ-সম্পদ (এই উদ্দেশ্যেই) ব্যয় করতে থাকবে (কিন্তু) তারপর যখন অকৃতকার্যতার লক্ষণ অনুভূত হবে, তখন (ব্যয়কৃত) সে সম্পদ তাদের পক্ষে আক্ষেপ ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (ভাববে বৃথাই এ সম্পদ ব্যয় করলাম। আর) তারপর (শেষ পর্যন্ত যখন) ব্যর্থ হয়ে পড়বে (তখন সম্পদের বৃথা ব্যয়ের অনুতাপের সঙ্গে পরাজয় ও ব্যর্থতার দ্বিতীয় অনুতাপটি একত্রিত হবে)। আর (তাদের এই শাস্তি অনুতাপ ও ব্যর্থতার গ্লানি তো হলো পার্থিব জীবনের জন্য। তদুপরি আখিরাতের শাস্তি তো আলাদা। যার বর্ণনা এই যে,) কাফিরদের দোযখের দিকে (নিয়ে যাবার জন্য কিয়ামতের দিন) সমবেত করা হবে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা অপবিত্র নাপাক (লোকদেরকে) পূতঃপবিত্র (লোকদের) থেকে পৃথক করে দেন। (কারণ দোযখীদের যখন দোযখের দিকে নিয়ে আসা হবে, তখন বাহ্যতই জান্নাতবাসীরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে) এবং (যাতে তাদের থেকে পৃথক করার পর) নাপাকদের পরস্পর মিলিয়ে (এবং) তারপর একত্র করে (নিয়ে) সবাইকে জাহান্নামে নিপতিত করেন। এ সমস্ত লোকই হলো পরিপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত [যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি এসব কাফিরকে বলে দিন, যদি এরা (নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত হয়ে যায়, (এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়,) তবে তাদের সমস্ত পাপ যা (তাদের ইসলাম গ্রহণের) পূর্বে হয়েছে, সেসবই ক্ষমা করে দেয়া হবে। (এ হলো মুসলমান হওয়ার অবস্থার হুকুম।) পক্ষান্তরে যদি তারা নিজেদের সেই (কুফরী) অভ্যাস-আচরণই বজায় রাখে, তাহলে (তাদেরকে জানিয়ে দিন যে,) সাবেক কাফিরদের ব্যাপারে (আমার) আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে ধ্বংস আর পরকালে যে আযাব, তাই তোমাদের জন্যও হবে। সুতরাং হত্যার মাধ্যমেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর আরব কাফির ব্যতীত অন্যান্য কাফিরের যিম্মী হওয়াকেও ধ্বংসই মনে করবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরীর ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানি আযাব প্রাপ্তিরই যোগ্য, কিন্তু মক্কায় রাসূলে করীম (সা)-এর উপস্থিতি ব্যাপক আযাবের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর তাঁর হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায় দুর্বল মুসলমানের কারণে এমন আযাব আসছে না যারা মক্কায় থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রাসূলে করীম (সা) কিংবা অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আযাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আযাবের যোগ্যই নয়। বরং তাদের আযাবের যোগ্য হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া কুফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমনসব অপরাধ রয়েছে যার ফলে তাদের উপর আযাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দু'টিতে তাদের তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত এরা নিজেরা তো মসজিদে হারাম অর্থাৎ খানায়ে কা'বায় ইবাদত করার যোগ্য নয়, তদুপরি যেসব মুসলমান সেখানে ইবাদত-বন্দেগী ও নামায, তওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে আগমনে বাধাদান করে। এতে হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে যখন রাসূলে করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামসহ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় অপরাধ হলো এই যে, এই নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত যে, আমরা মসজিদে হারামের মুতওয়াল্লী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে অনুমতি দেব, যাকে ইচ্ছা দেব না।

তাদের এই ধারণা ছিল দু'টি ভুল বোঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমত এই যে, তারা নিজেদের মসজিদে হারামের মুতাওয়াল্লী বলে মনে করেছিল, অথচ কোন কাফির কোন মসজিদের মুতাওয়াল্লী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাদের এই ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহ্‌র ঘর, সুতরাং এতে আসতে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্য নামাযীদের কষ্টের আশংকা থাকে। যেমন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন—"নিজেদের মসজিদসমূহকে রক্ষা কর ছোট শিশুদের থেকে, পাগলদের থেকে এবং নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে।" ছোট শিশু বলতে সেসব শিশুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর পাগলের দ্বারা অপবিত্রতারও আশংকা থাকে এবং নামাযীদের কষ্টেরও আশংকা থাকে। এছাড়া নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাযীদের কষ্টও হয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মুতাওয়াল্লীর এসব শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ হতে না দেয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা পরিস্থিতি ব্যতীত কোন মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেবার কোন অধিকার নেই।

কোরআন করীমে আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে হারামের মুতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র মুত্তাকী পরহিযগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে এর মুতাওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মুতাওয়াল্লী কোন মুসলমান দীনদার ও পরহিযগার ব্যক্তিরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন মুফাসসিরীন إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ-এর সর্বনামটি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহিযগার ব্যক্তিরাই হতে পারেন।

এই তফসীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই দাঁড়াচ্ছে যে, যারা শরীয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র ওলী হওয়ার দাবি করে, তারা সর্বৈব মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলীআল্লাহ্ বলে মনে করে, তারা (একান্তভাবেই) ধোঁকায় পতিত।

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শিরকের পঙ্কিলতা তো ছিলই, তাদের কার্যকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর থেকেও বহু নিম্নে রয়েছে। কারণ এরা নিজেদের যে কাজকে 'নামায' নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেয়া এবং হাতে কিছু তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য, যার সামান্যতম বুদ্ধিও থাকবে সেও এধরনের কার্যকলাপকে ইবাদত কিংবা নামায তো দূরের কথা, সঠিক কোন মানবীয় আচরণও বলতে পারে না। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের কুফরী ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহ্র আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। আযাব বলতে এখানে আখিরাতের আযাব হতে পারে এবং পার্থিব আযাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের উপর নাযিল হয়। এর পরে ৩৬ নং আয়াতে মক্কার কাফিরদের অন্য একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। যাতে তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অধিক মাল একত্র করেছিল এবং তা দীনে হক এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তা ব্যয় করেছিলো, কিন্তু পরিণতি এই দাঁড়িয়েছিল যে, এ সম্পদও তাদের হাত থেকে চলে গেল এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল।

এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর বর্ণনা মতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে বদরের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফিররা যখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছাল, তখন যাদের পিতা-পুত্র এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর আবূ সুফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হিফাযতকল্পে করা হয়েছে—যার ফলে জানমালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমানদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। তারা এ দাবি মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুতাপ যোগ হয়ে যায়।

কোরআন করীম এ আয়াতে এই ঘটনার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। বলা হয়, যারা কাফির, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র দীন থেকে মানুষকে বাধাদান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের ধন-সম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুত গযওয়ায়ে ওহুদে ঠিক তাই ঘটেছে; সঞ্চিত ধন-সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

বগভী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয়সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার জওয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার-দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বারজন সর্দার নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবূ জাহল, ওৎবা, শায়বা প্রমুখ। বলা বাহুল্য এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানাপিনা প্রভৃতিতে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কাজেই নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল। (মাযহারী)

আয়াত শেষে আখিরাতের দিক দিয়ে তাদের মন্দ পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ যারা কাফির, জাহান্নামের দিকেই হবে তাদের হাশর।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে, সত্য দীন থেকে বাধা দানকল্পে অর্থ ব্যয়ের যে অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমান কালের সেসব কাফিরও অন্তর্ভুক্ত যারা মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে এবং নিজেদের মিথ্যা ও বাতিল মতবাদের প্রতি আহ্বান করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাসপাতালে, শিক্ষাঙ্গনে এবং দান-খয়রাতের নামে ব্যয় করে থাকে। তেমনিভাবে সেসব পথভ্রষ্ট ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামের সর্ববাদীসম্মত আকীদা ও বিশ্বাসসমূহে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও সেগুলোর বিরুদ্ধে মানুষকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর দীনের হিফাযত করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখাও যায় যে, এরা বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য থেকে যায়।

৩৭তম আয়াতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর কিছু ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে যার সার-সংক্ষেপ এই যে, কাফিররা যেসব সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে আর অপমানিত-অপদস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই ঃ لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাতে অপবিত্র পঙ্কিল এবং পবিত্র পূতঃ বস্তুতে পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। طيب ও خبيث দু'টি বিপরীতার্থক শব্দ। خبيث শব্দটি অপবিত্র, গান্দা, পঙ্কিল ও হারাম বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর طيب তার বিপরীতে পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু বোঝাতে বলা হয়। এখানে এই দু'টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে কাফিরদের অপবিত্র ধন-সম্পদ এবং মুসলমানদের পবিত্র সম্পদ ও অর্থ বোঝা যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে, কাফিররা যে বিপুল অর্থসম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র—হারাম সম্পদ। ফলে তার অশুভ পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, তাতে মালও গেছে এবং জানও গেছে। পক্ষান্তরে তার বিপরীতে মুসলমানরা অতি অল্প পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র—হালাল। ফলে তা ব্যয়কারীরা বিজয় অর্জন করেছেন এবং সাথে সাথে গনীমতের মালামাল অর্জনেও সমর্থ হয়েছেন। তারপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فِىْ جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এক 'খবীস' তথা অপত্রিকে অপর অপবিত্রের সাথে মিলিয়ে দেন এবং তারপর সে সমস্তকে সমবেত করে দেবেন জাহান্নামে। বস্তুত এরাই হলো ক্ষতির সম্মুখীন।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, কাহরোবা যেমন ঘাসকে আকর্ষণ করে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাই পারস্পরিক আকর্ষণের উপর স্থাপিত, তেমনিভাবে কাজকর্ম, আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যেও একটা আকর্ষণ রয়েছে। একটি মন্দ কাজ আরেকটি মন্দ কাজকে এবং একটি ভাল কাজ আরেকটি ভাল কাজকে আকর্ষণ করে। একটি খারাপ সম্পদ এবং আরেকটি খারাপ সম্পদকে টেনে আনে এবং তারপর এসব খারাপ সম্পদ মিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর এরই পরিণতি হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত অপবিত্র সম্পদকে জাহান্নামে সমবেত করবেন এবং সম্পদের যারা অধিকারী তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

এছাড়া এখানে অনেক তফসীরবিদ মনীষী خبيث ও طيب-এর সাধারণ অর্থ অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং 'পাক' বলতে 'মুমিন' আর অপবিত্র বলতে 'কাফির' বুঝিয়েছেন। এমতাবস্থায় মর্ম হবে এই যে, উল্লিখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও অপবিত্র অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য করতে চান; সমস্ত মু'মিন জান্নাতে আর সমস্ত কাফির জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

৩৮তম আয়াতে কাফিরদের প্রতি আবারো এক মুরুব্বীসুলভ আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে উৎসাহও রয়েছে এবং ভীতিও রয়েছে। উৎসাহ এ ব্যাপারে যে, যদি তারা এ সমুদয় কুকর্মের পরে এখনও তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর ভীতি হলো এই যে, তারা যদি এখন অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাকে নতুন কোন আইন প্রণয়ন কিংবা নতুন করে কোন চিন্তাভাবনা করতে হবে না। বিগত কালের কাফিরদের জন্য যে আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে তাই তাদের উপরও প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং আখিরাতে হয়েছে কঠিন আযাবের যোগ্য!

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

---

(৩৯) আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ

তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (৪০) আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (হে মুসলমানগণ, তাদের এই কাফির থাকা অবস্থায়) তোমরা তাদের সাথে (অর্থাৎ আরব কাফিরদের সাথে) ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তাদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি (অর্থাৎ শিরকের ধারণা) শেষ হয়ে যায় এবং (আল্লাহর) দীন (নির্ভেজালভাবে যতক্ষণ না) আল্লাহর বলেই গণ্য হয়। (বস্তুত কারও ধর্মবিশ্বাস নির্ভেজালভাবে আল্লাহর প্রতি স্থাপিত হওয়া ইসলাম কবূল করার উপরই নির্ভরশীল। কাজেই মর্ম দাঁড়ায় এই যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তারা ইসলাম কবূল করে নেয়। কারণ আরবের কাফিরদের কাছ থেকে জিযিয়া কর নেয়া যায় না) অবশ্য এরা যদি (কুফরী থেকে) বিরত হয়ে যায়, তবে তাদের বাহ্যিক ইসলামকেই স্বীকার করে নাও, (মনের অবস্থার যাচাই করতে যেও না। কারণ সাময়িকভাবে যদি তারা ঈমান না আনে তবে) তাদের কার্যকলাপগুলো আল্লাহ তা'আলা যথার্থভাবেই প্রত্যক্ষ করেন। (কাজেই তা তিনিই বুঝাবেন, এতে আপনার কি এসে যায় ?) আর যদি তারা (ইসলাম থেকে) বিমুখতা অবলম্বন করে, তবে (আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের মুকাবিলা থেকে সরে এসো না, আর) দৃঢ়বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা (তাদের মুকাবিলায়) তোমাদের বন্ধু। তিনি অতি উত্তম বন্ধু বটেন এবং অতি উত্তম সাহায্যকারী। (কাজেই তিনি তোমাদের সাহায্য ও সহায়তা দান করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটি হলো সূরা আনফালের ঊনচল্লিশতম আয়াত। এতে দু'টি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) ফিৎনা (২) দীন। আরবী অভিধান অনুযায়ী শব্দ দু'টি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনদের নিকট থেকে এখানে দু'টি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। (১) ফিৎনা অর্থ কুফ্‌র ও শিরক আর (২) দীন অর্থ ইসলাম ধর্ম নিতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মুসলমানদের কাফিরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে, যতক্ষণ না কুফর নিঃশেষিত হয়ে ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব যতক্ষণ না বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এই নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোন ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দীন ইসলামের জন্য তা হবে আশংকাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেয়া যেতে পারে। যেমন, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তফসীর যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে, তাহলো এই যে, এতে 'ফিৎনা' অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফিররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনার দিকে হিজরত করেন, তখন তারা প্রতিটি মুসলমানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুণ্ঠন করতে থাকে। এমনকি মদীনায় পৌঁছার পরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে 'দীন' শব্দের অর্থ হলো প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, মুসলমানদের কাফিরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-র এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তাহলো এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা)-র বিরুদ্ধে যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সৈন্য সমাবেশ করে এবং উভয়পক্ষে মুসলমানদের উপরই যখন মুসলমানদের তলোয়ার চলতে থাকে, তখন দু'জন লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এখন মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন; অথচ আপনি সেই উমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, তিনি কোনক্রমেই এহেন ফিৎনা-ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফিৎনার সমাধান করার উদ্দেশ্যে কি কারণে এগিয়ে আসেন না! হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দু'জন আরয করলেন, আপনি কি কোরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন না وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিৎনা-ফাসাদ তথা দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, নিশ্চয়ই আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফিৎনা শেষ হয়ে দীন ইসলামের বিজয় সূচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক, তা চাও না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জিহাদ ও যুদ্ধের হুকুম ছিল কুফরীর ফিৎনা এবং কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তা আমরা করেছি এবং বরাবরই করে যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফিৎনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়। বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই-বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর হিদায়েত হচ্ছে এই যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-জিহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফিৎনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কিয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কিয়ামত পর্যন্তই জিহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদের পরিণতিতে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত এই যে, তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করা থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমতে থেকেই আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত এতদুভয় অবস্থার কোনটি গ্রহণ না করে অব্যাহত মুকাবিলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এই উভয় অবস্থার হুকুমই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۔

অর্থাৎ তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ যথার্থভাবেই অবলোকন করেন।

সে অনুযায়ীই তিনি তাদের সাথে ব্যবহার করবেন। সারমর্ম এই যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য এমন আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের পর কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন কিংবা মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করাটা শুধুমাত্র যুদ্ধের চাল এবং ধোঁকাও হতে পারে। এমতাবস্থায় যুদ্ধবিরতি করা মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এরই উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা তো বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুবর্তী থাকবে। আর সে আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে জানেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কাজেই যখন তারা মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করবে এবং সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে নেবে, তখন মুসলমানরা তা মেনে নিয়ে জিহাদ-যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য। কথা হলো এই যে, তারা অকপট ও সত্য মনে ইসলাম কিংবা সন্ধিচুক্তিকে গ্রহণ করল, এবং তাতে কোন প্রতারণা নিহিত রয়েছে কিনা সে বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা যথার্থভাবেই দেখেন ও অবগত রয়েছেন। তারা যদি এমনটি করে তবে তার জন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মুসলমানদের এ ধরনের ধারণা ও শঙ্কা-সংশয়ের উপর কোন বিষয়ের ভিত্তি রচনা করা উচিত নয়।

ইসলাম গ্রহণ কিংবা সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের কথা প্রকাশ করার পরেও যদি তাদের উপর হাত তোলা হয়, তবে যারা জিহাদ করেছে তারা অপরাধী হয়ে পড়বে। যেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দান করা হয়েছে, যেন আমি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ না তারা কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ [একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।] এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে এবং যখন তারা তা বাস্তবায়িত করবে, তখন তাদের রক্ত, তাদের ধনসম্পদ সবই নিরাপদ হয়ে যাবে। অবশ্য ইসলামী বিধান মতে কোন অপরাধ করলে সেজন্য তাদের শাস্তি দেয়া যাবে। বস্তুত তাদের মনের হিসাব-নিকাশের ভার থাকবে আল্লাহর উপর। তিনি জানবেন, তারা সত্য মনে এই কলেমা এবং ইসলামী আমলসমূহকে কবুল করেছে কি প্রতারণা করেছে।

অপর একটি হাদীস যা হযরত আবূ দাউদ (র) বহুসংখ্যক সাহাবায়ে-কিরামের রিওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন তা হলো এই যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ লোকের উপর অর্থাৎ এমন কোন লোকের উপর কোন অত্যাচার-উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, যে

ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের চুক্তি করে নিয়েছে, কিংবা যদি তার কোন ক্ষতিসাধন করে অথবা তার দ্বারা এমন কোন কাজ আদায় করে যা তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি কিংবা যদি তার কোন বস্তু তার মানসিক ইচ্ছার বাইরে নিয়ে নেয়, তবে কিয়ামতের দিন আমি সে মুসলমানের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির সমর্থন করব।

কোরআনে হাকীমের আয়াত ও উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনা বাহ্যত মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক আশঙ্কার সম্মুখীন করে দিয়েছে। তা হলো এই যে, ইসলামের কোন মহাশত্রুও যখন মুসলমানদের কবলে পড়ে এবং শুধুমাত্র জান বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ইসলামের কলেমা পড়ে নেয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতকে সংযত করে নেওয়া মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মুসলমানদের পক্ষে কোন শত্রুকেই বশ করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন রহস্যাদির ভার নিজের দায়িত্বে রেখে একান্ত মু'জিযাসুলভ ভঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কার্যত মুসলমানদের কোন সমরক্ষেত্রেই এমন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। অবশ্য সন্ধি অবস্থায় শত শত মুনাফিক সৃষ্টি হয়েছে যারা ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে এবং বাহ্যত নামায-রোযাও পালন করেছে। এর মধ্যে কোন কোন সংকীর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের তো এ উদ্দেশ্যই ছিল যে, মুসলমানদের থেকে কিছু ফায়দা হাসিল করে নেবে এবং শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের প্রতিশোধের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে। আবার অনেক ছিল যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার জন্য, বিরোধীদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার জন্য এমনটি করতো। কিন্তু আল্লাহর আইনে সে সমস্ত ব্যাপারেই মুসলমানদের হিদায়েত দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের সাথেও মুসলমানদের মতই আচরণ করে যতক্ষণ না তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা এবং চুক্তি লংঘনের বিষয় প্রমাণিত হয়ে যায়।

কোরআন করীমের এ শিক্ষা ছিল সে অবস্থার জন্য যখন ইসলামের শত্রুরা নিজেদের শত্রুতা পরিহারের অঙ্গীকার করবে এবং এ ব্যাপারে কোন চুক্তি সম্পাদন করে নেবে।

এ ছাড়া আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের জেদ ও শত্রুতা বজায় রাখতে প্রয়াস পায়। এ সম্পর্কিত হুকুম এর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ –

অর্থাৎ যদি তারা কথা না মানে, তবে তোমরা এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী, আর তিনি অতি উত্তম সাহায্যকারী এবং অতি উত্তম সমর্থনকারী।

সারকথা এই যে, তারা যদি নিজেদের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও কুফরী-শিরকী থেকে বিরত না হয়, তবে মুসলমানদের জন্য সে নির্দেশই বহাল থাকবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা। আর জিহাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ যেহেতু স্বভাবত বড় রকম সৈন্যবাহিনী, বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের উপরই নির্ভরশীল এবং মুসলমানদের কাছে পরিমাণে এসব বিষয় ছিল অল্প, কাজেই এমনটি হয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিল না যে, জিহাদের হুকুমটি মুসলমানদের কাছে ভারী বলে মনে হবে কিংবা তারা নিজেদের সংখ্যা ও সাজসরঞ্জামের স্বল্পতার দরুন এমন মনে করতে আরম্ভ করবেন যে, আমরা মুকাবিলায় সফল হতে পারব না। কাজেই এর প্রতিকারকল্পে মুসলমানদের বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছে যদিও মুসলমানদের

চেয়ে সাজসরঞ্জাম বেশি রয়েছে, কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'আলার গায়েবী সাহায্য-সহায়তা কোথায় পাবে যা মুসলমানরা পাচ্ছে এবং তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের মাঝে প্রত্যক্ষ করে থাকে। আরো বলা হয়েছে যে, এমনিতে তো দুনিয়ার সব পক্ষই কারো না কারো কাছ থেকে সাহায্য-সহায়তা অর্জন করেই নেয়, কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয় সেই সাহায্যদাতার শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞান-অভিজ্ঞানের উপর। একথা বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য এবং সূক্ষ্মদর্শিতার চেয়ে বেশি তো দূরের কথা এর সমান সারা বিশ্বেরও হতে পারে না। কেননা তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যদাতা ও পক্ষ সমর্থনকারী।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ
وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ
اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ
الْتَقَی الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾

(৪১) আর এ কথা জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাও তার এক-পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্‌র উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর একথাটি জেনে রাখ যে, (কাফিরদের কাছ থেকে) যেসব বস্তু-সামগ্রী গনীমত হিসাবে তোমরা অর্জন কর, তার হুকুম এই যে, (এই সমুদয় মালামালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতে হবে যার চার ভাগ হলো যোদ্ধাদের হক আর এক ভাগ অর্থাৎ) তার পঞ্চম ভাগ (আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে যার এক ভাগ হলো) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। [অর্থাৎ তা রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাবেন। বস্তুত রাসূলকে দেয়াই আল্লাহর সম্মুখে পেশ করার শামিল।] আর (এক ভাগ হলো) তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের এবং (এক ভাগ) এতীমদের, (এক ভাগ) গরীবদের এবং (এক ভাগ) মুসাফিরদের যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ এবং সে বস্তুর উপর (বিশ্বাস রাখ) যাকে আমি আমার বান্দা [মুহাম্মদ (সা)-এর] প্রতি পৃথকীকরণের দিন (অর্থাৎ যেদিন বদর প্রান্তরে মু'মিন ও কাফিরদের) দু'টি সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল; অবতীর্ণ করেছিলাম। (এর মর্ম হলো এই সেই গায়েবী সাহায্য যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে পাঠান হয়েছিল। অর্থাৎ তোমরা যদি আমার এবং আমার গায়েবী সাহায্য-সহায়তা ও দানের উপর বিশ্বাস রাখ তবে এ নির্দেশটি জেনে রাখ এবং সেমতে আমল কর। কথাটি এজন্য বলে দেয়া হলো, যাতে এক-পঞ্চমাংশ

পৃথক করতে কষ্ট না হয় এবং এ কথা উপলব্ধি করা যায় যে, গনীমতের যাবতীয় মাল আল্লাহর সাহায্যেই অর্জিত হয়েছে। কাজেই এর এক-পঞ্চমাংশ যদি নাও পাওয়া যায়, তাতে কি হলো ; যে চার ভাগ পাওয়া গেল তাও তোমাদের ক্ষমতাবহির্ভূতই ছিল। একান্ত আল্লাহর ক্ষমতাবলেই তা লাভ হয়েছে)। আর আল্লাহই সমস্ত বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাশীল। (বস্তুত তোমাদের এতটুকু পাবারও অধিকার ছিল না, যা পেলে, তাই অনেক বেশি।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে গনীমতের বিধান ও তার বন্টননীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর আগে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা শুনে নিন।

অভিধানে 'গনীমত' বলা হয় সে সমস্ত মাল-সামানকে যা শত্রুর নিকট থেকে লাভ হয়। শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলমানদের নিকট থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয়, তাকেই বলা হয় 'গনীমত'। আর যা কিছু আপস, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেমন জিযিয়া কর, খাজনা, ট্যাক্স প্রভৃতি–তাকে বলা হয় فَـيْـئ —কোরআন করীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ 'গনীমত' ও 'ফাউন') এতদুভয় প্রকার মালামালের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আন্‌ফালে সে গনীমতের মালামালের কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলমানদের কাছ থেকে লাভ হয়েছে।

এখানে সর্বাগ্রে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলামী ও কোরআনী মতাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিকানা শুধুমাত্র সে সত্তার জন্য নির্ধারিত যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোন কিছুর মালিকানা লাভ করার একটি মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হলো এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আইনের মাধ্যমে কোন বস্তুতে কোন ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত করে দেন। যেমন সূরা ইয়াসীনে চতুষ্পদ জীবের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ অর্থাৎ এরা কি দেখতে পায় না যে, চতুষ্পদ জন্তুসমূহ আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি (এবং) তারপর তারা সেগুলির মালিক হয়েছে। অর্থাৎ এদের মালিকানা নিজস্ব নয়; বরং আমিই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়েছি।

কোন জাতি যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অর্থাৎ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রথমে আল্লাহ তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্বীয় রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে থাকেন যে হতভাগা এ আল্লাহর দানের মাধ্যমেও প্রভাবিত না হয়, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, এই বিদ্রোহীদের জানমাল সবই হালাল করে দেয়া হয়েছে; আল্লাহ প্রদত্ত মালামালের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোন অধিকারই আর তাদের নেই। বরং তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়েছে। এই বাজেয়াপ্ত করা মালামালেরই অপর নাম গনীমতের মাল যা কাফিরদের মালিকানা থেকে বেরিয়ে গিয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় চলে আসে।

বাজেয়াপ্ত করা এই মালামালের ব্যাপারে প্রাচীনকালে আল্লাহ তা'আলার নিয়ম ছিল এই যে, এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোন অনুমতি কারো জন্যই ছিল না, বরং এ ধরনের মালামাল

একত্র করে কোন খোলামেলা জায়গায় রেখে দেয়া হতো এবং আকাশ থেকে এক ধরনের বিদ্যুচ্ছটা এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিত। আর এটাই ছিল জিহাদ কবুল হওয়ার লক্ষণ।

খাতেমুল আম্বিয়া (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে কতিপয় বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এও একটি যে, তাঁর উম্মতের জন্য গনীমতের মালামাল ভোগ করা হালাল করে দেয়া হয়েছে। (যেমন বর্ণিত হয়েছে মুসলিমের হাদীস) তাছাড়া হালালও আবার এমন হালাল যে, একে اطيب الاموال তথা পরিচ্ছন্নতম সম্পদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, যেসব সম্পদ বা মালামাল মানুষ নিজের উপার্জনের মাধ্যমে অর্জন করে তাতে মানুষের মালিকানা থেকে বিভিন্ন মাধ্যম অতিক্রম করার পর তার মালিকানা বা অধিকারে আসে এবং এসব মাধ্যমের মধ্যে হারাম, অবৈধ অথবা ঘৃণ্য পন্থার আশংকাও থাকে। পক্ষান্তরে গনীমতের মালামালের ক্ষেত্রে কাফিরদের মালিকানা তা থেকে রহিত হয়ে গিয়ে সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা বিদ্যমান থেকে যায় এবং অতঃপর তা যে লোক প্রাপ্ত হয়, সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা থেকেই প্রাপ্ত হয়। তখন আর তাতে কোনরকম সন্দেহ কিংবা হারাম হওয়ার কোন সংশয়ই থাকে না। যেমন, কূয়া থেকে তোলা পানি কিংবা স্বেচ্ছায় উদ্‌গত বৃক্ষ, লতাপাতা যা সরাসরি আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান মানুষ প্রাপ্ত হয়, কোন মানবিক মাধ্যম তার মাঝে থাকে না, তেমনি।

সারকথা এই যে, যেসব গনীমতের মালামাল পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য হালাল ছিল না, অনুগৃহীত এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্র দান হিসাবে তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে এসবের বন্টনবিধি وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আরবী অভিধানের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমত مـا শব্দটি ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করে। অতঃপর এই ব্যাপকতার অতিরিক্ত তাকীদের জন্য مِنْ شَىْءٍ শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, ছোটবড় যাই কিছু গনীমতের মাল হিসাবে অর্জিত হবে সে সবই এই নিয়ম-বিধির আওতাভুক্ত। কোন বস্তু সাধারণ বা ক্ষুদ্র মনে করে যদি কেউ বন্টন-বিধির বাইরে নিয়ে নেয়, তবে সে কঠিন অপরাধী বলে গণ্য হবে। কাজেই রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, একটি সুই-সুতাও যদি মালে গনীমতের অংশ হয়, তবুও কারো পক্ষে তা নিজ অংশের অতিরিক্ত নিয়ে নেয়া জায়েয নয়। বস্তুত নিজ অংশের বাইরে গনীমতের কোন বস্তু নিয়ে নেয়াকে غلول (গুলুল) বলে অভিহিত করে সেজন্য কঠিন ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং একে সাধারণ চুরি অপেক্ষা কঠিন হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বন্টন-বিধির এই শিরোনাম আরোপ করে সমস্ত মুসলমান মুজাহিদীনকে অবহিত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এই গনীমতের মালামাল হালাল করে দিয়েছেন, কিন্তু তা এক বিশেষ বিধির আওতায়ই হালাল। এই বিধি বহির্ভূত পন্থায় যদি কেউ তা থেকে কোন কিছু নিয়ে নেয় অর্থাৎ আত্মসাৎ করে, তবে তা হবে সাক্ষাৎ জাহান্নামের একটি অঙ্গার।

কোরআনী বিধি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, পৃথিবীর অন্য কোন বিধিই এমন নিখুঁত নয়। আর এটাই হলো কোরআনী বিধি-বিধানের পরিপূর্ণ ফলশ্রুতি ও সাফল্যের রহস্য যে, এতে

প্রথমে আল্লাহ্ ও পরকালের ভীতির আলোকে তার প্রতি ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, নিদর্শনমূলক শাস্তি প্রবর্তন করা হয়েছে।

অন্যথায় লক্ষণীয় যে, সাক্ষাৎ সমরাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধ চলাকালে যে মালামাল কাফিরদের হাত থেকে অর্জন করা হয়, যার কোন বিস্তারিত বিবরণ না পূর্ব থেকে মুসলমানদের নেতার জানা রয়েছে, না অন্য কারও। অথচ পরিস্থিতি-পরিবেশ হলো যুদ্ধের, যা সাধারণত বিয়াবান ময়দান বা প্রান্তরেই সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যাতে লুকিয়ে থাকার বা রাখার অবকাশ থাকে হাজারো রকম। নিরেট আইনের বলে এসব মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র আল্লাহ্ভীতিই এমন এক বিষয় ছিল যা প্রতিটি মুসলমানকে এতে সামান্যতম কারচুপি থেকেও বিরত রেখেছিল।

এখন এই বন্টন-বিধিটি লক্ষণীয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ অর্থাৎ গনীমতের মালামালের এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের, এতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের জন্য।

এখানে প্রথমত লক্ষণীয় যে, গোটা গনীমতের মালামালের বন্টন বিধিই বর্ণিত হচ্ছে, অথচ কোরআন এখানে শুধুমাত্র তার এক-পঞ্চমাংশের বন্টনবিধি বর্ণনা করেছে, অবশিষ্ট চার ভাগের কোন উল্লেখ করেনি। এতে কি রহস্য থাকতে পারে এবং বাকি চার ভাগের বন্টনবিধিই বা কি ? কিন্তু কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা করলে এতদুভয় প্রশ্নের উত্তরও এসব বাক্য থেকেই বেরিয়ে আসে। কারণ কোরআন করীম জিহাদে নিয়োজিত মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছে ঃ مَا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ "তোমরা যা কিছু গনীমত হিসাবে অর্জন করেছ।" এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এসব মালামাল অর্জনকারীদেরই প্রাপ্য। তারপর যখন বলা হলো যে, এসবের মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহ্ ও রাসূল প্রমুখের প্রাপ্য, তখন এর সুস্পষ্ট ফল দাঁড়াল এই যে, অবশিষ্ট চার ভাগই গনীমত অর্জনকারী ও মুজাহিদীনের প্রাপ্য। যেমন কোরআন করীমের উত্তরাধিকার আইনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَوَرِثَهٗ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ অর্থাৎ "কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যখন তার পিতামাতা হয়, তখন মাতা পায় এক-ষষ্ঠমাংশ।" এখানেও মায়ের অংশ বলেই শেষ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ হলো পিতার অধিকার। তেমনিভাবে مَا غَنِمْتُمْ বলার পর যখন শুধু পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করা হলো তাতেই প্রমাণিত হলো যে, অপরাপর চারটি অংশই মুজাহিদীনের হক। অতঃপর রাসূলে করীম (সা)-এর বর্ণনা এবং কার্যধারাও বিষয়টিকে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছে। তিনি অবশিষ্ট চার ভাগই এক বিশেষ বিধি অনুযায়ী মুজাহিদীনের মাঝে বন্টন করে দেন।

এবার সে পঞ্চমাংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যাক যা কোরআন করীম এ আয়াতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কোরআনের ভাষায় এখানে ছয়টি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ لِلّٰهِ - لِلرَّسُوْلِ - لِذِى الْقُرْبٰى - اَلْيَتٰمٰى - اَلْمَسَاكِيْنِ ও اِبْنِ السَّبِيْلِ -

لِلّٰهِ (আল্লাহ্র জন্য) শব্দটি সে সমস্ত বন্টন ক্ষেত্রের মধ্যে একটি অতি উজ্জ্বল শিরোনাম, যাতে আলোচ্য এক-পঞ্চমাংশ গনীমতের মাল বন্টিত হবে। অর্থাৎ এসমুদয় ক্ষেত্রই একনিষ্ঠভাবে

আল্লাহ্‌র জন্য। তাছাড়া এখানে বিশেষভাবে এ শব্দটি ব্যবহার করার মাঝেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, যেদিকে তফসীরে মাযহারিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো এই যে, মহানবী (সা) এবং তাঁর খান্দান তথা পরিবার-পরিজনদের জন্য সদকার মালামাল গ্রহণ করাকে হারাম সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। কেননা তা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার পক্ষে শোভন নয়। তার কারণ, এসব মালামাল সাধারণ মানুষের ধনসম্পদ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন তথা পঙ্কিলতামুক্ত করার জন্য মূল সম্পদের মধ্য থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। এ মালকে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَوْسَاخُ النَّاسِ অর্থাৎ মানুষের গাদ-কাচড়া। এহেন বস্তু নবীপরিবারের যোগ্য নয়।

গনীমতের মালামালের পঞ্চমাংশ থেকে যেহেতু কোরআন রাসূলে করীম ও তাঁর খান্দানকেও অংশী সাব্যস্ত করেছে, কাজেই এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অংশটি লোকদের মালিকানা থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসেনি, বরং সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে এসেছে। যেমন, এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল কাফিরদের অধিকার বা মালিকানা থেকে বেরিয়ে সরাসরিভাবে আল্লাহ্‌র নির্ভেজাল মালিকানায় পরিণত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তা উপহার হিসাবে বিতরণ করা হয়। সে কারণেই এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য যে, রাসূলে করীম (সা) ও তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনকে অর্থাৎ ذوى الْقُرْبٰى-কে গনীমতের মাল থেকে যে পঞ্চমাংশ দেয়া হয়েছে তা মানুষের সদকা নয়, বরং সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান। আয়াতের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত মালামাল প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাভুক্ত। তাঁরই নির্দেশ মুতাবিক উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে ব্যয় করা হবে।'

সে জন্যই এক-পঞ্চমাংশের প্রকৃত প্রাপক রয়েছে পাঁচটি। (১) রাসূল ; (২) যাবিল-কোরবা (নিকট আত্মীয়-স্বজন), এতীম, (৪) মিসকীন এবং (৫) মুসাফির। তারপরেও তাদের প্রাপ্যতার স্তরভেদ রয়েছে। কোরআন করীমের বর্ণনা কৌশল লক্ষ্য করার মত যে, প্রাপ্যতার এসমস্ত পার্থক্যকে কেমন সূক্ষ্ম ও নাজুক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। এই পাঁচটি প্রাপকের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথম দুটিতে 'لام' লাম বর্ণ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে ঃ لِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى অথচ অপর তিনটিতে 'লাম' ব্যবহারের পরিবর্তে সবগুলোকে একটিকে অন্যটির সাথে জুড়ে দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় لام বর্ণটি কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। لِلّٰهِ শব্দে 'লাম' বর্ণটি মালিকানার এ বৈশিষ্ট্য বা নির্দিষ্টতা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, যাবতীয় সম্পদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। আর لِلرَّسُوْلِ শব্দে এর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো প্রাপ্যতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এই এক-পঞ্চমাংশ গনীমতের মালামাল ব্যয়-বন্টন করার অধিকার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেছেন। ইমাম তাহাবীর গবেষণা এবং তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী এর সারমর্ম এই যে, এখানে যদিও এক-পঞ্চমাংশের ব্যয়ক্ষেত্র বা প্রাপক হিসাবে পাঁচটি খাতের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাসূলে করীম (সা)-এর পরিপূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি নিজের কল্যাণ বিবেচনা অনুসারে এই পাঁচটি ক্ষেত্রেই গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করতে পারেন। যেমন, সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে সমুদয় গনীমতের মালামাল বন্টনের ব্যাপারে এ নির্দেশই ছিল যে, রাসূলে করীম

(সা) স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় তা যেকোন স্থানে ব্যবহার করতে পারেন, যাকে খুশী দিতে পারেন। অতঃপর وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ আয়াত গনীমতের মালামালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে তার চার ভাগকে মুজাহিদীনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এর পঞ্চমাংশটি পূর্ববর্তী নির্দেশেরই আওতাভুক্ত রয়ে গেছে। এর ব্যয় করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবেচনার উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এখানে এই পঞ্চমাংশের জন্য পাঁচটি খাত নির্ধারিত করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ অংশটি এই পাঁচটি খাতেই আবর্তিত হতে থাকবে। অবশ্য অধিকাংশ বিজ্ঞ গবেষক ইমামের মতে এই এক-পঞ্চমাংশকে সমানভাবে পাঁচ ভাগ করে আয়াতে বর্ণিত পাঁচটি খাতে সমানভাবে বন্টন করে দেয়া মহানবী (সা)-এর জন্য অপরিহার্য ছিল না, বরং এটুকু অপরিহার্য ছিল যে, গনীমতের এই এক-পঞ্চমাংশকে এই পাঁচ প্রকারের সবাইকে অথবা কাউকে কাউকে স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী দান করবেন।

এর সবচাইতে বড় ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো এ আয়াতের শব্দাবলী এবং তাতে বর্ণিত মাস্‌রাফ ও ব্যয়খাতসমূহের প্রকারগুলো। কারণ এসব প্রকার কার্যত পৃথক পৃথক নয়। বরং পারস্পরিক সমন্বিতও হতে পারে। যেমন, যে ব্যক্তি যাবিল-কোরবা বা নিকটাত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে সে এতীমও হতে পারে, মিসকীন কিংবা মুসাফিরও হতে পারে। তেমনিভাবে মিসকীন-মুসাফির হলে সাথে সাথে তার এতীম হওয়াও বিচিত্র নয়। আর সে লোক যাবিল-কোরবাও হতে পারে। তেমনিভাবে যে মিসকীন সে লোক মুসাফিরের তালিকায়ও আসতে পারে। যদি এ সবরকম লোকের মাঝে পৃথকভাবে এবং সবার মাঝে সমান সমান বিতরণ করা উদ্দেশ্য হতো, তবে এক প্রকারের লোক অন্য প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াটাই হতো বাঞ্ছনীয়। তাহলে দেখা যেত যাবিল-কোরবার যে ব্যক্তি এতীম এবং মুসাফির ও মিসকীনও হতো, তবে প্রত্যেক প্রেক্ষিতের বিবেচনায় একেকটি করে মিলে চারটি অংশই তাকে দেয়া কর্তব্য হয়ে পড়ত। যেমন, মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির সাথে বিভিন্ন রকমের নিকটাত্মীয়তার সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে প্রত্যেক নৈকট্যের জন্যই সে পৃথক পৃথকভাবে মীরাসের অংশ পেয়ে থাকে। গোটা উম্মতের কেউ এ মতের প্রবক্তা নন যে, গনীমতের বেলায় কোন এক ব্যক্তিকে চার ভাগ দেয়া যেতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা)-এর উপর এমন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা আয়াতের উদ্দেশ্যই নয় যে, এই পাঁচ প্রকার লোকের সবাইকে অবশ্য অবশ্যই দিতে হবে এবং সমান সমান অংশে দিতে হবে। বরং আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এই যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ মাল উল্লিখিত পাঁচ প্রকার লোকের মধ্য থেকে যাকে যে পরিমাণ দিতে চাইবেন, মহানবী (সা) নিজের ইচ্ছামত দিতে পারবেন।-(মাযহারী)

সে কারণেই হযরত ফাতিমা যোহরা (রা) যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট এই এক-পঞ্চমাংশ গনীমতের মধ্য থেকে একটি খাদেমের জন্য আবেদন করলেন এবং সাথে সাথে সংসারের কাজকর্মে নিজের পরিশ্রম, অন্যান্য অসুবিধা এবং নিজের শারীরিক দুর্বলতার কথাও ব্যক্ত করলেন, তখন মহানবী (সা) এই অপারকতার কথা জানিয়ে তাঁকে দান করতে অস্বীকার করলেন যে, আমার সামনে তোমার চেয়ে বেশি অসুবিধায় রয়েছেন সুফফাবাসীরা। তাঁরা সীমাহীন দারিদ্র্য-দুর্দশায় নিপতিত। কাজেই তাঁদের বাদ দিয়ে আমি তোমাকে দিতে পারি না।-(সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

এতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সবরকম লোকের পৃথক পৃথক হক ছিল না। যদি তাই হতো, তবে যাবিল-কোরবার অধিকারে ফাতিমা যোহ্‌রা (রা)-র চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার আর কার থাকতে পারে ? সুতরাং এগুলো ছিল প্রাপ্য ক্ষেত্রের বিবরণ, প্রাপ্য অধিকারের বিবরণ নয়।

মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর এক-পঞ্চমাংশের বন্টন ঃ অধিকাংশ ইমামের মতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশের মধ্য থেকে যে অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য রাখা হয়েছিল তা তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের সুউচ্চ মর্যাদার ভিত্তিতে তেমনি ছিল যেমন করে তাঁকে বিশেষভাবে এ অধিকারও দেয়া হয়েছিল যে, তিনি সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে নিজের পছন্দমত যেকোন বস্তু নিতে পারতেন। সে অধিকার বলে কোন কোন গনীমতের মধ্য থেকে মহানবী (সা) কোন কোন বস্তু নিয়েও ছিলেন। আর গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ভাতাও গ্রহণ করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই অংশ নিজে থেকেই শেষ হয়ে যায়। কারণ তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল নেই।

যাবিল-কোরবার পঞ্চমাংশ ঃ এতে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশে দরিদ্র নিকটাত্মীয়ের অধিকার বা হক এর অন্যান্য প্রাপক এতীম মিসকীন ও মুসাফিরের অগ্রবর্তী। কারণ নিকটাত্মীয়কে সদকা-যাকাত প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা যায় না, অথচ অন্যান্যের ক্ষেত্রে যাকাত-ফিতরার দ্বারা সাহায্য করা যায়। অবশ্য ধনী নিকটাত্মীয়কে এর মধ্য থেকে দেয়া যাবে কিনা, এ প্রশ্নে হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নিকটাত্মীয়দের দান করতেন তার দু'টি ভিত্তি ছিল। (১) তাঁদের দরিদ্র ও অসহায় এবং (২) দীনের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য-সহায়তা। দ্বিতীয় ভিত্তিটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট থাকতে পারে শুধু দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের বিষয়টি। আর এই ভিত্তিতে কিয়ামত অবধি প্রত্যেক ইমামই তাঁদেরকে অন্যান্যের তুলনায় অগ্রবর্তী গণ্য করবেন। (হিদায়া, জাস্‌সাস) ইমাম শাফিয়ী (র) হতেও এ বক্তব্যই উদ্ধৃত রয়েছে।−(কুরতুবী)

কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের মতে যাবিল-কোরবার অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নৈকট্যের ভিত্তিতে চিরকাল বলবৎ থাকবে এবং তাতে ধনী-গরীব সবাই শরীক থাকবে। তবে সমকালীন আমীর (শাসক) নিজ বিবেচনায় তাদেরকে অংশ দেবেন।−(মাযহারী) এ ব্যাপারে আদত বিষয়টি হলো খুলাফায়ে-রাশিদীনের অনুসৃত রীতি। দেখতে হবে, তাঁরা মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর কি করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার এ ব্যাপারে লিখেছেন ঃ ان الخلفاء الاربعة الراشدين قسموه على ثلثة اسهم। অর্থাৎ চারজন খুলাফায়ে-রাশিদীনই মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর গনীমতের এক-পঞ্চমাংশকে মাত্র তিন ভাগে বিভক্ত করে এতীম, মিকীন ও ফকীরদের মাঝে বিতরণ করেছেন।

অবশ্য ফারূকে আযম হযরত উমর (রা) থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি হুযূর (সা)-এর নিকটাত্মীয়ের মধ্যে যাঁরা গরীব ও অভাবী ছিলেন, তাঁদেরকেও গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে দিয়ে থাকতেন।−(আবূ দাউদ)। বলা বাহুল্য, এটা শুধুমাত্র হযরত উমর ফারূকেরই রীতি ছিল না, অন্য খলীফারাও তাই করতেন।

আর যেসব রিওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ও হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁদের খিলাফতের শেষকাল পর্যন্তই যাবিল-কোরবার হক সে মাল থেকে পৃথক করে নিতেন এবং হযরত আলী (রা)-কে তার মুতওয়াল্লী বানিয়ে যাবিল-কোরবার মধ্যে বিতরণ করাতেন। (যেমনটি বর্ণিত রয়েছে ইমাম আবূ ইউসুফ রচিত কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে।) তবে এটা তার পরিপন্থী নয় যে, তা দরিদ্র যাবিল-কোরবার মাঝে বন্টন করার জন্যই নির্ধারিত ছিল।

উপকার্য ঃ রাসূলে করীম (সা) স্বীয় কার্যের মাধ্যমে যাবিল-কোরবা তথা নিকটাত্মীয়ের নির্ধারণ এভাবে করেছেন যে, বনু হাশিম তো তাঁর নিজের গোত্র ছিলই, তার সাথে বনু মুত্তালিবকেও এজন্য সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন যে, এরা ইসলাম কিংবা জাহিলিয়াত কোন কালেই বনু হাশিম থেকে আলাদা হয়নি। এমনকি মক্কার কুরাইশরা যখন বনু হাশিমের প্রতি খাদ্য অবরোধ করে এবং তাদেরকে শে'আবে আবী তালেবের মধ্যে অন্তরীণ করে দেয় তখন যদিও বনু মুত্তালিবকে তারা এ বয়কটের অন্তর্ভুক্ত করেনি, কিন্তু এরা নিজেরা স্বেচ্ছায়ই এই বয়কটে শরীক হয়ে যায়। -(মাযহারী)

বদর যুদ্ধের দিনটিই ইয়াওমুল-ফোরকান ঃ আলোচ্য আয়াতে বদরের দিনটিকেই 'ইয়াওমুল ফোরকান' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম বাহ্যিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে মুসলমানদের প্রকৃত বিজয় এবং কাফিরদের নিদর্শনমূলক পরাজয় এ দিনটিতেই সূচিত হয় এবং এরই ভিত্তিতে দিনটিতে কুফর ও ইসলামের বাহ্যিক পার্থক্যও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ
أَسْفَلَ مِنْكُمْ ط وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعٰدِ لا وَلٰكِنْ
لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ٥ لا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ط وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿৪২﴾ إِذْ يُرِيكَهُمُ
اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ط وَلَوْ أَرٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَا
زَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ط إِنَّهٗ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿৪৩﴾
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ط وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿৪৪﴾ ع

(৪২) আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের এ প্রান্তে আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নিচে নেমে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা একসঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল,–যাতে সেসব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (৪৩) আল্লাহ্ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফিরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন ; বেশি করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন, যা কিছু অন্তরে রয়েছে। (৪৪) আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্যদল মুকাবিলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ্ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহ্র নিকট গিয়ে পৌঁছায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা সে সময়ের কথা যখন তোমরা সে ময়দানের এ প্রান্তে ছিলে আর ওরা (অর্থাৎ কাফিররা) ছিল ময়দানের সে প্রান্তে। (এ প্রান্তে বলতে মদীনার নিকটবর্তী এলাকা আর সে প্রান্তে বলতে মদীনা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী এলাকাকে বোঝানো হয়েছে।) আর (কুরাইশদের) সে কাফেলা তোমাদের থেকে নিচের দিকে (নিরাপদে) ছিল। (অর্থাৎ সাগরের তীরে তীরে চলে যাচ্ছিল। অর্থাৎ একান্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে চলছিল। উভয় দলই সামনাসামনি এগিয়ে আসছিল। ফলে উভয় দলই একে অপরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সেদিককার কাফেলা পথেই ছিল, যার ফলে কাফির বাহিনীর মনে তার সাহায্যপ্রাপ্তির ধারণা ছিল বদ্ধমূল। কাজেই উত্তেজনা অধিকতর বেড়ে যায়। যাহোক, সেটি ছিল এমনই এক কঠিন পরিস্থিতি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য গায়েবী সাহায্য নাযিল করেন। যেমন উপরে বলা হয়েছে ঃ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا। আর (তাও ভাগ্যের বিষয় এই হয়েছে, হঠাৎ করে মুখোমুখি হয়ে যায়। তা না হলে) যদি (সাধারণ রীতিঅভ্যাস অনুযায়ী পূর্ব থেকে) তোমরা এবং তারা (যুদ্ধের জন্য) কোন বিষয় নির্ধারণ করে নিতে (যে, অমুক সময়ে যুদ্ধ করব) তবে (অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমাদের মাঝে এই নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিত। তা মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের নিঃসম্বলতার দরুনই মতবিরোধ হোক কিংবা কাফিরদের সাথেই মতানৈক্য হোক, এদিককার সম্বলহীনতা আর ওদিকে মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতির দরুন এ যুদ্ধের হয়তো সুযোগই আসত না। অতএব, এতে যে ফলাফল দাঁড়িয়েছে তাও হতো না যার আলোচনা করা হয়েছে لِيَهْلِكَ আয়াতে।) কিন্তু (আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন যাতে সে মতবিরোধের কোন সুযোগই আসেনি; অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল) যাতে করে সে বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটে যা আল্লাহ্ তা'আলা মঞ্জুর করে রেখেছেন (অর্থাৎ সত্যের নিদর্শন যাতে প্রকাশ হয়ে যায়।) এবং যাতে সে নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর যার ধ্বংস (অর্থাৎ

পথভ্রষ্ট) হওয়ার বিষয় আল্লাহ্ মঞ্জুর করে রেখেছেন, সে ধ্বংস হয়ে যায়। আর যারা জীবিত থাকার (অর্থাৎ সুপথগামী থাকার) তারা (-ও) যেন নিদর্শন প্রকাশের পর জীবিত থাকতে পারে। (অর্থাৎ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যাতে একটি বিশেষ পন্থায় ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পেতে পারে। সংখ্যা ও সামর্থ্যের এহেন স্বল্পতা সত্ত্বেও যেন মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে যেতে পারে, যা একান্তই অস্বাভাবিক। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম সত্য। বস্তুত এতে আল্লাহ্র প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করেছে। এরপরেও যারা পথভ্রষ্ট হবে সে সত্য প্রকাশের পরই তা হবে—ফলে তার আযাবপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়ে পড়বে, আপত্তির কোন অবকাশ থাকবে না। তেমনিভাবে যার ভাগ্যে হিদায়েতপ্রাপ্তি রয়েছে, সে সত্যকেই গ্রহণ করবে।) আর এতে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (তিনি জানেন, কে এই সত্য প্রকাশের পর মুখে ও অন্তরে কুফরী অবলম্বন করে কিংবা ঈমান আনে। আর) সে সময়টিও স্মরণ করার মত, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নযোগে সে লোকদের সংখ্যা কম করে দেখিয়েছেন (বস্তুত আপনি যখন এ স্বপ্নের বিষয় সাহাবীদের অবহিত করেন, তখন তাদের মনোবল বেড়ে যায়।) আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সংখ্যা আপনাকে বেশি করে দেখাতেন (এবং আপনি তা সাহাবীদের অবহিত করতেন), তাহলে (হে সাহাবীগণ,) তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এই (যুদ্ধের) ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক (মতবিরোধ ও) বিবাদ-বিসংবাদ (সৃষ্টি) হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদেরকে এই মনোবল হারিয়ে ফেলতে এবং বিরোধের হাত থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনের কথা যথার্থভাবে জানেন। (এক্ষেত্রেও তিনি জানতেন যে, এভাবে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে আর ওভাবে শক্তি সঞ্চারিত হবে। কাজেই তিনি এ ব্যবস্থাই করেছেন)। এবং (স্বপ্নযোগে কম দেখানোর উপরই শুধু ক্ষান্ত করেন নি, উপরন্তু রহস্য বাস্তবায়নকল্পে সম্মুখ সমরে মুসলমানদের দৃষ্টিতে, কাফিরদের সংখ্যা অল্প দেখা যায়। পক্ষান্তরে কাফিরদের দৃষ্টিতেও মুসলমানদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়, যা বাস্তবসম্মতও ছিল বটে। অতএব বলা হয়েছে,) সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুকাবিলার সময় তোমাদের দৃষ্টিতে কাফিরদের সংখ্যা কম করে দেখাচ্ছিলেন। আর (তেমনিভাবে) তাদের চোখে তোমাদের সংখ্যা কম করে দেখাচ্ছিলেন, যাতে আল্লাহ্ কর্তৃক মঞ্জুরকৃত কাজটির পূর্ণতা সাধন করে দেন। (যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে ليهلك من هلك) বস্তুত সমস্ত মোকদ্দমাই আল্লাহ্র দরবারে রুজু করা হবে (তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জীবিত অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ও হিদায়েতপ্রাপ্তকে শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বদর যুদ্ধ ছিল কুফর ও ইসলামের সর্বপ্রথম সংঘর্ষ, যা বাহ্যিক ও বস্তুগত উভয় দিক দিয়েই ইসলামের মহত্ত্ব ও সত্যতা প্রমাণ করেছে। সে কারণেই কোরআন করীম এর বিস্তারিত বর্ণনা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। আলোচ্য আয়াতেও তারই বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ আলোচনায় বহুবিধ তাৎপর্য ও কল্যাণ ছাড়াও একটি বিশেষ উপকারিতা এই নিহিত রয়েছে যে, এ যুদ্ধে বাহ্যিক ও বস্তুগত দিক দিয়ে মুসলমানদের বিজয় লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। মক্কাবাসী মুশরিকীনদের পরাজয়েরও কোন লক্ষণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্র অদৃশ্য শক্তি সমস্ত

প্রয়োজন ও বাহ্যিক ব্যবস্থার রূপ পাল্টে দিয়েছেন। এ ঘটনার বিশ্লেষণের জন্য এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে কয়েকটি শব্দ এবং সেগুলোর আভিধানিক বিশ্লেষণ লক্ষণীয়।

عُدْوَةٌ -এর অর্থ হয় 'এক দিক'। আর دُنْيَا শব্দটি গঠিত হয়েছে اَدْنٰى শব্দ থেকে। এর অর্থ নিকটতর। আখিরাতের তুলনায় এ পৃথিবীকেও دُنْيَـا এ জন্যই বলা হয় যে, এটি আখিরাতের জীবনের তুলনায় মানুষের খুবই নিকটবর্তী আর قُصْوٰى শব্দটি اَقْصٰى থেকে গঠিত। اَقْصٰى অর্থ অতি দূরবর্তী।

উনচল্লিশতম আয়াতে 'ধ্বংসপ্রাপ্তি' এবং তার বিপরীতে 'জীবন লাভ'-এর উল্লেখ রয়েছে। এ শব্দ দুটির দ্বারা বাহ্যিক মৃত্যু ও জীবন উদ্দেশ্য নয় বরং এর অর্থ হলো মর্মগত মৃত্যু ও জীবন তথা ধ্বংস ও মুক্তি। মর্মগত জীবন হলো ইসলাম ও ঈমান আর মৃত্যু হলো শিরক ও কুফ্‌র। কোরআন করীম বেশ কয়েক জায়গাতেই এ অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ –

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কথা মান, যখন তাঁরা তোমাদের এমন বিষয়ের প্রতি আহবান করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।"

এখানে জীবন বলতে সেই প্রকৃত জীবন এবং চিরন্তন শান্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের বিনিময় লাভ হয়। তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এই যে, ৪২তম আয়াতে বদর সমরাঙ্গনের পটভূমির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ছিল عـدوه دنيـا-এর নিকটবর্তী আর কাফিররা ছিল عدوه قصى-এর নিকটবর্তী। মুসলমানদের অবস্থান এই সমরাঙ্গনের সেই প্রান্তে ছিল, যা ছিল মদীনার কাছাকাছি। আর কাফিররা ছিল সমরাঙ্গনের অপর প্রান্তে, যা মদীনা থেকে দূরবর্তী ছিল। আর আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা যার কারণে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাও মক্কা থেকে আগত সৈন্যদের নিকটবর্তী, মুসলমানদের নাগালের বাইরে তিন মাইলের ব্যবধানে সাগরের তীর ধরে চলে যাচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের এই নকশা বা পটভূমি বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়টি বাতলে দেয়া যে, যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে মুসলমানরা একান্ত ভ্রান্ত স্থান ও পরিবেশে অবস্থান করছিল। সেখান থেকে বাহ্যত শত্রুকে কাবু করা তো দূরের কথা, আত্মরক্ষার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। তাছাড়া তাদের নিকট পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ মদীনা থেকে দূরবর্তী যে প্রান্তে কাফিররা শিবির স্থাপন করেছিল, তা ছিল পরিষ্কার, সমতল ভূমি। পানিও তাদের নিকট ছিল।

এ যুদ্ধক্ষেত্রের উভয় প্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করে (প্রকারান্তরে) এ কথাও বাতলে দেয়া হয়েছে যে, উভয় সৈন্যবাহিনীই একেবারে সামনাসামনি অবস্থান করছিল, যাতে কারো শক্তি কিংবা দুর্বলতাই অপরের কাছে গোপন থাকতে না পারে। তদুপরি এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকদের মনে এই নিশ্চয়তা বদ্ধমূল ছিল যে, আমাদের কাফেলা মুসলমানদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এখন প্রয়োজন হলে তারাও আমাদের সাহায্য করতে পারে। অপরদিকে মুসলমানরা অবস্থানের দিক দিয়েও ছিল কষ্ট ও পেরেশানীর মাঝে, আর কোনখান

থেকে অতিরিক্ত সাহায্যেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুত একথা পূর্ব থেকে নির্ধারিত এবং যেকোন লেখাপড়া জানা লোকেরই জানা যে, মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট তিনশ' তের জন। অপরপক্ষে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। মুসলমানদের কাছে না ছিল যথেষ্ট সংখ্যক সওয়ারী, না ছিল অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য। পক্ষান্তরে কাফির বাহিনী সব দিক দিয়েই ছিল সুসজ্জিত।

এ জিহাদে মুসলমানরা কোন সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মুকাবিলার প্রস্তুতি নিয়েও বের হয়নি, বরং আপাতত একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে পথে বাধা দিয়ে শত্রুদের শক্তিকে দমিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মাত্র তিন শ' তেরজন মুসলমান নিরস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে এক হাজার জওয়ানের এক সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে মুকাবিলা হয়ে যায়।

কোরআনের এ আয়াতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের দৃষ্টিতে এ ঘটনাটি যদিও একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার মত অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে গেছে বলে মনে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে যত আকস্মিক বিষয়ই অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে, সেগুলোর পর্যায় ও রূপ যদিও আকস্মিকতার মতই দেখা যায়, কিন্তু বিশ্বস্রষ্টার দৃষ্টিতে সে সমস্ত কিছুই একটা সুদৃঢ় ব্যবস্থার একেকটি কড়া। সেগুলোর মাঝে কোন একটি বিষয়ও ব্যতিক্রমী কিংবা অসংলগ্ন নয়। তবে গোটা ব্যবস্থাপনাটি যখন মানুষের সামনে এসে যায়, তখনই তারা বুঝতে পারে, এ আকস্মিকতার মাঝে কি কি রহস্য ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

বদর যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। এর আকস্মিক ও অনিচ্ছাকৃত প্রকাশের মাঝে এই তাৎপর্য নিহিত ছিল যে, وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعَادِ অর্থাৎ সাধারণ যুদ্ধসমূহের মত এ যুদ্ধটিও যদি সমস্ত দিক সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং পারস্পরিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করা হতো, তবে অবস্থার তাকাদা অনুসারে আদৌ যুদ্ধ হতো না। বরং এতে মতবিরোধই দেখা দিত। তা মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা ও দুর্বলতা এবং প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্য ও প্রচণ্ড শক্তির প্রেক্ষিতেই মতপার্থক্য হোক কিংবা উভয় পক্ষের অর্থাৎ মুসলমান ও কাফিরদের নির্ধারিত সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হওয়ার দরুনই হোক। মুসলমানগণ নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও দুর্বলতার জন্য হয়তো যুদ্ধে এগিয়ে যাবার সাহস করতো না। আর কাফিরদের উপরও যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতাপ জমিয়ে রেখেছিলেন, সুতরাং তারাও সংখ্যাধিক্য এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও সম্মুখ সমরে আসতে ভয় করত।

কাজেই প্রকৃতির সুদৃঢ় ব্যবস্থা উভয় পক্ষেই এমন অবস্থার সৃষ্টি করে দেয় যে, তেমন বেশি একটা চিন্তা-ভাবনার সুযোগই হলো না। মক্কাবাসীদের আবু সুফিয়ানের ভীত-সন্ত্রস্ত কাফেলার আর্ত ফরিয়াদ কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এক ভয়াবহ রূপে সামনে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করল, আর মুসলমানদের এগোতে উৎসাহিত করল তাদের এ ধারণা যে, আমাদের সামনে মুকাবিলা করার মত কোন সুসজ্জিত বাহিনী নেই ; আছে একটি সাধারণ বাণিজ্যিক কাফেলা। কিন্তু মহাজ্ঞানী মহাজনের উদ্দেশ্য ছিল উভয় পক্ষের মাঝে একটা আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ হয়ে যাওয়া। আর তাতে করে যেন এ যুদ্ধের পেছনে ইসলামের যে বিজয়সূচক ফলাফল নিহিত রয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায়। সেজন্যই বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا

অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি বা অবস্থা সত্ত্বেও এজন্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েই গেল, যেন আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজের সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন তা পূর্ণ করে দেখিয়ে দেন। আর তা ছিল এই যে, এক হাজার জওয়ানের সশস্ত্র ও সমরোপকরণে সমৃদ্ধ বাহিনীর মুকাবিলায় তিন শ' তের জন নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল ক্ষুধার্ত মুসলমানের একটি ক্ষুদ্র দল–আবার তাও যুদ্ধের অবস্থানের দিক দিয়ে একান্ত অনুপযোগী স্থান থেকেও যখন এ পাহাড়ের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন এ পাহাড়ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং এই সামান্য দলটি হয় বিজয়ী, যা সুস্পষ্টভাবে এ কথারই চাক্ষুস প্রমাণ যে, এদের পিছনে কোন মহাশক্তি কাজ করছিল, যা থেকে বঞ্চিত ছিল এই এক হাজারের বাহিনী। তাছাড়া এ কথাও সুস্পষ্ট যে, তাদের সমর্থন ছিল ইসলামের দরুন এবং ওদের বঞ্চিতি ছিল কুফরীর কারণে। তাতে করে প্রতিটি বুদ্ধিমান-বিবেচক মানুষ বুঝতে পারল সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য। সে কারণেই আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে ঃ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ অর্থাৎ বদরের ঘটনায় ইসলামের সুস্পষ্ট সত্যতা এবং কুফরের অসত্য ও বর্জনীয় হওয়ার বিষয়টি এজন্য খুলে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে যারা ধ্বংসের সম্মুখীন হতে চায়, তারা যেন দেখে শুনেই তাতে পা বাড়ায়, আর যারা বেঁচে থাকতে চায় তারাও যেন দেখেশুনেই বেঁচে থাকে; কোনটাই যেন অন্ধকারে এবং ভুল বোঝাবুঝির মাঝে না হয়।

এ আয়াতের শব্দগুলোর মধ্যে 'হালাক' বা ধ্বংসের দ্বারা কুফরীকে এবং 'হায়াত' বা জীবন শব্দের দ্বারা ইসলামকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সত্য বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবার পর ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা এবং ওজর-আপত্তির কারণ শেষ হয়ে গেছে। এখন যে লোক কুফরী অবলম্বন করবে সে চোখে দেখেই ধ্বংসের দিকে যাবে আর যে লোক ইসলাম অবলম্বন করবে সে দেখেশুনেই চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন গ্রহণ করবে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যথেষ্ট শ্রবণকারী, সবার মনের গোপন কুফরী ও ঈমান পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর সামনে রয়েছে এবং এগুলোর শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কেও তিনি পরিজ্ঞাত।

৪৩ ও ৪৪তম আয়াতে প্রকৃতির এক অপূর্ব বিস্ময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা বদর যুদ্ধের ময়দানে এই উদ্দেশ্যে কার্যকর করা হয়, যাতে উভয় বাহিনীর কোন একটিও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে যুদ্ধের অনুষ্ঠানকেই না শেষ করে দেয়। কারণ এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে বস্তুগত দিক দিয়েও ইসলামের সত্যতার বিকাশ ঘটানো ছিল নির্ধারিত।

বস্তুত প্রকৃতির সে বিস্ময়টি ছিল এই যে, কাফির বাহিনী যদিও তিনগুণ বেশি ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র স্বীয় পরিপূর্ণ ক্ষমা ও কুদরতবলে তাদের সংখ্যাকে মুসলমানদের চোখে কম করে দেখিয়েছেন, যাতে মুসলমানদের মধ্যে কোন দুর্বলতা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়ে না যায়। আর এ ঘটনাটি ঘটে দু'বার। একবার মহানবী (সা)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হয় এবং তিনি বিষয়টি মুসলমানদের কাছে বলেন। তাতে তাদের মনোবল বেড়ে যায়। আর দ্বিতীয়বার ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষ সামনাসামনি হয়, তখন মুসলমানদের তাদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়। সুতরাং ৪৩তম আয়াতে স্বপ্নের ঘটনা এবং ৪৪তম আয়াতে প্রত্যক্ষ জাগ্রত অবস্থার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষীয় বাহিনীকে এমন দেখাচ্ছিল যে, আমি আমার নিকটবর্তী একজনকে বললাম, এরা গোটা নব্বইয়েক লোক হতে পারে। পাশের লোকটি বলল, না, তা নয়–শতেক হতে পারে হয়তো।

শেষ আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে يُقَلِّلُكُمْ فِيْ اَعْيُنِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছেন। এর অর্থ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সে সংখ্যাই তাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষেই অল্প ছিল। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সংখ্যা মুসলমানদের ছিল, তার চেয়েও কম করে দেখিয়েছেন। যেমন, কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, আবূ জাহ্ল মুসলমানদের বাহিনী দেখে তার সাথীদের বলেছিল যে, তাদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে না, যাদের খোরাক একটি উট হতে পারে। আরবে কোন বাহিনীর সংখ্যা কতটি জীব তাদের খাবার জন্য যবাই করা হয় তারই ভিত্তিতে অনুমান করা হতো। একশ লোকের খোরাক ধরা হতো একটি উট। রাসূলে করীম (সা) নিজেও বদর সমরাঙ্গনে কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা জানার জন্য সেখানকার কতিপয় লোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের বাহিনীতে দৈনিক ক'টি উট যবাই করা হয় ? তখন তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, দশটি উট যবাই করা হয়। তাতেই তিনি সৈন্য সংখ্যা এক হাজার বলে অনুমান করে নেন। সারকথা, আবূ জাহ্লের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যা মোট শতেক দেখানো হয়। এখানেও কম করে দেখানোর তাৎপর্য এই যে, কাফিরদের মনে মুসলিম ভীতি যেন পূর্ব থেকে আচ্ছন্ন হয়ে না যায়, যার ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ যা হোক, আয়াতটির দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, কোন কোন সময় মু'জিযা ও অলৌকিকতা স্বরূপ চোখের দেখাও ভুল প্রতিপন্ন হয়ে যেতে পারে। যেমনটি এক্ষেত্রে হয়েছে।

সেজন্যই এখানে পুনর্বার বলা হয়েছে ঃ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً অর্থাৎ এহেন কুদরতী বিস্ময় এবং চোখের দৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ এ কারণে প্রকাশ হয় যাতে সে কাজটি সুসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে, যা আল্লাহ করতে চান। অর্থাৎ মুসলমানদের তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও বিজয় দান করে ইসলামের সত্যতা এবং তার প্রতি অদৃশ্য সমর্থন প্রকাশ পায়। বস্তুত এ যুদ্ধের যা উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা'আলা এভাবে তা পূর্ণ করে দেখিয়ে দেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সব বিষয়ই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে; তিনি যা ইচ্ছা করবেন এবং যেমন ইচ্ছা নির্দেশ দেবেন। তিনি অল্পকে অধিকের উপর এবং দুর্বলকে শক্তির উপর বিজয়ী করে দিতে পারেন, অল্পকে অধিক, অধিককে অল্পে পরিণত করতে পারেন। সুতরাং মাওলানা রূমী বলেন ঃ

گر تو خواهی عین غم شادی شود
عین بند پائے آزادی شود
چوں توخواهی آتش آب خوش شود
ور توخواهی آب هم آتش شود

خاك وباد وآب وآتش بنده اند
بامن وتو مرده باحق زنده اند

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا
وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاۗءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾

(৪৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। (৪৬) আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। (৪৭) আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুত আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে সে সমস্ত বিষয়, যা তারা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, (কাফিরদের) কোন দলের সাথে যখন তোমাদের (জিহাদে) মুকাবিলা করার সুযোগ আসে, তখন (এসব নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, প্রথমত) সুদৃঢ় থাকবে (পালিয়ে যাবে না)। আর (দ্বিতীয়ত) খুব বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে। (কারণ যিকর তথা আল্লাহর স্মরণে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পায়।) আশা করা যায়, (এতে করে) তোমরা যুদ্ধে কৃতকার্য হয়ে যাবে। (কারণ দৃঢ়তা আর মনোবল যখন একত্রিত হয়ে যায়, তখন বিজয়াশা প্রবল হয়ে যায়।) আর (তৃতীয়ত যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে (যাতে কোন একটি কাজও শরীয়ত বিরোধী না হয়।) আর (চতুর্থত নিজেদের নেতার সাথে কিংবা) পারস্পরিকভাবে কোন বিবাদ করবে না। অন্যথায় (পারস্পরিক অনৈক্যের দরুন) হীনবল হয়ে পড়বে। (কারণ তাতে করে তোমাদের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং একে অন্যের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আর একা কোন লোক

কিইবা করতে পারে ?) আর তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। (প্রভাব চলে যাওয়া অর্থ তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কারণ অন্যরা যখন এই মতবিরোধ সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হবে।) আর (পঞ্চমত কখনো কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখা দিলে সেজন্য ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। বস্তুত আল্লাহর সান্নিধ্যই হয় সাহায্যের কারণ।) আর (ষষ্ঠত নিয়তকে নির্ভেজাল রাখবে, দম্ভ কিংবা লোক দেখানোর ক্ষেত্রে) সেই (কাফির) লোকদের মত হবে না, যারা (এই বদরের ঘটনাতেই) নিজেদের অবস্থান থেকে দম্ভভরে এবং লোকদের (নিজেদের আড়ম্বর ও সাজসরঞ্জাম) প্রদর্শন করতে করতে বেরিয়ে এসেছে। আর (এহেন দম্ভ ও লোক দেখানোর সাথে সাথে তাদের নিয়ত ছিল) মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে (অর্থাৎ দীন থেকে) বিরত রাখা। (কারণ তারা মুসলমানদের অপমান করতে যাচ্ছিল। যার প্রতিক্রিয়াও মূলত ধর্ম থেকে সাধারণ লোকের দূরত্ব বিধান।) বস্তুত আল্লাহ তা'আলা (সে লোকদেরকে পুরোপুরি শাস্তি দান করবেন। সুতরাং) তাদের কৃতকর্মকে তিনি (স্বীয় জ্ঞানের) বেষ্টনীতে নিয়ে নিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুদ্ধ-জিহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কোরআনের হিদায়েত ঃ প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য এবং শত্রুর মুকাবিলার জন্য একটি বিশেষ হিদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনের কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত। আর তা হলো কয়েকটি বিষয়।

প্রথমত দৃঢ়তা ঃ অর্থাৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা দুই-ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কারো মন দৃঢ় এটা এমন বিষয় যা মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচাইতে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকেজো, বেকার।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর যিকর। এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদাররা ছাড়া সাধারণ পৃথিবী গাফিল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহিনী সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হিদায়েত, এই নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মুতাবিক যেকোন অঙ্গনে যেকোন জাতির সাথে মুকাবিলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহর যিকরের নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মুকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

বিপদ যত কঠিন হোক না কেন, আল্লাহর স্মরণ সে সমস্ত হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় স্বভাবত এমন এক সময় যখন কেউ কাউকে স্মরণ করে না; সবাই শুধুমাত্র নিজেদের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। সেজন্যই জাহিলিয়াত আমলের আরব কবিরা যুদ্ধের ময়দানেও নিজেদের প্রেমাস্পদ প্রেয়সীদের স্মরণ করে গর্ববোধ করত যে, এটা যথার্থই বলিষ্ঠ মনোবল ও প্রেমে পরিপক্কতার প্রমাণ বটে। জাহিলিয়াত আমলের কোন এক কবি বলেছেন ঃ

ذكرتك والخطى يخطر بيننا

অর্থাৎ আমি তখনও তোমার কথা স্মরণ করেছি, যখন আমাদের মাঝে বর্শা বিনিময় চলছিল।

কোরআনে করীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদের আল্লাহর স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে; তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকীদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কোরআনে আল্লাহর যিকর ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম নেই। صَلٰوةً كَثِيْرًا অথবা صِيَامًا كَثِيْرًا কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহর যিকর তথা স্মরণ এমন সহজ একটি ইবাদত যে, তাতে না তেমন কোন বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং নাইবা অন্য কোন কাজের কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহর যিকরের জন্য কোন শর্তাশর্ত, কোন বাধ্যবাধকতা, ওযু কিংবা পবিত্রতা, পোশাকাশাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোন নিয়মই আরোপ করেন নি। যেকোন মানুষ যেকোন অবস্থায় ওযুর সাথে, বিনা ওযুতে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইমাম জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিস্‌নে হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর যিকর শুধু মুখে কিংবা মনে মনে যিকর করাকেই বলা হয় না বরং প্রতিটি জায়েয বা বৈধ কাজ আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সবই যিকরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী যিকরুল্লাহর মর্ম এত ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিদ্রিত মানুষকেও যাকের বলা যেতে পারে। যেমন, কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে ঃ نوم العالم عبادة অর্থাৎ আলিম ব্যক্তির ঘুমও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ যে আলিম তার ইলমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবই আল্লাহর আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহিদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেওয়া হলো বলে মনে হয়, যা স্বভাবতই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর যিক্‌রের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনও কোন পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি, একটা শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজকর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্ট-পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোন একটা বাক্য কিংবা কোন গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কোরআন করীমে মুসলমানদের

তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহর যিকরের দু'টি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি যিকর তো হলো তাই, যা সাধারণত 'না'রায়ে তকবীর'-এর স্লোগানের মাধ্যমে করা হয়। এ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই 'যিক্রুল্লাহ্'-র অন্তর্ভুক্ত।

৪৬তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর। কারণ আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চনার কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কোরআনী হিদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হলো ثبات - ذكر الله ও اطاعت। অর্থাৎ দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহর যিকর ও আনুগত্য। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا এতে ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَنَازَعُوْا অর্থাৎ তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না। তা হলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের বল ভেঙে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

এতে বিবাদ-বিসংবাদের দু'টি পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। (১) তোমরা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়বে এবং (২) তোমাদের বল ভেঙে যাবে, তোমরা শত্রুর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে। পারস্পরিক ঝগড়া ও বিবাদ-বিসংবাদের দরুন অন্যের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, কিন্তু এতে নিজের শক্তির উপর এমন কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে যার কারণে দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়তে হবে ? এর উত্তর এই যে, পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে গোটা দলের শক্তি সংযুক্ত থাকে। ফলে এককভাবে ব্যক্তি ও নিজের মাঝে গোটা দলের সমপরিমাণ শক্তি অনুভব করে। পক্ষান্তরে যখন পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাস থাকে না, তখন ব্যক্তির একার ক্ষমতাই থেকে যায়, যা যুদ্ধ-বিগ্রহের বেলায় কোন কিছুই নয়।

তারপরে বলা হয়েছে ঃ وَاصْبِرُوْا অর্থাৎ অবশ্য ধৈর্য ধারণ কর। বাক্যের বিন্যাস ধারায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, কোন দলের মত ও উদ্দেশ্যে যত ঐক্যই থাক না কেন, কিন্তু ব্যক্তি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া কোন উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য থাকা অপরিহার্য। কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে এবং অন্যকে সঙ্গে রাখতে গিয়ে মানুষকে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়েও ধৈর্যধারণ ও সহনশীলতার স্বভাব গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও

অনমনীয়তা না থাকা উচিত যা গৃহীত না হলে ক্ষেপে যায়। এই গুণের অপর নামই হলো 'সবর'। ইদানীং এ কথাটি সবাই জানে এবং বলেও থাকে যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকার মূল কথা 'সবর' অবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের মত মানাবার ফিকিরে ক্ষেপে না যাওয়ার গুণটি অতি অল্প লোকের মাঝেই পাওয়া যায়। সে কারণেই ঐক্য ও একতার যাবতীয় ওয়াজ-নসীহতই নিষ্ফল হয়ে যায়। অপরকে নিজের কথা বা মত মানাবার ক্ষমতা মানুষের থাকে না। তবে নিজে অপরের কথা বা মতামত মেনে নেবার এবং যদি তাঁর জ্ঞান ও সততার তাগিদে না-ই মানতে পারে, তবে অন্তত মৌনতা অবলম্বন করার অধিকার অবশ্যই তার রয়েছে। কাজেই কোরআন করীম বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য হিদায়েত দানের সঙ্গে সঙ্গে 'সবর' অবলম্বনের দীক্ষাও প্রতিটি ব্যক্তি ও দলকে দিয়েছে যাতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকার কাজটি কার্যক্ষেত্রে সহজ হয়ে যায়।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে কোরআন করীম لَا تَنَازَعُوْا বলেছে। অর্থাৎ পারস্পরিক বিবাদ-দ্বন্দ্ব থেকে বিরত করেছে, মতের পার্থক্য কিংবা তা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি। যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সাথে সাথে নিজের মত অন্যকে মানাবার প্রেরণা কার্যকর থাকে তাকেই বলা হয় বিবাদ ও বিসংবাদ। আর এটিই হলো সে প্রেরণা যাকে কোরআন করীম– وَاصْبِرُوْا শব্দে ব্যক্ত করেছে এবং সবশেষে সবর অবলম্বনের এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততাকে দূর করে দিয়েছে। বলা হয়েছে اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ। অর্থাৎ যারা সবর অবলম্বন করে তথা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে রয়েছেন। এটি এমন এক মহা সম্পদ যে, এটা পরকালের যাবতীয় সম্পদের মুকাবিলায় অতি নগণ্য।

কোন কোন যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) এ সমস্ত হিদায়েতকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই ভাষণ দান করেছেন–"হে উপস্থিত সৈন্যগণ, তোমরা শত্রুর মুকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করো না বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অব্যাহতি কামনা কর। আর অগত্যা যদি মুকাবিলা হয়েই যায়, তবে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবশ্যই অবলম্বন কর এবং একথা জেনে নাও যে, জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতেই নিহিত। –(মুসলিম)

৪৭তম আয়াতে আরো একটি ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্কীকরণ এবং তা থেকে বাঁচার হিদায়েত দান করা হয়েছে। তা হলো নিজের শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের উপর গর্ব করা কিংবা কাজ করতে গিয়ে সত্যতা ও নিঃস্বার্থতার পরিবর্তে নিজের অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকানো থাকা। কারণ এ দু'টি বিষয়ও বড় বড় শক্তিশালী দলকে পর্যন্ত পরাস্ত-পরাভূত করে দেয়।

এ আয়াতে মক্কার কুরাইশদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা নিজেদের বাণিজ্যিক কাফেলার হিফাযতের জন্য বিপুল সংখ্যা ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে নিজেদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে সদম্ভে মক্কা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আর বাণিজ্যিক কাফেলাটি যখন মুসলমানদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখনও তারা ফিরে না গিয়ে নিজেদের সাহস ও বাহাদুরি প্রকাশ করতে চায়।

প্রামাণ্য রিওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, আবূ সুফিয়ান যখন তার বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে মুসলমানদের নাগালের বাইরে চলে যায় তখন আবূ জাহলের কাছে দূত পাঠিয়ে দেয় যে, এখন

আর তোমাদের এগিয়ে যাবার দরকার নেই, ফিরে চলে এসো। আবূ সুফিয়ান ছাড়া আরো বহু কুরাইশের মতও ছিল তাই। কিন্তু আবূ জাহ্ল তার গর্ব-অহঙ্কার-দাম্ভিকতা ও খ্যাতির মোহে শপথ করে বসে যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে যাব না, বদরে পৌঁছে যতক্ষণ না কয়েক দিন যাবত নিজেদের বিজয়-উৎসব উদ্‌যাপন করে নেব।

যার পরিণতিতে সে নিজে এবং তার কয়েকজন বড় বড় সাথী সেখানেই নিহত হয় এবং একই গর্তে প্রোথিত হয়ে রয়ে যায়। এ আয়াতে মুসলমানদের তাদের অনুসৃত পন্থা থেকে বিরত থাকারও হিদায়েত দেয়া হয়েছে।

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ
النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنَٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

(৪৮) আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনি হলো উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুতপায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নেই—আমি দেখছি যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহ্‌কে। আর আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ত কঠিন। (৪৯) যখন মুনাফিকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুত, যারা ভরসা করে আল্লাহ্‌র উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদের সাথে সে সময়টির কথা বলুন, যখন শয়তান সে (কাফির) লোকদেরকে (ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে) তাদের (কুফরীসুলভ) আচরণ [রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা প্রভৃতিকে তাদের দৃষ্টিতে] সুন্দর করে দেখায় (ফলে তারা এ সমস্ত বিষয়কে ভাল মনে করতে থাকে)। তদুপরি (সে ওয়াস্ওয়াসার ঊর্ধ্বে তাদের সামানাসামনি এ কথাও) বলে যে, (তোমাদের মাঝে এমন শক্তি-সামর্থ্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তোমাদের বিরোধী) লোকদের মধ্যে আজকের দিনে কেউই তোমাদের উপর বিজয় অর্জন করার মত নেই। আর আমি তোমাদের সমর্থক-(তোমরা

বহিরাগত শত্রুদেরও কোন ভয় করো না এবং ভেতরের শত্রুদের ব্যাপারেও কোন রকম আশংকা করো না)। তারপর যখন (কাফির ও মুসলমান) উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সামনাসামনি হয়ে যায় (এবং সে অর্থাৎ শয়তান যখন ফেরেশতাদের অবতরণ প্রত্যক্ষ করে) তখন পিছন ফিরে পালাতে আরম্ভ করে এবং বলে তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (আমি সমর্থক-সহায়ক কোন কিছুই নই। কারণ) আমি সে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করছি যা তোমরা দেখতে পাও না (অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী)। আমি যে আল্লাহকে ভয় করি (যে, তিনি না আবার এ পৃথিবীতেই ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমার খবর নিয়ে নেন)। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন কঠিন শাস্তিদাতা। তাছাড়া সে বিষয়টিও স্মরণ করার মত, যখন (মদীনার মুনাফিকদের মধ্য থেকে) এবং (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যাদের অন্তরে (সন্দেহ সংশয়জনিত) ব্যাধি বিদ্যমান ছিল (নিঃসম্বল মুসলমানদের কাফিরদের মুকাবিলায় আসতে দেখে) বলছিল যে, এসব (মুসলমান) লোকগুলোকে তাদের ধর্ম এক বিভ্রান্তিতে নিপতিত করে দিয়েছে; (নিজেদের ধর্মের সত্যতার ভরসায় এরা এহেন কঠিন বিপদে এসে পড়ছে। আল্লাহ্ উত্তর দিচ্ছেন—) আল্লাহ্র উপর যারা ভরসা করে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই হয় বিজয়ী। কারণ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরাক্রমশীল। (কাজেই তাঁর উপর ভরসাকারীকে বিজয়ী করে দেন। অবশ্য ঘটনাচক্রে এমন ভরসাকারীও যদি কখনো পরাজিত হয়ে পড়ে, তবে তার পেছনে কিছু মঙ্গল নিহিত থাকে। কারণ) তিনি সুবিজ্ঞও বটে। (সুতরাং কোন কিছুই বাহ্যিক সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, প্রকৃত ক্ষমতাশীল হলেন অন্যজন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আনফালের প্রথম থেকেই চলে আসছে বদর যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলী, উপস্থিত পরিস্থিতি, তাতে অর্জিত শিক্ষা ও উপদেশাবলী এবং আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত আলোচনা।

সেসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে শয়তান কর্তৃক মক্কার কুরাইশদের প্রতারিত করে মুসলমানদের মুকাবিলায় নামানো এবং ঠিক যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তার পালিয়ে যাওয়া। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে সেকথাই বলা হয়েছে।

শয়তানের এই প্রতারণা ছিল কুরাইশদের মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টির আকারে কিংবা মানুষের আকৃতিতে সরাসরি সামনে এসে কথাবার্তা বলার মাধ্যমে। এতে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। তবে কোরআনের শব্দাবলীতে দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রতিই অধিকতর সমর্থন বোঝা যায় যে, সে মানুষের আকৃতিতে সামনাসামনি এসে প্রতারিত করেছিল।

ইমাম ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশংকা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ বকর গোত্রও আমাদের শত্রু; আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগে এই শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়িঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে! সুতরাং কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশংকা তাদের পায়ের বেড়ি হয়ে রইল। এমনি সময়ে শয়তান সোরাকা ইবনে মালিকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হলো যে, তাঁর

হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তার সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সোরাকা ইবনে মালিক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কুরাইশদের মনে তারই আক্রমণের আশংকা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ জওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বসল এবং দু'ভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। প্রথমত, لا غالب لكم اليوم من الناس অর্থাৎ আজকের দিনে এমন কেউ নেই, যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষের সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তিসামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি—কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মুকাবিলায় বিজয় অর্জন করবে এমন কেউ নেই।

দ্বিতীয়ত, اِنِّىْ جَارٌلَّكُمْ। অর্থাৎ বনি বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশংকা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি যে, এমনটি হবে না; আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কুরাইশরা সোরাকা ইবনে মালিক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল, কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে গেল এবং বনি বকর গোত্রের আক্রমণাশংকা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় উদ্বুদ্ধ হলো।

এই দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ অর্থাৎ যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে গেল, তখন শয়তান পেছন ফিরে পালিয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তায় একটি শয়তানি বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুকাবিলায় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন মানবাকৃতিতে সোরাকা ইবনে মালিকের রূপে স্বীয় শয়তানি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন সে জিবরাঈল-আমীন এবং তাঁর সাথী ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কুরাইশী যুবক হারেস ইবনে হিশামের হাতে ধরা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেস তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ ! তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেসকে ফেলে দিল এবং নিজের শয়তানি বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেস তাকে সোরাকা মনে করে বলল, হে আরব সর্দার সোরাকা, তুমি তো বলেছিলে ঃ "আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি।" অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ। তখন শয়তান সোরাকা বেশেই উত্তর দিল ঃ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি হতে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহকে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহকে ভয়

করি।' সম্পর্কে তফসীর শাস্ত্রের ইমাম কাতাদাহ বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল। সত্যি সত্যিই যদি সে আল্লাহকে ভয় করত, তাহলে নাফরমানী করবে কেন? কিন্তু অধিকাংশ মনীষী বলেছেন যে, ভয় করাও যথাস্থানে ঠিক। কারণ সে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহা ক্ষমতা এবং কঠিন আযাব সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করার কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করায় কোন লাভ নেই।

সোরাকা এবং তার বাহিনীর পশ্চাদপসরণের দরুন স্বীয় বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়তে দেখে আবূ জাহল কথাটি ঘুরিয়ে বলল, সোরাকা পালিয়ে যাওয়ায় তোমরা ঘাবড়িয়ো না, সে তো মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল। যা হোক, শয়তানের পশ্চাদপসরণের পর তাদের যা পরিণতি হবার ছিল তা-ই হলো। তারপর যখন মক্কায় ফিরে এল এবং সোরাকা ইবনে মালিকের সঙ্গে তাদের একজনের দেখা হলো, তখন সে সোরাকার প্রতি ভর্ৎসনা করে বলল, "বদর যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ও যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমারই উপর অর্পিত হবে। তুমি ঠিক যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সমরাঙ্গন থেকে পশ্চাদপসরণ করে আমাদের জওয়ানদের মনোবল ভেঙে দিয়েছ।" সে বলল, "আমি তো তোমাদের সাথেও যাইনি, তোমাদের কোন কাজেও অংশগ্রহণ করিনি। তোমাদের পরাজয়ের সংবাদও তো আমি তোমাদের মক্কায় ফিরে আসার পরেই শুনেছি।"

এসব রিওয়ায়েত ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, অভিশপ্ত শয়তানের এটি একটি সাধারণ অভ্যাস যে, সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে দিয়ে ঠিক সময়মত আলাদা হয়ে যায়। তার এ অভ্যাস সম্পর্কে কোরআনে করীমও বারবার আলোচনা করেছে। এক আয়াতে রয়েছে ঃ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنْكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ –

শয়তানের ধোঁকা প্রতারণা এবং তা থেকে বাঁচার উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে ঃ

(১) শয়তান মানুষের জাতশত্রু, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা রকম কলাকৌশল ও চাল-ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে থাকে। কোন কোন সময় শুধু মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে তোলে, আবার কখনো সামনাসামনি এসে ধোঁকা দেয়।

(২) শয়তানকে আল্লাহ্ তা'আলা এই ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফিকাহ্‌বিদের গ্রন্থ 'আকামুল-মার্জান ফী আহকামিল্ জানান'-এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সূফী মনীষীবৃন্দ যাঁরা আধ্যাত্মিক কাশ্‌ফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তাঁরা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোন রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরম্ভ করা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে, এমন কি কাশ্‌ফ ও ইলহামেও শয়তানের পক্ষ থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মাওলানা রুমী (র) বলেন ঃ

اے بسا ابلیس آدم روئے ست

پس بهر دستے نشاید داد دشت

আর হাফিয বলেন ঃ

در راه عشق وسوسه اهر من بسے ست
هشدار وگوش رابه پیام سروش دار

'পায়ামে সারোশ' অর্থ আল্লাহ্‌র ওহী।

কৃতকার্যতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও অপরিহার্য ঃ (৩) যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোন অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসাবে প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তিষ্ককে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকেই ভাল মনে করতে শুরু করে দেয়। ন্যায়পন্থীদের মত তারাও নিজেদের অন্যায় অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরি হয়ে যায়। সেজন্য কুরাইশ বাহিনী এবং তার সর্দার যখন বায়তুল্লাহ্ থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন বায়তুল্লাহ্‌র সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ اللهم انصر اهدى الطائفتين। —অর্থাৎ "আয় আল্লাহ্ উভয় দলের যেটি অধিকতর সৎপন্থী তারই সাহায্য কর, তাকেই বিজয় দান কর।" এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হিদায়েত প্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থী বলে মনে করত। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জানমাল কোরবান করে দিত।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের গতি-প্রকৃতি সঠিক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদীনার মুনাফিক ও মক্কার মুশরিকদের একটি যৌথ সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা তাদের জন্য দুঃখ করেই যেন বলা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই ঃ غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ অর্থাৎ বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে চলে এসেছে, তা এই বেচারাদের তাদের দীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে ফেলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেছেন ঃ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ। অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে নেয়, জেনে রাখো, সে কখনও অপমানিত-অপদস্থ হয় না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর উপর পরাক্রমশীল। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধিই বিকল হয়ে যায়। মর্মার্থ এই যে, তোমরা শুধু বস্তু ও বস্তুজগত সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোন খবরই নেই যা বস্তু ও বস্তুজগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার ভাণ্ডারে রয়েছে এবং যা তাঁর উপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের সঙ্গে থাকে।

ইদানীংকালেও সরল-সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে তথাকথিত অনেক বিজ্ঞ-বুদ্ধিমান বলে থাকে—"এরা পুরান দিনের লোক, এদের কিছু বলো না।" কিন্তু এদের মধ্যে যদি আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও ভরসা থাকে, তবে এতে তাদের কিছুই অনিষ্ট হতে পারে না।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَـٰرَهُمْ ۚ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ
وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۙ وَٱلَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ
شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ
قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

(৫০) আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের জান কবজ করে; প্রহার করে তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদ্দেশে আর বলে, জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৫১) এই হলো সে সবের বিনিময় যা তোমরা তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। বস্তুত এটি এ জন্য যে, আল্লাহ্ বান্দার উপর জুলুম করেন না। (৫২) যেমন, রীতি রয়েছে ফিরাউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে যে, এরা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাপের দরুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহা শক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা। (৫৩) তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ কখনও পরিবর্তন করেন না সে সব নিয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুত আল্লাহ্ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি যদি (তখনকার ঘটনা) প্রত্যক্ষ করেন (তবে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখবেন—) যখন ফেরেশতারা এই (বর্তমান) কাফিরদের জান কবজ করে যাচ্ছেন (এবং) তাদের মুখে-পিঠে প্রহার করেছেন এবং একথা বলছেন যে (এখনই কি দেখেছ পরবর্তিতে) আগুনের শাস্তি ভোগ করবে (আর) এ আযাব সেসব (কুফরী) কৃতকর্মেরই কারণে যা তোমরা নিজের হাতে সংগ্রহ করেছ। তাছাড়া একথা সপ্রমাণিত যে, আল্লাহ্ বান্দাদের উপর জুলুমকারী নন। (সুতরাং আল্লাহ্ বিনা অপরাধে শাস্তি দেননি। অতএব কুফরের কারণে শাস্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে) তাদের অবস্থা তেমনি যেমন ফিরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী (কাফির)-দের অবস্থা ছিল তারাও আল্লাহ্ নির্দেশসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং তার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (সে) পাপের দরুন তাদের (আযাবের মাঝে) পাকড়াও করেছিলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা

মহা শক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা। (তাঁর মুকাবিলায় এমন কোন শক্তি নেই যে তাঁর আযাবকে প্রতিহত করতে পারে। আর 'বিনা অপরাধে আমি যে শাস্তি দান করি না'-) তা এ কারণে যে, (আমার একটি মূলনীতি নির্ধারিত রয়েছে। আর বিনা অপরাধে শাস্তি না দেওয়া তারই একটি ধারা। বস্তুত সে নিয়মটি হলো এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নিয়ামতকে পরিবর্তন করেন না যা কোন জাতিকে দান করেছেন, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের নিজস্ব কার্যকলাপ পরিবর্তন করে দেয়। আর এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত শ্রবণশীল, মহাজ্ঞানী। (সুতরাং তিনি কথার পরিবর্তনকে শোনেন, কাজের পরিবর্তন সম্পর্কে জানেন। বস্তুত উপস্থিত কাফিররা তাদের অবস্থার এই পরিবর্তন সাধন করে যে, তাদের মাঝে কুফরী থাকা সত্ত্বেও প্রথমে ঈমান আনার যোগ্যতা নিকটবর্তী ছিল, কিন্তু অস্বীকৃতি ও বিরোধিতা করে করে সে যোগ্যতাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কাজেই আমি তাদের প্রতি 'অবকাশ' দানের যে নিয়ামত দিয়ে রেখেছিলাম, তা পাকড়াও জনিত আযাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছি। কারণ তারা উল্লিখিত পন্থায় নিকটবর্তী নিয়ামত হিদায়েত প্রাপ্তির যোগ্যতাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে কাফিরদের মৃত্যুকালীন আযাব এবং ফেরেশতাদের সতর্কীকরণের আলোচনা করা হয়েছে। এতে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র ফেরেশতারা কাফিরদের রূহ কবজ করেন এবং তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করেন এবং বলেন যে, আগুনে জ্বলার আযাবের মজা গ্রহণ কর; আপনি যদি সে সময়ে তাদের অবস্থা দেখতেন, তখন আপনি এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামদের কেউ কেউ এ বিবরণকে সে সমস্ত কুরাইশ কাফিরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ্ মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যেসব কাফির সর্দার নিহত হয় তাদের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের হাত ছিল। তাঁরা তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে তাদের মুখে এবং পেছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে তাদের হত্যা করেছিলেন আর সেই সঙ্গে আখিরাতের আযাব সম্পর্কে তাদের সংবাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন।

আর যারা আয়াতের শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন কোন কাফির মৃত্যুবরণ করে, তখন মউতের ফেরেশতা রূহ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের হাতে আগুনের চাবুক এবং লোহার গদা থাকে যার দ্বারা মরণোন্মুখ কাফিরকে আঘাত করা হয়। যেহেতু এই আযাবের সম্পর্ক জড়জগতের সাথে নয়, বরং কবর জগতের সাথে যাকে 'বরযখ' বলা হয়, কাজেই এই আযাব সাধারণত চোখে দেখা যায় না।

সেজন্যই রাসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "যদি আপনি দেখতেন, তবে বড়ই করুণ দৃশ্য দেখতে পেতেন।" এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখেও অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কাফিরদের উপর আযাব হয়ে থাকে।

কিন্তু এর সম্পর্ক হলো আলমে গায়েব বা অদৃশ্য জগতের সাথে। তাই তা সাধারণভাবে দেখা যায় না। কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বর্ণনাতেও কবর আযাবের ব্যাপারে বিপুল আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফিরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখিরাতে এ আযাব তোমাদের নিজের হাতেরই অর্জিত। সাধারণ কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেরই উল্লেখ করা হয়েছে। মর্মার্থ হলো এই যে, এসব আযাব তোমাদের নিজেদের আমলেরই ফলাফল। আর একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর জুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আযাবে নিপতিত করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার এই আযাব নতুন কিছু নয়, বরং এটাই আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ রীতি যে, তিনি তাঁর বান্দাদের হিদায়েতের জন্য তাদেরকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করেন, আশেপাশে তাদের জন্য এমন অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান থাকে যেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই তারা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরত ও মহত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং অসহায় সৃষ্টিকে আর তাঁর সাথে শরীক করে না। তদুপরি অতিরিক্ত সতর্কীকরণের জন্য নবী-রাসূল পাঠান। আল্লাহ্র রাসূল তাদের বুঝাতে ও বোঝাতে সামান্যতম ত্রুটিও রাখেন না। তাঁরা তাদেরকে মু'জিযা আকারে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ানক ক্ষমতার দৃশ্যাবলীও দেখান। তারপরেও যখন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এ সমস্ত বিষয় থেকে চোখ বন্ধ করে নেয় এবং আল্লাহ্র সতর্কতার কোনটিতেই কান দেয় না, তখন এহেন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হলো এই যে, পৃথিবীতেও তাদের উপর আযাব নেমে আসে এবং আখিরাতেও অন্তহীন আযাবে বন্দী হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ دَاْبِ — كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ রীতি, অভ্যাস। অর্থাৎ ফিরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী কাফির ও উদ্ধত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি সম্পর্কে গোটা বিশ্বই জানতে পেরেছে যে, তিনি ফিরাউনকে তার সমস্ত আড়ম্বর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আ'দ ও সামূদ জাতিসমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতির আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় আযাবে নিপতিত করেছেন। اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আল্লাহ্ অত্যন্ত শক্তিশালী, কোন ক্ষমতাবানই নিজের শক্তির বলে তাঁর আযাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতিকে যে নিয়ামত দান করেন তিনি তা ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়।

এখানে প্রথম এ কথাটি লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ নিয়ামত দান করার জন্য কোন মূলনীতি বর্ণনা করেন নি। না সে জন্য কোন রকম বাধ্যবাধকতা ও শর্তাশর্ত আরোপ করেছেন, না তা কারো কোন সৎকর্মের উপর তা নির্ভরশীল রেখেছেন। তার কারণ যদি এমনই হতো, তবে সর্বপ্রথম নিয়ামত আমাদের অস্তিত্ব যাতে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের হাজারো বিস্ময়কর নিয়ামতের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এসব নিয়ামত সে সময় দান করা হয়, যখন না ছিলাম আমরা, না ছিল আমাদের কোন আমল বা কাজকর্ম।

ما نبوديم وتقاضا ما نبود
لطف تونا گفته ما مى شنود

কাজেই যদি আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ বান্দার সৎকর্মের অপেক্ষায় থাকত, তবে আমাদের অস্তিত্বই স্থাপিত হতো না।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও রহমত তথা তাঁর দান ও করুণা তাঁর রব্বুল আলামীন ও রাহমানুর-রাহীম গুণেরই প্রকৃতিগত ফসল। তবে অবশ্য এ সমস্ত নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য একটা নিয়ম বা মূলনীতি রয়েছে যা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, যে জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নিয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে পরিবর্তিত করে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়।

অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে ভাল ও সৎ অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেওয়া কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল, নিয়ামত প্রাপ্তির পর তারচেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া।

এই বিশ্লেষণের দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, বিগত আয়াতগুলোতে যে সমস্ত জাতি-সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের কাফিররা এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়। এ আয়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক এ কারণে যে, এরা যদিও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত প্রাপ্তির সময়ও তেমন কোন ভাল অবস্থায় ছিল না; সবাই ছিল মুশরিক ও কাফির, কিন্তু নিয়ামত প্রাপ্তির পর এরা নিজেদের মন্দাচার ও অসৎ কর্মে পূর্বের চাইতে বহুগুণে বেশি তৎপর হয়ে ওঠে।

ফিরাউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলদের উপর নানা রকম অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং হযরত মূসা (আ)-এর মুকাবিলা ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী অপরাধে আরেকটি সংযোজন। এতে করে তারা নিজেদের অবস্থাকে অধিকতর কল্যাণের দিকে প্রত্যাবর্তিত করে দেয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর নিয়ামতকে বিপদাপদ ও শাস্তি-সাজায় বদলে দেন। তেমনিভাবে মক্কার কুরাইশরা যদিও মুশরিক ও বদকার ছিল, কিন্তু তার সাথে সাথে তাদের মাঝে কিছু সৎ কর্ম, সেলাহ্ রেহমী, স্বজনবাৎসল্য, মেহমান-নাওয়াযী তথা অতিথিপরায়ণতা, হাজীদের সেবা, বায়তুল্লাহ্‌র প্রতি সম্মানবোধ প্রভৃতি কিছু সদগুণও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য দীন দুনিয়ার নিয়ামতরাজির দরজা খুলে দিয়েছেন, দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি দান করেছেন। যেসব দেশে কারো বাণিজ্যিক কাফেলা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারত না সেসব দেশে—যেমন, সিরিয়া ও ইয়ামেনে তাদের

বাণিজ্যিক কাফেলা যেত এবং একান্ত নিরাপদে লাভবান হয়ে ফিরে আসত। তার আলোচনা করেছে কোরআন করীম لايلف সূরায় رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ শিরোনামে।

আর দীনের দিক দিয়ে সে মহা নিয়ামত তাদের দান করা হয়েছে যা বিগত কোন জাতি-সম্প্রদায়ই পায়নি। তাদেরই মাঝে আবির্ভূত হন নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ নবী (সা) এবং তাদেরই মাঝে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ কোরআন করীম।

কিন্তু এরা আল্লাহ্ তা'আলার এ সমস্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করা, এর যথার্থ মর্যাদা দান এবং এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার পরিবর্তে আগের চেয়েও বেশি পঙ্কিলতায় মজে যায়। সেলাহ্-রেহমী পরিহার করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপরাধে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর চরম বর্বরতাসুলভ উৎপীড়ন চালাতে আরম্ভ করে, অতিথি-পরায়ণতার পরিবর্তে সেই মুসলমানদের জন্য দানাপানি বন্ধ করার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে, হাজীদের সেবা করার পরিবর্তে মুসলমানদের হেরেমে প্রবেশে পর্যন্ত বাধা দান করতে থাকে। এগুলো ছিল সেসব অবস্থা যাকে কুরাইশ কাফিররা পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এরই পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামতসমূহকে বিপদাপদ ও আযাবে রূপান্তরিত করে দেন। ফলে এরা দুনিয়াতেও অপদস্থ হয় এবং যে সত্তা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন তাঁরই মাধ্যমে এরা নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানায়।

তফসীরে মাযহারীতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিলাব ইবনে মুররা যিনি রাসূলে করীম (সা)-এর বংশ-পরম্পরায় তৃতীয় পুরুষে পরদাদা হিসাবে গণ্য, তিনি প্রথম থেকেই দীনে-ইবরাহীমী ও ইসমাঈলীর অনুগামী ছিলেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে এ দীনের নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্য তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। কোসাই ইবনে কিলাবের সময়ে তাদের মধ্যে মূর্তি উপাসনার সূচনা হয়। তাঁর পূর্বে তাদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন কা'আব ইবনে লুওয়াই। তিনি জুমার দিন যাকে তাদের ভাষায় 'আরোমিয়া' বলা হতো (সমাজের) সবাইকে সমবেত করে ভাষণ দিতেন এবং সবাইকে বলতেন যে, তার সন্তানবর্গের মাঝে শেষনবী (সা)-এর জন্ম হবে। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা সবার জন্য অপরিহার্য হবে। যে লোক তাঁর উপর ঈমান আনবে না, তার কোন আমলই কবূল হবে না। মহানবী (সা) সম্পর্কে তার আরবী কবিতা জাহিলিয়াত আমলের কবিদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কোসাই ইবনে কিলাব সমস্ত হাজীর জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি এ দায়িত্বটি মহানবী (সা)-এর বংশে তাঁর আমলেও বলবৎ ছিল। এই ইতিহাসের দ্বারা এ কথাও বলা যেতে পারে যে, কুরাইশদের পরিবর্তনের মর্ম হলো দীনে ইবরাহীমী পরিহার করে মূর্তি উপাসনা আরম্ভ করা।

যাহোক, আয়াতের প্রতিপাদ্যে এ কথা বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কোন সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামত এমন কোন কোন লোককেও দান করেন যে, তার আমল বা কর্মের দ্বারা তার যোগ্য নয়, কিন্তু নিয়ামত প্রদত্ত হওয়ার পর যদি সে নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে কল্যাণের দিকে ফিরানোর পরিবর্তে মন্দ কাজের দিকেই আরো বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ে, তখন প্রদত্ত নিয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সে লোক আল্লাহ্‌র আযাবের যোগ্য হয়ে পড়ে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের প্রতিটি কথাবার্তা শুনেন এবং তাদের সমস্ত আমল ও কার্যকলাপ জানেন। এতে কোন রকম ভুল-বিভ্রান্তির কোনই অবকাশ নেই।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾ ۖ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

(৫৪) যেমন ছিল রীতি ফিরাউনের বংশধর এবং যারা তাদের পূর্বে ছিল, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহকে। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফিরাউনের বংশধরদের। বস্তুত এরা সবাই ছিল জালিম। (৫৫) সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহ্র নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, অতঃপর আর ঈমান আনেনি। (৫৬) যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃত চুক্তি লংঘন করে এবং তারা ভয় করে না। (৫৭) সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়, তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। (৫৮) তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সুতরাং এই পরিবর্তনের ব্যাপারেও) তাদের অবস্থা ফিরাউনের বংশধর এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থারই মত। তারা যখন তাদের পরওয়ারদিগারের আয়াত (তথা নিদর্শন)

সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন সে জন্য আমি তাদেরকে তাদের (সেসব) পাপের দরুন ধ্বংস করে দিয়েছি। আর (তাদের মধ্যে) ফিরাউনের বংশধরদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছি। বস্তুত তারা (ফিরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা) সবাই ছিল জালিম। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এ সমস্ত কাফিরই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। (আর আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে এরা যখন এমন,) কাজেই এরা ঈমান আনবে না। তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আপনি তাদের কাছ থেকে (কয়েকবার) প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন (কিন্তু) প্রতিবারই তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি লংঘন করেছে (অথচ) তারা (এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ব্যাপারে) ভয় করে না। অতএব, তাদেরকে যদি আপনি কখনো যুদ্ধে ধরতে পারেন, তবে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে (তার মাধ্যমে) এ ধরনের অন্য লোকদেরকেও বিচ্ছিন্ন করে দিন, যাতে তারা এ কথা বুঝতে পারে (যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দরুনই এই আপদ; আর আমরা এমন করব না। এ নির্দেশটি হচ্ছে সে সময়ের জন্য যখন তারা প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে)। আর (প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞা লংঘন করা না হয়ে থাকলেও) যদি আপনি কোন জাতির (বা সম্প্রদায়ের) পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের) আশংকা করেন, তবে (এ অনুমতি রয়েছে যে,) আপনি সে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে দিতে পারেন। (অর্থাৎ সে প্রতিশ্রুতি বলবৎ না রাখার ঘোষণা এমনভাবে করে দিন যেন) আপনি এবং তারা (এই ঘোষণার) সমান হয়ে যেতে পারেন। (এমনভাবে ঘোষণা না দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা আর) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বরং শব্দাবলীও প্রায় তেমনি, যা এক আয়াত আগেই আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ কিন্তু এতদুভয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকম। পূর্ববর্তী আয়াতে এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তাদের কুফরীই তাদের আযাবের কারণ হয়েছে। আর আলোচ্য এ আয়াতে উদ্দেশ্য হলো এ কথা ব্যক্ত করা যে, যখন কোন জাতির উপর আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজি দান করা হয়, কিন্তু তারা মূল্য বুঝে না এবং আল্লাহ্র দরবারে প্রণত হয় না, তখন সে নিয়ামতসমূহকে বালা-মসীবতে রূপান্তরিত করে দেয়াই হলো আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নিয়ম। সুতরাং ফিরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীরাও যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মূল্য দেয়নি, তখন তাদের কাছ থেকে নিয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তৎস্থলে তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়েছে। এছাড়া কোথাও কোথাও শব্দের কিছু পরিবর্তন করে বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, প্রথম আয়াতে ছিল كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আর এখানে বলা হয়েছে بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ এতে 'আল্লাহ্' শব্দের পরিবর্তে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা এত বড় জালিম ও ন্যায়বিমুখ যে, যে সত্তা

তাদের 'রব' তথা পালনকর্তা, তাদেরকে প্রাথমিক অস্তিত্ব থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত যার নিয়ামত প্রতিপালন করেছে, এরা তাঁরই নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে।

তাছাড়া পূর্ববর্তী আয়াতে فَاَخَذَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ বলা হয়েছিল, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে ঃ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ এতে পূর্বের সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ হয়ে গেছে। কারণ প্রথম আয়াতে তাদেরকে আযাবে নিপতিত করার কথাই বলা হয়েছিল যার বিভিন্ন রূপ হতে পারত। জীবিত অবস্থায়ও নানা রকম বিপদাপদের সম্মুখীন করে কিংবা সম্পূর্ণভাবে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়ে আযাবে পাকড়াও করা যেতে পারত। কাজেই এ আয়াতে اَهْلَكْنٰهُمْ বলে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, সে সমস্ত জাতির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি। প্রত্যেক জাতির ধ্বংসের রূপও ছিল বিভিন্ন। ফিরাউন যেহেতু খোদায়ীর দাবিদার ছিল এবং তার সম্প্রদায়ও তার সত্যতা স্বীকার করত, সে জন্য বিশেষভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ আমি ফিরাউনের অনুসারীদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছি। অন্যান্য জাতির ধ্বংসের রূপ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়নি। তবে অন্য আয়াতে তার বিরবণও বিধৃত হয়েছে। কারো উপর ভূমিকম্প নাযিল হয়েছে, কেউ মাটিতে ধসে গেছে, কারো আকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে, আবার কারো উপর তুফান চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সবশেষে মক্কার মুশরিকদের উপর বদর প্রাঙ্গণে মুসলমানদের মাধ্যমে আযাব এসেছে।

এর পরবর্তী আয়াতে সেসব কাফির সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এতে دَوَابِّ শব্দটি دَابَّةٌ-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী। মানুষসহ যত প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্বুদ্ধিতা ও অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে ঃ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত খানাপিনা ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌঁছা হবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদী সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

তদুপরি বাক্যটিতে সে সমস্ত লোককে আযাব থেকে বাদ দেয়াও উদ্দেশ্য, যারা যদিও তখন কাফিরদের সাথে মিলে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কোন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে নিজেদের সাবেক ভ্রান্ত কাজ থেকে তওবা করে নেয়।

বস্তুত হয়েছেও তাই। তাদের মধ্য থেকে বিরাট একদল মুসলমান হয়ে শুধু যে নিজেই সৎ ও পরহিযগার হয়েছে তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণব্রত ও পরহিযগারীর আহবায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় আয়াত ঃ اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ এ আয়াতটি মদীনার ইহুদী এবং বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহ্র আযাব অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরদের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে জালিম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবিদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত, ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইহুদী। মক্কায় মুশরিকদের মাঝে আবূ জাহ্ল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদীনার ইহুদীদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে আশরাফ।

রাসূলে করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ্ জ্বলেই যাচ্ছিল।

এদিকে ইসলামী রাজনীতির তাকাদা ছিল এই যে, যতটা সম্ভব মদীনার ইহুদীদেরকে কোন না কোন চুক্তি-প্রতিশ্রুতির আওতায় নিজেদের সাথে জড়িয়ে রাখা, যাতে তারা মক্কাবাসীদের মদীনায় এনে না তুলে। তাছাড়া ইহুদীরাও নিজেদের ভয়ের দরুন এরই আগ্রহী ছিল।

ইসলামী রাজনীতির প্রথম ধাপ ঃ ইসলামী জাতীয়তা ঃ রাসূলে করীম (সা) মদীনায় আগমনের পর ইসলামী রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর হুযূর (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। পারস্পরিকভাবে এবং মুহাজিরীনদের সাথেও তিনি ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ ইহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি ঃ এ রাজনীতির দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দুটি। ১. মক্কায় মুশরিকীন, যাদের অত্যাচার উৎপীড়নে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করছিল এবং ২. মদীনার ইহুদীবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী হয়েছিল। এদের মধ্য থেকে ইহুদীদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যার একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞাপত্র লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদীনা এলাকার সমস্ত ইহুদী, মুসলমান, আনসার ও মুহাজিরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবনে কাসীর 'আল বিদায়াহ্ ওয়ান্নিহায়াহ্' গ্রন্থে এবং সীরাতে ইবনে হিশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে প্রকাশ্যে কি গোপনে

সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে মক্কার মুশরিকদের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে। তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফিরদের অপমানসূচক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে ওঠে এবং তারা মহানবী (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে ওযর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লংঘন করব না।

মহানবী (সা) ইসলামী গাম্ভীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা তাঁর অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাবের বাধ্য ছিল। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ততার কথা জানতে পেরে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে মক্কার মুশরিকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদীনার ইহুদীরা তোমাদের সাথে থাকবে।

এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বারের চুক্তির লংঘন, যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। উল্লিখিত আয়াতে এভাবে বারবার চুক্তি লংঘনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লংঘন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ অর্থাৎ এরা ভয় করে না। এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগ্যরা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখিরাতের কোন চিন্তাই নেই। কাজেই এরা আখিরাতের আযাব থেকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লংঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে, এরা নিজেদের গাফিলাতি ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারে ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবূ জাহ্লের মত কা'আব ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইহুদীদের দেশছাড়া করা হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে সেসব চুক্তি লংঘনকারীদের সম্পর্কে একটি হিদায়েতনামা দিয়েছেন, যার শব্দ নিম্নরূপ ঃ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ এতে تَثْقَفَنَّهُمْ শব্দটির অর্থ তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর شَرِّدْ মূল ধাতু تَشْرِيد থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ বিতাড়িত এবং বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। অতএব আয়াতের অর্থ হবে যে, "আপনি যদি কোন যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদের এমন কঠোর শাস্তি দিন, যা অন্যদের জন্যও নিদর্শন হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হলো এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরিকীন ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মুকাবিলা করার সাহস করবে না।

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ বলে রাব্বুল আলামীনের ব্যাপক রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সুকঠিন নিদর্শনমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়; বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায় ঃ পঞ্চম আয়াতে রাসূল মকবূল (সা)-কে যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাতলে দেয়া হয়েছে। এতে চুক্তির অনুবর্তিতার গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, কোন সময় যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ চুক্তি লংঘনের আশংকা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নয়। বরং এর বিশুদ্ধ পন্থা হলো এই যে, প্রতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচরণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদেরও সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। আয়াতের কথাগুলো হলো এই ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاۤءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَاۤئِنِيْنَ -

অর্থাৎ আপনার যদি কোন চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা হয়, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন, যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ যে জাতির সাথে কোন সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার মুকাবিলায় কোন রকম সামরিক পদক্ষেপ করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাফির শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েয নয়। অবশ্য যদি অপর পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা সৃষ্টি হয়, তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপর পক্ষ এতে সমান সমান হয়। অর্থাৎ এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা না হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পূর্ব থেকেই তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না। বরং যেকোন প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

এটা ইসলামের ন্যায় ও সুবিচার যে, এতে বিশ্বাসঘাতক শত্রুরও হক বা অধিকারের হিফাযত করা হয় এবং মুসলমানদের উপরও তাদের মুকাবিলার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় যে, চুক্তি প্রত্যাহারের পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রস্তুতিও যেন গ্রহণ না করে।—(মাযহারী)

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ সুলায়ম ইবনে আমের-এর রিওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য হযরত মুআবিয়া (রা) এবং কোন এক সম্প্রদায়ের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মুআবিয়া (রা) ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন হযরত মুআবিয়ার সৈন্যদল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল, দেখা গেল একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চস্বরে না'রা লাগিয়ে আসছেন যে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرًا অর্থাৎ নারায়ে তকবীরের সাথে তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে কোন সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে কোন গিঁঠ খোলা অথবা বাঁধাও চাই না। যা হোক, হযরত মুআবিয়াকে বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলছেন, তিনি হলেন হযরত আমর ইবনে আম্বাসাহ্ সাহাবী। হযরত মু'আবিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনের পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন।—(ইবনে কাসীর)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۭ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ
مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ
اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۭ
وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾
وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۭ هُوَ الَّذِيْٓ
اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ۙ

(৫৯) আর কাফিররা যেন এ কথা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। (৬০) আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে। যেন

প্রভাব পড়ে আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপরও, যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্‌র রাহে তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (৬১) আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত; (৬২) পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কাফিররা যেন নিজেদের এমন মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; নিশ্চয়ই তারা আমাকে (আল্লাহ্ তা'আলাকে) দুর্বল করতে পারে না যে, তাঁর আয়ত্তে না এসে থাকতে পারবে। বস্তুত তিনি তাদেরকে হয় দুনিয়াতেই শাস্তির সম্মুখীন করে দেবেন, না হয় আখিরাতে তো নিশ্চিতভাবেই তা করবেন। আর এসব কাফিরের (সাথে মুকাবিলা করার জন্য) তোমাদের দ্বারা যতটা সম্ভব অস্ত্রশস্ত্র এবং পালিত ঘোড়া প্রভৃতি সাজসরঞ্জাম)-এর মাধ্যমে তোমরা (নিজেদের) প্রভাব তাদের উপর বিস্তার করে রাখতে পার, যারা (কুফরীর দরুন) আল্লাহ্ তা'আলার দুশমন (এবং তোমাদের সাথে থাকার দরুন) তোমাদের শত্রু (যাদের সাথে অহর্নিশি তোমাদের সংঘাত হতে থাকে) এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য কাফিরের উপরও (যাতে প্রভাব বিস্তার করে রাখতে পার) যাদেরকে তোমরা (নিশ্চিতভাবে) জানতে পার না, (বরং) তাদেরকে আল্লাহই জানেন। (যেমন, রোম ও পারস্যের কাফিররা যাদের সাথে কখনও কোন সংঘাতের পালা পড়েনি, কিন্তু সাহাবাদের সাজসরঞ্জাম ও সৈন্য স্থাপনার নিপুণতা সমকালে তাদের মুকাবিলায়ও কাজে আসে এবং তাতে তাদের উপরও প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাদের অনেকে মুকাবিলা করে পরাজিত হয় এবং অনেকে জিযিয়া কর দানে সম্মত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তাও ছিল প্রভাবেরই প্রতিক্রিয়া)। আর আল্লাহ্‌র রাহে (যাতে জিহাদও অন্তর্ভুক্ত) যা কিছু ব্যয় করবে (এতে সেসব ব্যয়ও এসে গেছে, যা জিহাদের সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে গিয়ে করা হয়) তা (অর্থাৎ তার সওয়াব) তোমাদেরকে (আখিরাতে) পুরোপুরিই দেওয়া হবে এবং তোমাদের জন্য (তাতে) কোন রকম কমতি করা হবে না। বস্তুত যদি তারা (অর্থাৎ কাফিররা) সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তবে আপনার (জন্য)-ও (এ অনুমতি রয়েছে যে, আপনি যদি এতে কল্যাণ দেখতে পান, তবে) সেদিকে ঝুঁকে পড়তে পারেন। আর (যদি তাতে কল্যাণ থাকা সত্ত্বেও) এমন কোন সম্ভাবনা থাকে যে, এটা তাদের চালও হতে পারে, তবে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন (এমন সম্ভাবনার দরুন কোন আশংকা করবেন না)। নিঃসন্দেহ তিনি যথেষ্ট শ্রবণকারী, মহাবিজ্ঞ (তিনি তাদের কথাবার্তা ও অবস্থা শোনেন ও জানেন। তিনি নিজেই তাদের ব্যবস্থা করে দেবেন)। আর যদি (বাস্তবিকপক্ষেই এ সম্ভাবনা যথার্থ হয় এবং সত্যি সত্যি যদি) তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, আল্লাহ তা'আলা আপনার (সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের) জন্য

যথেষ্ট। (যেমন ইতোপূর্বেও তিনি আপনার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং) তিনিই তো আপনাকে গায়েবী সাহায্য (অর্থাৎ ফেরেশতা) দ্বারা এবং বাহ্যিক সাহায্য (অর্থাৎ মুসলমানদের মাধ্যমে) শক্তি দান করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে সে সমস্ত কাফিরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে, এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ বদরের যুদ্ধটি কাফিরদের জন্য এক আল্লাহর আযাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ অর্থাৎ এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না, তিনি যখনই তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো-বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখিরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোন অপরাধী পাপী যদি কোন বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে বরং স্বীয় অপরাধে অটল-অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যই মুক্তি পেয়ে গেছে, বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহর হাতের মুঠায় রয়েছে এবং এই অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা ফরয ঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরি করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরি করার সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ-এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে তোমাদেরও ততটাই অর্জন করতে হবে বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ যোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই যথেষ্ট—আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে مِنْ قُوَّةٍ অর্থাৎ মুকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীরচর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কোরআন করীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলেছে বোমা, রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এ সবকিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যেকোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হয় যদি তা এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম

ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফিরদের মুকাবিলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল।

قـوت শব্দটি ব্যাপকার্থে উল্লেখ করার পর প্রকৃষ্টভাবে বিশেষ قـوت বা শক্তির কথাও বলা হয়েছে— وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ — رباط শব্দটি ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর ربوط অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, ঘোড়া বাঁধা, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে বাঁধা ঘোড়া। তবে দু'এরই মর্ম এক। অর্থাৎ জিহাদের নিয়মে ঘোড়া পালা এবং সেগুলোকে বাঁধা কিংবা পালিত ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় এনে সমবেত করা। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে বিশেষ করে ঘোড়ার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, তখনকার যুগে কোন দেশ ও জাতিকে জয় করার জন্য ঘোড়াই ছিল সবচেয়ে কার্যকর ও উপকারী। তাছাড়া এ যুগেও বহু জায়গা রয়েছে, যা ঘোড়া ছাড়া জয় করা যাবে না। সে কারণেই রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, ঘোড়ার ললাটদেশে আল্লাহ তা'আলা বরকত দিয়েছেন।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদত ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। তীর বানানো এবং চালানোর জন্য বিরাট বিরাট সওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে।

আর জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম, সেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

جَاهِدُ وَالْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ

"মুশরিকীনদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখে জিহাদ কর।"—[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়েত করা হয়েছে]

এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই হুকুম রাখে। ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধে কাফির ও মুলহিদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশদানের পর সেসব সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা রয়েছে ঃ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রভাবিত করে দেয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও হতে পারে। আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরয।

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য হয় তাদের মধ্যে অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হলো সেসব লোক, যাদের সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা চলছে। অর্থাৎ মক্কার কাফির ও মদীনার ইহুদীরা। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে, যাদেরকে এখনও মুসলমানরা জানে না। এর মর্ম হলো সারা দুনিয়ার কাফির ও মুশরিকগণ, যারা এখনও মুসলমানদের মুকাবিলায় আসেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও

সংঘর্ষ বাধতে পারে। কোরআন করীমের এ আয়াতটিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা যদি নিজেদের উপস্থিত শত্রুর মুকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু তাদের উপরই পড়বে না, বরং দূর-দূরান্তের কাফিরবর্গ; কিসরা ও কায়সার প্রভৃতির উপরেও পড়বে। বস্তুত হয়েছেও তাই। খুলাফায়ে-রাশিদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অর্থ-সম্পদের দ্বারাই তৈরি করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র রাহে মাল বা অর্থ সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং তার মহা প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেওয়া হবে। কোন কোন সময় দুনিয়াতেই গনীমতের মালের আকারে এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখিরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই—বলা বাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান।

তৃতীয় আয়াতে সন্ধির বিধি-বিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا — سَلْم সীন বর্ণের উপর যবর (َ) এবং سِلم সীন বর্ণের নীচে যের (ِ) উভয় উচ্চারণেই সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি কাফিররা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনাকেও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশবাচক পদ উত্তমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, কাফিররা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধিও করতে পারেন।

আর اِنْ جَنَحُوْا এর শর্ত আরোপ করাতে বোঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে, যখন কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানরা সন্ধির উদ্যোগ করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

তবে যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোন পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ কর্মাও জায়েয।

আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোন সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রাসূলে করীম (সা)-কে হিদায়েত দান করা হয়েছে যে, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন। কারণ তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কা-সম্ভাবনার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না। এসব আশঙ্কার বিষয়গুলোকে আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিন।

তারপর চতুর্থ আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং

আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহ্‌র সাহায্য-সমর্থনেই আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাতকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

এ আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রেক্ষাপটেই এ আয়াত অবতরণের পর থেকে মহানবী (সা)-কে সমগ্র জীবনে এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি, যাতে শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার দরুন তাঁর কোন রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সে কারণেই তফসীরবিদ আলিমরা বলেছেন, ওয়াদাটি মহানবী (সা)-এর জন্য وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ওয়াদারই অনুরূপ। কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত সাহাবায়ে কিরামকে নিশ্চিতভাবেই অব্যাহতি দিয়ে দেন। এতে এ কথাও বোঝা যায় যে, এ ওয়াদাটি বিশেষভাবে মহানবী (সা)-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।—(বয়ানুল কোরআন) অন্যান্য লোকের পক্ষে বাহ্যিক ব্যবস্থা ও অগ্রপশ্চাৎ অবস্থা অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ
ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ
أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

(৬৩) আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু

আল্লাহ্ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৬৪) হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। (৬৫) হে নবী, আপনি মুসলমানদের উৎসাহিত করুন জিহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি বর্তমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মুকাবিলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফিরের উপর। তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। (৬৬) এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ' লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দুশ'র উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর আল্লাহ্ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (মুসলমানদের সাহায্যের মাধ্যম বানাবার জন্য) তাদের মনে একতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (কাজেই একথা একান্ত সুস্পষ্ট যে, যদি পারস্পরিক একতা সৃষ্টি না হতো, তারা মিলিতভাবে কোন কাজ, বিশেষত দীনের সাহায্য করতে পারত না এবং তাদের মাঝে নেতৃত্বের লোভ, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের প্রবলতা হেতু একতা সৃষ্টি এত কঠিন হয়ে দাঁড়াত যে,) যদি আপনি (পরিপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনার নিকট যথেষ্ট উপায়-উপকরণ থাকত, এমনকি এ কাজের জন্য) সারা দুনিয়ার বিষয়-সম্পদও যদি ব্যয় করতেন তবুও আপনি তাদের অন্তরে একতা সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু (এটা) আল্লাহ্রই কাজ ছিল যে, তিনি তাদের মাঝে একতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহা পরাক্রমশালী (যা ইচ্ছা স্বীয় ক্ষমতায় করে ফেলতে সক্ষম এবং) সুকৌশলী (যেভাবে যে কাজ করা যথার্থ বলে মনে করেন, সেভাবেই তা সম্পাদন করেন। বস্তুত যখন আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার গায়েবী সাহায্য এবং মু'মিনদের মাধ্যমে আপনার সহায়তার বিষয় জানতে পারলেন, তখন) হে নবী, (এতেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, প্রকৃতপক্ষে) আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর যেসব মু'মিন আপনার আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে (বাহ্যত) তারাও যথেষ্ট। হে নবী (সা) আপনি মু'মিনদের জিহাদে উৎসাহিত করুন (এবং এ ব্যাপারে এই বিধান তাদেরকে শুনিয়ে দিন যে,) তোমাদের মধ্যকার বিশজন দৃঢ়চিত্ত লোক (নিজেদের থেকে দশ গুণ বেশি সংখ্যক শত্রুর উপর অর্থাৎ) দু'শর উপর জয়ী হয়ে যাবে এবং (এমনিভাবে) যদি তোমাদের মধ্যে এক'শ লোক থাকে, তাহলে হাজার কাফিরের উপর জয়ী হবে। তার কারণ, তারা (কাফিররা) এমন লোক যারা (দীন সম্পর্কে) কিছুই জানে না। (আর সে কারণেই এরা কুফরীর উপর আঁকড়ে আছে এবং সে কারণেই এরা কোন রকম গায়েবী সাহায্যও পায় না। ফলে এরা পরাজিত হয়ে যায়। সুতরাং নিজেদের তুলনায় দশ গুণ শত্রুর মুকাবিলায় পশ্চাদপসরণ করা তোমাদের জন্য জায়েয নয়। প্রথমে এই হুকুমই নাযিল হয়েছিল। অতঃপর সাহাবীদের জন্য বিষয়টি কঠিন বিবেচিত

হলে তাঁরা নিবেদন করলেন। দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, যাতে প্রথমোক্ত হুকুম মনসূখ তথা রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ) এখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য (কিছুটা) হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি বোঝেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের (কিছুটা) অভাব রয়েছে। কাজেই (নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে,) তোমাদের মধ্যে এক'শ দৃঢ়চিত্ত লোক হলে (তারা নিজদের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক শত্রুর উপর অর্থাৎ) দু'শর উপর জয়ী হবে। আর (এমনিভাবে) যদি তোমরা এক হাজার হও, তবে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর (আমি যে ধৈর্য ধারণকারীর শর্ত আরোপ করেছি তা এজন্য করেছি যে,) আল্লাহ্ ধৈর্য ধারণকারী (অর্থাৎ যে মন ও পদক্ষেপে দৃঢ়তা অবলম্বন করে) তাদের সাথে রয়েছেন (অর্থাৎ তাদের সাহায্য করেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আন্‌ফালের উল্লিখিত চারটি আয়াতের প্রথমটিতে মুসলমানদের বিজয় ও কৃতকার্যতার প্রকৃত কারণ এবং তা অর্জনের উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। এরই পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বারা আপনার সমর্থন ও সহায়তা জ্ঞাপন করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিম দলের দ্বারা কারও সাহায্য-সহায়তা যে এ দলের পারস্পরিক ঐকমত্য ও একতার উপরই নির্ভর করে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া একতার অনুপাতেই দলের শক্তি ও গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক একতা ও ঐক্যের সম্পর্ক সুদৃঢ় হলে গোটা দলও শক্তিশালী হতে পারে। পক্ষান্তরে ঐক্য সম্পর্কে বাঁধন যদি দুর্বল ও শিথিল হয়, তবে গোটা দলই নড়বড়ে ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সেই বিশেষ দানের কথাই আলোচনা করেছেন, যা মহানবী (সা)-এর সাহায্যকল্পে সাধারণ মুসলমানদের প্রতি হয়েছিল—তাঁদের মনে পরিপূর্ণ ঐক্য ও পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। অথচ মহানবী (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে তাদের আওস ও খায্‌রাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বিবাদ চলতে থাকে। মহানবী (সা)-এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা এই জাতশত্রুদের পারস্পরিক গভীর বন্ধুতে পরিণত করে দিয়েছেন। মদীনায় নতুন ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন ও তার স্থিতি-স্থায়িত্ব এবং শত্রুদের উপর বিজয় লাভের প্রকৃত অন্তর্নিহিত কারণ অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহায়তাই ছিল, কিন্তু বাহ্যিক কারণটি ছিল মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্যবোধ ও সম্প্রীতি।

একই সাথে আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিভিন্ন মানুষের অন্তরকে মিলিয়ে দিয়ে তাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করা কোন মানবীয় ক্ষমতার কাজ নয়; বরং এ বিষয়টি একমাত্র সে মহান সত্তারই কাজ, যিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। কোন মানুষ যদি সারা দুনিয়ার ধন-দৌলতও এ কাজে ব্যয় করে ফেলে যে, পারস্পরিক বিরোধ-সম্পন্ন লোকদের মনে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেবে, তবুও সে কখনও তাতে কৃতকার্য হতে পারবে না।

মুসলমানদের পারস্পরিক স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রকৃত ভিত্তি ঃ এতে এ কথাই বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার দান। তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার না-ফরমানীর মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়, বরং তাঁর দান লাভের জন্য তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত শর্ত।

দল বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে একতা ও ঐকমত্য এমন একটি বিষয়, যার উপকারিতা ও প্রশংসনীয় হওয়ার ব্যাপারে কোন মযহাব ও ধর্ম, কিংবা কোন মতবাদেই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সেজন্যই এমন প্রতিটি লোক, যে মানুষের সংশোধন ও সংস্কার কামনা করে সে তাদের পরস্পরের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ পৃথিবী এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত নয় যে, দীর্ঘস্থায়ী ও আন্তরিক ঐক্য বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। কোরআন হাকীম এই বাস্তবতার প্রতিই কয়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا এই আয়াতে মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সবাই আল্লাহ্র রজ্জুকে অর্থাৎ কোরআন কিংবা ইসলামী শরীয়তকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তাহলে সবাই আপনা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে। অবশ্য মতের পার্থক্য থাকা পৃথক বিষয়; যতক্ষণ পর্যন্ত এ পার্থক্য তার সীমায় থাকে, ততক্ষণ তা বিবাদ-বিসংবাদ ও বিভেদের কারণ হতে পারে না। ঝগড়া-বিবাদ তখনই হয়, যখন শরীয়ত নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করা হয়। ইদানীং ঐক্য ঐক্য বলে সবাই চীৎকার করে, কিন্তু সবারই নিকট ঐক্যের অর্থ হয়ে থাকে এই যে, সবাই আমার কথা মেনে নিলেই ঐক্য হয়ে যাবে। অন্যেরাও ঐক্যের জন্য একই চিন্তায় থাকে, যেন মানুষ তাদের কথাই মেনে নেয়; এতেই ঐক্য সাধিত হবে। অথচ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যখন মতের পার্থক্য থাকা অপরিহার্য, তখন বলাই বাহুল্য যে, যদি প্রতিটি লোকই অন্যের সাথে ঐক্য সাধনকে নিজের মতকে অন্যদের মেনে নেওয়ার উপর নির্ভরশীল বিবেচনা করে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত পারস্পরিক ঐক্য সাধিত হতে পারে না। বরং ইত্তেফাক বা ঐক্যের বিশুদ্ধ ও প্রকৃতিগ্রাহ্য রূপ যা কোরআন বাতলে দিয়েছে তা হলো এই যে, উভয়ে মিলে তৃতীয় আরেক জনের কথা মেনে নাও। আর এই তৃতীয় জনই হবে এমন, যার মীমাংসা তথা সিদ্ধান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। বস্তুত তিনি হতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কাজেই উল্লিখিত আয়াতে হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, সবাই মিলে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তাহলেই সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের সমাধান হয়ে যাবে এবং পরিপূর্ণ ঐক্য সাধিত হবে।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا অর্থাৎ যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টি করে দেন। এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মনের মাঝে প্রকৃত সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টির মূল পন্থা হলো ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি নিষ্ঠা। এর অবর্তমানে

কোথাও কখনও কৃত্রিম কোন উপায়ে যদি কোন রকম ঐক্য সাধিত হয়েও যায়, তবে তা হবে একান্তই ভিত্তিহীন ও দুর্বল। সামান্য আঘাতেই তা ভেঙে শেষ হয়ে যাবে, যা সারা দুনিয়ার জাতিসমূহ নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা অহরহ প্রত্যক্ষ করে আসছে। সারকথা হলো এই যে, এই আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-এর উপর মহান পরওয়ারদিগারের সে সমস্ত দানের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে, যা মদীনার সমস্ত গোত্র-সম্প্রদায়ের মনে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সাহায্য-সহায়তার উদ্দেশ্যে তাদেরকে একটি লৌহ প্রাচীরের মত করে দেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় আয়াতেও একই প্রসঙ্গ সার-সংক্ষেপ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে রাসূলে করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনার জন্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা এবং বাহ্যিকভাবে মু'মিনদের জামাত যথেষ্ট। শত্রুদের সংখ্যা ও আয়োজন যত বড়ই হোক না কেন আপনি তাতে ভীত হবেন না। তফসীরকার মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, এ আয়াতটি বদর যুদ্ধকালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বাহ্নে নাযিল হয়েছিল, যাতে স্বল্প সংখ্যক নিঃসম্বল মুসলমান প্রতিপক্ষের বিপুলতা ও আয়োজন দেখে প্রভাবিত না হয়ে পড়েন।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের জন্য একটি যুদ্ধনীতির আলোচনা করা হয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় তাদেরকে কতটা দৃঢ়তা অবলম্বন করা ফরয এবং কোন পর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করা পাপ। পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার বিবরণে এর বিশদ আলোচনা এসে গেছে যে, আল্লাহ্র গায়েবী সাহায্য মুসলমানদের সাথে থাকে বলে তাদের ব্যাপারটি পৃথিবীর সাধারণ জাতি সম্প্রদায়ের মত নয়; এদের অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যকের উপর বিজয় অর্জন করতে পারে। যেমন, কোরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ বহু স্বল্প সংখ্যক দল আল্লাহ্র হুকুমে অধিক সংখ্যক প্রতিপক্ষের উপর বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়ে যায়।

সেজন্যই ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ বদর যুদ্ধে দশ জন মুসলমানকে এক'শ লোকের সমান সাব্যস্ত করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়চিত্ত লোক থাক, তাহলে দু'শ শত্রুর উপর জয়ী হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি একশ জন হও, তবে এক হাজার কাফিরের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।"

এতে সংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একশ' মুসলমান এক হাজার কাফিরের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হলো এই নির্দেশ দান যে, একশ মুসলমানকে এক হাজার কাফিরের মুকাবিলা করতে গিয়ে পালিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। এর কারণ, যাতে মুসলমানদের মন এ সুসংবাদে দৃঢ় হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। যদি নির্দেশাত্মক বাক্যের মাধ্যমে এ হুকুম দেওয়া হতো, তবে প্রকৃতিগতভাবেই তা ভারী বলে মনে হতে পারত।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধ গয্ওয়ায়ে বদর এমন এক অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। তাও আবার সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন

না। বরং জরুরী ভিত্তিতে যাঁরা তৈরী হতে পেরেছিলেন শুধু তাঁরাই এ যুদ্ধের সৈনিক হয়েছিলেন। কাজেই এ যুদ্ধে একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফিরের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এমনই ভঙ্গিতে দেওয়া হয়, যার সাথে সাহায্যের ওয়াদাও বিদ্যমান থাকে।

চতুর্থ আয়াতে পরবর্তীকালের জন্য এ নির্দেশ রহিত করে দ্বিতীয় নির্দেশ জারী করা হয় যে-

"এখন আল্লাহ্ তা'আলা হাল্কা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের কমতি দেখা দিয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি একশ লোক দৃঢ়চিত্ত থাক, তবে তারা দু'শ লোকের উপর জয়ী হবে।"

এখানেও উদ্দেশ্য হলো এই যে একশ' মুসলমানের পক্ষে দু'শ কাফিরের মুকাবিলা করতে গিয়ে পালিয়ে আসা জায়েয নয়। প্রথম আয়াতে একজন মুসলমানের জন্য দশজন অমুসলমানের মুকাবিলা থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আর এ আয়াতে একজন মুসলমানকে দু'জন অমুসলমানের মুকাবিলা থেকে পালিয়ে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এটাই হলো এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নির্দেশ যা সর্বকালেই বলবৎ থাকবে।

এখানেও নির্দেশকে নির্দেশ আকারে নয়; বরং সংবাদ ও সুসংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুসলমানের জন্য দু'জন কাফিরের বিরুদ্ধে অটল থাকার নির্দেশ দান (নাউযুবিল্লাহ) কোন রকম অন্যায় কিংবা যবরদস্তিমূলক নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে তাদের ঈমানের দৌলতে এমন শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, তারা একজনই দু'জনের সমান হয়ে থাকে।

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য-সহায়তা দানের সুসংবাদটি এই শর্তের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, এসব মুসলমানকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রাণকে বিপদের সম্মুখীন করে দিয়ে দৃঢ়চিত্ত থাকা শুধুমাত্র তাদেরই পক্ষে সম্ভব, যাদের পরিপূর্ণ ঈমান থাকবে। কারণ পরিপূর্ণ ঈমান মানুষকে শাহাদতের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে, আর এই অনুপ্রেরণা তাদের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীয়তের সাধারণ হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সবার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গদানের এ প্রতিশ্রুতি। আর এই আল্লাহ্র সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ যে ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদিগারের সঙ্গলাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ

عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوْا
مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

(৬৭) নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্ চান আখিরাত। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা। (৬৮) যদি একটি বিষয় না হতো যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সে জন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছাত। (৬৯) সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুসলমানগণ, তোমরা কিছু বিনিময় নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য নবী করীম (সা)-কে যে পরামর্শ দিচ্ছিলে, তা ছিল একান্তই অসময়োচিত। কারণ] এটা নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তাঁর কাছে বন্দী থেকে যাবে বরং তাদের হত্যা করে ফেলাই সমীচীন, যতক্ষণ না তারা পৃথিবীতে উত্তমরূপে (কাফিরদের) রক্তপাত ঘটিয়ে নেবে। (কারণ জিহাদের নির্দেশের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো দাঙ্গা-হাঙ্গামা তথা ফিতনা-ফাসাদকে প্রতিহত করা। বস্তুত যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফিরদের দাপট সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে যাবে দাঙ্গা-ফাসাদ দূর হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এমনটি হওয়ার পূর্বে বন্দীদের জীবিত ছেড়ে দেয়া, তাঁর সংস্কারমূলক মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। অবশ্য এমন শক্তি সঞ্চিত হয়ে যাওয়ার পর বন্দীদের হত্যা করা অপরিহার্য নয়। বরং তখনকার জন্য অন্যান্য বৈধ পন্থাও রয়েছে। অতএব তোমরা তাঁকে এহেন অসঙ্গত পরামর্শ কেন দিলে?) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, আর সেজন্যই ফিদইয়া বা বিনিময়ের পরামর্শ দিয়েছ অথচ আল্লাহ্ আখিরাত (-এর মঙ্গল) চান (আর তা কাফিরদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরাজয়বরণ করার উপরই নির্ভর করে। তাতে ইসলামের নূর ও হিদায়েত বিস্তার লাভ করবে এবং অবাধে তারা প্রচুর সংখ্যায় মুসলমান হয়ে মুক্তি লাভ করবে)। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রম ও হিকমতের অধিকারী। (তিনিই তোমাদের কাফিরদের উপর বিজয় দান করে থাকেন এবং এই বিজয়ের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদশালী করে দেন। অবশ্য এতে অনেক সময় বিশেষ কোন হিকমতের প্রেক্ষিতে বিলম্বও ঘটে। তোমাদের দ্বারা এমন অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হয়েছে যে,) যদি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক (এ সমস্ত বন্দীর মধ্যে অনেকের মুসলমান হয়ে যাওয়া এবং তাতে করে সম্ভাব্য দাঙ্গা-ফাসাদ সংঘটিত না-হওয়ার ব্যাপারে) নিয়তি নির্ধারিত হয়ে না যেত, তবে তোমরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ সেজন্য তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আরোপিত হতো। (কিন্তু যেহেতু কোন দাঙ্গা-ফাসাদ সংঘটিত হয়নি এবং ঘটনাচক্রে তোমাদের

পরামর্শ সঠিক হয়ে গেছে, কাজেই তোমরা শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করেছ। অর্থাৎ আমি এই ফিদইয়া তথা মুক্তিপণকে মুবাহ্ করে দিয়েছি।) সুতরাং (তোমরা তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসাবে) যা কিছু গ্রহণ করেছ, সেগুলোকে হালাল ও পাক-পবিত্র বস্তু মনে করেই খাও এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক (এবং ভবিষ্যতে এসব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল করুণাময়। (তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দিয়ে তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীলতা প্রকাশ করেছেন এবং মুক্তিপণ হিসাবে গৃহীত বস্তু-সামগ্রীকে তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়ে তোমাদের উপর বিরাট করুণা করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতটি গয্ওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রিওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনাটি হলো এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ, যা একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনও জিহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহকামের কোন বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন জিহাদ করতে গিয়ে গনীমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রুসৈন্য নিজেদের আয়ত্তে এসে গেলে, তাকে বন্দী করা জায়েয হবে কিনা এবং বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি বিষয় ইতিপূর্বে কোরআনে আলোচনা করা হয় নি।

পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়া (আ)-এর শরীয়তে গনীমতের দ্বারা উপকৃত হওয়া কিংবা সেগুলো ব্যবহার করা হালাল ছিল না। বরং গনীমতের যাবতীয় মালামাল একত্র করে কোন ময়দানে রেখে দিতে হতো। আর আল্লাহ্র রীতি অনুযায়ী একটি আগুন এসে সেগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিত। একেই মনে করা হতো জিহাদ কবূল হওয়ার লক্ষণ। গনীমতের মালামাল জ্বালানোর জন্য যদি আসমানি আগুন না আসত, তাহলে বোঝা যেত যে, জিহাদে এমন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে থাকবে, যার ফলে তা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হয় নি।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফিরদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। গনীমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্র তো জানা ছিল, কিন্তু গযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। অথচ গয্ওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনীমত হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ে বৈধতা সম্পর্কে কোন ওহী তখনও আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কিরামের প্রতি এহেন ত্বরান্বিত পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যত দুটি অধিকার মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দু'টি দিকের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়। তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ্ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তজা (রা)-এর রিওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল-আমীন রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ শোনান যে, আপনি সাহাবায়ে কিরামকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এই যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙে দিবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে একথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে, এর বদলা হিসাবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দী আজ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সাহাবায়ে কিরামের এ দুটি থেকে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ এটি যদি পছন্দই হতো তবে এর ফলে সত্তর জন মুসলমানের খুন অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ দুটি বিষয়ই যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা হলো, তখন কোন কোন সাহাবীর ধারণা হলো যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়ত এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানরা যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন মুসলমানের শাহাদতের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে সিদ্দীকে আকবর (রা) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। শুধুমাত্র হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত প্রদান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মুকাবিলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কুরাইশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনানির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল।

রাসূলে করীম (সা) যিনি রাহ্‌মাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ

করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া। তিনি সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ لواتفقتما ماخالفتكما অর্থাৎ তোমরা উভয়ে যদি কোন বিষয়ে একমত হয়ে যেতে, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না। (মাযহারী) তাঁদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার তাকাদা। অতএব, তাই হলো। আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর আল্লাহ্র বাণী মুতাবিক সত্তর জন মুসলমানের শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলো।

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার রাসূলকে অসংগত পরামর্শ দান করছো। কারণ শত্রুদের বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে إِثْخَانْ –এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারও শক্তি ও দম্ভকে ভেঙে দিতে গিয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া । এ অর্থের তাকীদ বোঝাবার জন্য فِى الْاَرْضِ বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হলো এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধূলিসাৎ করে দেন।

যেসব সাহাবা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাঁদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল—অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ-সম্পদ এসে যাবে। অথচ তখনও পর্যন্ত কোন সরাসরি 'নছ' বা আল্লাহ্র বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রাসূলে করীম (সা)-এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদণ্ডের উপর গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশি হবে, তাদের পক্ষে গনীমতের যে মাল-সামান বা দ্রব্যসামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যে কাজে বৈধাবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই সাহাবায়ে কিরামের সে কাজটিকে ভর্ৎসনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে ঃ – تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া কামনা করছ অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্ চান তোমরা যেন আখিরাত কামনা কর। এখানে ভর্ৎসনা হিসাবে শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা ছিল অসন্তুষ্টির কারণ। বন্দীদের মুসলমান হওয়ার আশা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের মত নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে ভর্ৎসনা ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। যদিও রাসূলে করীম (সা) নিজেও তাঁদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি

ছিল একান্তভাবেই তাঁর রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়াভিত্তিক।

আয়াতের শেষাংশে "وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রমশীল, হিকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় আগ্রহে পরবর্তী বিজয়ে আপনাদের জন্য ধন-সম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

দ্বিতীয় আয়াতটিতেও এই ভর্ৎসনারই উপসংহারস্বরূপ বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক যদি নিয়তি নির্ধারিত হয়ে না যেত, তবে তোমরা যে কাজ করেছ, অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, সেজন্য তোমাদের উপর কোন বড় রকমের শাস্তি সংঘটিত হতো।

উল্লিখিত নির্ধারিত নিয়তির তাৎপর্য সম্পর্কে তিরমিযী গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতের জন্য গনীমতের মালামাল হালাল ছিল না। বদরের ঘটনাকালে মুসলমানরা যখন গনীমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে, অথচ তখনও তার বৈধতার কোন নির্দেশ নাযিল হয়নি, তখন ভর্ৎসনাসূচক এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, গনীমতের মালামালের বৈধতাসূচক নির্দেশ আসার প্রাক্কালে মুসলমানদের এহেন পদক্ষেপ এমনই পাপ ছিল, যার দরুন আযাব নেমে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার এই হুকুমটি 'লওহে মাহ্‌ফুযে' লিপিবদ্ধ ছিল যে, এই উম্মতের জন্য গনীমতের মালকে হালাল করে দেয়া হবে, সেহেতু মুসলমানদের এ ভুলের জন্য আযাব নাযিল হয়নি।-(মাযহারী)

কোন কোন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার আযাব একেবারেই সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তা থামিয়ে দেন। সে আযাব যদি আসত তাহলে উমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুআয ছাড়া কেউই তা থেকে অব্যাহতি পেত না।" এতে প্রতীয়মান হয়, মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেয়াই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। অথচ তিরমিযীর রিওয়ায়েত অনুসারে বোঝা যাচ্ছে যে, গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করাই ছিল ভর্ৎসনার হেতু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা পার্থক্য নেই। বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করাও ছিল গনীমতের মাল সংগ্রহেরই অংশবিশেষ।

মাসাআলা ঃ উল্লিখিত আয়াতে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তিদান ও গনীমতের মালামাল সংগ্রহের কারণে ভর্ৎসনা নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, এবং পরে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এ সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। সে কারণেই পরবর্তী আয়াতে গনীমতের মালামাল সংক্রান্ত মাস'আলাটি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– فكلوا مما غنمتم অর্থাৎ গনীমতের যেসব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে, এখন থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা হালাল করে দেয়া হলো। কিন্তু তার পরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, গনীমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলো; কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব মালামাল সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছিল হয়তো

সেগুলোতে কোন রকম কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। সেজন্যই এর পর حَلٰلًا طَيِّبًا বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যদিও বৈধতার হুকুম নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে গনীমতের মাল সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া জায়েয ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনীমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল।

মাস'আলা ঃ এখানে উসূলে ফিকাহ্ একটি বিষয় লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। তা হলো এই যে, যখন কোন অবৈধ পদক্ষেপের পর স্বতন্ত্র কোন আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনই প্রভাব থাকে না; সে মালামাল যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়। যেমনটি এখানে (অর্থাৎ গনীমতের মালের ব্যাপারে) হয়েছে। কিন্তু এরই অন্য একটি উদাহরণ হলো এই যে, কোন ব্যাপারে পূর্ব থেকেই হয়তো নির্দিষ্ট হুকুম নাযিল হয়েছিল কিন্তু আনুষঙ্গিক কাজটি সম্পাদন করে ফেলার পর জানা গেল যে, আমাদের কাজটি কোরআন ও সুন্নাহ্র অমুক হুকুমের বিরোধী ছিল, তখন এমতাবস্থায় হুকুমটি প্রকাশিত হবার পর কৃত ভুলের জন্য ক্ষমা করা হলেও সে মালামাল আর হালাল থাকে না।—নূরুল আন্ওয়ার ঃ মোল্লা জীওয়ান। আলোচ্য আয়াতে গনীমতের মালামালকে যদিও 'হালালে-তাইয়্যেব' তথা পবিত্র-হালাল বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, কিন্তু আয়াতের শেষাংশে এই বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়েছে وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল যদিও হালাল করা হয়েছে কিন্তু তা একটি বিশেষ আইনের আওতায় করা হয়েছে। সে আইনের বিরুদ্ধাচরণ করা কিংবা নিজের অধিকারের অতিরিক্ত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এখানে বিষয় ছিল দু'টি। (১) গনীমতের মালামাল এবং (২) বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া। প্রথম বিষয় সম্পর্কে এ আয়াত পরিষ্কার বিধান বলে দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি এখনও পরিষ্কার হয়নি। এ সম্পর্কে সূরা মুহাম্মদে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا অর্থাৎ যখন যুদ্ধে কাফিরদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হবে তখন তাদের হত্যা কর, যতক্ষণ না তোমরা রক্তপাতের মাধ্যমে তাদের শক্তি সামর্থ্যকে ভেঙে চুরমার করে দাও। তারপর তাদেরকে বাঁধ শক্তভাবে। অতঃপর হয় তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্বক কোন রকম বিনিময় না নিয়েই মুক্ত করে দাও, অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত কর যতক্ষণ না যুদ্ধে তার অস্ত্র ফেলে দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গযওয়ায়ে বদরে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তিদানের প্রেক্ষিতে ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল ইসলামের প্রথম জিহাদ। তখনও পর্যন্ত কাফিরদের শক্তি ও ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। ঘটনাচক্রে তাদের উপর এক বিপদ এসে উপস্থিত হয়। তারপর যখন ইসলাম ও মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ সে হুকুম রহিত করার উদ্দেশ্যে সূরা মুহাম্মদের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে

মহানবী (সা) এবং মুসলমানদেরকে বন্দীদের সম্পর্কে চারটি ক্ষমতা দান করা হয়। তা হলো এই ঃ

ان شَاءَ وا قتلوهم ' وان شاءوا استعبدوهم'
وان شاءوا افادوهم ' وان شاءوا اعتقوهم -

অর্থাৎ (১) ইচ্ছা করলে সবাইকে হত্যা করতে পার, (২) ইচ্ছা করলে দাস বানিয়ে নিতে পার, (৩) ইচ্ছা করলে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে পার এবং (৪) ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ ব্যতীত তাদের মুক্ত করে দিতে পার।

উল্লিখিত চারটি ক্ষমতার প্রথম দু'টির ব্যাপারে সমগ্র উম্মতের ইজমা ও ঐকমত্য রয়েছে যে, মুসলমানদের আমীরের তথা নেতার জন্য সমস্ত বন্দীকে হত্যা কিংবা দাস বানিয়ে নেয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে বিনিময় না নিয়ে কিংবা বিনিময় না নিয়ে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিয়ী (র), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), ইমাম সওরী ও ইসহাক (র) এবং তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও আ'তা (র)-র মতে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে অথবা তা না নিয়ে ছেড়ে দেয়া কিংবা মুসলমান বন্দীদের সাথে বিনিময় করাও মুসলমানদের আমীরের জন্য জায়েয।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, আওযায়ী, কাতাদাহ্, যাহ্হাক, সুদ্দী ও ইবনে জুরায়েজ (র) প্রমুখ বলেন, কোন রকম বিনিময় না নিয়ে ছেড়ে দেয়া তো মোটেই জায়েয নয়, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব অনুযায়ী মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়াও জায়েয নয়। অবশ্য 'সিয়ারে কবীরে'র রিওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, মুসলমানদের যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়া যেতে পারে। তবে মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও সাহেবাইন (ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ)-এর মতে জায়েয। তাঁদের দুটি রিওয়ায়েতের মধ্যে প্রকাশ্য রিওয়ায়েতের দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয়।-(মাযহারী)

যেসব মনীষী মুক্তিপণ নিয়ে কিংবা না নিয়ে ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দান করেছেন, তাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-র মতানুসারে সূরা মুহাম্মদের আয়াতকে সূরা আন্‌ফালের আয়াতের জন্য রহিতকারী এবং আন্‌ফালের আয়াতকে রহিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। হানাফী ফিকাহ্‌বিদরা সূরা মুহাম্মদের আয়াতকে রহিত এবং সূরা আন্‌ফালের فَشَرِّدْبِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ وَجَدْتُمُوْهُمْ এবং اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ আয়াতদ্বয়কে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই মুক্তিপণের বিনিময়েই হোক আর বিনিময় ছাড়াই হোক, বন্দীদের ছেড়ে দেয়া তাদের নিকট জায়েয নয়।-(মাযহারী)

কিন্তু যদি সূরা আন্‌ফাল ও সূরা মুহাম্মদের আয়াতের শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয়, এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিই কোনটির জন্য নাসেখ বা মনসূখ নয়: বরং এ দুটিই দুটি বিভিন্ন অবস্থার হুকুম।

সূরা আনফালের আয়াতেও মূল হুকুম اِثْخَانٌ فِى الْاَرْضِ। অর্থাৎ হত্যার মাধ্যমে কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্যকে ভেঙে দেয়ার এবং পরে সূরা মুহাম্মদের আয়াতে مَنٌّ ও فداء (অর্থাৎ বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে অথবা বিনিময় ব্যতিরেকে) ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে اثخـان فى الارض –এর বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ রক্তপাতের মাধ্যমে কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্যকে পঙ্গু করে দেয়ার পর মুক্তিপণ নিয়ে বা না নিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

'সিয়ারে কবীরে' হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র রিওয়ায়েতেরও এমনি উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় প্রকার নির্দেশই দেয়া যেতে পারে।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

(৭০) হে নবী তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে যে, আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়–বস্তুত তারা আল্লাহ্র সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে রাসূল, আপনার কব্জায় যেসব বন্দী রয়েছে (তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়ে গেছে) আপনি তাদের বলে দিন, তোমাদের মনে ঈমান রয়েছে বলে যখন আল্লাহ্ জানবেন (অর্থাৎ তোমরা সত্য সত্যই যখন মুসলমান হয়ে যাবে—কারণ আল্লাহ্র জানা যে বাস্তবানুগই হয়ে থাকে এবং তিনি তাকেই মুসলমান বলে জানবেন, যে বাস্তবিকই মুসলমান হয়। পক্ষান্তরে যে অমুসলিম হবে, তাকে তিনি অমুসলিমই জানবেন। সুতরাং তোমরা যদি মনের দিক দিয়েও মুসলমান হয়ে গিয়ে থাক) তবে তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণস্বরূপ) যা কিছু নেয়া হয়েছে,

তোমাদের (পার্থিব-জীবনে) তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দিয়ে দেবেন এবং (আখিরাতেও) তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ্ একান্তই ক্ষমাশীল। (সে জন্যই তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর) তিনি অত্যন্ত করুণাময়। (কাজেই তোমাদের তিনি প্রতিদানও দেবেন।) অথচ যদি তারা (সত্যিকারভাবে মুসলমান না হয়ে শুধু আপনাকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করে এবং মনে মনে) আপনার সাথে প্রতারণার ইচ্ছা পোষণ করে, (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আপনার সাথে বিরোধিতা ও মুকাবিলা করতে চায়) তবে (সে জন্য আপনি আদৌ ভাববেন না) আল্লাহ্ পুনরায় তাদেরকে আপনার হাতে বন্দী করিয়ে দেবেন। যেমন (ইতিপূর্বে) তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল (এবং আপনার বিরোধিতা ও মুকাবিলা করেছিল) অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে (আপনার হাতে) বন্দী করিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় ব্যাপারেই সক্ষম, পরিজ্ঞাত, (কে খেয়ানতকারী সে বিষয়ে তিনি ভালই জানেন। আর) একান্তই কুশলী। (তিনি এমন সব অবস্থা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যাতে খেয়ানতকারী তথা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরা পরাজিত হতে বাধ্য হয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গয্ওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের সে শত্রু যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনই কোন ত্রুটি করেনি; যখনই কোন রকম সুযোগ পেয়েছে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না ; এটা তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসাবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত মেহেরবানী ও দয়া যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয়, তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের মন-মানসিকতায় কোন রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে خير অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা। অর্থাৎ মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দীর মধ্যে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার সাথে সাথে তাদের এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তিলাভের পর নিজেদের লাভক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থানে দান ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণ উত্তম ও অধিক ছিল।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী (সা)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফির সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় সাতশ' স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান।

যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে, তখন তিনি হুযূর আকরাম (সা)-এর নিকট নিবেদন করলেন, আমার আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক। হুযূর (সা) বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলমানদের গনীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদ্ইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি এ কথাও বললেন যে, আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে-আবী তালেব এবং নওফল ইবনে হারেসের মুক্তিপণও আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। আব্বাস (রা) নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কুরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে, আমি সম্পূর্ণভাবে ফকির হয়ে যাব। মহানবী (সা) বললেন, কেন আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফয্লের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রা) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন ? আমি যে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়! হুযূর (সা) বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদিগার আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হযরত আব্বাস (রা)-র মনে হুযূর (সা)-এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুযূর (সা)-এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সন্দেহও ছিল যা এসময় আল্লাহ্ তা'আলা দূর করে দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তাঁর বহু টাকা-কড়ি মক্কার কুরাইশদের নিকট ঋণ হিসাবে প্রাপ্য ছিল। তিনি যদি তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, তবে সে টাকাগুলো মারা যেত। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা করলেন না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে মহান্বী (সা) তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন।

হযরত আব্বাস (রা)-র এ সমস্ত কথোপকথনের প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (সা) উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যদি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত নিষ্ঠাসহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রা) ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ ও বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ

বিশ উকিয়া সোনা নেয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দিরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজ্বের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খিদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন-সম্পদও এ তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

গযওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা খট্কা ছিল যে, হয়তো এরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পরে আমাদের কোন-না-কোন ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ খট্কাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন ঃ

إِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ-

অর্থাৎ যদি আপনার সাথে খেয়ানত করার সংকল্পই তারা করে, তবে তাতে আপনার কোন ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্র সাথেও খেয়ানত করেছে। অর্থাৎ সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ্ তা'আলা রাব্বুল আলামীন তথা বিশ্বপালক হওয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই খেয়ানত তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্থ, পদদলিত, লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা মনের গোপনতম রহস্য সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তিনি বড়ই সুকৌশলী, হিকমতওয়ালা। এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ্র হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাবে কোথায় ? তিনি এমনিভাবে তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের একান্ত উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহবান করা হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পার্থিব ও পারত্রিক কল্যাণ শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাদের বন্দীদশা ও মুক্তি দান এবং তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে অর্থাৎ সূরার শেষ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম। কারণ কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, মুসলমানদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাযী হবে না। এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ হিজরত। অর্থাৎ এ নগরী বা দেশ ছেড়ে অন্য কোন নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন করা যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামী হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করা যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجٰهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَّلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ
وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجٰهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا
وَّنَصَرُوا أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجٰهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰبِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾ ع

(৭২) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী-চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মুকাবিলায় নয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সে সবই দেখেন। (৭৩) আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘড়বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে তারাই হলো সত্যিকারের মুসলমান। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী (৭৫) আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘড়বাড়ি ছেড়েছে

এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহ্র বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছেন, হিজরত করেছেন এবং নিজেদের জানমালের মাধ্যমে আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করেছেন (স্বভাবতই যা হিজরতের পর সংঘটিত হওয়া অনিবার্য ছিল। যদিও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি এর উপর নির্ভরশীল নয়; এ দলকেই মুহাজিরীন নামে অভিহিত করা হয়।) আর যারা (এই মুহাজিরীনদের) আশ্রয় দিয়েছেন এবং (তাঁদের) সাহায্য-সহায়তা করেছেন, (যারা আনসার নামে অভিহিত, এতদুভয় প্রকার লোকেরা) পারস্পরিক উত্তরাধিকারী হবেন। (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছেন কিন্তু হিজরত করেন নি, তাঁদের সাথে তোমাদের (অর্থাৎ মুহাজিরীনদের) মীরাসের কোন সম্পর্ক নেই (না এরা তাদের উত্তরাধিকারী, আর না তারা এদের উত্তরাধিকারী হবে—) যতক্ষণ না তারা হিজরত করবেন। (বস্তুত যখন হিজরত করে চলে আসবে, তখন তাঁরাও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।) আর (তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক না থাকলেও) যদি তারা তোমাদের নিকট ধর্মীয় কাজে (অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে) সাহায্য কামনা করে, তবে তোমাদের জন্য তাদের সাহায্য করা ওয়াজিব। তবে সেসব জাতি-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে (তা ওয়াজিব) নয়, যাদের সাথে তোমাদের (সন্ধি) চুক্তি থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সুতরাং তাঁর নির্ধারিত বিধি-বিধানের বিচ্যুতি ঘটিয়ে অসন্তুষ্টির যোগ্য হতে যেয়ো না) আর (তোমাদের মধ্যে যেমন পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্ক রয়েছে; তেমনিভাবে) যারা কাফির তারাও পারস্পরিক উত্তরাধিকারী। (না তারা তোমাদের উত্তরাধিকারী, আর না তোমরা তাদের উত্তরাধিকারী।) যদি (আলোচ্য) এই নির্দেশের উপর তোমরা আমল না কর, (বরং অসীম ধর্মীয় বিরোধ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আত্মীয়তার কারণে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পর্ক বিদ্যমান রাখ) তবে দুনিয়া জুড়ে মহা ফাসাদ (ও বিপর্যয়) বিস্তার লাভ করবে। (তার কারণ, পারস্পরিক উত্তরাধিকারের দরুন সবাইকে একই দলভুক্ত বিবেচনা করা হবে। অথচ পৃথক দলগত ঐক্য ছাড়া ইসলামের পরিপূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য লাভ হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইসলামের দুর্বলতাই হলো বিশ্বময় যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদের মূল।) আর [মুহাজিরীন ও আনসারদের পারস্পরিক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশে সে সমস্ত মুহাজিরীনই অন্তর্ভুক্ত, যারা হুযূরে আকরাম (সা)-এর সময়ে হিজরত করেছেন অথবা পরবর্তীতে। অবশ্য তাঁদের মর্যাদায় পার্থক্য থাকবে।] যারা (প্রাথমিক পর্যায়ে) মুসলমান হয়েছেন এবং [নবী করীম (সা)-এর সময়েই] হিজরত করেছেন এবং (প্রথম থেকেই) আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করেছেন আর যারা (সে সমস্ত মুহাজিরীনকে) নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন এবং সাহায্য-সহায়তা করেছেন, তারা সবাই ঈমানের পূর্ণ হক আদায়কারী। (কারণ ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রবর্তী থাকাটাই হলো তার হক।) তাদের জন্য (আখিরাতে) বিরাট মাগফিরাত এবং (জান্নাতে)

বিপুল সম্মানজনক রুযী (নির্ধারিত) রয়েছে। বস্তুত যারা [নবী করীম (সা)-এর হিজরতের] পরবর্তীকালে ঈমান গ্রহণ করেছে এবং হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে (অর্থাৎ করণীয় সবকিছুই করেছে, কিন্তু পরে করেছে) তারা (ফযীলত ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে তোমাদের সমপর্যায়ের না হলেও) তোমাদের মধ্যেই গণ্য হবে। (তা ফযীলত ও মর্যাদার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে কমবেশি হবে। কারণ আমলের পার্থক্যের দরুন মর্যাদার পার্থক্য ঘটে। অবশ্যই মীরাসের ক্ষেত্রে তারা সব দিক দিয়েই তোমাদের মাঝে গণ্য হবে। তার কারণ, আমলজনিত মর্যাদার দরুন শরীয়তের বিধিবিধানের কোন পার্থক্য ঘটে না। আর পরবর্তীকালে হিজরতকারীদের মধ্যে) যারা (পারস্পরিক অথবা পূর্ববর্তী মুহাজিরীনদের) আত্মীয় (মর্যাদার দিক দিয়ে কম হওয়া সত্ত্বেও তারা উত্তরাধিকার লাভের দিক দিয়ে) কিতাবুল্লাহ্ (তথা শরীয়তের বিধান কিংবা মীরাস সংক্রান্ত আয়াত-এর ভিত্তিতে একে অপরের উত্তরাধিকারের তুলনায়) বেশি হকদার। (আত্মীয়রা মর্যাদার দিক দিয়ে অধিক হলেও।) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে সম্যক অবগত। (সে কারণেই তিনি যে বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন, তা সর্বকালীন কল্যাণের ভিত্তিতেই করেছেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলো সূরা আন্‌ফালের শেষ চারটি আয়াত। এগুলোতে সে সমস্ত আহকাম বর্ণনাই প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজিরদের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজির মুসলমান ও অমুসলমানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে।

এসব বিধি-বিধান বা হুকুম-আহ্কামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত লোকের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় তারা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত; মুসলমান ও কাফির। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে দু'রকম; (১) মুহাজির; যারা হিজরত ফরয হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে মদীনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। (২) যারা কোন বৈধ অসুবিধার দরুন কিংবা অন্য কোন কারণে মক্কাতেই থেকে যান।

পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এ সবরকম লোকের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। কারণ ইসলামের প্রাথমিক পর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পিতা কাফিরই রয়ে গেল। কিংবা পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পুত্র রয়ে গেল কাফির। তেমনিভাবে ভাই-ভাতিজা, নানা-মামা প্রভৃতির অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি মুহাজির-অমুহাজির মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা তো বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধন-সম্পদের অধিকারী তারই নিকটবর্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যে যা কিছু এ পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত কিছুর মালিকানাই আল্লাহ্ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার জন্য, এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং

মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারে চলে যাওয়াটাই ছিল ন্যায়বিচার ও যুক্তিসম্মত। যার কার্যকর রূপ ছিল ইসলামী বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তদ্দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হতো। তাছাড়া মানুষ যখন একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ না পাবে আমার সন্তানসন্ততি, না পাবে আমার পিতামাতা, আর না পাবে আমার স্ত্রী, তখন ফল দাঁড়াত এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোন মানুষই স্বীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্তই প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করত। তার বেশি কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্নবান হতো না। বলা বাহুল্য, এতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত শহর-নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদী নেমে আসত।

সে কারণেই আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে তার আত্মীয়-স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এমন আত্মীয়-স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধন-সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হতো।

এরই সাথে সাথে ইসলাম যে অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটির প্রতিও মীরাসের বন্টন ব্যাপারে লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানব জাতির সৃষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত। এদিক দিয়ে সমগ্র মানব বিশ্বকে দু'টি পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে; মুমিন ও কাফির। কোরআনে উল্লিখিত এ আয়াত "خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ" -এর মর্মও তাই।

এই দ্বি-বিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্ককে মীরাসের পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান কোন কাফির আত্মীয়ের মীরাসের কোন অংশ পাবে না এবং কোন কাফিরেরও তার কোন মুসলমান আত্মীয়ের মীরাসের কোন অধিকার থাকবে না। প্রথমোক্ত দু'টি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বস্তুত এ নির্দেশটি চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে।

এর সাথে মুসলমান মুহাজির ও আনসারদের মীরাস সংক্রান্ত অন্য একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানরা যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। না কোন মুহাজির মুসলমান তার অমুহাজির মুসলমান আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজির কোন মুসলমান মুহাজির মুসলমানের মীরাসের কোন অংশ পাবে। বলা বাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্তই কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ মক্কা বিজয়ের পর স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) ঘোষণা করে দেন لاهجرة بعد الفتح অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরতের হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়।

এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন, এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটিও চিরস্থায়ী ও গায়ের মনসূখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতিতে কোরআনের অবতরণকালে এ হুকুমটি

নাযিল হয়েছিল, যদি কোনকালে কোন দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেখানেও এ হুকুমই প্রবর্তিত হবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি মুসলিম নরনারীর উপর হিজরত করা 'ফরযে আইন' তথা অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হাতেগনা কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকি সব মুসলমানই হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এরই লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজিরদের ইসলামও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজির অমুহাজিরদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল।

এখন যদি কোন দেশে আবারও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে বসবাস করে যদি ইসলামী ফরায়েয সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরয হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোন ওযর ব্যতীত হিজরত না করা নিশ্চিতভাবে যদি কুফরীর লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই আরোপিত হবে। মুহাজির ও অমুহাজিরদের মাঝে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাজির ও অমুহাজিরদের মাঝে মীরাসী স্বত্ব রহিতকরণের হুকুমটি প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোন হুকুম নয়, বরং এটিও সে প্রাথমিক নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই কুফরীর লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে কাফির বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে কুফরীর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে আরেকটি নির্দেশ অমুহাজির মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজির মুসলমানদের নিকট কোন রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে মুহাজির মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য; যাতে এ কথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজির মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে কাফিরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি, বরং তাদের এই ইসলামী অধিকার এখনও বলবৎ রয়ে গেছে যে, সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে পারে।

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে নুযুল মক্কা থেকে মদীনায় বিশেষ হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজির মুসলমান ছিলেন, যারা মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কাফিরদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কাজেই তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে একান্তই মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে ছিল, তা বলাই বাহুল্য। আর কোরআন করীম যখন মুহাজির মুসলমানদের প্রতি তাদের (অমুহাজির মক্কাবাসী মুসলমানদের) সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বোঝা যায় যে, যেকোন অবস্থায়, যেকোন জাতির মুকাবিলায় তাঁদের সাহায্য করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। এমনকি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি মুসলমানদের কোন যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই করতে হবে, অথচ ইসলামী নীতিতে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী নির্দেশেরও

উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজির মুসলমান যদি মুহাজির মুসলমানের নিকট এমন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে মুসলমান ভাইদের সাহায্য করাও জায়েয নয়।

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এবার বাক্যের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا .

অর্থাৎ সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয় আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে; অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে; অর্থাৎ মদীনার আনসার মুসলমানগণ—এতদুভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী, সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোনই সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে।

এখানে কোরআন করীম وَلَايَتٌ ও وَلِىٌّ শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হলো বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত হাসান কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের ইমামের মতে এখানে ولايت অর্থ উত্তরাধিকার এবং ولى অর্থ উত্তরাধিকারী। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহায়তাও নিয়েছেন।

প্রথম তফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজির ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিস হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে আর না থাকবে সে সমস্ত মুসলমানের সাথে যারা হিজরত করেন নি। প্রথম নির্দেশ অর্থাৎ দীনি পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরীত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকি থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি, তখন মুহাজির ও অমুহাজিরদের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোন কোন ফিকহ্‌বিদ প্রমাণ করেছেন যে, দীনের পার্থক্য যেমন উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ, তেমনিভাবে দেশের পার্থক্যও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহ্‌র কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥

অর্থাৎ এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যেকোন অবস্থায় তারাও মুসলমান। যদি তারা নিজেদের দীনের হিফাযতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁদের সাহায্য করা তাঁদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলমানের সাহায্য করা জায়েয নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলে করীম (সা) যখন মক্কার কাফিরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদীনায় চলে যাবে হুযূর (সা) তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই আবূ জান্দাল (রা) যাকে কাফিররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল, কোন রকমে মহানবীর খিদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যারতার জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্ত্বেও উল্লিখিত আয়াতের হুকুম অনুসারে তিনি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অপারকতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন।

তাঁর এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানের জন্যই একান্ত পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত (সা) আল্লাহ্র নির্দেশের আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের আয়ু বেশি দিন নেই। তাছাড়া আর কটি দিন ধৈর্য ধারণের সওয়াবও আবূ জান্দালের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী (সা) কোরআনী নির্দেশ মুতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাপদের উপর গুরুত্ব দান করেছিলেন। এটাই হলো ইসলামী শরীয়তের সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তাঁরা পার্থিব জীবনে বিজয় ও সম্মান এবং আখিরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং সবলকে ফাঁকি দেয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামান্যতম স্বার্থ দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ অর্থাৎ কাফিররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। وَلِىٌّ শব্দটি যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফিরদেরকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং উত্তরাধিকার বন্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে

প্রচলিত রয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইনই প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি তাদের এতীম-অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদীর অভিভাবক তাদেরই মধ্য থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে অমুসলমানদের নিজস্ব আইন-কানুন ইসলামী রাষ্ট্রেও সংরক্ষিত রাখা হবে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ। অর্থাৎ তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে।

এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহ্‌কামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মুহাজির ও আনসারদের একে অপরের অভিভাবক হতে হবে—যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত এখানকার মুহাজিরীন ও অমুহাজিরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্য-সহায়তায় সম্পর্ক তার শর্ত মুতাবিক বলবৎ থাকা উচিত। তৃতীয়ত, কাফিররা একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়।

বস্তুত এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবত এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, এখানে যেসব হুকুম-আহকাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলার মূলনীতিস্বরূপ। কারণ এসব আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কের চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতা-পুত্র কিংবা ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও কোন কাফির কোন মুসলমানের এবং কোন মুসলমান কোন কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্খতাজনিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই হিদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নয়। এমনিভাবে এই হিদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, কাফিররা একে অপরের উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোন রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃশ্যত এগুলোকে কতিপয় আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তির জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও ব্যাপক মূলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহ্‌কাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনার পর এমন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা সাধারণত অন্যান্য আহ্‌কামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হলো এই যে, তোমরা যদি এসব আহ্‌কামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্বময় বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, দাঙ্গা বিশৃঙ্খলা রোধে এসব বিধি-বিধানের বিশেষ প্রভাব ও অবদান রয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফিরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেন নি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তো বা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করছে। তারপরই বলা হয়েছে ঃ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাঁদের জন্য মাগফিরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, الاسلام يهدم ماكان قبله والهجرة تهدم ماكان قبلها অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

চতুর্থ আয়াতে মুহাজিরদের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজির, যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাঁদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাঁদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদেরই অনুরূপ। তাঁরা সবাই পরস্পরের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজিররাও তোমাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজিরদেরই মত।

এটি সূরা আনফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

আরবী অভিধান اولو শব্দটি 'সাথী' অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার বাংলা অর্থ হলো 'সম্পন্ন'। যেমন اولو العقل বুদ্ধিসম্পন্ন। اولو الامر দায়িত্বসম্পন্ন। কাজেই اولو الارحام অর্থ হয় গর্ভ-সাথী, একই গর্ভসম্পন্ন ارحام শব্দটি رحم শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হলো সে অঙ্গ যাতে সন্তানের জন্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই اولو الارحام আত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে অপরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয় কিন্তু যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা

অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে فِىْ كِتٰبِ اللهِ অর্থ فِىْ حُكْمِ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ নির্দেশবলে এ বিধান জারি হয়েছে।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর اُوْلُوا الْاَرْحَامْ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়-বেগানা অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কোরআন করীম সূরা নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছে। মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'আহলে ফারায়েয' বা 'যাবিল ফুরূয'। এদেরকে দেয়ার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে তা আয়াত দৃষ্টে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করা কর্তব্য। তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোন সম্পত্তি বন্টন করে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ দূরবর্তী আত্মীয়তা যে সমগ্র বিশ্বমানুষের মাঝেই বর্তমান, তাতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়েরই অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার বংশধর। কাজেই নিকটবর্তী আত্মীয়দের দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে মীরাস বন্টনের কার্যকর ও বাস্তব রূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ রাসূলে করীম (সা)-এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যাবিল ফুরূযে'র অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 'আসাবাগণ' অর্থাৎ পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর 'আসাবা'র মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে বন্টন করা হবে।

আসাবা ছাড়াও অন্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েয শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য 'যাবিল আরহাম' শব্দ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত হয়েছে। কোরআন করীমে বর্ণিত اولو الارحام শব্দটি কিন্তু আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল ফুরূয, আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেয়া হয়েছে। তাতে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'যাবিল ফুরূয' বলা হয়। এছাড়া অন্যদের সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر –

অর্থাৎ যাদের অংশ স্বয়ং কোরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকেই দিতে হবে যারা মৃতের ঘনিষ্ঠতম পুরুষ।

এদেরকে মীরাসের পরিভাষায় 'আসাবা' (عصبہ) বলা হয়। যদি কোন মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রাসূলে করীম (সা)-এর কথা অনুযায়ী তবেই মৃতের

সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে হবে। এদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম'। যেমন মামা, খালা প্রভৃতি।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজিরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোন বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম, যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেয়া ছিল।

সূরা আন্‌ফাল শেষ হলো

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তা উপলব্ধি করার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

تمت سورة الانفال بعون الله تعالى وحمده ليلة الخميس لثمانى وعشرين من جمادى الاخرى سنه ١٣٨١ هجرى - واسئل الله تعالى التوفيق والعون فى تكميل تفسير سورة التوبة ولله الحمد اوله واخره محمد شفيع عفى عنه-

وتم النظر الثانى عليه يوم الجمعة لتسعة عشر من جمادى الاولى سنه ١٣٩٠ ه - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ -

سورة التوبة

সূরা তওবা

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকূ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١ فَسِيْحُوْا فِى
الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى
الْكٰفِرِيْنَ ۝٢ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ
اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ۬ وَرَسُوْلُهٗ ۗ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ
تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ
اَلِيْمٍ ۝٣ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا
وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٤ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ
مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

(১) সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (২) অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারবে না,

আর নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। (৩) আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তার রাসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্কে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফিরদের মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৪) তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (৫) অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এখন থেকে) সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে সেসব মুশরিকের সাথে, যাদের সাথে তোমরা (মেয়াদ নির্দিষ্ট করা ব্যতীত) চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (এ আদেশ তৃতীয় দলের জন্য, যাদের বিবরণ 'আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়'-এ দেয়া হবে। আর চতুর্থ দল, যাদের সাথে কোনরূপ চুক্তি হয়নি, তাদের কথা এ থেকেই ভাল বোঝা যায় যে, যখন চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উঠিয়ে নেয়া হলো, তখন চুক্তিবহির্ভূত মুশরিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নই উঠে না।) অতএব (উক্ত দল দু'টিকে জানিয়ে দাও যে,) তোমরা পরিভ্রমণ কর এদেশে চার মাসকাল (যাতে এ অবসরে কোন সুযোগ বা আশ্রয়ের সন্ধান করে নিতে পার), আর (এতদসঙ্গে এ কথাও) জেনে রাখ (যে, এ অবকাশের ফলে তোমরা মুসলমানদের উৎপীড়ন থেকে রেহাই পেতে পারলেও,) তোমরা পরাভূত করতে পারবে না আল্লাহ্কে (যাতে তাঁর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে পার), আর (একথাও জেনে রাখ যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ (পরজীবনে) কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন (অর্থাৎ শাস্তি দেবেন। তোমাদের পরিভ্রমণ তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারবে না। এ ছাড়া দুনিয়াতে নিহত হওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই। এতে রয়েছে তওবার উৎসাহ ও তাগিদ)। আর (প্রথম ও দ্বিতীয় দল সম্পর্কে) মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করা ব্যতিরেকে এখনই সেই) মুশরিকদের (নিরাপত্তা বিধান) থেকে দায়িত্বমুক্ত (হচ্ছেন, যারা স্বয়ং চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এরা হলো প্রথমোক্ত দল)। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও তাদের বলা যাচ্ছে যে,) যদি তোমরা (কুফরী থেকে) তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য (উভয় জগতে) কল্যাণকর হবে। (দুনিয়ার কল্যাণ হলো এই যে, তোমাদের চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ মার্জিত হবে এবং মুসলমানদের হাতে নিহত হবে না। আর আখিরাতের কল্যাণ হলো, তথায় তোমাদের নাজাত হবে। আর যদি (ইসলাম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্কে তোমরা

পরাভূত করতে পারবে না (যাতে কোথাও আত্মগোপন করে থাকতে পার)। আর (আল্লাহ্কে পরাভূত করতে না পারার ব্যাখ্যা হলো, সেই) কাফিরদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও (যা নিশ্চিতভাবে আখিরাতে ভোগ করতে হবে। তবে দুনিয়াবী শাস্তির সম্ভাবনাও আছে। মোটকথা, ইসলামবিমুখ হলে শাস্তি ভোগ অনিবার্য)। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের (সাথে কৃত চুক্তি পালনে) কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কোন (শত্রুকে) সাহায্যও করেনি (তারা হলো দ্বিতীয় দল), তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া (নির্দিষ্ট) মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। (সাবধান! চুক্তি ভঙ্গ করো না। কারণ) অবশ্যই আল্লাহ্ (চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারে) সাবধানী লোকদের পছন্দ করেন। অতএব, তোমরাও সাবধানতা অবলম্বন কর; এতে আল্লাহ্ পাকের প্রিয়পাত্র হবে। সামনে প্রথম দলের অবশিষ্ট হুকুম বর্ণিত হচ্ছে যে, এদের যখন অবকাশ নেই তাই এদের হত্যা করার সুযোগ যদি এখনো থাকত, তথাপি মুহররম মাস শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করবে। (কারণ নিষিদ্ধ মাসসমূহে রক্তপাত অবৈধ।) অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে হত্যা কর (প্রথম দলভুক্ত) মুশরিকদের যেখানে তাদের পাও এবং তাদের বন্দী কর ও অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসো। কিন্তু যদি (কুফর থেকে তারা) তওবা করে (নেয় এবং ইসলামের হুকুম তা'মীল করে—যেমন,) নামায কায়েম করে যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (তাদের হত্যা ও বন্দী করো না। কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (এ জন্যে তিনি তওবাকারীদের কুফরী অপরাধ মার্জনা করেন এবং তাদের জানের নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ্র এ হুকুম অবশিষ্ট দলের বেলায়ও প্রযোজ্য যখন তাদের মেয়াদ অতিক্রান্ত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে সূরা বরাআতের শুরু। একে সূরা 'তওবাও' বলা হয়। বরাআত বলা হয় এ জন্য যে, এতে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর 'তওবা' বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলমানদের তওবা কবূল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে—(মাযহারী)। সূরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআন মজীদে এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' লেখা হয় না, অথচ অন্য সকল সূরার শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ লেখা হয়। এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লিখিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের আগে মনে রাখা আবশ্যক যে, কোরআন মজীদ তেইশ বছরের দীর্ঘ পরিসরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। এমনকি একই সূরার বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। হযরত জিব্রীলে আমীন 'ওহী নিয়ে এলে আল্লাহ্র আদেশ মতে কোন্ সূরার কোন্ আয়াতের পর অত্র আয়াতকে স্থান দিতে হবে তাও বলে যেতেন। সেমতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহী লেখকদের দ্বারা তা' লিখিয়ে নিতেন।

একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' নাযিল হতো। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হলো, অতঃপর অপর সূরা শুরু হলো। কোরআন মজীদের সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষে নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিস্মিল্লাহ্

নাযিল হয় আর না রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা লিখে নেয়ার জন্য ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সা)-এর ইন্তিকাল হয়।

কোরআন সংগ্রাহক হযরত উসমান গনী (রা) স্বীয় শাসনামলে যখন কোরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোন সূরা নয় বরং অন্য কোন সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন্ সূরার অংশ হতে পারে ? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আনফালের অংশ বলাই সঙ্গত।

হযরত উসমান (রা)-এর এক রিওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে সূরা আনফাল ও তওবাকে করীনাতাইন বা মিলিত সূরা বলা হতো (মাযহারী)। সেজন্য একে সূরা আন্‌ফালের পর স্থান দেয়া হয়। এতে এ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সূরা আন্‌ফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে সূরা তওবার স্বতন্ত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কোরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আন্‌ফালের শেষে এবং সূরা তওবা শুরু করার আগে কিছু ফাঁক রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়; যেমন, অপরাপর সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্'র স্থান হয়।

সূরা বরাআত বা তওবার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ লিখিত না হওয়ার এ তত্ত্বটি হাদীসের কিতাব আবূ দাউদ, নাসায়ী ও মসনদে ইমাম আহমদে স্বয়ং হযরত উসমান গনী (রা) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাস্‌সিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-কে প্রশ্নও করেছিলেন যে, যে নিয়মে কোরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস হয় অর্থাৎ প্রথম দিকে শতাধিক আয়াতসম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়—পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'মি-ঈন', অতঃপর রাখা হয় শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো—যাদের বলা হয় 'মাসানী'। এর পর স্থান দেয়া হয় ছোট সূরাগুলোকে—যাদের বলা হয় 'মুফাস্‌সালাত'। কোরআন সংকলনের এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আন্‌ফালের আগে স্থান দেওয়া কি উচিত ছিল না ? কারণ সূরা তওবার আয়াতসংখ্যা শতের অধিক। আর আন্‌ফালের শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে আয়াতের সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে যাদের سبع طوال বলা হয়; তদনুসারে আন্‌ফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ এখানে এ নিয়মের বরখেলাফ করা হয়। এর রহস্য কি ?

হযরত উসমান গনী (রা) বলেন, কথাগুলো সত্য, কি কোরআনের বেলায় যা করা হলো, তা সাবধানতার খাতিরে। কারণ বাস্তবে সূরা তওবা যদি স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আন্‌ফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, আন্‌ফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই ওহীর ইঙ্গিত ব্যতীত আন্‌ফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেওয়া আমাদের পক্ষে বৈধ হবে না। আর একথাও সত্য যে, ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন হিদায়েত আসেনি। তাই আনফালকে আগে এবং তওবাকে পরে রাখা হয়েছে।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আন্‌ফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে

বিসমিল্লাহ্ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোন সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লেখা। এ কারণেই আমাদের মান্য ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আন্ফালের তিলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তওবা থেকে তিলাওয়াত শুরু করে, কিংবা এর মাঝখান থেকে আরম্ভ করে, সে বিস্মিল্লাহ্ পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তওবার তিলাওয়াতকালে কোন অবস্থায়ই বিসমিল্লাহ্ পাঠ জায়েয নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু, এ ভুলও তারা করে বসে যে, এখানে বিসমিল্লাহ্-এর স্থলে তারা اعوذ بالله من النار। পাঠ করে। এর কোন প্রমাণ হুযূর (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক হযরত আলী (রা) থেকে অপর একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে সূরা তওবার শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিস্মিল্লাহ্তে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সূরা তওবায় কাফিরদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব যা মূল কারণের পরিপন্থী নয়। মূল কারণ হলো, তওবা ও আন্ফাল একটি মাত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, উপরোক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে যে, এ সূরায় কাফিরদের নিরাপত্তাকে নাকচ করে দেয়া হয় যাতে বিস্মিল্লাহ্ সঙ্গত নয়। তাই কুদরতের পক্ষ থেকে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করে দেয়া হয় যাতে বিস্মিল্লাহ্ লিখিত হয়।

সূরা তওবার উপরোক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্মোপলব্ধির জন্য যে ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেয়া আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেয়া হলো।

(১) সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ প্রসঙ্গে অনেক হুকুম-আহকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হোনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হলো অষ্টম হিজরী সালের মক্কা বিজয়। অতঃপর ঐ বছরেই সংঘটিত হয় হোনাইন যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরীর রজব মাসে। তারপর এ সালের যিলহজ্জ মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেয়া হয়।

(২) চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলো আয়াতে উল্লিখিত আছে, তার সারমর্ম হলো, ষষ্ঠ হিজরী সালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশ বংশীয় লোকেরা হযরত (সা)-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হুদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। এই মেয়াদকাল ছিল তফসীরে 'রূহুল-মা'আনী'র বর্ণনা মতে দশ বছর। মক্কার কুরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কুরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কুরাইশদের মিত্র অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিত্র হয়ে তাঁর সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে 'খোযাআ' গোত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হলো, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ

যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি চুক্তি হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গত বছরের উমরা কাযা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিনদিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মুতাবিক মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনু বকর গোত্র বনু খোযাআর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কুরাইশরা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থান বহু দূরে, তদুপরি এ হলো নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌঁছবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনু বকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে, যা কুরাইশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল, হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছর কাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি।

ওদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিত্র বনু খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, ওহোদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়েবী সাহায্য লাভের বিষয়টি কুরাইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার ওপর চুক্তিভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতির আশংকা বেড়ে গেল। চুক্তিভঙ্গের সংবাদ হযরতের কাছে পৌঁছার পর পূর্ণ নীরবতা লক্ষ্য করে এ আশংকা আরো ঘনিভূত হলো। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবূ সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মদীনায় প্রেরণ করে, যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সেই চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।

আবূ সুফিয়ান মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত (সা)-এর যুদ্ধপ্রস্তুতি অবলোকন করেন। এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা হযরত (সা)-এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলীর তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবূ সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

'বিদায়া' ও 'ইবনে কাসীর'-এর বর্ণনা মতে হযরত রাসূলে করীম (সা) অষ্টম হিজরীর দশই রমযান সাহাবায়ে কিরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

মক্কা বিজয়কালের উদারতা ঃ কুরাইশদের যে সকল নেতা ইসলামের সততায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু লোকজনের ভয়ে তা প্রকাশ করতেন না, তারা মক্কা বিজয়ের এ সুযোগে ইসলাম গ্রহণ করে নেন, যারা সেসময়ও নিজেদের পূর্বতন কুফরী ধর্মের উপর অবিচল ছিল, তাদের মধ্য থেকে কতিপয় লোক ছাড়া বাকি সকলের জানমালের নিরাপত্তা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পয়গম্বরী আদর্শের এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা প্রতিপক্ষ থেকে মোটেই আশা করা যায় না। তিনি সেদিন কাফিরদের সকল শত্রুতা, জুলুম ও অত্যাচারের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি রেখে

বলেছিলেন, আজ তোমাদের সে কথাই বলব, যা ইউসুফ (আ) আপন ভাইদের বলেছিলেন, যখন তারা পিতামাতা সহকারে ইউসুফের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে মিসর পৌঁছেন। তিনি তখন বলেছিলেন ঃ لاتثريب عليكم اليوم "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।" (প্রতিশোধ নেওয়া তো পরের কথা)।

মক্কা বিজয়কালে মুশরিকদের চার শ্রেণী ও তাদের ব্যাপারে হুকুম আহ্কাম ঃ সারকথা, মক্কা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এসে পড়ে। মক্কা ও তার আশপাশে অবস্থানকারী অমুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া হয়। কিন্তু সে সময় অমুসলমানরা ছিল অবস্থানুপাতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। এদের এক শ্রেণী হলো, যাদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয় এবং যারা পরে চুক্তি লংঘন করে। বস্তুত এ চুক্তি লংঘনই মক্কা আক্রমণ ও বিজয়ের কারণ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যাদের সাথে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। এরা সে চুক্তির উপর বহাল থাকে। যেমন বনু কিনানার দু'টি গোত্র, বনু যমারা ও বনু মুদলাজ। তফসীরে খাযিন-এর বর্ণনা মতে সূরা বরাআত নাযিল হওয়ার সময় এদের চুক্তির মেয়াদকাল আরও নয় মাস বাকি ছিল। তৃতীয় শ্রেণী হলো, যাদের সাথে সন্ধি হয়েছিল কোন মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করা ব্যতীত। চতুর্থ হলো, যাদের সাথে আদৌ কোন চুক্তি হয়নি।

মক্কা বিজয়ের আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিক বা আহ্লে কিতাবদের সাথে যতগুলো চুক্তি করেছেন, তার প্রত্যেকটিতে তিনি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, ওরা গোপনে ও প্রকাশ্যে চুক্তির শর্ত লংঘন করে এবং শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এসকল ধারাবাহিক তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ও আল্লাহ্র ইঙ্গিতে এ সিদ্ধান্ত নেন যে, ভবিষ্যতে এদের সাথে সন্ধির আর কোন চুক্তি সম্পাদন করবেন না, এবং আরব উপদ্বীপটিকে ইসলামের দুর্গ হিসেবে শুধু মুসলমানদের আবাসভূমিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে মক্কা নগরী তথা আরব ভূ-খণ্ড মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর অমুসলমানদের প্রতি আরবভূমি ত্যাগের নোটিশ দেওয়া যেত। কিন্তু ইসলামের উদার ও ন্যায়নীতি সর্বোপরি রাহ্মাতুল্লীল আলামীন (সা)-এর অপরিসীম দয়া ও সহিষ্ণুতার প্রেক্ষিতে তাদের সময় দেওয়া ব্যতীত ভিটামাটি ত্যাগের নির্দেশ দান ছিল বেমানান। সে কারণে সূরা বরাআতের শুরুতে উপরোক্ত চার শ্রেণীর অমুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক হুকুম-আহ্কাম নাযিল হয়।

কুরাইশ বংশীয় লোকেরা হলো প্রথম শ্রেণীভুক্ত। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিকে এরাই লংঘন করেছে। তাই ওরা অধিক সময় পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু সময়টি ছিল নিষিদ্ধ মাসগুলোর, যাতে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ। তাই সূরা তওবার পঞ্চম আয়াতে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় ঃ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ الاية যার সারকথা হলো, এরা চুক্তি লংঘন করে নিজেদের কোন অধিকার বাকি রাখেনি। তবে নিষিদ্ধ মাসের মর্যাদা আবশ্যক। অতএব এরা নিষিদ্ধ মাস শেষ হতেই যেন আরব ভূখণ্ড ত্যাগ করে কিংবা মুসলমান হয়ে যায়। নতুবা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

যে লোকদের সাথে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি হয় এবং তারা এর উপর অবিচলও থাকে, তারা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাদের সম্পর্কে সূরা তওবার চতুর্থ আয়াতে বলা হয় ঃ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ الاية "কিন্তু যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ এবং যারা চুক্তি পালনে কোন ত্রুটি করেনি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোন লোকের সাহায্যও করেনি; তাদের সাথে কৃত চুক্তি পালন করে চল তাদের মেয়াদকাল পর্যন্ত, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন।" এরা হলো বনু যমারা ও বনু মুদলাজ গোষ্ঠীর লোক। এ আদেশ বলে তারা নয় মাসের সময় লাভ করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ব্যাপারে হুকুম আছে এ সূরার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে। সেখানে বলা হয় ঃ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الاية অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ। তাদের জানিয়ে দাও যে, তোমরা এ দেশে আর মাত্র চার মাসকাল বিচরণ কর, আর মনে রেখ, তোমরা কখনও আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন।

সারকথা, প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত মতে মেয়াদ ধার্য করা ব্যতীত যাদের সাথে চুক্তি হয় কিংবা যাদের সাথে কোন চুক্তিই হয়নি, তারা চার মাসকাল সময় লাভ করে। চতুর্থ আয়াত মতে যাদের সাথে মেয়াদ ধার্য করে চুক্তি হয়, তারা মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সময় পায়। আর পঞ্চম আয়াত মতে নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত—মক্কার মুশরিকদের সময় দেয়া হয়।

মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় দেয়ার উদারনীতি ঃ ইসলামের উদারনীতি মতে উপযুক্ত আদেশাবলীর প্রয়োগ ও সময় দান—এ দু'য়ের শুরু সাব্যস্ত করা হয়। আরবের সর্বত্র এ সকল ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর থেকে, আর এগুলোর প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয় নবম হিজরীর হজ্জের মৌসুমে মিনা ও আরাফাতের সাধারণ সম্মেলনসমূহে। সূরা তওবার তৃতীয় আয়াতে কথাটি এভাবে ব্যক্ত করা হয় ঃ

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ الاية

আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও, যদি তোমরা তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখ তোমরা আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারবে না, আর এই কাফিরদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

চুক্তি বাতিলের খোলা প্রচার ও হুঁশিয়ারি দান ব্যতীত কাফিরদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না ঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত আদেশ পালন উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবম হিজরীর হজ্ব মৌসুমে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক ও হযরত আলী (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ করে আরাফাতের মাঠ ও মিনা প্রান্তরে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর সম্মেলনে আল্লাহ্‌র ঘোষণাটি প্রচার করেন। এ বিরাট সম্মেলনে যে কথা প্রচারিত হয়, তা আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রচার করেন। এ বিরাট সম্মেলনে যে কথা প্রচারিত হয়, তা আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে যায়। এ সত্ত্বেও হযরত আলী (রা)-র মাধ্যমে ইয়ামনে তা পুনঃ প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এ সাধারণ ঘোষণার পর প্রথম শ্রেণীভুক্ত মক্কার মুশরিকদের পক্ষে নিষিদ্ধ মাসগুলোর শেষ অর্থাৎ দশম হিজরীর মহররম মাস, দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষে একই হিজরীর রমযান মাস এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পক্ষে উক্ত হিজরীর রবিউস্‌সানী গত হলে আরবভূমি ত্যাগ করার বিধান ছিল। নতুবা, তারা যুদ্ধের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ আদেশ অনুযায়ী হজ্বের আগামী মৌসুমে আরবের সীমানায় কোন কাফির মুশরিকের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না—এ কথাটি সূরা তওবার فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ২৮তম আয়াতে ব্যক্ত করা হয় এরূপে অর্থাৎ চলতি মাসের পর এরা মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস لا يحجن بعد العام مشرك "এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্ব করবে না"-এর মর্মার্থও তাই। এ পর্যন্ত সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতের তফসীর ঘটনাবলীর আলোকে বর্ণিত হলো।

উক্ত আয়াতসমূহের আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ প্রথম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পর মক্কার কুরাইশ ও অপরাপর শত্রুভাবাপন্ন গোত্রের সাথে ক্ষমা মার্জনা ও দয়া-মায়ার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার দ্বারা মুসলমানদের এ শিক্ষা দেন যে, যখন তোমাদের কোন শত্রু তোমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তখন তার থেকে বিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নেবে না, বরং তাকে ক্ষমা করে ইসলামী আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। শত্রুর সাথে ক্ষমার আচরণে যদিও মন সায় দেয় না, তথাপি এতে লুক্কায়িত আছে বড় ধরনের কতিপয় মঙ্গল। এ মঙ্গল প্রথমে নিজের জন্য। কারণ প্রতিশোধ নেওয়ার মাঝে নফসের আনন্দ থাকলেও তা ক্ষণিকের। কিন্তু ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের যে উচ্চ দরজা লাভ করা যায় তা স্থায়ী, এর মূল্যও অসীম। স্থায়ীকে ক্ষণস্থায়ীর ওপর প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

দ্বিতীয় ঃ শত্রুকে কাবু করার পর নিজের রাগ সংবরণ একথা প্রমাণ করে যে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, বরং তা শুধু আল্লাহ্র জন্য। এই মহান উদ্দেশ্য ইসলামী জিহাদ ও ফাসাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়ার বুকে তাঁর শাসন জারি করার জন্য যে যুদ্ধ, তার নাম জিহাদ, নতুবা যুদ্ধবিগ্রহ মাত্রই ফাসাদ।

তৃতীয় ঃ শত্রু পরাস্ত হওয়ার পর সে যদি মুসলমানদের ক্ষমা-মার্জনার এ অনুপম আদর্শ প্রত্যক্ষ করে তবে সে ভদ্রতার খাতিরে হলেও মুসলমানদের ভালবাসবে। আর এ ভালবাসা দেবে তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা, যা হবে তার জন্য সফলতার চাবিকাঠি। মূলত এটিই জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ক্ষমা করার অর্থ নিরাপত্তাবিহীন হওয়া নয় ঃ দ্বিতীয় যে বিষয়টি বোঝা যায় তা হলো, ক্ষমা-মার্জনার অর্থ এই নয় যে, শত্রুকে শত্রুতার সুযোগ দেবে এবং নিজের জন্য নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেবে না। বরং বিচক্ষণতা হলো, ক্ষমা-মার্জনার সাথে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ও শত্রুতার সকল ছিদ্র বন্ধকরণ। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) বড় হিকমতপূর্ণ ইরশাদ করেছেন ঃ لا يلدغ المرء من حجر واحد مرتين "বুদ্ধিমান মানুষ এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।" নবম হিজরী সালে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা এবং হারম শরীফের সীমানা ত্যাগের জন্য তাদের সময় ও সুযোগদান উপরোক্ত প্রজ্ঞাসম্মত

কার্যক্রমের প্রমাণ বহন করে। তৃতীয় বিষয় হলো, সময় ও সুযোগ দান ব্যতীত দুর্বল মানুষের প্রতি হঠাৎ দেশত্যাগের আদেশ দেওয়া কাপুরুষতা ও চরম অভদ্রতা। তাই কাউকে দেশ ত্যাগের আদেশ দিতে গেলে প্রথমে তার প্রচার আবশ্যক এবং তাকে সময় ও সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে সে আমাদের আইন-কানুন মেনে নিতে রাযী না হলে যেখানে ইচ্ছা সহজে চলে যেতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত নবম হিজরীর সাধারণ ঘোষণা এবং সকল শ্রেণীকে সময় দানের দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

চতুর্থ ঃ কোন জাতির সাথে সন্ধি চুক্তি করার পর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তা বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে তা বাতিল অবশ্য করা যায়, কিন্তু উত্তম হলো চুক্তি তার নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত পালন করে যাওয়া, যেমন সূরা তওবার চতুর্থ আয়াতে বনু যমারা ও বনু মুদলাজ গোত্রের সাথে কৃত চুক্তি নয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ করার বর্ণনা রয়েছে।

পঞ্চম ঃ শত্রুদের সাথে প্রতিটি আচরণে মনে রাখতে হবে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, শত্রুতা তাদের সেই কুফরী আকীদা বিশ্বাসের সাথে, যা তাদের ইহ-পরকাল ধ্বংসের কারণ। বস্তুত এর মূলে রয়েছে তাদের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। তাই যুদ্ধ বা সন্ধির যেকোন অবস্থায় সহানুভূতিভাব ত্যাগ করা উচিত নয়। যেমন এ সকল আয়াতে বারংবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি তওবা কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য উভয় জাহানে কল্যাণকর। কিন্তু তওবা করা না হলে শুধু দুনিয়ায় নিহত ও ধ্বংস হবে— যাকে বহু কাফির জাতি কৃতিত্ব হিসাবেও গ্রহণ করে নেয়—তা নয়; বরং নিহত হওয়ার পর পরকালীন আযাব থেকেও নিস্তার পাবে না। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সতর্কতার ঘোষণার সাথে নসীহত ও হিতাকাঙ্ক্ষারও আমেজ রয়েছে।

ষষ্ঠ ঃ চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি যেমন মেয়াদকাল পর্যন্ত সন্ধিচুক্তি পালনের আদেশ রয়েছে, তেমনি তার শেষ ভাগে রয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ। 'আল্লাহ্ অবশ্যই সাবধানীদের পছন্দ করেন।' এতে চুক্তি পালনে সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য জাতির মত তোমরা ছলে-বলে-কৌশলে যেন চুক্তি ভঙ্গের পাঁয়তারা না কর।

সপ্তম ঃ পঞ্চম আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সঠিক উদ্দেশ্যে কোন জাতির সাথে জিহাদ আরম্ভ হলে তাদের মুকাবিলায় নিজেদের সকল শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক তখন দয়া-বাসনা বা নম্রতা হবে কাপুরুষতার নামান্তর।

অষ্টম ঃ পঞ্চম আয়াত প্রমাণ করে যে, কোন অমুসলমানের ইসলাম গ্রহণকে তিন শর্তে স্বীকৃতি দেয়া যায়। প্রথম তওবা, দ্বিতীয় নামায কায়েম, তৃতীয় যাকাত আদায়। এ তিন শর্ত যথাযথ পূরণ না হলে নিছক কলেমা পাঠে যুদ্ধ স্থগিত রাখা যাবে না। রাসূলে করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর যারা যাকাত দিতে অস্বীকার জ্ঞাপন করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সাহাবাদের সামনে এ আয়াতটি পেশ করে তাঁদের ইতস্তত ভাব দূর করেন।

নবম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত يوم الحج الاكبر-এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা), হযরত উমর ফারূক (রা), আবদুল্লাহ্

বিন উমর (রা) এবং আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা) প্রমুখ সাহাবা বলেন ঃ يوم الحج الاكبر-এর অর্থ আরাফাতের দিন। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন الحج عرفة 'হজ্ব হলো আরাফাতের দিন' (আবূ দাউদ)। আর কেউ বলেন, এর অর্থ কুরবানীর দিন বা দশই যিলহজ্ব।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র) এবং অপরাপর ইমাম এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধন উদ্দেশ্যে বলেন, হজ্বের পাঁচ দিন হলো হজ্বে আকবরের দিন। এতে আরাফাত ও কুরবানীর দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে يوم (দিন) শব্দের একবচন আরবী বাকরীতির বিরুদ্ধ নয়। কোরআনের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে يوم الفرقان রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের অপরাপর যুদ্ধ যথা يوم احد يوم بعاث প্রভৃতিতে একবচন রয়েছে। অনেক দিনব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে।

তা'ছাড়া উমরার অপর নাম হলো হজ্বে আসগর বা ছোট হজ্ব। এর থেকে হজ্বকে পৃথক করার জন্য বলা হয় হজ্বে আকবর অর্থাৎ বড় হজ্ব। তাই কোরআনের পরিভাষা মতে প্রতি বছরের হজ্বকে হজ্বে আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার, সে বছরের হজ্ব হলো হজ্বে আকবর—তাদের ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথা বলা আছে যে, হযরত (সা)-এর বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়েছিল। সম্ভবত এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফযীলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সাথে উক্ত ধারণার কোন সম্পর্ক নেই।

ইমাম জাস্সাস (র) 'আহ্কামুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, হজ্বের দিনগুলোকে 'হজ্বে আকবর' নামে অভিহিত করা থেকে এ মাস'আলাটি বের হয় যে, হজ্বের দিনগুলোতে উমরা পালন করা যাবে না। কেননা কোরআন মজীদ এ দিনগুলোকে হজ্বে আকবরের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছে।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ كَيْفَ يَكُونُ
لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ
عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا
ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ

فَسِقُوْنَ ۝٨ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ
اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝١٠ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝١١

(৬) আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্য যে এরা জ্ঞান রাখে না। (৭) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ্‌র নিকট ও তাঁর রাসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে ? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল হারামের নিকট। অতঃপর যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (৮) কিরূপে ? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না; তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। (৯) তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত্ত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট। (১০) তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী। (১১) অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর মুশরিকদের কেউ যদি (মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হত্যার বৈধ সময়ে তওবা ও ইসলামের ফযীলত এবং মাহাত্ম্য শুনে তৎপ্রতি উৎসাহিত হয় এবং ইসলামের সত্যতা ও স্বরূপ অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে) তোমার কাছে (এসে) আশ্রয় প্রার্থনা করে (যাতে পরিতৃপ্তির সাথে শুনতে ও অনুধাবন করতে পারে) তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম (অর্থাৎ সত্য দীনের প্রমাণপঞ্জি) শুনতে পারে। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে (অর্থাৎ তাকে যেতে দেবে, যাতে সে বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এরূপ আশ্রয় দানের) এ (আদেশ)-টি এজন্যে যে এরা (পূর্ণ) জ্ঞান রাখে না (তাই তাদের কিছু সুযোগ দেয়া

আবশ্যক। ওদিকে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা যে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তাদের চুক্তি ভঙ্গের আগেই ভবিষ্যদ্বাণীরূপে আল্লাহ্ বলেন,) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ্‌র নিকট ও তাঁর রাসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে ঃ (কারণ বলবৎ থাকার জন্য অপর পক্ষকেও অবিচল থাকা দরকার। সারকথা, এরা চুক্তিলংঘন অবশ্যই করবে। তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকেও কোন অনুকম্পা পাবে না) তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল হারাম (হারম শরীফ)-এর নিকট (এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক যাদের উল্লেখ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم আয়াতে এসেছে, এদের প্রতি আশা রাখা হয় যে, এরা চুক্তির উপর বহাল থাকবে), অতএব যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য সরল থাকে (চুক্তি ভঙ্গ না করে), তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। (এবং মেয়াদকাল পর্যন্ত চুক্তি পালন কর। উল্লেখ্য, সূরা 'বরাআত' নাযিল হওয়ার সময় মেয়াদকাল আরও নয় মাস বাকি ছিল। তাই তাদের চুক্তি রক্ষার ফলে মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করা হয়) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ (চুক্তি ভঙ্গ হতে) সাবধানী লোকদের পছন্দ করেন (তাই তোমরাও সাবধানতা অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হতে পার। দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা এখানে শেষ করে পরবর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর অবশিষ্ট বিষয় বর্ণিত হচ্ছে)। (৮) কিরূপে ? (তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। কারণ তাদের এ চুক্তি তো পারতপক্ষে, যুদ্ধের ভয়ে; অন্তরের সাথে নয়, তাই তারা) মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে (সুতরাং চুক্তি পালনের ইচ্ছাই যখন তাদের অন্তরে নেই, তখন তা কেমন করে পূর্ণ হবে।) আর তাদের অধিকাংশ অবাধ্য (এজন্য এরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চায় না। এক-আধটি রক্ষা করতে চাইলেও অধিকাংশের তুলনায় তা ধর্তব্য নয়, তাদের এই দুষ্ট প্রকৃতির কারণ হলো) (৯) তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর বিনিময়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভ তালাশ করে।) যেমন (কাফিরদের অবস্থা, এরা ধর্মের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় আর যখন দুনিয়াই এদের প্রিয়, তখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে পার্থিব উপকার পরিদৃষ্ট হলে, চুক্তিভঙ্গের সংকোচ আর থাকে না। পক্ষান্তরে দুনিয়ার উপর যারা ধর্মকে প্রাধান্য দেয়, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও প্রতিশ্রুতি পালন করে চলে) অতঃপর (ওরা দুনিয়াকে দীনের উপর প্রাধান্য দেয়ার ফলে) লোকদের নিবৃত্ত রাখে তাঁর (আল্লাহ্‌র) সরল পথ থেকে (প্রতিশ্রুতি রক্ষাও এর শামিল।) তারা যা করে চলছে, তা কতই না নিকৃষ্ট! (আর, তারা যে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না বললাম, তা শুধু তোমাদের বেলায় নয়; বরং তাদের চরিত্র হলো,) (১০) তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানদের ক্ষেত্রে(-ও) আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের, আর তারা (বিশেষত এ ক্ষেত্রে) অতিমাত্রায় সীমালংঘনকারী। (১১) অবশ্য (যখন তাদের প্রতিশ্রুতি ভরসাযোগ্য নয়; বরং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, যেমন সম্ভাবনা আছে প্রতিশ্রুতি রক্ষারও। তাই তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিধান দিচ্ছি যে) তারা যদি (কুফরী থেকে) তওবা করে (ইসলাম গ্রহণ করে,) এবং (কাজেকর্মে ইসলামকে প্রকাশ করে, যেমন) নামায

কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তা'হলে (তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ইত্যাদির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শিত হবে, তারা যাই করুক না কেন ? মোট কথা, ইসলাম গ্রহণের ফলে) তারা তোমাদের দীনি ভাই (এবং তাদের সকল অতীত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে), আর আমি বিধানসমূহ জ্ঞানী লোকদের (বলার) জন্যে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি (সুতরাং এখানেও তাই করা হলো)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কা বিজয়ের পর মক্কা ও তার আশপাশের সকল কাফির-মুশরিকের জানমালের সার্বিক নিরাপত্তা দানের বিষয়টি উল্লিখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোন চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভংগ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষার জন্য এ আয়াতসমূহে মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোন মেয়াদী চুক্তি হয়নি, তাদের প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, ত্বরিত মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে, তাদের চার মাসের দীর্ঘ সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা হয় আরামের সাথে যেতে পারে অথবা এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। আল্লাহ্‌র এ সকল আদেশের উদ্দেশ্য হলো, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তবে এ ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়; বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নেয়া হয়, সেহেতু তাদের সংশোধন ও মঙ্গল লাভের দরজা খোলা হয়। ষষ্ঠ আয়াতে একথারই প্রতিধ্বনি রয়েছে। যার সারবস্তু হলো, হে রাসূল, মুশরিকদের কেউ আপনার আশ্রয় নিতে চাইলে তাকে আশ্রয় দেয়া দরকার। এতে সে আপনার নিকটবর্তী হয়ে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে ও ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। তাকে শুধু সাময়িক আশ্রয় দেওয়া নয়, বরং যথার্থ নিরাপত্তার সাথে তাকে তার নিরাপত্তা স্থানে পৌঁছে দেয়াও মুসলমানদের কর্তব্য। আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয় যে, এ আদেশ এজন্য যে, এরা পূর্ণ জ্ঞান রাখে না, তাই আপনার পাশে থাকলে তারা অনেক কিছু জানতে পারবে।

ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (র) এ আয়াত থেকে কতিপয় মাসায়েল ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, যা এখানে তুলে ধরছি।

ইসলামের সত্যতার দলীল-প্রমাণ পেশ করা আলিমদের কর্তব্য ঃ প্রথমত, আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলীল তলব করে, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, কোন বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলী হাসিলের জন্য যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তফসীরে-কুরতুবীতে আছে ঃ এ হুকুম প্রযোজ্য হয়

তখন, যখন আল্লাহ্র কালাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশ্য হয়। ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য যদি আসতে চায়, তবে তা মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকদের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেওয়া যায় না ঃ তৃতীয়ত, বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেয়া যাবে না। কারণ এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান ও অবস্থানের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, حتى يسمع كلم الله অর্থাৎ এদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহ্র কালাম শুনতে পায়।

চতুর্থত, মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোন অমুসলমান প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি (ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যর্পণ করা।

সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত চার আয়াতে প্রথম আয়াতের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার কিছু কারণ দর্শানো হয়। এতে মুশরিকদের দুষ্ট প্রকৃতি এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে, তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশা বাতুলতা মাত্র। তবে মসজিদুল হারামের পাশে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় তাদের কথা ভিন্ন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ও রাসূলের দৃষ্টিতে ওদের অঙ্গীকার বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, যারা একটু সুযোগ পেলেই প্রতিশ্রুতি বা আত্মীয়তা কোনটিরই ধার ধারবে না। কারণ চুক্তি সই করলেও চুক্তি পালনের কোন ইচ্ছা তাদের অন্তরে নেই। তারা শুধু মুখের ভাষায় তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চায়। তাদের অধিকাংশই চুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক।

সদা ন্যায়ের উপর অবিচল এবং বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকার শিক্ষা ঃ কোরআন মজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, নগণ্য সংখ্যক মুশরিক ছাড়া বাকি সবাই চুক্তিভঙ্গ করেছে। সাধারণত এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোষ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যাগুরু অপরাধী দলের একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। কিন্তু কোরআন الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام। "তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ" বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি এবং আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভঙ্গ করো না; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশবশত এদের কষ্ট দেবে না। অষ্টম আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয় ঃ واكثرهم فاسقون "এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী" অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্রোচিত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। কোরআন মজীদ বিষয়টি অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে ঃ ولا يجرمنكم شنان قوم على

ان لاتعدلوا । "কোন জাতির শত্রুতা যেন বে-ইনসাফ হতে তোমাদের উদ্বুদ্ধ না করে।" (সূরা মায়িদাহ্)।

এরপর নবম আয়াতে বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের মর্মপীড়ার কারণ উল্লেখ করে তাদের উপদেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন বিচার-বিবেচনা করে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নেয়। তৎসঙ্গে মুসলমানদেরও হুঁশিয়ার করা হয় যে, এরা যে কারণে বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছে, সাবধান ! তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হলো দুনিয়াপ্রীতি। মূলত দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদের লালসা এদের অন্ধ করে রেখেছে। তাই এরা আল্লাহ্র আদেশাবলী ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাদের এ স্বভাব বড়ই পুঁতিগন্ধময়।

দশম আয়াতে এদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হয় ঃ لا يرقبون فى مؤمن الا ولاذمة এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুদ্র করে, তা নয়; বরং তারা যেকোন অমুসলমানের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে।

মুশরিকদের উপরোক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না। কোরআন যে আদর্শ ও ন্যায়-নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলমানদের হিদায়েত দেয় ঃ فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين তবে তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই।" এখানে বলা হয় যে, কাফিররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয়, তখন আল্লাহ্ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবি পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব লাভের তিন শর্ত ঃ এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম, কুফর ও শিরক থেকে তওবা। দ্বিতীয় নামায, তৃতীয় যাকাত। কারণ ঈমান ও তওবা হলো গোপন বিষয়। এর যথার্থতা সাধারণ মুসলমানের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তওবার দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়; নামায ও যাকাত।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ (রা) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত নামায ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গণ্য; তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফিকী যাই থাক না কেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্র ধারণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কিরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। (ইবনে কাসবীর)

একাদশ আয়াতের শেষ বাক্যে চুক্তিকারী ও তওবাকারী লোকদের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশাবলী পালনের তাগিদ দিয়ে বলা হয় ঃ ونفصل الايت لقوم يعلمون "আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।"

وَإِنْ نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ

دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ

لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ (১২) أَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ

وَهَمُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ج

فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (১৩) قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ

اللهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (১৪)

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (১৫)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا

مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۗ وَاللهُ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (১৬)

(১২) আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। (১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সংকল্প নিয়েছে রাসূলকে বহিষ্কারের ? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর ? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ্—যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৪) যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। (১৫) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ (যেমন তাদের অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয়) অঙ্গীকার করার পর এবং ঈমান না আনে; বরং কুফরী মতের উপর দৃঢ় থাকে। (যার ফলে) বিদ্রূপ (ও আপত্তি প্রকাশ) করে তোমাদের দীন (ইসলাম) সম্পর্কে, তবে (এমতাবস্থায়) তাদের কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করে। কারণ (এ অবস্থায়) তাদের কোন শপথ (বাকি) নেই। (এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কর) যাতে তারা (কুফরী থেকে) ফিরে আসে। (১৩) (এ পর্যন্ত তাদের চুক্তিভঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী করা হলো। পরবর্তী আয়াতে চুক্তিভঙ্গের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের উৎসাহ দিয়ে বলা হয়) তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না কেন, যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ (এবং বনূ বকর গোত্রের বিরুদ্ধে বনু খোযাআ গোত্রকে সাহায্য করেছে) আর সংকল্প নিয়েছে রাসূল (সা)-কে (দেশ থেকে বহিষ্কারের। আর এরাই প্রথমে তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে) অথচ তোমরা চুক্তি পালন করে চলছো আর তারা বসে বসে পাঁয়তারা আঁটছে। তাই তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না কেন ?) তোমরা কি তাদের (সাথে যুদ্ধ করতে) ভয় কর ? (যে এরা দলে ভারী ! যদি তাই হয়, তবে তাদের ভয় করার কিছু নেই। কেননা) তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ্, যদি তোমরা মু'মিন হও। (আল্লাহ্‌র ভয় যদি রাখ, তবে তাঁর বিরোধিতা করবে না। তিনি এক্ষণে তোমাদের প্রতি যুদ্ধের হুকুম দিচ্ছেন। তাই) যুদ্ধ কর তাদের সাথে আল্লাহ্ (প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে,) তোমাদের দ্বারা তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত (ও অপদস্থ) করবেন। তাদের উপর তোমাদের জয়ী করবেন এবং তাদেরকে শাস্তি ও তোমাদেরকে সাহায্য দানের দ্বারা (সেই) মুসলমানদের অন্তর শান্ত করবেন (১৫) ও তাদের মনের খুঁত দূর করবেন যাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই, কিন্তু অন্তর জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত আর আল্লাহ্ (সেই কাফিরদের থেকে) যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের তওফীক দেবেন। যেমন মক্কা বিজয়কালে এদের কেউ কেউ অস্ত্রধারণ করে এবং নিহত ও লাঞ্ছিত হয়, আর কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে) আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (নিজের জ্ঞান দ্বারা মানুষের পরিণতি কি ইসলাম, না কুফর তা'ও জানেন। সে জন্য নিজের প্রজ্ঞামতে অবস্থানুসারে বিধান প্রবর্তন করেন।) আর তোমরা (যারা যুদ্ধকে ভয় কর) কি মনে কর যে তোমাদের (এমনিতে) ছেড়ে দেওয়া হবে ? যতক্ষণ না আল্লাহ্ (প্রকাশ্যে) জেনে নেবেন, তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে (প্রকাশ্যে জানার মওকা হলো এমন যুদ্ধ, যে যুদ্ধে অংশ নিতে হয় আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে। তাই পরীক্ষা হয়ে যায় কে আল্লাহ্‌কে চায় এবং কে আত্মীয়-স্বজনকে চায়) আর আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (অতএব, তোমরা যুদ্ধে তৎপর হও বা অলস হয়ে বসে থাক, আল্লাহ্ সে অনুপাতেই তোমাদের বদলা দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ায় মক্কার যে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ স্থগিত রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার শুরুর আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তারা সন্ধিচুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। অতঃপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণসমূহ

বর্ণিত হয়। একাদশ আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামায ও যাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে যাওয়া ও তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল; তখন এদের সাথে মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। ইরশাদ হয় ঃ وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا ائمة الكفر অর্থাৎ "এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।"

فقاتلوهم লক্ষণীয় যে, এখানে আপাতদৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল, 'সেই কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর'। কিন্তু তা না বলে বলা হয় ঃ فقاتلوا ائمة الكفر 'সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।' তার কারণ, এরা চুক্তিভঙ্গের দ্বারা কুফরের ইমাম বা প্রধানে পরিণত হয়ে যুদ্ধের উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কতিপয় মুফাস্সির বলেন, এখানে কুফর-প্রধান বলতে বোঝায় মক্কার ঐ সকল কুরাইশ-প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ-প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষত এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ এজন্য দেওয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হলো এরা। তাছাড়া এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার ফলে এরা হয়ত প্রশ্রয় পেয়ে বসতো। (মাযহারী)

যিম্মীদের বিদ্রূপ অসহ্য ঃ وطعنوا فى دينكم "এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে" বাক্য থেকে কতিপয় আলিম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহবৃন্দের ঐকমত্যে আলোচ্য বিদ্রূপ হলো তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামী আইন কানুনের গবেষণার উদ্দেশ্যে কৃত সমালোচনা বিদ্রূপের শামিল নয় এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রূপ বলা যায় না। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম যিম্মীদের তত্ত্বগত সমালোচনার অনুমতি দেওয়া যায়, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুমতি দেয়া যায় না।

আয়াতের অপর বাক্য হলো ঃ انهم لا ايمان لهم অর্থাৎ 'এদের কোন শপথ নেই ; কারণ এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোন মূল্যমান নেই।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো ঃ لعلهم ينتهون 'যাতে তারা ফিরে আসে।' এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপর জাতির মত শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ-স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কদের মত নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।

অতঃপর ত্রয়োদশ আয়াতে মুসলমানদের জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলা হয়, তোমরা সেই জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না কেন, যারা তোমাদের নবীকে দেশান্তরিত করার পরিকল্পনা

নিয়েছে ? এরা হলো মদীনার ইহুদী অধিবাসী। এদের সদম্ভ ঘোষণা يخرجن الا عز منها الاذل "সম্মানী ও ক্ষমতাবান লোকেরা অবশ্যই মদীনা থেকে নীচু লোকদের বহিষ্কার করবে"। এদের দৃষ্টিতে সম্মানী লোক হলো তারা, আর নীচু ও দুর্বল লোক হলো মুসলমান। যার পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ্ তাদেরই দম্ভোক্তিকে অচিরে এভাবে সত্য করে দেখান যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা মদীনা থেকে ইহুদীদের সমূলে উৎখাত করেন। এতে দেখান হয় যে, সম্মানী ও শক্তিবান হলো মুসলমান এবং নীচু প্রকৃতির হলো ইহুদীরা।

وهم بدء وكم اول مرة 'তারাই প্রথমে বিবাদের সূত্রপাত করেছে' বাক্যে যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ বিবাদের সূত্রপাত যখন তারা করেছে, তখন তোমাদের কাজ হবে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তোলা। আর এটি সুস্থ বিবেকেরই দাবি।

এরপর মুসলমানদের অন্তর থেকে কাফিরদের ডর-ভয় দূর করার জন্য বলা হয়েছে ঃ اتخشونهم فالله احق ان تخشوه 'তোমরা কি তাদের ভয় কর ? অথচ, একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত।' যাঁর আযাব রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। পরিশেষে ان كنتم مؤمنين 'যদি তোমরা মু'মিন হও' বাক্য সংযোজন করে বলা হয় যে, শরীয়তের হুকুম তা'মিলে বাধা হয়—গায়রুল্লাহ্র এমন ভয় অন্তরে স্থান দেওয়া মুসলমানদের শান নয়।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ আয়াতে ভিন্ন কায়দায় মুসলমানদের প্রতি জিহাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এতে কতিপয় জানার বিষয় রয়েছে।

প্রথমত কাফিরদের সাথে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিলে আল্লাহ্র সাহায্য অবশ্যই এসে পড়বে, আর এই কাফির জাতি নিজেদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ্র আযাবের উপযুক্ত হয়ে রয়েছে। তবে পূর্ববর্তী উম্মতদের মত তাদের উপর আসমান বা যমীন থেকে আল্লাহ্র আযাব আসবে না; বরং يعذبهم الله بايديكم তোমাদের হস্তেই আল্লাহ্ তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের অন্তর থেকে সে সমুদয় চিন্তা-ক্লেশ দূর করবেন, যা কাফিরদের দ্বারা প্রতিনিয়ত পৌঁছাচ্ছিল।

তৃতীয়ত, কাফিরদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলমানদের মনে যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, আল্লাহ্ তা প্রশমিত করবেন তাদের দ্বারা শাস্তি দিয়ে।

পূর্ববর্তী আয়াতে لعلهم ينتهون যাতে তারা ফিরে আসে, বাক্য দ্বারা মুসলমানদের হিদায়েত করা হয় যে, নিছক প্রতিশোধের নেশার-উদ্দেশ্যে যেন কোন জাতির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়; বরং উদ্দেশ্য হবে তাদের আত্মশুদ্ধি ও সৎপথ প্রদর্শন। আর এ আয়াতে বলা হয় যে, মুসলমানেরা যদি নিজেদের নিয়তকে আল্লাহ্র জন্য শুদ্ধ করে নেয় এবং শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে যুদ্ধ করে, তবে আল্লাহ্ নিজগুণে তাদের ক্রোধ প্রশমনের কোন ব্যবস্থা করবেন।

চতুর্থত আয়াতে একটি বাক্য হলো, ويتوب الله على من يشاء "আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন।" অর্থাৎ তাদের তওবা কবূল করবেন। এ বাক্য জিহাদের আর একটি উপকার প্রতীয়মান হয়। তা'হলো শত্রুদলের অনেকের ইসলাম গ্রহণের তওফীক হবে এবং তারা মুসলমান হবে। তাই দেখা যায়, মক্কা বিজয়কালে সেখানে অনেক দুষ্ট কাফির লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে যেসকল অবস্থা ও ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী একের পর এক সকল ঘটনা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। সে জন্য এ আয়াতগুলো বহু মু'জিযাসম্বলিত রয়েছে, সন্দেহ নেই।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ شَـٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم
بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَـٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا
يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

(১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (১৮) নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আর আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্‌র মসজিদ (যার মধ্যে মসজিদুল হারাম অন্তর্ভুক্ত) আবাদ করার, যে অবস্থায় তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরী কার্যকলাপের স্বীকৃতি দিচ্ছে। (যেমন তারা নিজেদের মতাদর্শ প্রকাশকালে এমন আকায়েদ ব্যক্ত করে যা প্রকৃতপক্ষে কুফর। সার কথা, মসজিদ আবাদ করা নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ। কিন্তু শিরক এই উত্তম কাজের বিপরীত বিধায় তাদের মসজিদ আবাদ করার মত উত্তম কাজের যোগ্যতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সেজন্য তাদের এ কাজের কোনই মূল্য নেই, গর্ববোধের প্রশ্ন তো আসেই না) এদের (মুশরিকদের) আমল (মসজিদ নির্মাণ প্রভৃতি) বরবাদ (নিষ্ফল। কারণ কবুলিয়তের শর্ত অনুপস্থিত। তাই বেকার আমলের গর্ব বৃথা) এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (কেননা যে আমলগুলো নাজাতের উসিলা তা তো বরবাদই হয়ে গেল)। (১৮) নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো আবাদ করবে (এবং তাদের এ আমল কবূল হওয়ার যোগ্যতাও পূর্ণ রাখে যারা ঈমান এনেছে (অন্তরের সাথে) আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তা প্রকাশ করে। যেমন,) নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, আর (আল্লাহ্‌র প্রতি এমন ভরসা রাখে যে,) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব,

আশা করা (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়া) যায় তারা হিদায়েত (জান্নাত ও নাজাত) প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (যেহেতু তাদের আমল ঈমানের বরকতে কবূলযোগ্য, সেহেতু পরজীবনে এর উপকার পাবে। পক্ষান্তরে ঈমানের বরকত থেকে মুশরিকদের আমল শূন্য। তাই পরকালীন উপকার থেকে তারা বঞ্চিত। আর বেকার আমলের গর্ব হলো অসার।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজেদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মুকাবিলায় মুসলমানদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর উপরোক্ত আয়াতসমূহে জিহাদের তাগিদের সাথে রয়েছে এর তাৎপর্য। অর্থাৎ জিহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান সম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব এ পরীক্ষা জরুরী।

ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবি শুনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে ? অথচ আল্লাহ্ প্রকাশ্যে দেখতে চান কারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, আর কিছু দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ইতস্ততকারী, যারা মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অমুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুটি আলামতের উল্লেখ করা হয়।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুই আলামত ঃ প্রথম, শুধু আল্লাহ্‌র জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে। দ্বিতীয়, কোন অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয় ঃ والله خبير بما تعملون "আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" তাই তাঁর কাছে কোন হীলা-বাহানা চলবে না।

এ বিষয়টি কোরআনের অপর আয়াতে এরূপে ব্যক্ত হয় ঃ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون অর্থাৎ "লোকেরা কি মনে করে যে, ঈমানের দাবি করার পর কোন পরীক্ষায় নিপতিত করা ব্যতীত তাদের এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?"

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েয নয় ঃ ষষ্ঠদশ আয়াতে উল্লিখিত শব্দ وليجة-এর অর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে بطانة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কাপড়ের ঐ স্তর যা অন্যান্য কাপড়ের ভিতরে পেট বা শরীরের স্পর্শে থাকে। আয়াতটি হলো ঃ

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, মু'মিনদের ব্যতীত, আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত কর না, তারা তোমাদের ধ্বংসসাধনে কোন ত্রুটি বাকি রাখবে না।"

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে মসজিদুল-হারাম ও অন্যান্য মসজিদকে বাতিল উপাসনা থেকে পবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবূলযোগ্য তরীকায় ইবাদত করার পথনির্দেশ রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো ঃ

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে অবস্থিত মুশরিকদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে বাইরে নিক্ষেপ করেন। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে মসজিদুল হারাম তো পবিত্র, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও মুশরিকদের নিরাপত্তা বিধানে তারা এখনো বাতিল তরীকায় হারাম শরীফে তওয়াফ ও উপাসনা করে চলে।

অথচ প্রয়োজন হয়ে পড়ছে, যেরূপ মূর্তি থেকে হারাম শরীফকে পবিত্র করা হয়, সেরূপ মূর্তিপূজা ও অন্য সকল বাতিল উপাসনা থেকেও পবিত্র করা। এ উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশ বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু তা হতো সাধারণ ক্ষমার বরখেলাফ। যার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তাই ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হলো। তবে মক্কা বিজয়ের পরের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী (রা)-র দ্বারা মিনা ও আরাফাতের সমাবেশে ঘোষণা করান যে, ভবিষ্যতে হারাম শরীফে মুশরিকী তরীকায় কোন ইবাদত-উপাসনা এবং হজ্জ ও তওয়াফের অনুমতি থাকবে না। জাহিলী যুগে কা'বা শরীফে উলঙ্গ তওয়াফের যে ঘৃণ্য প্রথা চলে আসছে আগামীতে এর অনুমতি দেওয়া হবে না। হযরত আলী (রা) মিনার সমাবেশে নিম্নোক্ত ভাষায় ঘোষণাটি প্রচার করেন لا يحجن بعد العلم مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان অর্থাৎ "চলতি বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতে পারবে না।"

এক বছরের এই যে সময় দেওয়া হলো, তার কারণ, এদের মধ্যে আছে এমন অনেকে, যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি সাধিত হয় এবং পালন করেও চলছে। তাই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নতুন কোন আইন পালনে বাধ্য করা ইসলামী উদারনীতির খেলাফ। এজন্য এক বছর আগেই ঘোষণা করা হয় যে, হারাম শরীফকে মুশরিকী তরীকায় ইবাদত, উপাসনা ও আচার-প্রথা থেকে পবিত্র করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ এ ধরনের ইবাদত প্রকৃতপক্ষে ইবাদত নয় এবং এর দ্বারা মসজিদ আবাদ করা হলো বিরান করার নামান্তর।

মক্কার মুশরিকগণ শিরকী আচার-অনুষ্ঠানকে ইবাদত ও মসজিদুল হারামের হিফাযত ও আবাদ রাখার মাধ্যম মনে করত। আর এ জন্য তাদের গর্বেরও অন্ত ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, একমাত্র তারাই বায়তুল্লাহ্‌র ও মসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী ও হিফাযতকর্তা। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) বলেন, আমার পিতা আব্বাস যখন ইসলাম গ্রহণের আগে বদর যুদ্ধ চলাকালে বন্দী হন এবং মুসলমানরা তাঁর মত বুদ্ধিমান লোককে কুফর ও শিরকের উপর অবিচল থাকার জন্য বিদ্রূপ ও লজ্জা দান করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা শুধু আমাদের মন্দ দিকগুলো দেখ, ভালগুলো দেখ না। তোমাদের কি জানা নেই যে, আমরাই তো বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদুল হারামকে আবাদ রেখেছি এবং এর যাবতীয় ইন্তেযাম তথা হাজীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি রয়েছে আমাদের দায়িত্বে। তাই আমরাই এর মুতাওয়াল্লী। এ দাবির প্রেক্ষিত কোরআনের এই আয়াতগুলো নাযিল হয় ঃ ماكان للمشركين ان يعمروا مساجد الله অর্থাৎ "মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ত নয়।" কারণ মসজিদ নির্মিত হয় শুধু লা-শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য। কুফর ও শিরকের সাথে রয়েছে এ

উদ্দেশ্যের দ্বন্দ্ব। তাই এটা মসজিদ আবাদের উপকরণ হতে পারে না। মসজিদের তা'মীর বা আবাদ করার একাধিক অর্থ রয়েছে। প্রথম, গৃহ নির্মাণ। দ্বিতীয়, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা। তৃতীয়, ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিতি। 'ইমারত' থেকে উমরা শব্দের উৎপত্তি। উমরা পালনকালে 'বায়তুল্লাহ্'র যিয়ারত ও তথায় ইবাদতের জন্য উপস্থিত হতে হয়।

মক্কার মুশরিকরা এই তিন অর্থে নিজেদেরকে বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদুল হারামের আবাদকারী মনে করত এবং এতে তাদের গর্ব ছিল প্রচুর। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ দাবি নাকচ করে বলেন যে, কুফর ও শিরকের ওপর তাদের স্বীকৃতি ও সুদৃঢ় থাকার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার কোন অধিকার তাদের নেই বরং এ বিষয়ে তারা অনুপযুক্ত। এ কারণে তাদের আমলগুলো নিষ্ফল এবং তাদের স্থায়ী বসবাস হবে জাহান্নামে।

কুফর ও শিরকের স্বীকৃতি কথাটির এক অর্থ হলো, তারা শিরক ও কুফরী কার্যকলাপের দ্বারা তার স্বীকৃতি দিচ্ছে। অপর অর্থ হলো, কোন খৃস্টান বা ইহুদীর পরিচয় চাওয়া হলে তারা নিজেদের খৃস্টান বা ইহুদী বলে পরিচয় দেয়। অনুরূপ, অগ্নি উপাসক ও মূর্তিপূজকদের পরিচয় চাওয়া হলে নিজেদের কুফরী নামের দ্বারা পরিচয় প্রদান করে। এটিই হলো তাদের কুফর ও শিরকের স্বীকৃতি।—(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মসজিদ আবাদকরণে কাফিরদের অনুপযুক্ততা এবং দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের উপযুক্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। এর তফসীর হলো, মসজিদের প্রকৃত আবাদ তাদের দ্বারা সম্ভব, যারা আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে হুকুমে ইলাহীর অনুগত। যাদের পাকাপোক্ত বিশ্বাস রয়েছে আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি। যারা নিয়মিত নামাযের পাবন্দী করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ভয় অন্তরে স্থান দেয় না।

এখানে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও রোজ-কিয়ামতের উল্লেখ করা হলো মাত্র। রাসূলের উল্লেখ এ জন্য করা হলো না যে, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর আনীত শরীয়তের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস অসম্পূর্ণই থেকে যায়, ঈমান-বির-রাসূল, 'ঈমান-বিল্লাহ'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। একথা বোঝানোর জন্যই একদিন হুযূর (সা) সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন, বলতে পার, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অর্থ কি ? তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। হুযূর (সা) বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অর্থ হলো ,মানুষ অন্তরের সাথে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের আর কেউ যোগ্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, ঈমান-বির-রাসূল 'ঈমান-বিল্লাহ'-এ শামিল রয়েছে।—(মাযহারী)

"আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না" বাক্যের মর্ম হলো কারো ভয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন থেকে বিরত না থাকা। নতুবা, প্রত্যেক ভয়ঙ্কর বস্তুকে ভয় করা তো মানুষের স্বভাব। এজন্যই হিংস্র জন্তু, বিষাক্ত সর্প ও চোর-ডাকাত প্রভৃতিকে মানুষ ভয় করে। হযরত মূসা (আ)-এর সামনে যখন যাদুকরেরা রশিগুলোকে সর্পে পরিণত করে, তখন তিনিও ভীত হন। তাই কষ্টদায়ক বস্তুগুলোর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভয় উপরোক্ত কোরআনী আদেশের পরিপন্থী নয় এবং তা রিসালত বিরোধীও নয়। তবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে বিরত থাকা মু'মিনের শান নয়। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

কতিপয় মাসায়েল ঃ আয়াতে বলা হয় যে, মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা কাফিরদের নেই। অর্থ হলো, কাফিররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরও ব্যাপক অর্থে বলা যায়, কোন কাফিরকে কোন ইসলামী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা জায়েয নয়। তবে নির্মাণ কাজে অমুসলিমের সাহায্য নিতে দোষ নেই। (তফসীরে মুরাগী)

কোন অমুসলিম যদি সওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দেয় তবে কোন প্রকার দীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতি তার উপর আরোপ করা অথবা খোঁটা দেওয়ার আশংকা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েয রয়েছে। (শামী)

দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়, আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরোক্ত গুণাবলীসম্মত নেক্‌কার মুসলমানদের। এর থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হিফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকির বা দীনী ইলমের শিক্ষা দান কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা তার কামিল মু'মিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে তোমরা মসজিদে উপস্থিত হতে দেখ, তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ "আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো আবাদ করে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি..............।"

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে; নবীয়ে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তাঁর জন্যে জান্নাতের একটি মাকাম প্রস্তুত করেন।" হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হলো মেহমানের সম্মান করা।"—(মাযহারী, তাবরানী, ইবনে জারীর ও বায়হাকী শরীফ প্রভৃতি)।

কাযী সানাউল্লাহ পানীপথি (র) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ কারার শামিল। যেমন মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়, দুনিয়াবী কথাবার্তা, হারানো বস্তুর সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজে কবিতা পাঠ, ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হুল্লোড় প্রভৃতি মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাজ।—(মাযহারী)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ
وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَا
نَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

(১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র রাহে, এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ্ জালিম লোকদের হিদায়েত করেন না। (২০) যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে আর তারাই সফলকাম। (২১) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদিগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। (২২) তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে আছে মহা পুরস্কার। (২৩) হে ঈমানারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইয়ের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের (আমলের) সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র রাহে (তার সে আমল হলো ঈমান ও জিহাদ। এ দু'টি অন্য আমলের সমান হতে পারে না। তাই) এরা (যারা এ আমলের অধিকারী) আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়। (সারকথা, এক আমল অপর আমলের এবং এক আমলকারী অপর আমলকারীর সমান নয়। ঈমান ও জিহাদ এ দু'টির যে কোনটিই পানি সরবরাহ ও মসজিদ আবাদকরণ থেকে আফযল আমল। এ থেকে বোঝা যায় ঈমান এ দু'টি থেকে আফযল। এতে রয়েছে মুশরিকদের প্রশ্নের উত্তর। কারণ তাদের ঈমান নেই। আর জিহাদও যে উপরোক্ত দু'কাজ থেকে আফযল সে কথাও বোঝা গেল। তাই এতে রয়েছে সে সকল মু'মিনের প্রশ্নের উত্তর, যারা ঈমানের পর পানি সরবরাহ ও মসজিদ আবাদ করাকে জিহাদের চেয়ে আফযল মনে করত)। আর (উপরোক্ত

কথাটি স্বতন্ত্র। কিন্তু) আল্লাহ্ জালিম লোকদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) হিদায়েত করেন না। (ফলে তারা সত্য উপলব্ধি করে না। অথচ ঈমানদাররা অবিলম্বে তা মেনে নিয়েছে। সামনে উপরোক্ত দুই বিপরীত আমল সমান না হওয়ার আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ) যারা ঈমান এনেছে, (আল্লাহ্র জন্য) দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করেছে মাল ও জান দিয়ে, (পানি সরবরাহকারী ও মসজিদ আবাদকারী অপেক্ষা) তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে। (কারণ পানি সরবরাহকারী ও মসজিদ আবাদকারীরা যদি ঈমান-শূন্য হয়, তবে এ শ্রেষ্ঠত্ব দেশত্যাগী মু'মিন ও জিহাদকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে! আর যদি তারা ঈমানদার হয়, তবেও দেশত্যাগী মু'মিন যোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠত্ব সবার উর্ধ্বে থাকবে) আর এরাই সফলকাম (কেননা এদের প্রতিপক্ষ যদি ঈমানশূন্য হয়, তবে সফলতা এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর যদি ঈমানদার হয়, তবে উভয়কে সফলকাম অবশ্যি বলা যায়, কিন্তু এদের সফলতা সর্বোচ্চে। সামনে সফলতার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে,) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদিগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের (এমন বাগ-বাগিচার) যেখানে আছে তাদের জন্য স্বীয় শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে আছে মহা পুরস্কার (যা তাদের প্রদান করা হবে)। হে ঈমানদারগণ, তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা কুফরকে ঈমান অপেক্ষা (এমন) ভালবাসে (যে, তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা থাকে না)। আর তোমাদের যারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা সীমালংঘনকারী। (মোট কথা এসবের সম্পর্কই হলো হিজরতের সাথে। বস্তুত হিজরতের মাধ্যমে বড় বাধাই যখন নিষিদ্ধ হয়ে গেল তখন আর হিজরত কঠিন হতে পারে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা'হলো মক্কার অনেক কুরাইশ মুসলমানদের মুকাবিলায় গর্ব সহকারে বলত, মসজিদুল-হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর ওপর আর কারো কোন আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্বাস (রা) যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন, এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়রা তাঁকে বাতিল ধর্মের ওপর বহাল থাকায় বিদ্রূপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন ? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত (দেশত্যাগ)-কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে না। তফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

মাস্নাদে আব্দুর রাজ্জাকের রিওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমার যে ফযীলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ্ শরীফের চাবী আমার দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরেও রাত যাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস

বলেন, হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদুল হারামের শাসনক্ষমতা আমার নিয়ন্ত্রণে। হযরত আলী (রা) অতঃপর বলেন, বুঝতে পারি না এগুলোর ওপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হলো, আমি সবার থেকে ছয় মাস আগে বায়তুল্লাহ্র দিকে রুখ করে নামায আদায় করেছি এবং রাসূলুল্লাহ্র সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। তাতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোন আমল—তা যতই বড় হোক—আল্লাহ্র কাছে কোন মূল্য রাখে না। আর না শিরক অবস্থায় অনুরূপ আমলকারী আল্লাহ্র মকবুল বান্দায় পরিণত হতে পারবে।

মুসলিম শরীফে নুমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্ন রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুম'আর দিন তিনি কতিপয় সাহাবীর সাথে মসজিদে নববীতে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর মুকাবিলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত উমর ফারুক (রা) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্র মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুম'আর নামাযের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথামত প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ওপর জিহাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলত মুশরিকদেরও অহঙ্কার নিবারণ উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এসকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়।

সে যা হোক, উপরোক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হলো, শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবুলযোগ্য নয় এবং এর কোন মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোন মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মুকাবিলায় ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জিহাদে অগ্রগামী সে জিহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। এ পর্যন্ত ভূমিকার পর উল্লিখিত আয়াতের শব্দ ও অর্থের প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। ইরশাদ হয় ঃ

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে সেই লোকের (আমলের) সমান মনে কর যার ঈমান রয়েছে আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি এবং সে আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করেছে। এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়।"

পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা আয়াতের এ উদ্দেশ্য নির্ণয় করা যায় যে, ঈমান ও জিহাদ উভয়েই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি সরবরাহের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের

মাঝে মুশরিকের অসার দাবির খণ্ডন রয়েছে। আর জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা মুসলমানদের সেই ধারণার বিলোপ সাধন করা হচ্ছে, যাতে তারা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহকে জিহাদের চাইতেও পুণ্যকাজ মনে করত।

আল্লাহ্‌র যিকির জিহাদের চেয়ে পুণ্যকাজ ঃ তফসীর মাযহারীতে কাযী সানাউল্লা পানিপথী (র) বলেন, এ আয়াতে মসজিদ আবাদ করার ওপর জিহাদের যে ফযীলত রয়েছে তা তার যাহিরী অর্থানুসারে। অর্থাৎ মসজিদ আবাদ করার অর্থ যদি মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তবে তার চাইতে জিহাদের ফযীলত স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু মসজিদ আবাদ করার অর্থ যদি ইবাদত ও আল্লাহ্‌র যিকির উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনাগমন হয় আর এটিই হলো মসজিদের প্রকৃত আবাদকরণ, তবে রাসূলে করীম (সা)-এর স্পষ্ট হাদীসের আলোকে তা হবে জিহাদের চাইতেও আফযল, উত্তম কাজ। যেমন মাসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের এমন আমলের সন্ধান দেব, যা তোমাদের অন্যান্য আমল থেকে উত্তম, তোমাদের প্রভুর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, তোমাদের মর্যাদা সমুন্নতকারী এবং যা আল্লাহ্‌র রাহে সোনা-রূপা দান করার চাইতেও আফযল (উত্তম), এমন কি সেই জিহাদের চাইতেও আফযল, যেখানে তোমরা শত্রুর সাথে শক্ত মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবে এবং তোমরা তাদেরকে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তা অবশ্যই বলবেন। হযরত (সা) বলেন, তা হলো আল্লাহ্‌র যিকির। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, যিকিরের ফযীলত জিহাদের চাইতেও বেশি। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে মসজিদ আবাদের অর্থ যদি যিকরুল্লাহ নেওয়া হয় তবে তা জিহাদ থেকে আফযল হবে। কিন্তু এখানে মুশরিকদের গর্ব অহংকার যিকির ও ইবাদতের ভিত্তিতে ছিল না বরং তা ছিল রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে। তাই আয়াতে জিহাদকে অধিক ফযীলতের কাজ বলে অভিহিত করা হয়।

তবে কোরআন ও হাদীসের সম্মিলিত আদেশ-উপদেশের প্রতি দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয় যে, অবস্থার তারমত্যে আমলের ফযীলতেও তারতম্য ঘটে। এক অবস্থায় কোন বিশেষ আমল অপর আমলের চাইতে অধিক পুণ্যের হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে তা লঘু আমলে পরিণত হয়। যে অবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানের নিরাপত্তার জন্য আত্মরক্ষা যুদ্ধের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, সে অবস্থায় জিহাদ নিঃসন্দেহে সকল ইবাদত থেকে উত্তম। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূলে করীম (সা)-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিল। আর যখন যুদ্ধের এমন প্রয়োজন থাকে না তখন আল্লাহ্‌র যিকির হবে জিহাদের তুলনায় অধিক ফযীলতসম্পন্ন ইবাদত।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ "আর আল্লাহ্ জালিম লোকদের হিদায়েত করেন না।" অর্থাৎ ঈমান যে সকল আমলের মূল ও সকল ইবাদত থেকে আফযল এবং জিহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম, তা কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়; বরং একান্ত পরিষ্কার কথা। কিন্তু আল্লাহ জালিম লোকদের হিদায়েত ও উপলব্ধি-শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়।

বিংশতম আয়াতে তার ওপরের আয়াতে উল্লিখিত শব্দ لايستون 'সমান নয়'-এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়। ইরশাদ হয় ঃ الذين امنوا وهاجروا وجهدوا فى سبيل الله الاية "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম।" পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোন সফলতা আল্লাহ্ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানরা এ সফলতার অংশীদার কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদদের সফলতা সবার ঊর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হলো তারা।

২১তম ও ২২তম আয়াতে সেই সকল লোকের পুরস্কার ও পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হয় ঃ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنت الاية "তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার।"

উপরোক্ত আয়াতে হিজরত ও জিহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়। সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় জানাতে হয়। আর এটি হলো মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জিহাদের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। ইরশাদ হয় ঃ يايها الذين امنوا لاتتخذوا اباء كم واخوانكم الاية "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ কর না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমা লংঘনকারী।"

মাতা-পিতা-ভাই-ভগ্নি এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কোরআনের বহু আয়াতে রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক, তা মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নি ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। যেখানে এই দুই সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ উল্লিখিত পাঁচটি আয়াত থেকে আরও কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়। **প্রথমত** ঈমান হলো আমলের প্রাণ। ঈমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মত যা কবুলিয়তের অযোগ্য। আখিরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই। তবে আল্লাহ্ যেহেতু বে-ইনসাফ নন, সেহেতু কাফিরদের নিষ্প্রাণ নেক আমলগুলোকেও সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না; বরং দুনিয়ায় এর বিনিময়স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও অর্থ-সম্পদ দান করে হিসাব পরিষ্কার করে নেন। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ গোনাহ্ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। ঊনবিংশতম আয়াতের শেষ বাক্য ঃ ان الله لا يهدى القوم الظلمين "আল্লাহ্ জালিম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না" থেকে কথাটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয় ঃ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا "তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে তিনি ভালমন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।"

অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া পরহিযগারীর ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভালমন্দের পার্থক্যে ভুল করে না।

তৃতীয় ঃ নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হলো, আমলের আধিক্যের উপর ফযীলত নির্ভরশীল নয়, বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর তা নির্ভরশীল। সূরা মুলুকের শুরুতে আছে ঃ ليبلوكم ايكم احسن عملا "যাতে আল্লাহ্ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

চতুর্থ ঃ আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক। প্রথম, নিয়ামতের স্থায়িত্ব। দ্বিতীয়, নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দাদের জন্য আয়াতে এ দু'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। نعيم مقيم (স্থায়ী শান্তি) এতে আছে প্রথম বিষয়, আর خلدين فيها ابدا (তথায় চিরদিন বসবাস করবে) বাক্যে আছে দ্বিতীয় বিষয়।

পঞ্চম ঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা হলো, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরূপে সাহাবায়ে কিরাম যে অভিহিত তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কোরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বিলাল (রা), রোমের হযরত সোহাইব (রা), পারস্যের হযরত সালমান (রা), মক্কার কুরাইশ ও মদীনার আনসাররা গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় এই প্রমাণ বহন করে ঃ

هزار خويش كه بيگانه از خدا باشد - فدائے يك تن بيگانه كاشنا باشد اللهم ارزقنا اتباعهم واجعل حبك احب الاشياء الينا وخشيتك اخوف الاشياء عندنا -

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ
وَاَمْوَالُ ٰنِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ
تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ
فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

(২৪) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র; তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ কর—আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়ের তফসীর দেয়া হচ্ছে যে, হে মুহাম্মদ! তাদের) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের পরিবার, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসায়–যা বন্ধ হওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা (বসবাস করা) পছন্দ কর (যদি এ সকল বস্তু) আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান (হিজরত না করার শাস্তি) আসা পর্যন্ত (যেমন সূরা নিসা ৯৭ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়) ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ (الى قوله) فَاُولَئِكَ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

আর আল্লাহ্ তাঁর বিধান লংঘনকারীদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন না। এদের মনোবাঞ্ছা হলো উপরোক্ত সহায়-সম্পদ দ্বারা আরাম-আয়েশ লাভ। কিন্তু অতিসত্বর তাদের আশার বিপরীত মৃত্যু সবকিছু তছনছ করে দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা তওবার এ আয়াতটি নাযিল হয় মূলত তাদের ব্যাপারে যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করেনি। মাতাপিতা, ভাইবোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ সম্পদের মায়া হিজরতের ফরয আদায়ে বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (সা)-কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদের বলে দিন ঃ যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসায়, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ্ নাফরমানীদের কৃতকার্য করেন না।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থে যুদ্ধবিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। বাক্যের মর্ম হলো, যারা পার্থিব সম্পর্কের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর সব নাফরমানরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, তখন পার্থিব সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, এখানে বিধান অর্থ আল্লাহ্র আযাবের বিধান অর্থাৎ আখিরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত

রয়েছে, আল্লাহ্‌র আযাব অতি শীঘ্র তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। অন্যথায় আখিরাতের আযাব তো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারি উচ্চারণটি মূলত হিজরত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তদস্থলে উল্লেখ করা হয় জিহাদের—যা হলো হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেয়া হলো। এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জিহাদের আদেশ, এ আদেশ পালনে আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য সকল বস্তুর মায়া এমন কি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

এও হতে পারে যে, এখানে 'জিহাদ' বলে হিজরতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ হিজরত মূলত জিহাদেরই অন্যতম অংশ।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো ঃ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ "আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়েত করবেন না"। এতে বলা হয় যে, যারা হিজরতের আদেশ আসা সত্ত্বেও দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং অর্থ-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে, তাদের এ আচরণ দুনিয়াতেও কোন কাজ দেবে না এবং তারা আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তা পূরণ হওয়ার নয়; বরং জিহাদের দামামা বেজে ওঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আল্লাহ্‌র রীতি হলো তিনি নাফরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

হিজরতের মাসায়েল ঃ প্রথম, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ফরয হুকুম যখন আসে, তখন এ হুকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল না, বরং তা ছিল মুসলমান হওয়ার আলামতও। তাই যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে বিরত ছিল তাদের মুসলমান বলা যেত না। মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত হয়। তবে আদেশের মূল বক্তব্য এখনো বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহ্‌র আদেশ তথা নামায-রোযা প্রভৃতি পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সবসময়ের জন্য ফরয।

দ্বিতীয় ঃ গোনাহ্ ও পাপাচার যে দেশে প্রবল, সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সবসময়ের জন্য মুস্তাহাব। (বিস্তারিত অবগতির জন্য 'ফাত্হুলবারী' দ্রষ্টব্য)

উল্লিখিত আয়াতে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে দুনিয়াবী সম্পর্কের মোহে মোহিত হয়ে হিজরত করেনি। তবে আয়াতটির সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলমানের প্রতি এ আদেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না। ফলে যার ভালবাসা এ স্তরে নয়, সে আযাবের যোগ্য, তাকে আল্লাহ্‌র আযাবের অপেক্ষায় থাকা চাই।

পূর্ণতর ঈমানের পরিচয় ঃ এ জন্য বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান-সন্ততি ও ততক্ষণ অন্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।" আবূ দাঊদ ও তিরমিযী শরীফে আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ "রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহ্‌র

জন্য, শত্রুতা রেখেছে শুধু আল্লাহ্র জন্য, অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ্র জন্য, অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহ্র জন্য, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।"

হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভালবাসাকে অপরাপর ভালবাসার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ-রাসূলের হুকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ঈমান লাভের পূর্বশর্ত।

ইমামে তফসীর কাযী বায়যাবী (র) বলেন, অল্পসংখ্যক লোকই আয়াতে উল্লিখিত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কারণ অনেক বড় বড় আলিম ও পরহিযগার লোককেও স্ত্রীপরিজন এবং অর্থসম্পদের মোহে মত্ত দেখা যায়, তবে আল্লাহ্ যাদের হিফাযত করেন। কিন্তু কাযী বায়যাবী প্রসঙ্গত একথাও বলেন যে, এখানে ভালবাসা অর্থ অনিচ্ছাকৃত ভালবাসা উদ্দেশ্য নয়। কারণ আল্লাহ্ কোন মানুষকে তার শক্তি সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। তাই কারো অন্তরে যদি দুনিয়াবী সম্পর্কের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এ আকর্ষণ আল্লাহ্-রাসূলের ভালবাসাকে প্রভাবিত এবং বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত না করে, তবে তার এ দুনিয়াবী আকর্ষণ উপরোক্ত দণ্ডবিধির আওতায় আসে না। যেমন কোন অসুস্থ লোক ঔষধের তিক্ততা বা অস্ত্রোপচারকে ভয় করে, কিন্তু তার বিবেক একে শান্তি ও আরোগ্যের মাধ্যম মনে করে। এখানে যেমন তার অপারেশন-ভীতি স্বাভাবিক এবং এর জন্য কেউ তাকে তিরস্কারও করে না, তেমনি স্ত্রী-পরিজন ও অর্থসম্পদের মোহে কারো অন্তর যদি শরীয়তের কোন কোন হুকুম পালনে অনিচ্ছাকৃতরূপে ভার বোধ করে এবং এ সত্ত্বেও সে শরীয়তের হুকুম পালন করে চলে, তবে তার পক্ষে দুনিয়ার এ আকর্ষণ দূষণীয় নয়, বরং সে প্রশংসার পাত্র এবং তার আল্লাহ্-রাসূলের এ ভালবাসাকে এ আয়াত অনুসারে সবার উর্ধ্বে স্থান প্রাপ্তদের কাতারে শামিল রাখা হবে।

সন্দেহ নেই, ভালবাসার উন্নত স্তর হলো, স্বাভাবিক চাহিদার পরাজয় বরণ। যার ফলে প্রিয়জনের হুকুম তামিল তিক্ত বস্তুকেও মিষ্ট করে তোলে। যেমন, দুনিয়ার অস্থায়ী আরাম-আয়েশের অভিলাষীদের দেখা যায়, অসহ্য পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে স্বীকার করে নেয়। মাস শেষে কতিপয় রৌপ্য মুদ্রা লাভের আশায় চাকরিজীবীরা নিরন্তর পরিশ্রম থেকে আরম্ভ করে তোষামোদ ও উৎকোচ পর্যন্ত কোন্ কর্মটি বাদ রাখে ? এটি এজন্য যে, দুনিয়ার ভালবাসাকে সে সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে।

رنج راحت شدجو مطلب شدبزرگ
گرد گله توتیائے چشم گرگ

তেমনি আল্লাহ্, রাসূল ও আখিরাতের প্রেমে যাঁরা পাগল তাদেরও এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাঁরা ইবাদত-বন্দেগীতে কষ্টবোধ করার পরিবর্তে এক অবর্ণনীয় আস্বাদ লাভ করেন। তাই শরীয়তের যেকোন হুকুম পালনে তাঁদের কোন কষ্টবোধ হয় না। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "যার মধ্যে তিনটি লক্ষণ একত্র হয়, সে ঈমানের আস্বাদ পায়। তাহলো, ১, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে সকল বস্তু থেকে অধিক প্রিয় হয়। ২. সে কোন মানুষকে ভালবাসে শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে। ৩. কুফর ও শির্ক তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার মত মনে হয়।

হাদীসে উল্লিখিত ঈমানের আস্বাদ বলতে বোঝায়, ভালবাসার সেই স্তর, যেখানে পৌঁছে দুঃখ ও পরিশ্রমকে সুমিষ্ট মনে হয়। از محبت تلخها شیرین شود জনৈক আরবী কবি বলেন ঃ

واذ احلت الحلاوة قلبا - نشطت فى العبادة الاعضاء

—'যখন কোন অন্তর ঈমানের স্বাদ পায়, তখন অঙ্গগুলো ইবাদতের দ্বারা লজ্জিত বোধ করে।" আর একেই কোন কোন হাদীসে 'ইবাদতের প্রফুল্লতা' বলে অভিহিত করা হয়। হযরত (সা) একথাও বলেন, "আমার চোখের প্রশান্তি হলো নামাযের মাঝে।"

কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে বলেন, আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়া এক বিরাট নিয়ামত। কিন্তু এ নিয়ামত লাভ করা যায় আল্লাহ্র ওলীগণের সংসর্গে থেকে। এ জন্য সুফিয়ায়ে কিরাম তা হাসিলের জন্য মাশায়েখদের পদসেবাকে আবশ্যকীয় মনে করেন। তফসীরে 'রুহুল বয়ান' প্রণেতা বলেন 'বন্ধুত্বের এই মাকাম হাসিল হয় তাদের, যারা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর মত নিজের জানমাল ও সন্তানের কোরবানী দিয়েছে আল্লাহ্র পথে, তাঁরই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।'

কাযী বায়যাবী (র) স্বীয় তফসীরে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত ও শরীয়তের হিফাযত এবং এতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের প্রতিরোধও আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ
اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ
بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ
بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

(২৫) আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (২৬) তারপর আল্লাহ্ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা

দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদের এবং এটি হলো কাফিরদের কর্মফল। (২৭) এরপর আল্লাহ্ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(২৫) আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন (যুদ্ধের) অনেক ক্ষেত্রে (কাফিরদের বিরুদ্ধে। যেমন বদর যুদ্ধ প্রভৃতি) এবং হোনাইন (যুদ্ধে)-এর দিনেও (তোমাদের সাহায্য করেন যার কাহিনী বড় অদ্ভুত, চমকপ্রদ), যখন (এ অবস্থা হয় যে,) তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও (কাফিরদের বাণ নিক্ষেপের ফলে) তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর (পরিশেষে) তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে (২৬) তারপর আল্লাহ্ নাযিল করেন তাঁর পক্ষে থেকে সান্ত্বনা তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের (অন্তরগুলোর) প্রতি এবং (সাহায্যের জন্য) অবতীর্ণ করেন (আসমান থেকে) এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। এতে তোমাদের মনোবল ফিরে আসে এবং জয়ী হও)। আর (আল্লাহ্) শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদের (তারা নিহত ও বন্দী হয় এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করে)। আর এটি হলো কাফিরদের জন্য (দুনিয়ার) সাজা। (২৭) এরপর আল্লাহ্ (এ কাফিরদের মধ্য হতে) যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন তওবার তওফীক দেন (ফলে অনেকে মুসলমান হয়) আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (যে, যারা মুসলমান হয় তাদের সকল অতীত অপরাধ ক্ষমা করে জান্নাতের উপযুক্ত করে দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হুনাইন যুদ্ধের জয়-পরাজয় এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল এবং কিছু দরকারি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতিপূর্বের সূরায় মক্কা বিজয় ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির বিবরণ ছিল।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্র সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতিক্ষেত্রে মুসলমানেরা লাভ করে। বলা হয় ঃ لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة "আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে।" এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় 'হুনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ সে যুদ্ধে এমন সব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য আয়াতের শাব্দিক তফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত এ যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেওয়া সমীচীন মনে করি। এতে আয়াতের তফসীর অনুধাবন হবে সহজ এবং যে সকল হিতকর বিষয়ের উদ্দেশ্যে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয় তা সামনে এসে যাবে। এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তফসীরে মাযহারী থেকে নেয়া হয়েছে, যাতে হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'হুনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম, যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল তফাতে অবস্থিত। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কুরাইশরা অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজিন গোত্র—যার একটি শাখা তায়েফের বনু সাকীফ নামে পরিচিত, হৈ চৈ পড়ে যায়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশংকা প্রকাশ করতে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের শিকার হবো আমরা। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশ্যে হাওয়াজিন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত তার শাখা গোত্রগুলোকে একত্র করে। আর সে গোত্রের মুষ্টিমেয় শ'খানেক লোক ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়।

এখানে আন্দোলনের নেতা ছিলেন মালিক বিন আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা—বনু কাআব ও বনু কিলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। এজন্য তারা বলে "পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে একত্র হয়, তথাপি তিনি সকলের ওপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।"

যা হোক এই দুই গোত্র ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক বিন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং যার যার সহায়-সম্পত্তিও সাথে রাখবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। এ কৌশলের ফলে যেন কারো পক্ষে পলায়নের সুযোগ না থাকে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজর (র) চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার; আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা শরীফে অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আত্তাব বিন আসাদ (রা)-কে আমীর নিয়োগ করেন এবং মুআয বিন জাবাল (রা)-কে লোকদের ইসলামী তালিম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্রশস্ত্র ধার স্বরূপ সংগ্রহ করেন। কুরাইশের সরদার সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ্ এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? হযরত (সা) বলেন, না, না বরং ধার স্বরূপ নিচ্ছি, যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেব। একথা শুনে সে একশ লৌহবর্ম এবং নওফেল বিন হারিস তিন হাজার বর্শা তাঁর হাতে তুলে দেয়। ইমাম জুহরী (র)-র বর্ণনা মতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে হযরত (সা) এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার যাঁরা মক্কা

বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিলেন। বাকি দু'হাজার ছিলেন আশেপাশের অধিবাসী, যাঁরা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাঁদের বলা হতো 'তোলাকা'। ৬ই শাওয়াল শুক্রবার হযরতের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। হযরত (সা) বলেন, ইনশাআল্লাহ্, আগামী কাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনি কিনানা'র সে স্থানে, যেখানে মক্কার কুরাইশরা ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জিহাদ-উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও রণদৃশ্য উপভোগের জন্য বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা বিন উসমানও ছিলেন, তিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত শোনান। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রা)-র হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী (রা)-র হাতে মারা পড়েন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সুচনায় দেখা যায় মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে ; আমি এ সুযোগে ত্বরিতবেগে হযরত (সা)-এর কাছে পৌঁছি। কিন্তু দেখি যে ডানদিকে হযরত আব্বাস, বাম দিকে আবূ সুফিয়ান বিন হারিস হযরত (সা)-এর হিফাযতে আছেন। এজন্য পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছি এবং সংকল্প নিই যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁর আয়ু শেষ করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এস। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বক্ষের উপর রাখেন আর দুআ করেন, "হে আল্লাহ্! এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।" অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি ওঠাই, আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও হযরত (সা)-কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হযরত (সা)-এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও আমি প্রস্তুত। তাই কাফিরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে হযরত (সা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খিদমতে হাযির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধিকে প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে আর আমাকে হত্যার জন্যে আশেপাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎ কাজ করানো। পরিশেষে তাই হলো!

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নযর বিন হারেসের সাথে। তিনিও এ উদ্দেশ্যে হুনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে হযরত (সা)-এর ভালবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফিরদের মুকাবিলা করে চলেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবূ বুরদা বিন নায়ার (রা)-র সাথে। তিনি 'আউতাস' নামক স্থানে পৌঁছে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর পাশে অন্য একজন

লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত (সা) বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ। এবার বল, আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ্ আমার হিফাযতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। আবূ বুরদা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অনুমতি দিন, আল্লাহ্র এই শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। একে শত্রুদলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। হযরত (সা) বলেন, চুপ কর, আমার দীন অপরাপর দীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ্ আমার হিফাযত করে যাবেন। এই বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন। সে যা হোক, মুসলিম সেনাদল হুনাইন নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল বিন হান্যালা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রু দলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিত হাস্যে হযরত (সা) বললেন, চিন্তা করো না। ওদের সবকিছু গনীমতের মালামাল হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হাদ্দাদ (রা)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দা রূপে পাঠান। তিনি দু'দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধপ্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনানায়ক মালিক বিন আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, "মুহাম্মদ এখনো কোন সাহসী যুদ্ধবাজ জাতির পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মুকাবিলা। আমরা তার সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙে ফেলবে এবং সকলে এক সাথে আক্রমণ করবে।" বস্তুত এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুক্কায়িত রেখে দেয়।

এ হলো শত্রুদের রণ-প্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতিপূর্বের ওহুদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র তিন শ তেরজন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পরাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফির সেনা। তাই হুনাইনের বিরাট যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে 'হাকিম' ও 'বাজ্জার'-এর বর্ণনা মতে কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের আতিশয্যে এ দাবি করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই শত্রুদল পালাতে বাধ্য হবে।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র না-পছন্দ যে, কোন মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভরসা করে থাকুক। তাই মুসলমানদের আল্লাহ্ এ কথাটি বুঝিয়ে দিতে চান।

হাওয়াযিন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুক্কায়িত কাফির সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে

ফেলে। এ সময় আবার ধূলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে সাহাবীদের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হলো না। ফলে তাঁরা পালাতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অল্প সংখ্যক সাহাবী, যাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ, অন্য রিওয়ায়েত মতে একশ কিংবা তারও কম, যাঁরা হযরত (সা)-এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদের মনোবাঞ্ছা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্বাস (রা)-কে বলেন, উচ্চস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নিচে জিহাদের বায়াত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায় ? সূরা বাকারা-ওয়ালারা কোথায় ? জান কোরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসাররাই বা কোথায় ? সবাই ফিরে এসো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে আছেন।

হযরত আব্বাস (রা)-র এ আওয়াজ রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীরা ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ্ এদের সাহায্যে ফেরেশতা দল পাঠিয়ে দেন। এর পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, কাফির সেনানায়ক মালিক বিন আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দুর্গে আত্মগোপন করে। এর পর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তর জন কাফির নেতা মারা পড়ে। কতিপয় মুসলমানের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চব্বিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য।

আলোচ্য প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে যুদ্ধের এদিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে এল না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গল, তারপর তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফিরদের শাস্তি দিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলেন ঃ ثم انزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين "অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর" এ বাক্যের অর্থ হলো হুনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যেসব সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা আল্লাহ্র সান্ত্বনা লাভের পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণের অর্থ হলো, তাঁরা বিজয়কে খুব নিকটে দেখেছিলেন। এতে বোঝা গেল, আল্লাহ্র সান্ত্বনা ছিল দুই প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্য, অন্য প্রকার হযরত (সা)-এর সাথে যারা সুদৃঢ় রয়েছেন, তাঁদের জন্য। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্য 'উপর' শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন, "অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর।"

অতঃপর বলা হয় ঃ وانزل جنودا لم تروها "এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যদল, যাদের তোমরা দেখনি।" এটি হলো সাধারণ লোকদের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কতিপয় রিওয়ায়েতে যে বর্ণনা আছে, তা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হলো ঃ وعذب الذين كفروا وذالك جزاء الكفرين "আর শাস্তি দিলেন কাফিরদের এবং এটি হলো কাফিরদের পরিণাম।" এ শাস্তি বলতে বোঝায় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া, যা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো। আর এটি ছিল পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হলো। পরবর্তী আয়াতে আখিরাতের ব্যাপারে উল্লেখ হয় নিম্নরূপে ঃ

ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"অতঃপর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন। আল্লাহ্ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।" এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছুসংখ্যক লোককে আল্লাহ্ ঈমানের তওফীক দেবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হলো।

হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার মারা পড়ে; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দীরূপে এবং মালামাল গনীমত রূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। এর মধ্যে ছিল ছ'হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চল্লিশ হাজারেরও অধিক বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রূপা যা ওজনে চার মণের সমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ সুফিয়ান বিন হারবকে গনীমতের এসব মালামালের তত্ত্বাধায়ক নিয়োগ করেন।

অতঃপর পরাজিত হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলে করীম (সা) পনের-বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে থাকেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস আদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্য হিদায়েতের দোয়া করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জি'ইররানা নামক স্থানে পৌঁছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশ্যে দর্শকরূপে যুদ্ধ প্রাঙ্গণে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'ইররানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

এখানে মালে-গনীমত রূপে প্রাপ্ত শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঠিক ভাগ-বাটোয়ারার সময় হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দ সদস্যের এক প্রতিনিধি যোহাইর বিন ছরদের নেতৃত্বে হযরত (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে হযরত (সা)-এর দুধ সম্পর্কীয় চাচা আবূ ইয়ারকানও ছিলেন। তারা এসে বলেন —ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের অনুরোধ, আমাদের পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ আমাদের

ফিরিয়ে দিন। আমরা আবূ ইয়ারকান সূত্রে আপনার আত্মীয়ও হই। আমরা যে দুর্দশায় পতিত হয়েছি, তা আপনার অজানা নয়। আমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হোন। প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবি। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এমনি দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা রোমান বা ইরাক সম্রাটের কাছে কোন অনুরোধ পেশ করি, তবে আশা যে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ আপনার আদর্শ চরিত্রকে সবার উর্ধ্বে রেখেছেন। তাই আপনার কাছে আমরা বিশেষভাবে আশান্বিত।

রাহমাতুললিল আলামীনের জন্য এ অনুরোধ ছিল উভয় সঙ্কটের কারণ। তাঁর দয়া ও উদার নীতির দাবি ছিল ওদের সকল বন্দী ও মালামাল ফিরিয়ে দেওয়া। অপরদিকে শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের উপর রয়েছে মুজাহিদদের ন্যায্য দাবি। তাদের সে দাবি থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। তাই বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে হযরত (সা) যে জবাব দিয়েছিলেন তা হলো ঃ

"আমার সাথে আছে অসংখ্য মুসলিম সেনা, এরা এ সকল মালামালের দাবিদার। আমি সত্য ও স্পষ্ট কথা পছন্দ করি। তাই তোমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিচ্ছি দু'টির একটি। হয় বন্দীদের ফেরত নাও, নয়তো মালামাল নিয়ে যাও।" যে'টি চাইবে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। তারা বন্দী মুক্তি গ্রহণ করল। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল সাহাবীকে একত্র করে একটি খুৎবা পাঠ করেন। খুৎবায় আল্লাহ্র প্রশংসা করার পর বলেন ঃ

"তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে এখানে এসেছে। তাদের বন্দীদের মুক্তিদান সঙ্গত মনে করছি। তোমাদের যারা সন্তুষ্ট মনে নিজেদের অংশ ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হতে পার, তারা যেন এদের প্রতি দয়াবান হয়। আর যারা প্রস্তুত হতে না পার, ভবিষ্যতের 'মালে ফাই' থেকে তাদের উপযুক্ত বদলা দেব।"

হযরত (সা)-এর এ খুতবার পর সর্বস্তর থেকে আওয়াজ আসে ঃ 'বন্দী প্রত্যর্পণে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে রাযী।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ন্যায়নীতি ও পরের হকের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যক আছে বিধায় সমস্বরে তাদের এ সন্তুষ্টি প্রকাশকে যথেষ্ট মনে করলেন না। তাই বলেন, আমি বুঝতে পারছি না তোমাদের কে সন্তুষ্টচিত্তে নিজের প্রাপ্য ত্যাগ করতে রাযী হয়েছ, কে লজ্জার খাতিরে নীরব রয়েছ। এটি মানুষের পারস্পরিক হক। সুতরাং প্রত্যেক গোত্র ও দলের সরদারগণ আপন লোকদের সঠিক রায় নিয়ে আমাকে যেন অবহিত করে।

সেমতে তারা নিজ লোকদের ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে হযরত (সা)-কে জানান যে, প্রত্যেকে নিজেদের অধিকার ছাড়তে রাযী আছে। একথা জানার পরই রাসূলুল্লাহ (সা) হুনাইন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান করেন।

এই লোকদের কথাই আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ

অর্থাৎ এরপর আল্লাহ্ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন। হুনাইন যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো, তার কিছু অংশ কোরআন থেকে এবং বাকি অংশ নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে।—(মাযহারী, ইবনে কাসীর)

আহ্কাম ও মাসায়েল

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় বিভিন্ন আহ্কাম ও মাসায়েল এবং প্রাসঙ্গিক কিছু জরুরী বিষয়। মূলত এগুলোর বর্ণনার জন্য ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হলো।

আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্য ঃ উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রথম হিদায়েত হলো মুসলমানদের কোন অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি আল্লাহ্র সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তেমন সকল শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে।

হুনাইন যুদ্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ও মুসলিম সেনাদের সংখ্যাধিক্য দেখে কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, তা আল্লাহ্র নিকট তাঁর প্রিয় বান্দাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফিরদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁরা পলায়নপর হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্র গায়েবী সাহায্য পেয়ে তাঁরা এ যুদ্ধে জয়ী হন।

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণে ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেওয়া ঃ দ্বিতীয় হিদায়েত যা এই ঘটনা থেকে হয়, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে মক্কার বিজিত কাফিরদের থেকে যে যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ এবং প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। অথচ এরা ছিল বিজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই জোর করেও সমর্থন আদায় করা যেত। কিন্তু হযরত (সা) তা করেন নি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ সদ্ব্যবহারের হিদায়েত।

তৃতীয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনাইন গমনকালে 'খাইফে বনী কেনানা' নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের সেখানে, যেখানে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের একঘরে করে রাখার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হিদায়েত আছে, তাহলো, আল্লাহ্ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের কথা যেন ভুলে না যায় এবং যাতে আল্লাহ্র শোকর আদায় করে। দুর্গে আশ্রয় নেওয়া হাওয়াযিন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদ-দু'আর পরিবর্তে হিদায়েত লাভের যে দু'আ হযরত (সা) করেছেন–তাতে রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য শত্রুকে পরাভূত করা নয় ; বরং উদ্দেশ্য হলো হিদায়েতের পথে তাদের নিয়ে আসা। তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থ ঃ পরাজিত শত্রুদের থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ ইসলাম ও ঈমানের হিদায়েত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছিলেন।

হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধবন্দী মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা আনন্দের সাথে রাযীও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। লজ্জা বা জনগণের চাপে

কেউ নীরব থাকলে তা সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। আমাদের মাননীয় ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদরা এ থেকে এই মাস'আলা বের করেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনের চাঁদা আদায় করাও জায়েয নয়। কারণ অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে অনেক ভদ্রলোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে, অথচ অন্তর এতে পূর্ণ সায় দেয় না। এ ধরনের অর্থকড়ির বরকতও পাওয়া যায় না।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

(২৮) "হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ্ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো (কদর্য আকীদার ফলে) অপবিত্র, সুতরাং (এই অপবিত্রতার প্রেক্ষিতে তাদের জন্য যে হুকুম-আহকাম তার একটি হলো) এ বছরের পর তারা যেমন মসজিদুল হারামের (অর্থাৎ হেরেম শরীফের) নিকট (ও) না আসে (অর্থাৎ হেরেম শরীফের ত্রি-সীমানায় যেন ঢুকতে না পারে)। আর যদি তোমরা (এ আদেশ বলবত হওয়ার ফলে) দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর (অর্থাৎ কায়-কারবার প্রায় এদের হাতে, এরা চলে গেলে কিরূপে চলা যাবে—যদি এরূপ মনে কর) তবে (ভরসা রাখ আল্লাহ্র উপর) আল্লাহ্ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ (স্বীয় আহকামের রহস্য সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ, (এ সকল এবং রহস্যের পূর্ণতা বিধানে) প্রজ্ঞাময় (তাই এই আদেশ জারি করলেন) এবং তিনি তোমাদের আযাব মোচনের ব্যবস্থাও করে দেবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা বরাআতের শুরুতে কাফির মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়। আলোচ্য আয়াতে সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের উল্লেখ করা হয়। সম্পর্কচ্ছেদের সারকথা ছিল বছরকালের মধ্যে কাফিরদের সাথে কৃত চুক্তিসমূহ বাতিল বা পূর্ণ করে দেওয়া হোক এবং এ ঘোষণার এক বছর পর কোন মুশরিক যেন হেরেমের সীমানায় না থাকে।

আলোচ্য আয়াতে এক বিশেষ কায়দায় বিষয়টির বিবরণ দেওয়া হয়। এতে রয়েছে উপরোক্ত আদেশের হিকমত ও রহস্য এবং তজ্জনিত কতিপয় মুসলমানের অহেতুক আশঙ্কার জবাব।

আয়াতে উল্লিখিত نجس (নাজাস) শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ব্যাপক অর্থে পঙ্কিলতা যার প্রতি মানুষের ঘৃণাবোধ থাকে। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র) বলেন, 'নাজাস' বলতে চোখ, নাক ও হাত দ্বারা অনুভূত বস্তুসমূহের যেমন, তেমনি জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা অনুভূত বস্তুসমূহেরও অপবিত্রতা বোঝানো হয়। তাই 'নাজাস' বলতে দৃশ্যমান ঘৃণিত বস্তুকেও বোঝায় এবং অদৃশ্য অপবিত্রতা যার ফলে শরীয়তে ওযু বা গোসল ওয়াজিব হয় তাও বোঝায়। যেমন জানাবত, হায়েয, নেফাস পরবর্তী অবস্থা এবং ঐ সকল বাতিনী নাজাসত যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে রয়েছে যেমন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মন্দ ঘৃণিত স্বভাব।

উল্লিখিত আয়াতের শুরুতে انما শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা حصر বা কোন বস্তুর সার্বিক মর্মকে সীমিত করা হয়। তাই انما المشركون نجس-এর মর্ম হবে মুশরিকরা সঠিক অর্থেই অপবিত্র। কারণ এদের মধ্যে সাধারণত তিন ধরনের অপবিত্রতা থাকে। তারা অনেকগুলো দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তুকেও অপবিত্র মনে করে না। যেমন মদ ও মাদক দ্রব্যাদি। আর অদৃশ্য অপবিত্রতা কিছু আছে বলে তারা বিশ্বাসও করে না। যেমন স্ত্রীসঙ্গম ও হায়েয-নেফাস পরবর্তী অবস্থা। সে জন্য এ সকল অবস্থায় তারা গোসলকে আবশ্যক মনে করে না। অনুরূপ ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মন্দ স্বভাবগুলোকে তারা দূষণীয় মনে করে না।

তাই আয়াতে মুশরিকদের প্রকৃত খাঁটি অপবিত্র রূপে চিহ্নিত করে আদেশ দেওয়া হয় ঃ فلا يقربوا المسجد الحرام সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।

'মসজিদুল হারাম' বলতে সাধারণত বোঝায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকের আঙিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কোরআন ও হাদীসের কোন কোন স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হেরেম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা কয়েক বর্গমাইল এলাকা ব্যাপী, যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আ), যেমন মি'রাজের ঘটনায় মসজিদুল হারাম উল্লেখ রয়েছে। ইমামদের ঐকমত্যে এখানে মসজিদুল হারাম অর্থ বায়তুল্লাহ্র আঙিনা নয়। কারণ মি'রাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রা)-র গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহ্র আঙিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সূরা তওবার শুরুতে যে মসজিদুল হারাম-এর উল্লেখ রয়েছে ঃ الذين عهدتم عند المسجد الحرام। তার অর্থও পূর্ণ হারাম শরীফ। কারণ এখানে উল্লিখিত সন্ধির স্থান হলো 'হুদায়বিয়া' যা হারাম শরীফের সীমানার বাইরে এর সন্নিকটে অবস্থিত—(জাস্সাস)। এ বছরের পর মুশরিকদের জন্য পূর্ণ হেরেম শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো।

তবে এ বছর বলতে কোনটি বোঝায় তা নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরী। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তা হলো নবম হিজরী। কারণ নবী করীম (সা) নবম হিজরীর হজ্জের মৌসুমে হযরত আলী ও আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-র দ্বারা কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম হিজরী থেকে দশম হিজরী পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরীর পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

কতিপয় প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরীর পর মসজিদুল হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিনটি প্রশ্ন আসে। প্রথম, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল হারামের জন্য, না অন্যান্য মসজিদের জন্যও ? দ্বিতীয় মসজিদুল হারামের জন্য হয়ে থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্য, না শুধু হজ্জ ও ওমরার জন্য ? তৃতীয়, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্য, না আহলে-কিতাব কাফিরদের জন্যও ?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কোরআন নীরব, তাই ইজতিহাদকারী ইমামগণ কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত ও হযরত (সা)-এর হাদীস সামনে রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করতে হয়, কোরআন মজীদ মুশরিকদের যে অপবিত্র ঘোষণা করেছে, তা কোন দৃষ্টিতে? যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রতা হেতু বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। কারণ দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরয হয়েছে এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়। পক্ষান্তরে কথাটি যদি কুফর-শিরকের বাতিনী অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে সম্ভবত এর হুকুম হবে ভিন্ন।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ মদীনার ফিকাহ্শাস্ত্রবিদরা তথা ইমাম মালিক (র) ও অন্য ইমামদের মতে মুশরিকরা যেকোন দৃষ্টিকোণে অপবিত্র। কারণ তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তেমনি জানাবতের গোসলেরও ধার ধারে না। তদুপরি কুফর-শিরকের বাতেনী অপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক এবং সকল মসজিদের জন্যই হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

এ মতের সমর্থনে তাঁরা হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ (র)-র একটি ফরমানকে দলীলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকদের লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, "মসজিদসমূহে কাফিরদের প্রবেশ করতে দেবে না।" এ ফরমানে তিনি উপরোক্ত আয়াতটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় দলীল হলো নবী করীম (সা)-এর এই হাদীস ঃ

"কোন ঋতুবতী মহিলা বা জানাবত যার জন্য গোসল ফরয হয়েছে, তার পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েয মনে করি না।" আর এ কথা সত্য যে, কাফির মুশরিকরা জানাবতের গোসল সাধারণত করে না। তাই তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, হুকুমটি কাফির-মুশরিক এবং আহলে-কিতাব সকলের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল হারামের জন্য নির্দিষ্ট। অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশাদি নিষিদ্ধ নয়।—ইমাম শাফিয়ী (র)-র দলীল হলো সুমামা বিন উসালের ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে এক স্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে নবী করীম (সা) তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে, উপরোক্ত আয়াতে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য মুশরিকদের প্রতি যে আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হলো, আগামী বছর থেকে মুশরিকদের স্বীয় রীতি অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর দলীল হলো, হজ্জের যে মৌসুমে হযরত আলী (রা)-র দ্বারা কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা

ঘোষণা করা হয় তাতে এ কথা ছিল ঃ لا يحجن بعد العام مشرك 'অর্থাৎ এ বছর পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না।' তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াত فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ 'মুশরিকগণ মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হবে না।'-এর অর্থ হবে আগামী বছর থেকে মুশরিকদের জন্য হজ্জ ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র) অতঃপর বলেন, হজ্জ ও ওমরা ছাড়া মুশরিকরা অন্য কোন প্রয়োজনে আমীরুল মু'মিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ মতের সমর্থনে তাঁর দলীল হলো, মক্কা বিজয়ের পর সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হলে মসজিদে তাদের অবস্থান করানো হয়। অথচ এরা তখনও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে কিরামও আপত্তি তুলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা তো অপবিত্র। হযরত (সা) তখন বলেছিলেন, "মসজিদের মাটি এদের অপবিত্রতায় প্রভাবিত হবে না।"—(জাসসাস)

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয় যে, কোরআন মজীদে মুশরিকদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে তা তাদের কুফর ও শিরকজনিত বাতিনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এ মতেরই অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "কোন মুশরিক মসজিদের নিকটবর্তী হবে না।" তবে সে কোন মুসলমান দাস বা দাসী হলে প্রয়োজনবোধে প্রবেশ করতে পারে। —(কুরতুবী)

এ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে মসজিদুল হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না, বরং আসল কারণ হলো কুফর ও শিরক এবং এ দুয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির আশঙ্কা। এ আশংকা দাস-দাসীর মধ্যে না থাকায় তাদের অনুমতি দেওয়া হলো। এছাড়া প্রকাশ্য অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে কাফির-মুশরিক–মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানরাও মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে না!

তদুপরি অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এখানে মসজিদুল হারাম বলতে যখন পূর্ণ হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য, তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে না হয়ে কুফর-শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে হওয়া অধিকতর সঙ্গত। এজন্য শুধু মসজিদুল হারামের নয় বরং পূর্ণ হেরেম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ এটি হলো ইসলামের দুর্গ। কোন অমুসলিম থাকতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-র উপরোক্ত তত্ত্বের সারকথা হলো, কোরআন ও হাদীস মতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক এবং এটি জরুরী বিষয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদি হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বরাআতের শুরুতে। অর্থাৎ অচিরেই হেরেম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। কিন্তু আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই তাদের হেরেম শরীফ ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন করে

যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এবং অন্যদের কিছুদিনের সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এই আদেশ কার্যকরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, "এ বছরের পর—পূর্ণ হেরেম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না।" তারা শিরকী প্রথামত হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তওবার আয়াতে যেমন পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয় যে, নবম হিজরীর পর কোন মুশরিক হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না, রাসূলে করীম (সা) এ আদেশকে আরও ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোন কাফির-মুশরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু হযরত (সা) নিজে এ আদেশ কার্যকর করতে পারেন নি। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে হযরত উমর ফারূক (রা)-র শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন।

বাকি থাকলো কাফিরদের অপবিত্রতা এবং মসজিদগুলোকে নাপাকী থেকে পবিত্র করার মাস'আলা। এ সম্পর্কে ফিকাহ্ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, কোন মুসলমান প্রকাশ্য নাপাকী নিয়ে এবং গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কোন মসজিদ প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যদিকে কাফির-মুশরিক হোক বা আহলে-কিতাব, তারাও সাধারণত উল্লিখিত নাপাকী থেকে পবিত্র নয়, তাই বিশেষ প্রয়োজন না হলে তাদের জন্যও কোন মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়।

উক্ত আয়াত মতে, হেরেম শরীফে কাফির-মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলমানদের জন্য এক নতুন অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হলো। কারণ মক্কা হলো অনুর্বর জায়গা। খাদ্যশস্যের উৎপাদন এখানে হয় না। বহিরাগত লোকেরা এখানে খাদ্যের চালান নিয়ে আসতো। এভাবে হজ্জের মৌসুমে মক্কাবাসীদের জন্য জীবিকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় হয়ে যেত। কিন্তু হেরেম শরীফে ওদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলে পূর্বাবস্থা আর বাকি থাকবে না, এ প্রশ্নের উত্তর আয়াতের এ বাক্যে আল্লাহ্ সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً الخ অর্থাৎ "তোমরা যদি অভাব-অনটনের ভয় কর তবে মনে রেখ যে, রিযিকের সকল ব্যবস্থা আল্লাহ্র হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে কাফিরদের থেকে তোমাদের বেনিয়াজ করে দেবেন।" "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে" বাক্য দ্বারা সন্দেহের উদ্রেক করা উদ্দেশ্য নয়। বরং বাক্যটি এ কথার ইঙ্গিতবহ যে, পার্থিব উপায়-উপকরণের প্রতি যাদের দৃষ্টি, তারা যদিও মনে করবে যে, কাফিরদের হরম শরীফে আসতে না দেওয়ার ফলে আর্থিক সঙ্কট অনিবার্য, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উপকরণের মুহতাজ নন; বরং বিলম্ব তাঁর ইচ্ছার। তিনি ইচ্ছা করলেই সবকিছু অনায়াসে হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের অভাব দূর করে দেবেন।"

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ

الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ
صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى
الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

(২৯) "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। (৩০) ইহুদীরা বলে 'ওযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র।" এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফিরদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন্ উল্টাপথে চলে যাচ্ছে।"

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(২৯) তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে (পরিপূর্ণ) ঈমান রাখে না। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা) যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম মনে করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম (ইসলাম), যতক্ষণ না করজোড়ে তারা (অধীন ও প্রজা রূপে) জিযিয়া প্রদান করে। (৩০) আর ইহুদী (-দের কেহ কেহ) বলে (নাউযুবিল্লাহ) ওযাইর (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃস্টান (-দের অনেক) বলে মসীহ (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা (যার সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই) এরা পূর্ববর্তী কাফিরদের মত কথা বলে (ওরা হলো আরবের মুশরিক সম্প্রদায়। ওরা ফেরেশতাদের আল্লাহ্‌র কন্যারূপে অভিহিত করে। সে জন্য ইহুদী খৃস্টানেরাও ওদের কাফির বলে। অথচ তারাও সেই কুফরী উক্তির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। 'পূববর্তী কাফির' বলা এজন্য যে, মুশরিকরা গোমরাহীর অতি প্রাচীন স্তরের ছিল) আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন্ উল্টা পথে চলে যাচ্ছে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কত জঘন্য মিথ্যার বেশাতি চালিয়ে যাচ্ছে। এ হলো তাদের কুফরী বাক্যসমূহ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের পূর্ব আয়াতে মক্কার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতদ্বয়ে আহ্‌লে-কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহ্‌লে-কিতাবের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ-অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দু'টি তারই পটভূমি। তফসীরে

দুররে মনসূরে' মুফাস্‌সিরে কোরআন হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াত দু'টি তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল।

আভিধানিক অর্থে 'আহ্‌লে-কিতাব' বলতে যদিও সেই কাফির দলসমূহকে বোঝায়, যারা কোন-না-কোন আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী; কিন্তু কোরআনের পরিভাষায় আহ্‌লে-কিতাব বলতে বোঝায় শুধু ইহুদী ও খৃস্টানদের। কারণ আরবের আশেপাশে এই দু'সম্প্রদায়ই আহ্‌লে-কিতাব নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এজন্যে কোরআনে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হয়ঃ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ অর্থাৎ তোমরা হয়ত বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল, আর আমরা তো গঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম—(আন'আম ঃ ১৫৬)।

আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করে অত্র আয়াতদ্বয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহ্‌লে-কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফির সম্প্রদায়ের জন্যেই। কারণ যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা' সকল কাফিরের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ-উদ্দেশ্যে যে, ইহুদী-খৃস্টানেরা অন্তত তাওরাত-ইঞ্জিল এবং হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর প্রতি তো ঈমান রাখে। অতএব পূর্বের আম্বিয়া (আ) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জিহাদী মনোভাবের জন্য বাধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এক দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে আছে তাওরাত-ইঞ্জিলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জিলের রয়েছে রাসূলে করীম (সা) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এ সত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

প্রথম আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে। প্রথমত لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ—তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে না। দ্বিতীয়ত ঃ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ—রোজ হাশরের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। তৃতীয়তঃ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ—আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না। চতুর্থত ঃ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ সত্য ধর্ম গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক।

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইহুদী খৃস্টানেরা তো বাহ্যত আল্লাহ্, পরকাল ও রোজ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান বিশ্বাস আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোন মূল্য নেই। ইহুদী খৃস্টানেরা যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইহুদী কর্তৃক হযরত ওযাইর ও খৃস্টান কর্তৃক হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করে প্রকারান্তরে শিরক তথা অংশীবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবি হলো অসার।

অনুরূপ, আখিরাতের প্রতি যে ঈমান বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা আহ্‌লে-কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হলো, রোজ কিয়ামতে মানুষ জড়দেহ নিয়ে উঠবে না;

বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হলো জান্নাত আর অশান্তি হলো জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কোরআনের পেশকৃত ধ্যান-ধারণার বরখেল্যাফ। সুতরাং আখিরাতের প্রতি ঈমানও তাদের যথাযোগ্য নয়।

তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইহুদী-খৃস্টানেরা আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হলো ঃ তাওরাত ও ইঞ্জিলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য যা তাওরাত ও ইঞ্জিলে হারাম ছিল কিন্তু তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না।

এ থেকে একটি মাস'আলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা' নয় বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী। তবে হারামকে হারাম মনে করে কেউ যদি ভুলে অসতর্ক পদক্ষেপ নেয়, তবে তা কুফরী নয়, বরং তা গুনাহ্ ও ফাসিকী।

আয়াতে উল্লিখিত حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ 'যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে' বাক্য দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তাঁবেদার প্রজারূপে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

'জিযিয়া'র শাব্দিক অর্থ, 'বিনিময়' পুরস্কার। শরীয়তের পরিভাষায় জিযিয়া বলা হয় কাফিরদের প্রাণের বিনিময় গৃহীত অর্থকে।

জিযিয়ার তাৎপর্য ঃ কুফর ও শিরক হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ্ নিজের অসীম রহমতগুণে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে নিয়ে থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিযিয়া কর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করবে স্বয়ং সরকার। অন্যদিকে তারা নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শরীয়তের পরিভাষায় এ হলো জিযিয়া কর।

দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে জিযিয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিযিয়া নেয়া হবে। যেমন, নাজরান গোত্রের সাথে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্য ধার্য হয় এক উকিয়া রূপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহাম হয় এক উকিয়া, যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ।

অনুরূপ তাগ্‌লিব গোত্রীয় খৃস্টানদের সাথে হযরত উমর (রা)-র চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নিসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিযিয়া কর প্রদান করবে।

মুসলমানরা যদি কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসীদের তাদের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখে এবং তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত

নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিযিয়ার হার হবে যা হযরত উমর ফারূক (রা) আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলেন। তাহলো, উচ্চ বিত্তের জন্য চার দিরহাম, মধ্যবিত্তের জন্য দু'দিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্ন বিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম। অর্থাৎ সাড়ে তিন মাশা রূপা অথবা তার সমমূল্যের অর্থ। গরীব-দুঃখী, বিকলাঙ্গ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মযাজকদের এই জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জিযিয়া আদায়ের বেলায় রাসূলে করীম (সা)-এর তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি যেন করা না হয়। হযরত (সা) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর জুলুম চালাবে রোজ হাশরে আমি জালিমের বিরুদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব।'—(মাযহারী)

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম এ মত পোষণ করেন যে, শরীয়ত জিযিয়ার বিশেষ কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন।

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হলো যে, জিযিয়া প্রথা ইসলামী বিনিময় নয়, বরং তা আদায় করা হয় কাফিরদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফের বিনিময়ে। সুতরাং এ সন্দেহ যেন না হয় যে, অল্প মূল্যের বিনিময়ে ওদের কুফরী অবস্থায় বহাল থাকার অনুমতি কেমন করে দেয়া হলো? কারণ এমন অনেক লোক আছে, যাদের স্বধর্মে অবিচল থেকে জিযিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। যেমন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ এবং যাজক সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَدٍ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ অর্থ এখানে কারণ, يد অর্থ শক্তি ও বিজয়। তাই জিযিয়া যেন খয়রাতি চাদা প্রদানের মত না হয় বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসাবে।—(রূহুল-মা'আনী)। এর পরের বাক্য হলো وَهُمْ صَاغِرُونَ ইমাম শাফিয়ী (র)-র তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হলো—তারা যেন ইসলামের সাধারণ আইন-কানুনের আনুগত্যকে নিজেদের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয়।—(রূহুল-মা'আনী, তফসীরে মাযহারী)

জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায়ই প্রযোজ্য। তারা আহ্‌লে-কিতাব হোক বা অন্য কেউ। তবে আরবের মুশরিকরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের থেকে জিযিয়া গৃহীত হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত হলো প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা। প্রথম আয়াতে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, আহ্‌লে-কিতাবগণ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে না। দ্বিতীয় আয়াতে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদীরা হযরত ওযাইর (আ) ও খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করে। তাই তাদের ঈমান ও তাওহীদের দাবি নিরর্থক। এর পর বলা হয়— ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ 'এটি তাদের মুখের কথা।' এ বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম, তারা নিজেদের

ভ্রান্ত আকীদার কথা নিজ মুখেও স্বীকার করে। এতে গোপনীয়তা কিছুই নেই। দুই, তারা মুখে যে কুফরী উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোন দলীল আছে, না কোন যুক্তি। অতঃপর বলা হয় ঃ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ط قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ “এরা পূর্ববর্তী কাফিরদের মত কথা বলে, আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন। ওরা কোন্ উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।” এতে অর্থ হলো ইহুদী ও খৃষ্টানরা নবীদের আল্লাহ্র পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাফির ও মুশরিকদের মতই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত-মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করেছিল।

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (৩১) يُرِيْدُوْنَ اَنْ
يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ
وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ (৩২) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ لا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (৩৩) يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ
اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ
يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (৩৪) لا يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ
فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ (৩৫)

---

(৩১) তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের

ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র ! (৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন—যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৩) তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হিদায়েত ও সত্য দীন সহকারে যেন এ দীনকে অপরাপর দীনের উপর জয়যুক্ত করেন যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৪) হে ঈমানদারগণ ! পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (৩৫) সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।"

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কুফরী আচরণের বিবরণ দিয়ে বলা হচ্ছে) তারা (ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের আনুগত্যের দিক দিয়ে) তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে (এই রূপে যে, তারা হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মত এদের আনুগত্য করে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদেশের উপর এদের আদেশকে প্রাধান্য দেয়। এ ধরনের আনুগত্যই হলো ইবাদত। এ দৃষ্টিকোণে তারা পীর পুরোহিতদের ইবাদত করে চলছে) এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও (এক হিসাবে মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। পুত্র হলে আল্লাহ্ তাঁর মাঝেও সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক) অথচ তাঁরা (আসমানি কিতাব দ্বারা) আদিষ্ট ছিলেন একমাত্র মাবুদ (বরহক)-এর ইবাদত করবে, তিনি ছাড়া আর কেউ মাবুদ নেই। তিনি তাদের শির্‌ক থেকে কতই না পবিত্র! (এ হলো তাদের বাতিল পথ অবলম্বনের বিবরণ। সামনে তাদের আরেক কুফরীর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে, তারা সত্য দীনকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। বলা হয়,) তার মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূর (দীন-ইসলাম)-কে নির্বাপিত করতে চায় (অর্থাৎ নানা আপত্তি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা ইসলামের প্রসার রোধ করতে চায়) কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণ বিকাশ ব্যতীত নিরস্ত হবেন না। যদিও কাফিররা (এতে কিতাবীগণও এসে গেল) তা অপ্রীতিকর মনে করুক। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূল (মুহাম্মদ)-কে হিদায়েত (–এর উপকরণ অর্থাৎ (কোরআন) ও সত্য দীন (ইসলাম) সহকারে, যাতে তিনি এই দীনকে অপরাপর (সকল) দীনের উপর জয়যুক্ত করেন। (এ হলো আপন নূরের পূর্ণ বিকাশ) যদিও মুশরিকরা (ইহুদী খৃস্টানসহ) তা অপ্রীতিকর মনে করুক। হে ঈমানদারগণ, (ইহুদী-খৃস্টানেরা পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেক লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে (অর্থাৎ শরীয়তের প্রকৃত হুকুমকে গোপন করে সাধারণ লোকের মর্জিমত ফতোয়া দিয়ে ওরা পয়সা রোজগারে ব্যস্ত) এবং এর দ্বারা তারা আল্লাহ্‌র পথ (ইসলাম) থেকে লোকদের নিবৃত্ত রাখছে

(অর্থাৎ তাদের মিথ্যা ফতোয়ার ধোঁকায় পড়ে মানুষ অধিকতর বিভ্রান্ত হচ্ছে যার ফলে সত্য গ্রহণ এমনকি সত্যের অন্বেষণেও নিস্পৃহ)। আর (তারা কঠিন লোভে পড়ে অর্থ জমা করতেও ব্যস্ত। যার সাজা হলো) যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ যাকাত আদায় করে না। হে রাসূল, আপনি) তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন। (সে আযাব ভোগ করতে হবে সেদিন) তা জাহান্নামের আগুনে (প্রথমে উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে) তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (এবং বলা হবে) এগুলো তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর যা জমা করে রেখেছিলে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ে ইহুদী-খৃস্টান আলিম ও পীর-পুরোহিতদের কুফরী উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে। احبر - حبر -এর এবং رهبان - راهب এ বহুবচন। حبر ইহুদী ও খৃস্টানদের আলিমকে এবং راهب, তাদের সংসার বিবাগীদেরকে বলা হয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদী খৃস্টানরা তাদের আলিম ও যাজক শ্রেণীকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ হযরত ঈসা (আ)-কেও মাবুদ মনে করে। তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলিম ও যাজক শ্রেণীকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হলো, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণীর জন্য উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; তা আল্লাহ্ রাসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন ? বলা বাহুল্য, পীর পুরোহিতগণের আল্লাহ্ রাসূল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। আর এটি হলো প্রকাশ্য কুফরী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শরীয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে-কিরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহির ইমামদের মতামতের অনুসরণ-এর সাথে অত্র আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এঁদের অনুসরণ হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্-রাসূলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হলো, ইমাম ও আলিমরা আল্লাহ্-রাসূলের আদেশ নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলিমদের জিজ্ঞেস করে—তারপর সেমতে আমল করেন। যে ওলামায়ে কিরামের ইজতিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামদের পায়রবী করেন। এই পায়রবী হলো কোরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই তা মূলত আল্লাহ্‌রই পায়রবী। কোরআনে ইরশাদ হয়ঃ فَسْـئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْـرِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُـوْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম-আহ্‌কাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হও তবে বিজ্ঞ আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস কর।

পক্ষান্তরে ইহুদী খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের আদেশ নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলিম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে

নিয়েছে, তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় অত্র আয়াতে। অতঃপর বলা হয়, "এই গোমরাহী অবলম্বন করেছে বটে কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ হলো একমাত্র তাঁর ইবাদত করার এবং তিনি তাদের শিরকী কার্যকালাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।"

ইহুদী খৃষ্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহ্র অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটি শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং আল্লাহ্র সত্য দীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্য অসম্ভব। বরং আল্লাহ্র অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দীনে ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফির ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর তৃতীয় আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ আপন রাসূলকে হিদায়েতের উপকরণ—কোরআন এবং সত্য দীন-ইসলাম সহকারে এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচীত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কোরআনে রয়েছে যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দীনের উপর দীনে-ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতি, যেমন হযরত মিক্দাদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ্ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।" আল্লাহ্র এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

রাসূলে করীম (সা) ও সলফে-সালেহীনের পবিত্র যুগে আল্লাহ্র নূরের পূর্ণ বিকাশের দৃশ্য গোটা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও দীন-ইসলাম দলীল-প্রমাণ ও মৌলিকতার দিক দিয়ে এমন এক পূর্ণাঙ্গ ধর্ম যার খুঁত ধরার সুযোগ কোন বিবেকবান মানুষের হবে না। তাই কাফিরদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই দীন দলীল-প্রমাণে চির ভাস্বর। এ জন্য মুসলমানরা যতদিন ইসলামের পূর্ণ অনুগত থাকবে, ততদিন তাদের শৌর্য বীর্য ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকবে। ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাই। মুসলমানরা যতদিন কোরআন ও হাদীসের পূর্ণ অনুগত ছিল, ততদিন পাহাড় কি সমুদ্র কোনটাই তাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারেনি। এভাবে গোটা দুনিয়ার কর্তৃত্ব একদিন তাদের হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু যেখানে মুসলমানরা পরাভূত ও হীনবল হয়ে পড়েছিল, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেই বিপর্যয়ের মূলে ছিল কোরআন-হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ এবং তৎপ্রতি অবহেলা। কিন্তু এ দুর্গতি মুসলমানদের, ইসলামের নয়। ইসলাম আপন জ্যোতিতে সদা ভাস্বর।

চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদী-খৃষ্টান পীর-পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেওয়া হয়, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদী-খৃষ্টানের আলোচনায়

মুসলমানদের হয়ত এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মত না হয়, আয়াতে ইহুদী খৃস্টান পীর-পুরোহিতদের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলাধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহ্র সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখছে।

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতের যেখানে এ অবস্থা সেখানে সাধারণত সমকালীন সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদ তা না করে। كثير (অধিকাংশ) শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনরূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের ভোগের অর্থ হলো, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তাওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তাওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হলো যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়, বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কেননা যেখানে নেতাদের এ অবস্থা সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না। তাছাড়া, পীর-পুরোহিতদের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়।

ইহুদী-খৃস্টান আলিম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ-লালসা থেকে। এ জন্য আয়াতে বর্ণিত অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন।"

"আর তা খরচ করে না আল্লাহ্র পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধান মতে আল্লাহ্র ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থসম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে মালামালের যাকাত দেওয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধনরত্নের শামিল নয়।"—(আবূ দাঊদ, আহমদ)। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গুনাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ্ ও ইমাম এ মতের অনুসারী।

ولاينفقونها "আর তা খরচ করে না" বাক্যের 'তা' সর্বনামের উদ্দিষ্ট বস্তু হলো রৌপ্য। অথচ আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে মাযহারীর মতে এ বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে যাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার মূল্যের সাথে সাথে যোগ করে রূপার হিসাব মতে যাকাত প্রদান করবে।

শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ যে অর্থসম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের রূপ ধারণ করে।

এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে। কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রূকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্য বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتٰبِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ
عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ
اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾

(৩৬) নিশ্চয় আল্লাহ্র বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (৩৭) এই মাস পিছিয়ে দেওয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফিরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহ্র নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহ্র হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করে দেওয়া হলো। আর আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধানে (শরীয়তে) আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় (গ্রহণযোগ্য চান্দ্রমাস হলো) বারটি—(এ হিসাব আজ থেকে নয়, বরং) আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে (চলে আসছে)। তন্মধ্যে (বিশেষভাবে) চারটি মাস সম্মানিত—(তা হলো জিলকদ, জিলহজ্ব, মুহাররম ও রজব), এটিই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিধান। (অর্থাৎ মাস বারটি হওয়া এবং তন্মধ্যে চারটি বিশেষ মাস নিষিদ্ধ হওয়া। পক্ষান্তরে জাহিলী প্রথা অনুসারে কখনো বর্ষ-শুমারীতে মাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, আবার কখনো নিষিদ্ধ মাসের সম্মান পরিহার করে চলা হলো আল্লাহ্‌র ধর্ম বিধানের অমান্যতা।) সুতরাং তোমরা এর মধ্যে (আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে) নিজেদের প্রতি ক্ষতি করো না। (অর্থাৎ জাহিলী প্রথা পালন করে নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করো না।) আর তোমরা যুদ্ধ কর মুশরিকদের সাথে (যারা কুফরীতে এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে) সমবেতভাবে যেমন তারাও তোমাদের সাথে (সর্বক্ষণ) যুদ্ধ (প্রস্তুতি) চালিয়ে যাচ্ছে। আর (যদি তাদের সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রে শঙ্কিত হও, তবে) মনে রেখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সুতরাং ঈমান ও তাক্‌ওয়া দৃঢ়রূপে অবলম্বন করে থাক এবং কাউকে ভয় করো না। সামনে মুশরিকদের জাহেলী অভ্যাসের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে,) নিষিদ্ধ কাল (কিংবা এর হুরমতকে অন্য মাসে পিছিয়ে দেওয়া কেবল কুফরীর মাত্রাই বৃদ্ধি করে, যার ফলে (সাধারণ) কাফিরগণ (-ও) গোমরাহীতে পতিত হয় (এভাবে যে) এরা (স্বার্থসিদ্ধির জন্য) এতে হালাল করে নেয় এক বছর এবং (কোন উদ্দেশ্য না থাকলে) হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে গণনা পূর্ণ করে নেয় (আল্লাহ্‌র নির্দিষ্টকরণ ও নির্ধারণের প্রতি লক্ষ্য না করে) আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলোর। (অতঃপর নির্ধারণ ও নির্দিষ্টকরণ যখন নাই থাকল, তখন) হালাল করে নেয় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজসমূহ তাদের জন্য শোভনীয় করে দেওয়া হলো, আর (তাদের কুফরী ও হঠকারিতার জন্য দুঃখ করা বৃথা। কারণ) আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়েত (-এর তওফীক দান) করেন না। কেননা এরা স্বয়ং সরল পথে আসতে চায় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের কুফর ও শিরক এবং গোমরাহী ও অপকর্মসমূহের বিবরণ ছিল। আলোচ্য আয়াতদ্বয় এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়, জাহিলী যুগের এক কুপ্রথার বর্ণনা এবং এর থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মুসলমানদের তাগিদ দেওয়া হয়। যার বিবরণ হলো এই যে, প্রাচীন কাল থেকে পূর্ববর্তী সকল নবীর শরীয়তসমূহে বার চান্দ্রমাসকে এক বছর গণনা করা হতো এবং তন্মধ্যে চারটি মাস যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহররম ও রজব মাসকে বড়ই বরকতময় ও সম্মানিত মনে করা হতো।

সকল নবীর শরীয়ত এ ব্যাপারে একমত যে, এ চার মাসে যেকোন ইবাদতের সওয়াব বহুগণে বৃদ্ধি পায়। তেমনি এ সময়ে পাপাচার করলে তার পরিণাম এবং আযাবও কঠোরভাবে ভোগ করতে হবে। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহও নিষিদ্ধ ছিল।

মক্কার অধিবাসী আরবগণ ছিল হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নবুয়তের প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁর শরীয়ত অনুসরণের দাবীদার। বলা বাহুল্য, ইবরাহীমী

শরীয়ত মতেও এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ এমনকি জন্তু শিকারও ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা জাহিলী যুগে আবরবাসীদের স্বভাবে পরিণত হওয়ায় উপরোক্ত হুকুম তালিম করা ছিল তাদের জন্য বড়ই দুষ্কর। তাই তারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা টালবাহানার আশ্রয় নিত। কখনো এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহের মনস্থ করলে, কিংবা যুদ্ধের সিলসিলা নিষিদ্ধ মাসেও প্রসারিত হলে তারা বলত, বর্তমান বছরে এ মাস নিষিদ্ধ নয়, আগামী মাস থেকেই নিষিদ্ধ মাসের শুরু। যেমন, যুদ্ধ চলাকালে মুহররম মাস এসে পড়লে বলত, এ বছরের মুহররম নিষিদ্ধ মাস নয়, বরং তা হবে সফর বা রবিউল আউয়াল মাস। অথবা বলত, এ বছরের প্রথম মাস হলো সফর, মুহররম হবে দ্বিতীয়। সারকথা, আল্লাহ্র চিরাচরিত নিয়মের বিরুদ্ধে বছরের যেকোন চার মাসকে তাদের সুবিধামত নিষিদ্ধরূপে গণ্য করে নিত। যে মাসকে ইচ্ছা, যিলহজ্জ বা রমযান নামে অভিহিত করত। এমনকি অনেক সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে দশটি মাস অতিবাহিত হলে বর্ষপূর্তির জন্য আরও কয়টি মাস বাড়িয়ে দিয়ে বলত—এ বছরটি হবে চৌদ্দ মাস সম্বলিত। অতঃপর অতিরিক্ত চার মাসকে সে বছরের নিষিদ্ধ মাসরূপে গণ্য করত।

সারকথা, দীনে ইবরাহীমীর প্রতি তাদের এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ ছিল যে, বছরের চারটি মাসের হুরমত অনুধাবন করে তাতে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। কিন্তু আল্লাহ্ মাসের যে ধারাবাহিকতা নির্ধারিত রেখেছেন এবং সেমতে যে চার মাসকে নিষিদ্ধ করেছেন, তাতে নানা হেরফের করে তারা নিজেদের স্বার্থ পূরণ করে নিত। ফলে সে সময় কোন্ মাস প্রকৃত রমযান বা শাওয়ালের এবং কোন্ মাস জিলকদ বা রজবের তা নির্ধারণ করা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। অষ্টম হিজরী সালে যখন মক্কা বিজিত হয় এবং নবম সালে রাসূলে করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জের মৌসুমে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার জন্য প্রেরণ করছিলেন, সে মাসটি প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও ছিল যিলহজ্জের, কিন্তু জাহিলী যুগের সেই পুরাতন প্রথানুসারে তা জিলকদই সাব্যস্ত হলো এবং সে মতে তাদের কাছে সে বছরের হজ্বের মাস ছিল যিলহজ্জের স্থলে জিলকদ। অতঃপর দশম হিজরী সালে যখন নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জের জন্য মক্কায় আগমন করেন, তখন অবলীলাক্রমে এমন ব্যবস্থাও হয়ে যায় যে, প্রকৃত যিলহজ্জ জাহিলী হিসাব মতেও যিলহজ্জেই সাব্যস্ত নয়। সেজন্য রাসূলে করীম (সা) মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় ইরশাদ করেছিলেন ঃ الا ان الزمان قد استدا ركهيئة يوم خلق الله السموات والارض অর্থাৎ "কালের চক্র ঘুরেফিরে সেই নিয়মের উপর এসে গেল, যার উপর আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সৃষ্টি করেছিলেন।" অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যে মাসটি যিলহজ্জ, তা জাহিলী প্রথানুসারেও যিলহজ্জই সাব্যস্ত হলো।

জাহিলী প্রথায় মাস গণনার এই রদবদল ও বিনিময়, তার ফলে কোন মাস বা দিন বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনেও বিস্তর জটিলতা সৃষ্টি হতো। যেমন, যিলহজ্জের প্রথম দশকে রয়েছে হজ্জের আহকাম, দশই মুহররমের রোযা এবং বছরের শেষে যাকাত আদায়ের হুকুম প্রভৃতি।

মাসের নাম পরিবর্তন ও অদলবদল—যথা, মুহাররমের সফর ও সফরের মুহাররম নামকরণ প্রভৃতি বাহ্যত বড় কিছু নয়; কিন্তু এর ফলে শরীয়তের অসংখ্য হুকুমের বিকৃতি ঘটে আমল যে

নষ্ট হয়ে যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আলোচ্য প্রথম দু'আয়াতে সেই জাহিলী প্রথার মন্দ দিকের উল্লেখ করে তৎপ্রতি মুসলমানদেরকে সাবধানতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا "নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট মাস-গণনায় মাস হলো বারটি।" এখানে উল্লিখিত عدت অর্থ গণনা। شهور হলো شهر -এর বহুবচন। অর্থাৎ মাস। বাক্যের সারমর্ম হলো আল্লাহ্র কাছে মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত ; এতে কম বেশী কারো ক্ষমতা নেই।

অতঃপর كِتَابِ اللهِ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোজে আযল অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই লাউহে-মাহফূযে লিখিত রয়েছে। এরপর يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোজে আযলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা নির্ধারণ হয়। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে।

তারপর বলা হয় مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ তন্মধ্যে চার মাস হলো নিষিদ্ধ। সেহেতু এ চার মাসে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হলো, এই চারটি মাস সম্মানিত, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম, তা' ইসলামী শরীয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং ইবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকী রয়েছে।

বিদায়ী হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় নবী করীম (সা) সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, "তিনটি মাস হলো ধারাবাহিক—জিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহররম, অপরটি হলো রজব। তবে রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব হলো রমযান। আর মুযার গোত্রের ধারণামতে রজব হলো জুমাদিউসসানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই নবী করীম (সা) খুতবায় মুযার গোত্রের রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ "এটিই হলো সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ এবং সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হলো দীনে-মুসতাকীম। এতে কোন মানুষের কমবেশী কিংবা পরিবর্তন পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত।

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি অবিচার করো না" অর্থাৎ এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং ইবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

ইমাম জাস্সাস (র) 'আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, কোরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে ইবাদত করা হলে বাকী মাসগুলোতেও ইবাদতের তওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকী মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

এ পর্যন্ত ছিল জাহিলী প্রথার বর্ণনা ও তার নিন্দাবাদ। আয়াতের শেষ বাক্যে সূরা তওবার শুরুতে প্রদত্ত আদেশের পুনরাবৃত্তি করা হয় অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সমস্ত কাফির ও মুশরিকের সাথে জিহাদ করাই ওয়াজিব।

দ্বিতীয় আয়াতেও সেই জাহিলী প্রথার উল্লেখ করা হয় নিম্নরূপে ঃ إِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ। নিষিদ্ধকালে অন্য মাসে পিছিয়ে দেওয়া কেবল কুফরীর মাত্রাকেই বৃদ্ধি করে। نسى অর্থ পিছিয়ে দেওয়া এবং পরে আনা।

মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, মাসের এই ওলট-পালট করার ফলে একদিকে আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে এবং অন্যদিকে আল্লাহ্‌র হুকুমেরও তা'মিল হবে। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন যে, এর ফলে তাদের কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, যাতে তাদের গোমরাহী উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে অর্থাৎ কোন বছরে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হারাম করে এবং আর কোন বছরে হালাল করে। لِيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ "যাতে শুমার পূর্ণ করে নেয় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলো" বাক্যের মর্ম হলো শুধু গণনা পূরণ দ্বারা হুকুমের তামিল হয় না; বরং যে হুকুম যে মাসের সাথে নির্দিষ্ট, তা সে মাসেই করতে হবে।

আহ্কাম ও মাসায়েল

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামী শরীয়তে প্রচলিত তা মানবরচিত পরিভাষা নয় বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তরতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহ্কাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শরীয়তের আহ্কামের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চান্দ্রমাসের হিসাব মতেই রোযা, হজ্ব ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কোরআন মজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছে لتعلموا عدد السنين والحساب (যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর)। অতএব চন্দ্র ও সূর্য এই দুয়ের মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহ্‌র অধিকতর পছন্দ। তাই শরীয়তের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্য চান্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে-কিফায়া; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গুনাহ্‌গার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জয়েয আছে। তবে তা আল্লাহ্ ও পরবর্তীদের তরীকার বরখেলাফ। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও নাজায়েয মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা এতে শরীয়তের বিধানের কোন সম্পর্ক নেই। জাহিলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরীয়তের হুকুম পরিবর্তিত হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু কোন হুকুম পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ
اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿৩৮﴾ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ
وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿৩৯﴾ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ
اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ
مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿৪০﴾ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿৪১﴾ لَوْ كَانَ
عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ
يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿৪২﴾ ع

(৩৮) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে ? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। (৩৯) যদি বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৪০) যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে

মনে রেখো, আল্লাহ্ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হইও না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত আল্লাহ্ কাফিরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহ্র কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময় (৪১) তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। (৪২) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো। আর তারা এখনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ্ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, (প্রস্তুত হয়ে বের হতে চাও না) তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে ? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি নগণ্য। যদি তোমরা এই (জিহাদের জন্য) বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন (অর্থাৎ তোমাদের বিনাশ করে দেবেন) এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির অভ্যুদয় ঘটাবেন (এবং তাদের দ্বারাই আল্লাহ্ কাজ নেবেন)। আর তোমরা তাঁর (দীনের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ব ব্যাপারে শক্তিমান। যদি তোমরা তাঁর [রাসূলের সাহায্য না কর (তবে) তখনই আল্লাহ্ও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন (তাঁর এর থেকে আরও বেশি দুঃসহ অবস্থা ছিল।] কাফিররা তাঁকে (অতিষ্ঠ করে মক্কা থেকে) বহিষ্কার করেছিল, যখন তিনি ছিলেন দু'জনের একজন (দ্বিতীয়জন ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে), যখন উভয়ে (সওর) গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন (এতটুকুও) বিষণ্ন হইও না, (নিশ্চয়) আল্লাহ্ (তা'আলার সাহায্য) আমাদের সাথে আছে। সে (সাহায্য হলো) আল্লাহ্ তাঁর (অন্তরের) প্রতি স্বীয় (পক্ষ থেকে) সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং (ফেরেশতাদের) এমন বাহিনী দ্বারা তাঁকে শক্তি যোগালেন, যাদের তোমরা দেখনি। আর আল্লাহ্ কাফিরদের মাথা (ও কৌশল) নীচু করে দিলেন (যেন ব্যর্থ হয়) এবং আল্লাহ্র কথাই সমুন্নত থাকল (যে তাঁর তদবীর ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাই সফল হলো)। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তাই তাঁর বাণী ও প্রজ্ঞা জয়ী হলো)। তোমরা (জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়, সরঞ্জাম স্বল্প হোক বা প্রচুর এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর জান ও মাল দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা একীন রাখ (তবে বিলম্ব করো না।) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী

হতো, কিন্তু যাত্রাপথ তাদের কাছে সুদীর্ঘ মনে হলো (তাই ঘরে বসে থাকল)। আর যখন (তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে,) তারা শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য হলে অবশ্যই তোমাদের সাথে যেতাম। এরা (উপর্যুপরি মিথ্যা বলে) নিজেদের বিনষ্ট (আযাবের উপযুক্ত) করেছে। আল্লাহ্ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী (সাধ্য থাকা সত্ত্বেও জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত আয়াতসমূহে রাসূলে করীম (সা) কর্তৃক পরিচালিত এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বর্ণনা এবং প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম ও পথনির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো তাবুক যুদ্ধ, মহানবী (সা)-এর প্রায় সর্বশেষ যুদ্ধ।

'তাবুক' মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। সিরিয়া ছিল তৎকালে রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। রাসূলে করীম (সা) অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধ সমাপন করে যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, যখন আরব ব'দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং মক্কার মুশরিকদের সাথে একটানা আট বছর যুদ্ধ চালিয়ে মুসলমানরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কিন্তু যে রাব্বুল আলামীন ইতিপূর্বে সকল দীনের উপর ইসলামের বিজয় সম্বলিত আয়াত ليظهره على الدين كله নাযিল করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ানোর সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে অবসর যাপনের সময় কোথায়? মহানবী (সা) মদীনা পৌঁছামাত্র সিরিয়া প্রত্যাগত যয়তুন তৈল ব্যবসায়ী দলের মুখে সংবাদ পেলেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তাবুকে তার সেনাবাহিনী সমাবেশ করছে এবং এক বছরের অগ্রিম বেতন দিয়ে তাদের পরিতুষ্ট রেখেছে। আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরবের কতিপয় গোত্রের সাথেও তাদের যোগসাজশ রয়েছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেবে।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূলে করীম (সা) তাদের আক্রমণের আগে ঠিক তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সংকল্প নিলেন।—(তফসীরে মাযহারী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ-এর সৌজন্যে)

ঘটনাচক্রে তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। মদীনার অধিবাসীরা সাধারণ কৃষিজীবী। তখন তাদের ফসল কাটার সময়—যা ছিল তাদের গোটা বছরের জীবিকা। বলা বাহুল্য, চাকুরীজীবীদের অর্থকড়ি যেমন মাস শেষে ফুরিয়ে আসে, তেমনি নতুন মৌসুমের আগে কৃষিজীবীদের গোলাও খালি হয়ে যায়। তাই একদিকে অভাব-অনটন; অন্যদিকে ঘরে ফসল তোলার আশা, তদুপরি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরা—দীর্ঘ আট বছরের রণক্লান্ত মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিরাট পরীক্ষার বিষয়।

কিন্তু সময়ের দাবি উপেক্ষা করা যায় না। বিশেষত এ যুদ্ধ হলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। আগেকার যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল নিজেদের সাধারণ মানুষের সাথে, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধটি হবে রোমান সম্রাটের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার সকল

মুসলমানকে যুদ্ধে বের হবার আদেশ দেন এবং আশপাশের অন্যান্য গোত্রগুলোকেও এতে অংশ নেওয়ার আহবান জানান।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের এ সাধারণ আহবান ছিল মুসলমানদের জন্য অগ্নি-পরীক্ষা এবং ইসলামের মৌখিক দাবীদার মুনাফিকদের সনাক্ত করার মোক্ষম উপায়। তাই এদের কথা বাদ দিলেও খোদ মুসলমানরাও অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

একদল হলো যারা কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অপর দল কিছু দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে প্রথম দলের সাথে শামিল হয়। এ দু'দল সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ "তা প্রশংসার যোগ্য, যারা তীব্র সঙ্কটকালে তাঁর আনুগত্য করেছে তাদের একদলের অন্তরসমূহ বিচ্যুতির কাছাকাছি হওয়ার পরেও।"

তৃতীয় দল যারা প্রকৃত কোন ওযরের ফলে যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি। কোরআন তাদের সম্পর্কে বলে ঃ ليس على الضعفاء ولا على المرضى অর্থাৎ দুর্বল ও পীড়িত লোকদের জন্য গুনাহ্‌র কিছু নেই। একথা বলে তাদের ওযর কবূল হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়।

চতুর্থ দল হলো, যারা কোন ওযর-অসুবিধা ছাড়াই নিছক অলসতার দরুন যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে। এদের ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ 'যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে' اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

আয়াতগুলোতে উক্ত দলের অলসতার দরুন শাস্তির হুমকি এবং পরিশেষে তাদের তওবা কবূল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।

পঞ্চম দল হলো মুনাফিকদের। এরা পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তে নিজেদের আর লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এরা যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকে। কোরআনের অনেকগুলো আয়াতে এদের বর্ণনা রয়েছে।

ষষ্ঠ দল হলো মুনাফিকদের সেই উপদল, যারা গোয়েন্দা বৃত্তি ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ (আয়াত ৪৭) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ (আয়াত ৬৫) এবং وَهَمُّوْا بِمَالَمْ يَنَالُوْا (৭৪) আয়াতসমূহে এ মুনাফিকদের বর্ণনা দেওয়া হয়।

কিন্তু এ সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যুদ্ধে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। বিপুল সেই মুসলমানদের সংখ্যায় ছিল, যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাই এ যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার, যা ইতিপূর্বেকার কোন যুদ্ধে দেখা যায়নি।

এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ রোম সম্রাটের কানে গেলে সে ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। রাসূলে করীম (সা) সাহাবীদের নিয়ে কয়েকদিন রণক্ষেত্রে অবস্থান করার পর তাদের মুকাবিলার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

উল্লিখিত আয়াতগুলোর সম্পর্ক বাহ্যত সেই চতুর্থ দলের সাথে, যারা ওযর-আপত্তি ছাড়া শুধু অলসতার দরুন যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত ছিল। প্রথম আয়াতে অলসতার জন্য সাজার হুমকি, তৎসঙ্গে অলসতার মূল কারণ এবং পরে তার প্রতিকারের উপায় কি, তা' বর্ণিত হয়। এ বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়েছে তা হলো ঃ

দুনিয়ার মোহ ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল ঃ অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দীনের ব্যাপারে সকল আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা ও সকল আপরাধ এবং গুনাহ্র মূলে রয়েছে দুনিয়ার প্রীতি ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে ঃ حب الدينا رأس كل خطيئة ঃ অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ সকল গুনাহ্র মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয় ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, আল্লাহ্র পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)। আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।"

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার এই বলে উল্লেখ করা হয় ঃ "দুনিয়াবী জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।" যার সারকথা হলো, আখিরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুত আখিরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয় তিনটি ঃ তাওহীদ, রিসালত ও পরকালে বিশ্বাস। তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হলো বিশুদ্ধ আমলের রূহ এবং গোনাহ্ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চিন্তা করলে পরিষ্কার হবে যে, দুনিয়ার শান্তি-শৃংখলা আখিরাতের আকীদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবন কাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন-আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুত এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, দুনিয়াবী ব্যস্ততা এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হলো, আল্লাহ্র যিকির ও স্মরণ এবং আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই আমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষার পাত্র হয়। সবী ও সাহাবা কিরামের স্বর্ণ-যুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ্ ও আখিরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, ঝড়ের বেগে যেন তা'

বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায় ! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরোক্ত কোরআনী প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, "তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

তৃতীয় আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহ্র রাসূল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মুহতাজ নন। আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফর-সঙ্গী হিসাবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর (রা) ছাড়া আর কেউ ছিল না। পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ ছিল না; বরং তা ছিল এক গিরিগুহা, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল তাঁর শত্রুরা। তখন গুহা-সঙ্গী হযরত আবূ বকর (রা)-এর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়ত শত্রুরা তাঁর বন্ধুর জীবন নাশ করে দেবে, কিন্তু এ সময়েও রাসূলুল্লাহ্ ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে, তা নয়, বরং সফর সঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হইও না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।" দু'শব্দের এ বাক্যটা বলা মুশকিল কিছু নয়। কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ এ নাজুক দৃশ্য সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝতে দেরী হবে না যে, নিছক দুনিয়াবী উপায় উপকরণের প্রতি ভরসা রেখে মনের এই নিশ্চিত ভাব সম্ভব নয়। তবুও যে সম্ভব হলো আয়াতের পরবর্তী বাক্যে তার রহস্য বলে দেওয়া হলো। ইরশাদ হয় ঃ "আল্লাহ্ তাঁর কল্‌ব মুবারকে সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাঁর সাহায্য করেন, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।" অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতারাও হতে পারেন এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ এগুলোও আল্লাহ্র সৈন্যদল। সারকথা, এর ফলে কুফরীর পতাকা অবনমিত হয় এবং আল্লাহ্র ঝাণ্ডা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

চতুর্থ আয়াতে তাগিদদানের উদ্দেশ্যে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদে বের হবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

পঞ্চম আয়াতে অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওযরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ্ যে শক্তি-সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা আল্লাহ্র রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿৪৩﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ

بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿৪৪﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿৪৫﴾

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ

انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿৪৬﴾

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاوْضَعُوْا

خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿৪৭﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ

وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ

كٰرِهُوْنَ ﴿৪৮﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي

الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿৪৯﴾ اِنْ تُصِبْكَ

حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ

اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿৫০﴾ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا

مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿৫১﴾

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖؗ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৪৩) আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত কারা সত্যবাদী এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। (৪৪) আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে, তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ্ সাবধানীদের ভাল জানেন। (৪৫) নিঃসন্দেহ তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলছে। (৪৬) আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহ্র পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত্ত রাখলেন এবং আদেশ হলো উপবিষ্ট লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (৪৭) যদি তোমাদের সাথে তারা বের হতো, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাত তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুত আল্লাহ্ জালিমদের ভালভাবেই জানেন। (৪৮) তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ ওলটপালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হলো আল্লাহ্র হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দ বোধ করল। (৪৯) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (৫০) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে। (৫১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য রেখেছেন। তিনি আমাদের কার্য নির্বাহক। আল্লাহ্র উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য দু'কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর ; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা (তো) করে দিলেন, (কিন্তু) আপনি তাদের (এত শীঘ্র) কেন অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না স্পষ্ট হয়ে যেত আপনার সামনে সত্যবাদীরা এবং (যে পর্যন্ত না) জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের (এতে তারা আপনাকে প্রতারিত করে উল্লসিত হতে পারত না)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে, তারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে (এবং তাতে শরীক না হওয়ার জন্য) আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না (বরং আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত এগিয়ে যাবে) আর আল্লাহ্ (সেই) মুত্তাকীদের ভাল করে জানেন (তাদের উপযুক্ত প্রতিদান ও সওয়াব দেবেন)। তবে তারাই (জিহাদে যাওয়া থেকে) আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে না এবং (ইসলামের ব্যাপারে) তাদের অন্তর সন্দেহে পতিত, সুতরাং তারা নিজেদের সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে চলছে—(কখনো সহযোগিতার খেয়াল, কখনো বিরোধিতার মনোভাব)। আর যদি তারা (যুদ্ধে) বের হবার সংকল্প নিত (যেমন ওযর পেশ করাকালে বলেছিল, যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অসুবিধা হেতু পারছি না। একথা সত্যি হলে) তবে (চলার) কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করত (যেমন, সফরকালে সংগ্রহ করা হয়) কিন্তু (আদতেই তাদের ইচ্ছা ছিল না। ফলে বিলম্ব হয়ে গেল। যেমন لَوْخَرَجُوْا فِيْكُمْ আয়াতে তার বর্ণনা আসছে। আর এই বিলম্ব হেতু) আল্লাহ্ তাদের যাওয়া পছন্দ করেন না, (তাই তাদের তওফীক দিলেন না এবং সৃষ্টিগত রীতি মতে) তাদের বলা হলো, বিকলাঙ্গ লোকদের সাথে তোমরাও বসে থাক। (আর তাদের যাওয়া শুভ না হওয়ার কারণ হলো যে,) তারা তোমাদের সাথে শামিল থাকলে অধিক হারে ফাসাদ করা ছাড়া আর কিছুই করত না। (সেই ফাসাদ হলো) তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজে বেড়াত (অর্থাৎ লাগানো-বাজানোর দ্বারা বিভেদ সৃষ্টি করত, মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে অস্থির করে তুলত এবং শত্রুর ভয় দেখিয়ে তোমাদের হীনবল করত। তাই তাদের না যাওয়াটা ভালই হলো) এবং (এখনো) তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। আর আল্লাহ্ এই জালিমদের ভাল করেই জেনে নেবেন। (তাদের এই দুষ্টুমি নতুন কিছু নয়—) তারা ইতিপূর্বেও (ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে) ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল (অর্থাৎ প্রথমে যুদ্ধে শরীক হয়ে পরে মুসলমানদের হীনবল করার জন্য সরে যায়) এবং (এছাড়া, আপনার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে) আপনার কাজগুলোকে ওলটপালট করার প্রয়াস পায়। এমতাবস্থায় (আল্লাহ্র) সত্য প্রতিশ্রুতি এমন অবস্থায় এসে যায় যখন তারা মন্দবোধ করছিল। (তা'হলো) আল্লাহ্র হুকুম বিজয়ী থাকল। (অনুরূপ ভবিষ্যতেও কোন চিন্তা নেই) আর তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ আপনাকে বলে, আমাকে (যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থাকার) অনুমতি দিন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। ভাল করে শুনে নাও, তারা তো ক্ষতির মধ্যে পূর্ব থেকেই পতিত [কারণ, হযরত (সা)-এর অবাধ্যতা ও কুফরীর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে ?] আর নিঃসন্দেহে (পরকালে) জাহান্নাম এই কাফিরদের ঘিরে রাখবে। আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দ বোধ করে এবং আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা (আনন্দের সাথে) বলে,

আমরা (এজন্যই) পূর্ব থেকে নিজেদের জন্য সাবধানতার পথ অবলম্বন করেছিলাম। (অর্থাৎ যুদ্ধে শরীক হইনি।) আর (একথা বলে) উল্লসিত মনে ফিরে যায়। (হে রাসূল,) আপনি (তাদের দু'টি কথা) বলুন, (প্রথমত) আমাদের কাছে কোন বিপদ আসবে না কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন তিনিই আমাদের প্রভু (সুতরাং প্রভু যা সাব্যস্ত করে, খাদিমের পক্ষে তার উপরই সন্তুষ্ট থাকা জরুরী।) আর (আমাদেরই বা বৈশিষ্ট্য কি) সমস্ত মুসলমানের যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্র জন্য সোপর্দ করা উচিত। (দ্বিতীয়ত) বলুন (যে, আমাদের জন্য উত্তম অবস্থা যেমন উত্তম, সুপরিণতির প্রেক্ষিতে বালা-মুসীবতও উত্তম। কেননা এর দ্বারা পাপ মোচন হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং) তোমরা তো আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের একটির প্রত্যাশায় রয়েছ; (অর্থাৎ তোমরা তো অপেক্ষায় রয়েছ যে, দেখা যাক কি হয়। তা ভাল হোক বা মন্দ, উভয়ই আমাদের জন্য কল্যাণকর।) আর আমরা প্রত্যাশায় আছি আল্লাহ্ তোমাদের কোন্ আযাবে পতিত করবেন (তা) নিজের পক্ষ থেকে (হোক, দুনিয়া বা আখিরাতের) কিংবা আমাদের দ্বারা (তোমরা নিজেদের কুফরী প্রকাশ করলে অন্য কাফিরদের মত তোমাদেরও হত্যা করা হবে।) অতএব তোমরা অপেক্ষা কর (স্ব-অবস্থায়), আমরাও তোমাদের সাথে (স্ব-অবস্থায়) অপেক্ষা করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ রুকূর সতেরটি আয়াতের অধিকাংশ স্থান জুড়ে সেই মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে, যারা মিথ্যা বাহানা দাঁড় করে তাবুক যুদ্ধে অংশ না নেয়ার জন্য রাসূলে করীম (সা)-এর অনুমতি নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো মাসায়েল, আহকাম ও হিদায়েতের সমাবেশ রয়েছে।

প্রথম আয়াতে এক অপূর্ব সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে হযরতের প্রতি অভিযোগ করা হয় যে, মুনাফিকরা মিথ্যা ওযর দেখিয়ে নিজেদের মা'যুর প্রকাশ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের আগে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো কেন ? যাতে এরা উল্লাস প্রকাশ করে বলছে যে, আল্লাহ্র রাসূলকে সহজে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে দেন যে, নিছক বাহানা তালাশের জন্যই তাদের ওযর প্রকাশ, নতুবা অব্যাহতি না পেলেও তারা যুদ্ধে শরীক হতো না। আলোচ্য আয়াতে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে, তারা যুদ্ধে শরীক হলেও মুসলমানদের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হতো না। তবে এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধ থেকে তাদের অব্যাহতি না দিলেও তারা অবশ্যই যেত না, কিন্তু এতে তাদের মনের কুটিলতা প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং মুসলমানদের প্রতারিত করে উল্লাস প্রকাশের সুযোগ পেত না। আয়াতের শুরুতে অভিযোগের যে ভাব, তার উদ্দেশ্য তিরস্কার করা নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কীকরণ। বাহ্যত এক প্রকারের তিরস্কার মনে হলেও কত স্নেহমমত্বের সাথে তার প্রকাশ ঘটে। কি সুন্দর বাচনভঙ্গি! لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ "কেন আপনি অনুমতি প্রদান করলেন" এর আগেই বলে দেওয়া হয় عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ "আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।" অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রাসূলে করীম (সা)-এর সুউচ্চ মর্যাদা ও শান এবং আল্লাহ্র পথে তাঁর গভীর সম্পর্কের প্রতি যাদের দৃষ্টি, তারা বলেন যে, আল্লাহ্র সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কোন

কাজের জবাব তলব ছিল তাঁর বরদাশতের বাইরে। প্রথমেই যদি "কেন অব্যাহতি দিলেন" বলা হতো, তবে রাসূল (সা)-এর কলব মোবারকের পক্ষে তা সহ্য করা দুষ্কর হতো। তাই প্রথমেই "আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন" বলে একদিকে ইঙ্গিত দেয়া হলো যে, এমন কিছু হয়ে গেল যা আল্লাহ্র অপছন্দ। অন্যদিকে ক্ষমা করার আশ্বাসবাণী শোনানো হয়, যাতে তাঁর কলব মোবারক ভারাক্রান্ত হয়ে না পড়ে।

প্রশ্ন আসতে পারে, রাসূলে করীম (সা) ছিলেন নিষ্পাপ। অতএব এখানে 'ক্ষমা' শব্দের ব্যবহার কেন ? ক্ষমা তো গুনাহ্ ও অপরাধের জন্য হয়ে থাকে। এর উত্তর হলো, 'ক্ষমা' শব্দটির প্রয়োগ যেমন গুনাহের জন্য, তেমনি অপছন্দ ও উত্তম নয় এমন ব্যাপারেও করা যেতে পারে। আর এটি নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে মু'মিন ও মুনাফিকের পার্থক্য দেখানো হয়েছে যে, মু'মিনগণ জান ও মালের মোহে পড়ে জিহাদ থেকে বাঁচার জন্য আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করে না, বরং এ হলো তাদের কাজ, আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান বিশুদ্ধ নয়। আর আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের ভাল করে জানেন।

চতুর্থ আয়াতে মুনাফিকদের পেশকৃত ওযর যে মিথ্যা তার একটি আলামত দেখিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً —"জিহাদের জন্য বের হবার সংকল্প এদের থাকলে নিশ্চয় এর কিছু প্রস্তুতিও নিত" কিন্তু দেখা যায় যে, তাদের কোন প্রস্তুতিই নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাদের ওযর মিথ্যা বাহানা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত জিহাদে বের হবার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না।

গ্রহণযোগ্য ওযর ও জিহাদে বাহানার পার্থক্য ঃ এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওযর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তা হলো সেই লোকদের ওযর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাযুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে কিন্তু আদশে পালনে যার কোন ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোন ওযরও উপস্থিত হয়, তবে গুনাহের এ ওযর হবে গুনাহের চাইতে নিকৃষ্ট। সুতরাং এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ জুম'আর নামাযে শরীক হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ্ মা'যুর লোকের পূর্ণ সওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুম'আর কোন প্রস্তুতিই নেয় নি, তার কোন ওযর উপস্থিত হলে তা হবে বাহানার নামান্তর।

উদাহরণত দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামা'আতে শরীক হওয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময়মত জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে, কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামায কাযা হয়ে যায়। যেমন রাসূলে করীম (সা)-এর লায়লাতুত্ তারীতের ঘটনা। সময়মত জেগে ওঠার জন্য তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে নিয়োজিত রাখেন, যেন প্রত্যূষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও

তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলে চোখ খোলে–এ ওযর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবা কিরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ لا تفـــريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة। অর্থাৎ "ঘুমের মধ্যে মানুষ মা'যুর। তাই এটি হলো যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।" সান্ত্বনার কারণ হলো, সময়মত জেগে ওঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি ও অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোন ওযর গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যাবে। নিছক মৌখিক জমাখরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

পঞ্চম আয়াতে মিথ্যা ওযর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জিহাদ থেকে এদের নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ ওখানে গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফাসাদ সৃষ্টি করত। অতঃপর বলা হয় ঃ وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে আছে এমন এক সরলপ্রাণ মুসলমান, যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হতো।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ 'ইতিপূর্বেও তারা ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল।' যেমন ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে। وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُونَ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র বিজয় হলো, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল।" এর দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে। যেমন ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ আয়াতে জদ বিন কায়েস নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ওযর পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধ লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কোরআন মজীদ তার কথার উত্তরে বলে ঃ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا 'ভাল করে শোন' এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ রাসূলের অবাধ্যতা ও জিহাদ পরিত্যাগের অপরাধের এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফিরদের পরিবেষ্টন করে আছে।" তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আখিরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌঁছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমানে ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ মতে বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

সপ্তম আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যত মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু وَإِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ "আপনার কোন মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কাল হয়ে যায়।" وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ ... ... هُمْ خَرِجُوا এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জন্য যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।

অষ্টম আয়াতে আল্লাহ্ পাক মহানবী (সা) ও মুসলমানদের মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার হিদায়েত দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ قُلْ لَنْ

يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا "আপনি ঐ বস্তু পূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এসব পার্থিব উপকরণ হলো এক যবনিকা বিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহ্রই। আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই তা আগেই আল্লাহ্ আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভালমন্দ নির্ভরশীল নয়।

তদবীর সহকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য; বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুল ঃ আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের মূল তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্র প্রতি ভরসা)-এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে য়া আছে তাই হবে। বরং তার অর্থ হলো, সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের সাধ্যমত চেষ্টা ও সাহস করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে আর দৃষ্টি আল্লাহ্র প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের মালিক হলেন তিনি।

তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্মবিরোধী কিছু লোক আদতেই তকদীর ও তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্থিব উপায় উপকরণকেই আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপরদিকে কিছু মূর্খ লোক, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপা দেয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জিহাদের জন্য নবী করীম (সা)-এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি, তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফার্সী প্রবাদ আছে ঃ برتوکل زانوے اشتربہ بند "তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা বেঁধে নাও" অর্থাৎ দুনিয়ার উপায়-উপকরণও আল্লাহ্র নিয়ামত, এ নিয়ামতের সদ্ব্যবহার না করা হলো নাশোকরী ও মূর্খতা। তবে উপায় উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীন নয় বরং আল্লাহ্র হুকুমের যে অধীন সে বিশ্বাস রাখবে।

শেষের আয়াতে মু'মিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফিরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং তা আমাদের জন্য শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ মু'মিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূল কথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি। এই হলো هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ "তোমরা কি আমাদের দুটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ ?"

অপরদিকে কাফিরদের অবস্থা হলো তার বিপরীত। আযাব থেকে কোন অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখিরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই ; তা অবশ্যই ভোগ করবে।

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا
فَاسِقِينَ (৫৩) وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ
وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (৫৪) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ
أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (৫৫) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ۚ وَمَا هُم مِّنكُمْ
وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (৫৬) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ
مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (৫৭) وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ
فِي الصَّدَقَاتِ ج فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا
هُمْ يَسْخَطُونَ (৫৮) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لا وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ لا إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (৫৯) ع

(৫৩) আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় কবূল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে। (৫৫) সুতরাং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্র ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণ বিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়। (৫৬) তারা আল্লাহ্র নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে। (৫৮) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে।

এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হতো, যদি তারা সন্তুষ্ট হতো আল্লাহ্ ও তার রাসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তার রাসূলও, আমরা শুধু আল্লাহ্কেই কামনা করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (সেই মুনাফিকদের) বলুন, তোমরা (জিহাদ প্রভৃতিতে) ইচ্ছায় ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনও (আল্লাহ্র দরবারে) কবূল হবে না, (কারণ) তোমরা নাফরমানের দল (নাফরমান বলতে এখানে কাফির)। আর তাদের দান-খয়রাত কবূল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে (আর কাফিরের আমল কবূল হওয়ার অযোগ্য।) এবং (গোপন কুফরীর প্রকাশ্য আলামত হলো এই যে,) তারা নামায আদায় করে অলসতার সাথে, আর (সৎকাজে) ব্যয় করে, কিন্তু কুণ্ঠিত মনে (কারণ, তাদের অন্তরে ঈমান নেই—যাতে সওয়াবের আশা করা যায়, আশা থাকলেই ইবাদতের স্পৃহা জাগে)। নিছক দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্যই তারা অগত্যা যা কিছু করে (আর যখন তারা এভাবে প্রত্যাখ্যাত) তখন তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে [যে, এ প্রত্যাখ্যাত লোকদের এত ধনসম্পদ কিরূপে দেওয়া হলো ? কারণ এগুলো আসলে নিয়ামত নয়; বরং এক ধরনের আযাব। কেননা আল্লাহ্র ইচ্ছা হলো এর দ্বারা দুনিয়ার জীবনে (-ও) তাদের আযাবে রাখা এবং কুফরী অবস্থায় তাদের মৃত্যুবরণ করা [যাতে আখিরাতেও আযাবে থাকে। সুতরাং যে ধনসম্পদের এহেন পরিণতি, তাকে নিয়ামত মনে করাই ভুল]। আর এই (মুনাফিক) লোকেরা আল্লাহ্র নামে হলফ করে বলে যে, আমরাও তোমাদের দলের (অর্থাৎ মুসলমান), অথচ (প্রকৃত প্রস্তাবে) তারা তোমাদের দলের নয়, তবে (অবস্থা এই যে,) তারা ভীত-সন্ত্রস্ত (তাই মিথ্যা হলফ করে নিজেদের কুফরীকে গোপন রাখছে, যেন অপরাপর কাফিরের সাথে মুসলমানদের যে আচরণ তা থেকে রেহাই পায়। তাদের আর কোথাও ঠাঁই পাওয়ার জায়গা নেই, যেখানে ইচ্ছা স্বাধীন মনে যেতে পারে। নতুবা) কোন আশ্রয়স্থল, কোন (গিরি) গুহা বা মাথা গুঁজবার স্থান যদি তারা পেত, তবে অবশ্যই সেদিকে ধাবিত হতো (কিন্তু কোন পথ নেই, তাই মিথ্যা হলফ করে নিজেদের মুসলমান পরিচয় দিচ্ছে।) আর তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদ্কা (বিলি-বন্টনের) ব্যাপারে আপনাকে দোষারোপ করে (যে, নাউযুবিল্লাহ্! ন্যায্য বন্টন হলো না,) কিন্তু যদি তারা সদ্কা থেকে (মনমত) অংশ পায়, তবে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি (মনমত অংশ) না পায়, তবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। (এতে বোঝা যায় যে, তাদের আপত্তির মূলে রয়েছে দুনিয়ার লোভ ও স্বার্থপরতা।) আর তাদের জন্য কতইনা উত্তম হতো, যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা দিয়েছেন, তার উপর সন্তুষ্ট হতো এবং (সে সম্পর্কে) বলত, আমাদের জন্য আল্লাহ্ (এর দেয়াই) যথেষ্ট (এ রূপে যা পেলাম তাতে বরকত হবে। এরপর আরও প্রয়োজন ও তার ইচ্ছা হলে) ভবিষ্যতে আল্লাহ্ নিজ

দয়ায় আরও দেবেন এবং তাঁর রাসূলে (সা)-ও দেবেন। আমরা (আন্তরিকভাবে) শুধু আল্লাহ্‌কেই কামনা করি (এবং তাঁর কাছেই সকল প্রত্যাশা রাখি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের কুস্বভাব ও মন্দ আচরণের আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের সারকথাও অনেকটা তাই। আর ঃ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا "আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলো, এগুলোর দ্বারা তাদের আযাবে রাখা" বাক্যে মুনাফিকদের জন্য তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে যে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হলো, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্য পার্থিব জীবনেও এক বড় আযাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতঃপর তা হাসিলের জন্য নানা চেষ্টা-তদবীর, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হিফাযত আর না পরিবার-পরিজনের সাথে আমোদ-আহ্লাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি হলো একেকটি স্বতন্ত্র আযাব। এরপর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামত অর্থকড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন সে চিন্তা ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

পরিশেষে এ সকল অর্থসম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাতছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না। বস্তুত এসবই হলো আযাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা নিয়েই দিবানিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখিরাতের আযাবের পটভূমি।

কাফিরদের সদ্‌কা দেওয়া যায় কি ? শেষের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদ্‌কার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমত না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করত। এখানে যদি সদ্‌কার সাধারণ অর্থ নেওয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদ্‌কা বোঝায়, তবে কোন প্রশ্ন থাকে না। কারণ অমুসলিমদের নফল সদ্‌কা দান ইমামদের ঐকমত্যে জায়েয এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর যদি সদ্‌কা বলতে ফরয সদ্‌কা যথা, যাকাত ও ওশর প্রভৃতি বোঝানো হয়, তবে তা থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্য দেয়া হতো যে, তারা নিজেদের মুসলমান রূপেই প্রকাশ করত এবং কুফরীর কোন প্রকাশ্য প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে আদেশ দান করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক।—(বায়ানুল কোরআন)

لَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى "তারা নামাযে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে"—আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাযে আলস্য ও দান খয়রাতে কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দু'প্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

(৬০) যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য এই হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ফরয) সদ্‌সা কেবল গরীব, মুহ্তাজ, যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ আবশ্যক তাদের হক এবং তা (ব্যয় করা হবে) দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায়ে, জিহাদকারীদের (অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের) জন্য এবং মুসাফিরের (সাহায্যের) জন্য। এই হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত হুকুম, আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সদ্কার ব্যয় খাত ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে সদ্কা সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর উপর মুনাফিকদের আপত্তির বর্ণনা ও তার জবাব। মুনাফিকরা অপবাদ রটাত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (নাউযুবিল্লাহ্!) সদ্কা বন্টনে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে চলেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সদ্কা ব্যয়-খাত ঠিক করে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদ্কা পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র হুকুম মতেই সদ্কার বিলি-বন্টন করেছেন; নিজের খেয়ালখুশি মত নয়।

হাদীস গ্রন্থ আবূ দাউদ ও দারে কুতনী গ্রন্থে বর্ণিত এবং হযরত যিয়াদ বিন হারিস সদরী কর্তৃক রিওয়ায়েতকৃত এক হাদীস দ্বারাও এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। রিওয়ায়েতকারী বলেন, আমি একদা রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যদের একটি দল অচিরে প্রেরণ করবেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে হযরত (সা) আমাকে বলেন, يا اخاصداء المطاع فى قومه। অর্থাৎ "তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা।" আমি আরয করলাম,

এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। আল্লাহ্র অনুগ্রহে তারা হিদায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। রিওয়ায়েতকারী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে হযরত (সা)-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হুযুর (সা) তাকে জবাব দিলেন ঃ

"সদ্কার ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ্ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদ্কার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।"—(কুরতুবী, পৃঃ ১৬৮, খণ্ড—১)।

এই হলো আয়াতের শানে-নুযুল। এর তফসীর ও ব্যাখ্যা দানের আগে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদে সকল প্রাণীর রিযিক সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অপার হিকমতের প্রেক্ষিতে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য রেখেছেন; সবাইকে সমান রিযিক দেননি। এই পার্থক্য রাখার মধ্যে রয়েছে মানুষের চরিত্র বিন্যাস এবং বিশ্ব পরিচালনা সম্পর্কিত বহুবিধ রহস্য, যার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ সেই হিকমতগুণে কাউকে করেছেন ধনী এবং কাউকে গরীব। কিন্তু ধনীর অর্থ-সম্পদে নির্দিষ্ট রেখেছেন গরীবের অংশ। এক আয়াতে আছে ঃ وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ অর্থাৎ ধনীদের সম্পদে রয়েছে ফকির বঞ্চিতদের অধিকার (সূরা যারিয়াত)। এতে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরীবদের একটি অংশ রয়েছে আর এ হলো তাদের হক।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ধনীরা যে দান-খয়রাত করে, তা তাদের ইহ্সান নয়, বরং এটি গরীবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, এ হক আল্লাহ্ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ নিজের খেয়াল-খুশিমত তাতে কমবেশি করতে পারবে না। আল্লাহ্ নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ এবং তা বাতলানোর কাজটি আপন রাসূলের ওপর সোপর্দ করেছেন। তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা সাহাবা কিরামকে মৌখিক বলেই যথেষ্ট মনে করেন নি এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত ফরমান লিখে হযরত উমর ফারূক ও আমর বিন হাযম্ (রা)-কে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের নিসাব এবং প্রত্যেক নিসাবে যাকাতের যে হার তা চিরদিনের জন্য আল্লাহ্ আপন রাসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে বা কোন দেশে কমবেশি বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।

নির্ভরযোগ্য তথ্য মতে মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ নাযিল হয়। তফসীরে ইবনে কাসীর সূরা মুযযাম্মিলের আয়াত ঃ فَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ('সুতরাং নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর') দ্বারা তাই প্রমাণ করা হয়। কারণ সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাযিল হয়। তবে বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শুরুতে যাকাতের বিশেষ নিসাব বা বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি। বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকত, তা মুসলমানগণ মুক্ত হস্তে আল্লাহ্র রাহে দান করে দিতেন। হিজরতের পরে মদীনা শরীফে যাকাতের নিসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর সদ্কা ও যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হয়।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব সদ্কার খাতগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের জন্য নামাযের মতই ফরয। কারণ এ আয়াতে নির্ধারিত

খাতগুলো ফরয সদ্‌কারই খাত। হাদীস মতে নফল সদ্‌কা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত।

যদিও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণ অর্থেই সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে ওয়াজিব ও নফল উভয় সদ্‌কাই শামিল রয়েছে, তবে অত্র আয়াতে ইমামদের ঐকমত্যে কেবল ফরয সদ্‌কার খাতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, কোরআনে যেসব স্থানে 'সদ্‌কা' শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে নফল সদ্‌কার কোন আলামত না থাকলে ফরয সদ্‌কাই উদ্দেশ্য হবে।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا (কেবল) শব্দ আনা হয়। তাই শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সদ্‌কার যেসব খাতের বর্ণনা সামনে দেওয়া হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা হবে। এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা যাবে না। যেমন, জিহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি। এগুলোও যে ভাল ও আবশ্যকীয় এবং তাতে ব্যয় করা যে বড় সওয়াবের কাজ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সকল সদ্‌কার হার নির্দিষ্ট, তা এ সকল কাজে ব্যয় করা যাবে না।

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ 'সাদাকাত' হলো 'সাদ্‌কা'র বহুবচন। আরবী অভিধানে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সম্পদের যে অংশ ব্যয় করা হয়, তাকে সদ্‌কা বলা হয় (কামূস)। ইমাম রাগিব (র) 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, দানকে সদ্‌কা বলা হয় এজন্য যে, দানকারী প্রকারান্তরে দাবি করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোন পার্থিব স্বার্থে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তার এই দান-খয়রাত। সুতরাং যে দানের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়া যুক্ত থাকে, কোরআন সে দানকে ব্যর্থ বলে গণ্য করেছে।

সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্য শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয সদ্‌কার ক্ষেত্রেও কোরআনের বহু স্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এবং আলোচ্য إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ আয়াত প্রভৃতি। বরং আল্লামা কুরতুবী (র)-র তত্ত্ব মতে কোরআনে যেখানে শুধু সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয সদ্‌কা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় হাদীসে সদ্‌কা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে, "কোন মুসলমানের সাথে হৃষ্ট চিত্তে সাক্ষাৎ করাও সদ্‌কা, কোন বোঝা বহনকারীর কাঁধে বোঝা তুলে দেওয়াও সদ্‌কা। কূপ থেকে নিজের জন্য উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদ্‌কা।" এ হাদীসে সদ্‌কা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তৃতীয় শব্দ হলো لِلْفُقَرَاءِ-এর শুরুতে ل (লাম) বর্ণটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে, সকল সদ্‌কা সেই লোকদেরই হক, যাদের উল্লেখ পরে রয়েছে।

আট খাতের বিবরণ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হলো যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। একটির অর্থ হলো যার কিছুই নেই এবং অপরটির অর্থ হলো যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে যাকাতের হুকুমে সমান। মোট কথা, যার কাছে

প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে এবং সেও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসনা-পেয়ালা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে।

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং যে ঋণগ্রস্ত নয়, সে নিসাবের মালিক। তাকে যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়। অনুরূপ, যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে–সব মিলে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্য হয়, তবে সেও নিসাবের মালিক, তাকেও যাকাত দেয়া ও তার নেয়া জায়েয নয়। তবে এ হিসাবে যে নিসাবের মালিক নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান, উপার্জনক্ষম এবং একদিনের খাবার সংস্থানও তার রয়েছে, তাকে যাকাত দেয়া অবশ্য জায়েয, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তার জন্য জায়েয নয়। এ ধরনের লোকের পক্ষে মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম। এ ব্যাপারে অনেকের অসাবধানতা রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা হাত পেতে যা লাভ করে, তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাহান্নামের অঙ্গার বলে অভিহিত করেছেন।—[আবূ দাউদ, আলী (রা) হতে কুরতুবী]

সারকথা, যাকাতের বেলায় ফকীর-মিসকীনের কোন প্রভেদ নেই। তবে অসিয়তের বেলায় প্রভেদ রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি মিসকীনদের জন্য কিছু অসিয়ত করে, তবে কোন্ ধরনের লোকদের দেওয়া যাবে এবং ফকীরদের জন্য অসিয়ত করলে কোন্ শ্রেণীকে দিতে হবে, এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তবে ফকীর বা মিসকীন যাকেই যাকাত দেয়া হোক, লক্ষ্য রাখতে হবে, সে যেন মুসলমান হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যেন না হয়।

অবশ্য সাধারণ সদ্কা অমুসলিমদেরও দেওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে ঃ تصدقوا على اهل الاديان كلها। "যেকোন ধর্মের লোককে দান কর।" কিন্তু যাকাত সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) হযরত মু'আয (রা)-কে ইয়ামেন প্রেরণকালে হিদায়েত দিয়েছিলেন যে, যাকাতের অর্থ শুধু মুসলিম ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং মুসলিম গরীবদেরকে দেয়া হবে। তাই যাকাতের অর্থ শুধু মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদ্কা-খয়রাত এমনকি সদকায়ে ফিতরও অমুসলিমদের দেওয়া জায়েয রয়েছে। (হিদায়াহ্)

দ্বিতীয় শর্ত নিসাবের মালিক না হওয়া। আর তার ফকীর বা মিসকীন শব্দের অর্থের দ্বারাই প্রকাশ পায়। কেননা তার নিকট হয় কিছুই থাকবে না অথবা নিসাবের পরিমাণ থেকে কম থাকবে। সুতরাং ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। যাই হোক, এই খাতের পর আরো ছয়টি খাতের বর্ণনা রয়েছে যার প্রথমটি হলো 'আমেলীনে সদ্কা' অর্থাৎ সদ্কা আদায়কারী। এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ হতে লোকদের কাছ থেকে যাকাত ও ওশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুলমালে জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কোরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে।

এর মূল রহস্য হলো এই যে, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের থেকে যাকাত ও অপরাপর সদ্কা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে। অত্র সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "হে রাসূল, আপনি তাদের মালামাল থেকে সদ্কা আদায় করুন।" এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। এখানে এতটুকু বলে রাখি যে, উক্ত আয়াত মতে আমীরুল মু'মিনীনের উপর যাকাত ও সদ্কা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলা বাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে যাকাত আদায়কারী তথা সেই সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে।

এ আয়াত মতে নবী করীম (সা) অনেক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আদায়কৃত যাকাত থেকেই তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল সাহাবার মধ্যে অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ ধনীদের জন্য সদ্কার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমত, যে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই, যদিও সে স্বদেশে ধনী। দ্বিতীয়ত, সদ্কা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়ত, সেই অর্থশালী ব্যক্তি, যার মওজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থত, যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করে গরীব-মিসকীন থেকে সদ্কার মালামাল ক্রয় করে। পঞ্চমত, যাকে গরীব লোকেরা সদ্কার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে।

সদ্কা আদায়কারীদের কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে সে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হলো, তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়া হবে।—(আহকামুল কোরআন–জাস্সাস, কুরতুবী) তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত যাকাতের অর্ধাংশের বেশি দেয়া যাবে না। যাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীদের বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকি থাকে না, তবে বেতনের হার হ্রাস করতে হবে। অর্ধেকের বেশি বেতন খাতে ব্যয় করা যাবে না।—(তফসীরে মাযহারী, যহীরিয়া)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, যাকাত তহবিল থেকে আদায়কারীদের যে বেতন দেয়া হয়, তা সদ্কা হিসেবে নয়, বরং পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবেই দেয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং যাকাত থেকে তাদের দেয়া জায়েয। আট প্রকারের ব্যয়খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, সেখানে স্বয়ং যাকাতের অর্থ পারিশ্রমিক রূপে দেয়া যায়। অথচ যাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোন বিনিময় ছাড়াই গরীবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোন গরীবকে কাজের বিনিময়ে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

এখানে দু'টি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত, যাকাত আদায়কারীদের কাজের বিনিময়ে কিরূপে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, ধনীর জন্য যাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে। উভয় প্রশ্নের উত্তর একটিই। তা হলো এই যে, সদ্কা আদায়কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারা আসলে গরীবদেরই উকীলস্বরূপ। বলা বাহুল্য, উকীল কিছু গ্রহণ করলে তা মক্কেলের গ্রহণ বলেই গণ্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো থেকে কর্জ আদায়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করে তবে কর্জের টাকা উকীলের হাতে অর্পণ করলেও যেমন কর্জদার দায়িত্ব মুক্ত হয়, তেমনি গরীবদের উকীল হিসেবে আদায়কারীর মাধ্যমে সদ্কা আদায় করলেও

ধনীদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর উকীল হিসেবে সদ্কার যে অর্থ তারা সংগ্রহ করবে, গরীবরাই তার মালিক হবে। এরপর যাকাতের অর্থ থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেয়া হয়, তা আসলে গরীবদের পক্ষ থেকেই, ধনীদের পক্ষ থেকে নয়। গরীবরা যাকাতের অর্থ দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে। সুতরাং যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের উকীলদের পারিশ্রমিক দেয়ার অধিকারও তাদের থাকবে।

অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, সদ্কা আদায়কারীদের তো গরীবরা উকীল নিযুক্ত করেনি, তারা কেমন করে উকীল সেজে বসল ? জবাব হলো যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে দেশের সকল গরীব-মিসকীনের উকীল। কারণ এদের ভরণপোষণের সমুদয় দায়িত্ব তাঁর। তিনি সদ্কা আদায়ের জন্য যাদের নিযুক্ত করেন, তারা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গরীবদেরও উকীল সাব্যস্ত হয়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সদ্কা আদায়কারীদের বেতন হিসেবে যা দেয়া হয় তা মূলত যাকাতের টাকা নয়, বরং যাকাত যে গরীবদের হক, সেই গরীবদের পক্ষ থেকে তা কাজের বিনিময় মাত্র। যেমন, কোন গরীব লোক যদি কাউকে তার মামলা পরিচালনার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং তাকে এ কাজের জন্য যাকাতের টাকা থেকে মজুরি দেয়, এখানে এ মজুরি যাকাত হিসেবে দেয়াও হচ্ছে না, আর যাকাত হিসেবে নেয়াও হচ্ছে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামী মাদ্রাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিরা সদ্কা ও যাকাত যে ধনীদের থেকে আদায় করেন, তারা উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই যাকাত সদ্কা থেকে তাদের বেতন-ভাতা আদায় করা যাবে না। বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ তারা ধনীদের উকীল, গরীবদের নয়। ধনীদের পক্ষ থেকেই যাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেয়া হয়েছে। সুতরাং যাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত দাতাদের যাকাত আদায় হবে না।

তারা যে গরীবদের উকীল নয়, তা সুস্পষ্ট। কারণ কোন গরীব তাদের উকীল নিযুক্ত করেন নি এবং আমীরুল মু'মিনীনের প্রতিনিধিত্বও তারা করে না। তাই তাদের পক্ষে ধনীদের উকীল হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং যাকাত খাতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাকাতের টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এ ব্যাপারে সাধারণত সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু প্রতিষ্ঠান যাকাতের বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে বছরের পর বছর সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রাখে। আর যাকাতদাতারা মনে করে যে, যাকাত আদায় হয়ে গেল। অথচ তাদের যাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা যাকাতের খাতসমূহে ব্যয়িত হবে।

অনুরূপ অনেকে বর্তমান যুগের যাকাত আদায়কারীদের আমীরুল মু'মিনীনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে তুলনা করে যাকাতের অর্থ থেকে তাদের বেতন আদায় করে। একান্তভাবেই এটি অজ্ঞতাপ্রসূত। দাতা ও গ্রহীতা কারো পক্ষেই তা জায়েয নয়।

ইবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ ঃ এখানে আর একটি প্রশ্ন আসে। কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন ইবাদতের বিনিময়েও মজুরি নেয়া

হারাম। মসনদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ وَلَاتَاْكُلُوْا بِهٖ অর্থাৎ "কোরআন পাঠ কর, কিন্তু কোরআনকে উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করো না।" অপর হাদীসে কোরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এসব হাদীসের প্রেক্ষিতে ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদরা একমত যে, ইবাদত-বন্দেগীর পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। সুতরাং বলা যায়, সদ্কা-খয়রাত আদায় করাও ইবাদত ও দীনের একটি সেবা। রাসূলে করীম (সা) একে এক প্রকারের জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাই এ ইবাদতের মজুরি গ্রহণ করাও হারাম হওয়া সঙ্গত। অথচ কোরআনের আলোচ্য আয়াতটি তা স্পষ্টরূপে জায়েয করে দিয়েছে এবং যাকাতের আট খাতের মধ্যে একেও শামিল করেছে।

ইমাম কুরতুবী (র) তাঁর তফসীরে বলেন, যে ইবাদত ফরযে আইন বা ওয়াজিবে আইন, তার পারিশ্রমিক নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু যে ইবাদত ফরযে কিফায়াহ্, তার বিনিময় নেয়া এ আয়াত মতে জায়েয। ফরযে কিফায়াহ্ হলো, যা সকল উম্মত বা শহরের সকল বাসিন্দার জন্য ফরয, কিন্তু সকলের আদায় করা জরুরী নয়; কিছু লোক আদায় করলে সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহ্গার হয়।

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, "এ আয়াত মতে ইমামতি ও ওয়ায-নসীহতের পারিশ্রমিক নেয়াও জায়েয রয়েছে। কারণ এগুলো ওয়াজিবে আইন নয়; বরং ওয়াজিবে কিফায়াহ।" অনুরূপ কোরআন-হাদীস ও অপরাপর দীনী ইলমের তালীম ও প্রচার সকল উম্মতের জন্যই ফরযে কিফায়াহ। কতিপয় লোক তা আদায় করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। তাই এসব ইবাদতের বিনিময় নেয়া জায়েয।

যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত হলো 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'। সাধারণত তারা তিনচার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ ছিল পরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ব হয়। আর কেউ ছিল ধনী, কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেউ ছিল পরিপক্ব মুসলমান, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হিদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায-নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না, বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রাসূলে করীম (সা)-এর সমগ্র জীবনের ব্রত ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহ্র বান্দাদের ঈমানের আলোকে নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যেকোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুল কুলুবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদ্কার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা হয়।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্কার অংশ দেয়া হতো। সাধারণ ধারণা মতে মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীই এতে রয়েছে। অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয়

ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য, আর নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর অবিচল রাখার জন্য। জনশ্রুতি রয়েছে যে, নবীযুগে উল্লিখিত বিশেষ কারণে এদের সদ্‌কা দান করা হতো। কিন্তু হযরত (সা)-এর ওফাতের পর যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফিরদের শত্রুতা থেকে বাঁচা ও নও-মুসলিমদের আকীদা পোক্ত করার জন্য এ সকল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন সেই কারণ ও উদ্দেশ্যও আর বাকি থাকেনি। তাই তাদের সদ্‌কা দানও বন্ধ করে দেয়া হয়। কতিপয় ফিকাহশাস্ত্রবিদ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমটি রহিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত উমর ফারূক (রা), হযরত হাসান বসরী, শা'বী, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক বিন আনাস (রা)।

তবে অপরাপর ইমাম ও ফিকাহশাস্ত্রবিদদের মতে হুকুমটি রহিত নয়। বরং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারূক (রা)-র যুগে প্রয়োজন ছিল না বলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন দেখা দিলে এই শ্রেণীর লোকদের যাকাতের অংশ দেয়া যাবে। এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব ইবনে আরাবী, ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)।

প্রকৃত সত্য হলো এই যে, কোন যুগেই সদকা প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদের অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত 'মুআল্লাফাতুল কুলুবে' শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (র) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে রাসূলে করীম (সা) যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্‌কার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر অর্থাৎ তারাই ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

অনুরূপ তফসীরে মাযহারীতে আছে ঃ لم يثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم اعطى احدا من الكفار للايلاف شيئا من الزكوة। অর্থাৎ কোন রিওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কাফিরের চিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন। এ কথার সমর্থনে তফসীরে কাশ্‌শাফের একটি উক্তি পেশ করা যায়। তাতে উল্লেখ আছে যে, "কোরআন এ স্থানে যাকাতের ব্যয়খাতের বর্ণনা উদ্দেশ্য হলো কাফির-মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সদকার অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আয়াতে এই ব্যয়-খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সদকায় কাফিরদের কোন অধিকার নেই। মুআল্লাফাতুল কুলুবে কাফিররা শামিল থাকলে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না।

তফসীরে মাযহারীতে সে ভ্রমটিকেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে, যা কোন কোন হাদীসের রিওয়ায়েতের দরুন মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে। সেসব রিওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন অমুসলিমকে কিছু উপঢৌকন দিয়েছেন। সুতরাং সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীর রিওয়ায়েতে সে কথার উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা) সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাকে তার কাফির থাকাকালে কিছু উপঢৌকন দান করেছেন। সে সম্পর্কে ইমাম নবভী (র)-র উদ্ধৃতিক্রমে লেখা হয়েছে যে, এসব দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না,

বরং হুনাইন যুদ্ধের গনীমতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার মধ্য থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বায়তুলমালের এই খাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফিকাহবিদের ঐকমত্যেই জায়েয। অতঃপর বলা হয়েছে, ইমাম বায়হাকী (র), ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ একথাই বলেছেন যে, এ দান যাকাতের মাল থেকে ছিল না, বরং গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে ছিল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এতে বোঝা গেল যে, স্বয়ং রাসূলে মকবুল (সা)-এর পবিত্র যুগে সদকার মালামাল যদিও বায়তুলমালে জমা করা হতো, কিন্তু তার হিসাব সম্পূর্ণভাবে পৃথক ছিল এবং বায়তুলমালের অন্যান্য খাত—যেমন গনীমতের পঞ্চমাংশ প্রভৃতির হিসাব ছিল আলাদা। তেমনি প্রত্যেক খাতের ব্যয়ক্ষেত্রও ছিল আলাদা। যেমন ফিকাহবিদরা বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে পৃথক পৃথক চারটি খাত থাকা আবশ্যক। এর প্রকৃত হুকুম হচ্ছে এই যে, শুধু চারটি খাত পৃথক রাখলেই চলবে না বরং প্রতিটি খাতের জন্য বায়তুলমালও পৃথক থাকতে হবে, যাতে প্রতিটি খাত তার নির্ধারিত ব্যয় করার পুরোপুরি সতর্কতা বজায় থাকতে পারে। অবশ্য যদি কোন সময় কোন বিশেষ খাতে কমতি দেখা দেয়, তবে অন্য খাত থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে ব্যয় করা যেতে পারে। বায়তুলমালের এই খাতগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ গনীমতসমূহের পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ যেসব মালামাল কাফিরদের থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তার চার ভাগ মুজাহিদীনের মাঝে বন্টন করে দিয়ে অবশিষ্ট পঞ্চমাংশ যা থাকে তা বায়তুলমালের প্রাপ্য। এবং খনিজ দ্রব্যসমূহের পঞ্চমাংশ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার খনি থেকে নির্গত বস্তু-সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের প্রাপ্য। রেকাযের পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ যে প্রাচীন গুপ্তধন কোন যমীন থেকে বের হয়, তারও পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের হক। এ তিন প্রকার অর্থসম্পদের পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের একই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় খাত হলো সদকার খাত—যাতে মুসলমানদের যাকাত সদকায়ে ফিতর ও যমীনের ওশর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় খাত 'খেরাজ ও ফাই'-এর মালামালের জন্য। এতে অমুসলমানদের যমীন থেকে লব্ধ কর, তাদের জিযিয়া এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ট্যাক্স এবং সে সমস্ত মালামাল যা অমুসলমানদের নিকট থেকে তাদের সম্মতিক্রমে সমঝোতার ভিত্তিতে অর্জিত হয়।

চতুর্থ খাত হলো ফৌতী মালের জন্য। যাতে লা-ওয়ারিস মাল, লা-ওয়ারিস ব্যক্তির মীরাস প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এই চার প্রকার খাতের ব্যয়ক্ষেত্র যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু এই চার খাতেই ফকীর-মিসকীনদের হক সংরক্ষিত করা হয়েছে। এতে অনুমান করা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে এই দুর্বল শ্রেণীকে সবল করে তোলার প্রতি কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই ইসলামী শাসনের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। অন্যথায় পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থায় একটা বিশেষ শ্রেণীই বড় হতে থাকে; গরীবরা বড় হবার কোন সুযোগই পায় না। ফলে এরই প্রতিক্রিয়া সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের জন্ম দিয়েছে। অথচ সেগুলো একান্তই একটি অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঝর্ণার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত এবং মানব চরিত্রের জন্য হলাহলস্বরূপ।

সারকথা এই যে, ইসলামী সরকারের চারটি বায়তুলমাল চারটি খাতের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত রয়েছে এবং চারটিতে ফকীর-মিসকীনদের হক সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি খাতের ব্যয়ক্ষেত্র স্বয়ং কোরআনে করীমই নির্ধারণ করে অতি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। প্রথম খাত অর্থাৎ গনীমতের মালামালের এক-পঞ্চমাংশের ব্যয়ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিবরণ সূরা আন্‌ফালে দশম পারার শুরুতে উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় খাতের অর্থাৎ সদ্‌কা-খয়রাতের ব্যয় ক্ষেত্রের বিবরণ সূরা তওবার আলোচ্য ষষ্ঠতম আয়াতে এসেছে। এখানে তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আর তৃতীয় খাতকে পরিভাষাগতভাবে 'মালে-ফাই' বলে অভিহিত করা হয়। এর বিবরণ সূরা হাশরে বিস্তারিতভাবে এসেছে। ইসলামী সরকারের অধিকাংশ ব্যয়, সামরিক ব্যয় ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রভৃতি এ খাত থেকেই নির্বাহ করা হয়। চতুর্থ খাত, অর্থাৎ লা-ওয়ারিস মালামাল রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের কর্মপন্থা অনুযায়ী অভাবী, পঙ্গু ও লা-ওয়ারিস শিশুদের জন্য নির্ধারিত।— (শামী—কিতাবুয্ যাকাত)

সারকথা এই যে, ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদরা বায়তুলমালের চারটি খাতকে পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করার এবং তার নির্ধারিত ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআনের এসব বাণীও রাসূলে করীম (সা) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের কর্মপন্থার দ্বারাও সুস্পষ্টভাবে তাই প্রমাণিত হয়।

প্রাসঙ্গিক এই আলোচনার পর মূল বিষয় مؤلفة القلوب -এর মাস'আলাটি লক্ষ্য করুন। উল্লিখিত বর্ণনায় বিজ্ঞ মুহাদ্দিসীন ও ফিকাহ্‌বিদদের ব্যাখ্যায় একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, مؤلفة القلوب-এর কোন অংশ কোন কাফিরকে কখনও দেয়া হয়নি। না রাসূলে করীম (সা)-এর আমলে এবং না খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে। আর যে সমস্ত অমুসলমানকে দেয়ার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে, তা সদ্‌কা-যাকাতের খাত থেকে দেয়া হয়নি; বরং গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে দেয়া হয়েছে, যা মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে যেকোন হাজতমন্দকেই দেয়া যেতে পারে। কাজেই مؤلفة القلوب বলতে থাকে শুধুমাত্র মুসলমান। বস্তুত এদের মাঝে যারা ফকীর তাদের অংশ যথাপূর্ব থাকার ব্যাপারে সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। মতবিরোধ শুধু এ অবস্থার ক্ষেত্রে রয়ে গেছে যে, এরা যদি সাহিবে-নিসাব, ধনীও হয় তবু ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ (র)-র মতে যেহেতু যাকাতের সমস্ত ব্যয়ক্ষেত্রেই ফকীর হওয়া শর্ত নয়, তাই তাঁরা مؤلفة القلوب-এ এমন ধরনের লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা ধনী ও সাহিবে-নিসাব। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র)-র মতে সদকা উসুলকারী 'আমিলীন'দের ছাড়া বাকি সমস্ত ব্যয়ক্ষেত্রে গরীব ও অসহায়ত্ব যেহেতু শর্ত, কাজেই مؤلفة القلوب-এর অংশও তাদেরকে এ শর্ত-সাপেক্ষেই দেয়া হবে যে, তারা ফকীর ও হাজতমন্দ হবে। যেমন, رقاب غارمين ও ابن السبيل প্রভৃতিকে এ শর্তেই যাকাত দেয়া হয় যে, এরা হাজতমন্দ; অভাবী। তা নিজেদের এলাকায় এরা মালদার, ধনীও হতে পারে।

এ ব্যাখ্যায় দেখা যায়, চার ইমামের মধ্যে কারো মতেই مؤلفة القلوب-এর অংশ বাতিল হয়ে যায় না, তবে পার্থক্য হলো শুধু এতটুকু যে, কেউ ফকীর-মিসকীন ব্যতীত অন্য কোন ব্যয়ক্ষেত্রে দৈন্য ও অভাবগ্রস্ততার শর্ত আরোপ করেন নি, আর কেউ এই শর্ত আরোপ করেছেন। যারা এই শর্ত আরোপ করেছেন, তাঁরা مؤلفة القلوب-এর মধ্যেও শুধুমাত্র সেই সব লোককেই অংশ দান করেন যারা গরীব ও অভাবগ্রস্ত। যা হোক, এ অংশ যথাযথ বিদ্যমান রয়েছে।—(তফসীরে মাযহারী)

এ পর্যন্ত সদ্‌কার আটটি ব্যয়ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হলো। এ চারটির অধিকার 'লাম' বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ পরবর্তীতে যে চারটি ব্যয়খাতের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'লাম'-এর পরিবর্তে فِىْ (ফী) ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَفِى الرِّقَابِ – وَالْغَارِمِيْنَ ইমাম যামাখ্‌শারী তাঁর 'কাশ্‌শাফ' গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয়খাত প্রথম চারটি ব্যয়খাতের তুলনায় বেশি হকদার। কারণ فِىْ হরফটি পাত্রকে বোঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সদ্‌কাসমূহ সেসব লোকের মাঝে রেখে দেয়া উচিত। তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তা তাদেরই বেশি। কেননা যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকীর-মিসকীনদের তুলনায় বেশি কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক কারো কাছে ঋণী এবং পাওনাদাররা তার উপর থাকে, সে সাধারণ গরীব-মিসকীনের চেয়ে বেশি অভাবে থাকে। কারণ নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের চাইতেও বেশি চিন্তা থাকে তার পাওনাদারদের জন্যে।

বাকি এই চারটি ব্যয়খাতের মধ্যে সর্বপ্রথম وَفِى الرِّقَابِ উল্লেখ করা হয়েছে। رِقَابِ হলো رقبة-এর বহুবচন। প্রকৃতপক্ষে رقبة বলা হয় গর্দান, গ্রীবা তথা ঘাড়কে। আর প্রচলিত অর্থে এমন লোককে رقبة বলা হয় যার গর্দান অন্য কারো গোলামিতে আবদ্ধ থাকে।

এতে ফিকাহ্‌বিদদের মতবিরোধ রয়েছে যে, এ আয়াতে رقاب-এর মর্ম কি ? অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ ও হাদীসবিদের মতে এর মর্ম এমন গোলাম বা ক্রীতদাস যাদের মনিব কোন সম্পদ বা অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে বলে দিয়েছে যে, এ পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ রোজগার করে দিয়ে দিলে তুমি আযাদ বা মুক্ত। একে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় 'মুকাতাব' বলা হয়। এমন লোককে মনিব এ অনুমতি দিয়ে দেয় যে, সে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করবে এবং তা মনিবকে এনে দেবে। উল্লিখিত আয়াতে رقاب-এর মর্ম এই যে, সে লোককে যাকাতের অর্থ থেকে অংশবিশেষ দিয়ে তার মুক্তি লাভে যেন সাহায্য করা হয়।

وَفِى الرِّقَابِ বলতে যে এ ধরনের গোলাম বা ক্রীতদাসকেই বোঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে তফসীরবিদ ও ফিকাহ্‌বিদ ইমামেরা একমত যে, তাদেরকে যাকাতের অর্থ দান করে তাদের মুক্তিলাভে সাহায্য করা উচিত। এদের ছাড়া অন্য গোলামদের খরিদ করে মুক্তি দান কিংবা তাদের মনিবদের যাকাতের অর্থ দিয়ে এমন চুক্তি সম্পাদন করা যাতে তারা এদের মুক্ত

করে দেয়—এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ইমাম—ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ একে জায়েয মনে করেন না। আর হযরত ইমাম মালিক (র)-এর এক রিওয়ায়েতও অধিকাংশ ইমামেরই সাথে রয়েছে। অর্থাৎ فِى الرِّقَابِ—কে শুধুমাত্র মুকাতাব গোলামদের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। অপর এক রিওয়ায়েত মতে ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি فِى الرِّقَابِ-এ সাধারণ গোলামদের অন্তর্ভুক্ত করে এ অনুমতিও দিয়েছেন যে, যাকাতের অর্থের দ্বারা গোলামকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করা যেতে পারে।—(আহকামুল কোরআন, ইবনে আরাবী মালিকী)

অধিকাংশ ইমাম ও ফিকাহ্‌বিদ যারা একে জায়েয বলেন না, তাঁদের সামনে একটি ফিকাহ্ সংক্রান্ত আপত্তি রয়েছে যে, যাকাতের অর্থে যদি গোলাম খরিদ করে মুক্ত করা হয়, তাহলে এর উপর সদ্‌কার সংজ্ঞাই প্রযোজ্য হয় না। কারণ যাকাত সে অর্থ সম্পদকে বলা হয় যা কোন রকম বিনিময় ব্যতিরেকে দান করা হয়। সুতরাং যাকাতের অর্থ যদি মনিবকে দেয়া হয়, তবে বলাই বাহুল্য যে, সে না যাকাত পাবার যোগ্য এবং না তাকে এ অর্থ বিনিময় ব্যতীত দেয়া হচ্ছে। বস্তুত গোলাম যে এ অর্থ পাবার যোগ্য, তাকে দেয়া হয়নি। অবশ্য এ কথা আলাদা যে, এ অর্থ দেয়ার উপকারিতা গোলাম পেয়ে গেছে—কেননা দাতা তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু মুক্ত করা সদ্‌কার সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং অকারণে প্রকৃত অর্থকে পরিহার করে সদ্‌কার রূপক অর্থ অর্থাৎ সাধারণ মর্ম গ্রহণ করা বিনা প্রয়োজনে জায়েয হবার কোন কারণ নেই। আর একথাও পরিষ্কার যে, উল্লিখিত আয়াতে সদ্‌কারই ব্যয়খাতসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। কাজেই فِى الرِّقَابِ-এর মর্ম এমন কোন বস্তু হতেই পারে না, যার উপর সদ্‌কার সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। যাকাতের এ অর্থ যদি গোলামকে দেয়া হয়, তবে যেহেতু গোলামের ব্যক্তিগত কোন মালিকানা অধিকার নেই, কাজেই তা আপনা-আপনিই মনিবের সম্পদ হয়ে যাবে। তখনও আযাদ করা না করা তারই ইখতিয়ারে থাকবে।

এই ফিকাহ্ সংক্রান্ত আপত্তির কারণে অধিকাংশ ইমাম ও ফিকাহবিদ বলেছেন যে, فِى الرِّقَابِ-এর দ্বারা শুধুমাত্র 'মুকাতাব' গোলামকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। এতে এ কথাও বোঝা গেল যে, সদ্‌কা আদায় হওয়ার জন্য পাওয়ার যোগ্য কাউকে সে সম্পদের মালিক বানিয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ তাতে তার মালিকানাসুলভ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না।

ষষ্ঠ ব্যয়খাত হলো اَلْغَارِمِيْنَ যা غَارِمْ-এর বহুবচন। এর অর্থ দেনাদার,ঋণী। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যয়খাত যা فِىْ-এর সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রাপ্যতার অধিকারে প্রথম চারটি ব্যয়খাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সেজন্য গোলামকে তার মুক্তির জন্য কিংবা ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ মুক্তির জন্য দান করা সাধারণ ফকীর-মিসকীনকে দান করার চাইতে উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই غَارِمْ (গারিম) বলা হয়। আবার কোন কোন ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ

কাজের জন্য না করে থাকে। কোন পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে—যেমন, মদ কিংবা বিয়ে-শাদীর নাজায়েয প্রথা-অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না, যাতে তার পাপ কাজ ও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা হয়।

সপ্তম খাত فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এখানে আবারো فِىْ হরফের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তফসীরে-কাশ্শাফে বর্ণিত রয়েছে যে, এই পুনরাবৃত্তিতে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এ খাতটি পূর্বোল্লিখিত সব খাত অপেক্ষা উত্তম। তার কারণ এই যে, এতে দু'টি ফায়দা রয়েছে। (১) গরীব-নিঃস্বের সাহায্য এবং (২) একটি ধর্মীয় সেবায় সহায়তা করা। কারণ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর মর্ম সেসব গাযী ও মুজাহিদ যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্জ করা ফরয হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরয হজ্জ আদায় করতে পারে। এ দু'টি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খিদমত ও ইবাদত। কাজেই যাকাতের মাল এতে ব্যয় করায় একজন নিঃস্ব লোকের সাহায্য হয় এবং একটি ইবাদত আদায়ের সহযোগিতাও হয়। এমনিভাবে ফিকাহ্‌বিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ তারাও একটি ইবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে। —(যাহিরিয়ার হাওয়ালায় রূহুল মা'আনী)

বাদায়ে' প্রণেতা বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতের আওতাভুক্ত, যে কোন সৎকাজ কিংবা ইবাদত করতে চায় যাতে অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থ-সম্পদ থাকবে না, যদ্দ্বারা সে কাজ সম্পাদন করতে পারে। যেমন, ধর্মীয় শিক্ষা ও তবলীগ এবং সে জন্য প্রচার-প্রকাশনা প্রভৃতি। কোন যাকাতের হকদার লোক যদি এ কাজ করতে চায়, তবে তাকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোন মালদার লোককে তা দেয়া যায় না।

উল্লিখিত বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, এ সমস্ত অবস্থাতেই যা فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর তফসীরে বর্ণনা করা হলো, দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার শর্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোন ধনী সাহিবে নিসাবের কোন অংশ এতে নেই। অবশ্য যদি তার বর্তমান মালামাল তার সে প্রয়োজন মেটাতে না পারে, যা জিহাদ কিংবা হজ্জের জন্য প্রয়োজন, তবে যদিও নিসাব পরিমাণ মালামাল বর্তমান থাকার কারণে তাকে ধনী বলা যেতে পারে–যেমন এক হাদীসেও তাকে غنى (ধনী) বলা হয়েছে, কিন্তু সেও এ হিসাবে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অথবা হজ্জের জন্য প্রয়োজন তা তার কাছে বর্তমান নয়। 'ফতহুল-কাদীর' গ্রন্থে শায়খ ইবনে হুমাম (র) বলেছেন, সদ্‌কাসংক্রান্ত আয়াতসমূহে যেসব ব্যয়খাতের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির শব্দ স্বয়ং এর প্রমাণ বহন করে যে, সে তার দৈন্য ও অভাবের ভিত্তিতেই হকদার। ফকীর ও মিসকীন শব্দে তো তা সুস্পষ্ট রয়েছে; রেকাব, গারেমীন, ফী-সাবীলিল্লাহ, ইবনুস সাবীল প্রভৃতি শব্দও এরই ইঙ্গিতবহ যে, তাদের অভাব দূর করার ভিত্তিতেই তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য যারা عاملين (আমিলীন) যাকাত উসুলকারী–তাদেরকে দেয়া হয় তাদের সেবার বিনিময়ে। সুতরাং এতে আমীর-ফকীর সমান। যেমন, غارمين-এর খাত সম্পর্কে বর্ণনা

করা হয়েছে যে, যে লোকের উপর দশ হাজার টাকার ঋণ রয়েছে এবং পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে রয়েছে, তাকে পাঁচ হাজার টাকার যাকাত দেয়া যেতে পারে। কারণ যে মাল তার কাছে মওজুদ রয়েছে, তা তার ঋণের দরুন না থাকারই শামিল।

জ্ঞাতব্য ঃ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ শব্দের শাব্দিক অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রাসূলে করীম (সা)-এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তফসীরশাস্ত্রের ইমামদের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কোরআনকে বোঝাতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকেও যাকাতের ব্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোন কোন দিক দিয়ে সৎকাজ কিংবা ইবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরী করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যাকাতের ব্যয়খাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থী। সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা কোরআনকে সরাসরি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে অধ্যয়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাঁদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের যত রকম তফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে হজ্জব্রতী ও মুজাহিদীনের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর একটি উট فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ফী-সাবীলিল্লাহ্) ওয়াকফ করে দিয়েছিল। তখন মহানবী (সা) সে লোকটিকে বলে দেন যে, একে হাজীদের সফরের কাজে ব্যবহার করো।—(মবসূত ৩, পৃ. ১০)

ইমাম ইবনে জরীর ইবনে কাসীর প্রমুখ হাদীসের রিওয়ায়েতের দ্বারাই কোরআনের তফসীর করেন। তাঁদের সবাই فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ শব্দকে এমন মুজাহিদীন ও হজ্জব্রতীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কাছে জিহাদ কিংবা হজ্জ করার উপকরণ নেই। আর যেসব ফিকাহ্‌বিদ মনীষী তালেবে-ইলম কিংবা অন্যান্য সৎকর্মীকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাঁরাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হতে হবে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ফকীর অভাবগ্রস্তরা নিজেই যাকাতের সর্বপ্রথম ব্যয়খাত। এদেরকে ফী-সাবীলিল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা যাকাতের হকদার ছিল। কিন্তু চার ইমাম ও উম্মতের ফিকাহ্‌বিদদের কেউই একথা বলেন নি যে, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে এবং সে সমস্তের যাবতীয় প্রয়োজন যাকাতের ব্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত। বরং তাঁরা এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে বলেছেন যে, যাকাতের মালামাল এসব বিষয়ে ব্যয় করা না-জায়েয। হানাফী ফিকাহবিদ ইমামদের মধ্যে শামসুল আয়িম্মা সারাখ্সী মবসূত দ্বিতীয় খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠায় এবং শরহেসিয়ার চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায় শাফিয়ী ফিকাহবিদদের মধ্যে আবূ ওবায়েদ 'কিতাবুল-আমওয়াল' গ্রন্থে, মালিকী ফিকাহ্‌বিদদের 'দার্দেজ শরহে মুখতাসারুল খলীল' প্রথম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠায় এবং হাম্বলী ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে 'মুত্তাফিক মুগনী' গ্রন্থে এ বিষয়টি সবিস্তারে লিখেছেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ও ফিকাহ্‌বিদদের উল্লিখিত এই বিশ্লেষণ ছাড়াও যদি একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, তবে এ বিষয়টি বোঝার জন্য যথেষ্ট। তাহ্‌লো এই যে, যাকাতের মাস'আলার ক্ষেত্রে যদি এতই ব্যাপকতা থাকত যে, সমস্ত ইবাদত-উপাসনা ও যাবতীয় সৎকাজে ব্যয় করাই এর অন্তর্ভুক্ত, তাহলে আর কোরআনে এই আটটি খাতের আলোচনা (নাউযুবিল্লাহ) একেবারেই বেকার হয়ে যেত। তাছাড়া এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে বাণীই যথেষ্ট যাতে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সদ্‌কার ব্যয়খাত নির্ধারণের বিষয়টি নবীগণকে সমর্পণ করেন নি। বরং তিনি নিজেই এর আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

অতএব, সমস্ত ইবাদত-উপাসনা ও সৎকর্মই যদি فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর মর্মভুক্ত হতো এবং এর যে কোনটিতে যাকাতের মালামাল ব্যয় করা যেত, তবে (নাউযুবিল্লাহ্) নবী (সা)-এর বাণীও সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রতিপন্ন হয়ে যেত। কাজেই বোঝা যাচ্ছে فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর আভিধানিক অর্থ দেখেই অজ্ঞজনের নিকট যে ব্যাপক বলে মনে হয় তা কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রকৃত মর্ম হলো তাই, যা রাসূলে করীম (সা), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীন (র)-গণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রমাণিত।

অষ্টম খাত হলো ابن السبيل (ইবনুস সাবীল)। سبيل অর্থ পথ। আর ابن অর্থ মূলত পুত্র হলেও আরবী পরিভাষায় ابن ও اب ও اخ প্রভৃতি সেসমস্ত বিষয়ের জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক কারো সাথে থাকে। এই পরিভাষা অনুযায়ীই ابن السبيل বলা হয় পথিক ও মুসাফিরকে। কারণ পথ অতিক্রম করা এবং গন্তব্য স্থানের সন্ধান করার সাথে তাদের সম্পর্কও অতি নিবিড়। আর যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বোঝানোই উদ্দেশ্য; যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাক না কেন! এমন মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেয়া যেতে পারে যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হবে।

এ পর্যন্ত যাকাতের সে আটটি খাতের বিবরণ সমাপ্ত হলো, যা উল্লিখিত আয়াতে সদ্‌কা ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার এমন কিছু মাস'আলা বর্ণনা করা যাচ্ছে যেগুলো একইভাবে সে সমস্ত খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মালিকানা ঃ অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এ সব খাতের কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তাদেরই উপকারকল্পে ব্যয় করা হয়, তবুও যাকাত আদায় হবে না। সে কারণেই চার ইমামসহ উম্মাহ্‌র অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের অর্থ মসজিদ-মাদ্রাসা কিংবা হাসপাতাল-এতীমখানা নির্মাণ অথবা তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েয নয়। যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা সেই ফকীর-মিসকীন ও অন্যরা প্রাপ্ত হয়, যারা যাকাতের খাত হিসাবে গণ্য, কিন্তু তাদের মালিকানা-স্বত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য এতীমখানাগুলোতে যদি মালিকানা-স্বত্ব হিসাবে এতীমদের খাওয়া-পরা দেয়া হয়, তবে সে ব্যয়ের অনুপাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। তেমনিভাবে হাসপাতালসমূহে

যেসব ওষুধ অভাবী গরীবদেরকে মালিকানা অধিকার মুতাবিক দিয়ে দেয়া হয়, তার মূল্যও যাকাতের অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। এমনিভাবে উম্মাহ্‌র ফিকাহ্‌বিদদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লা-ওয়ারিস মৃতের কাফন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যেতে পারে না। কারণ মৃতের মালিক হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। তবে যাকাতের অর্থ যদি কোন গরীব হকদার লোককে দিয়ে দেয়া হয় এবং সে স্বেচ্ছায় সে অর্থ লা-ওয়ারিস মৃতের কাফনে ব্যয় করে, তাহলে তা জায়েয। তেমনিভাবে যদি সে মৃতের উপর ঋণ থাকে, তবে সে ঋণ সরাসরি যাকাতের অর্থের দ্বারা আদায় করা যায় না। তবে তার কোন ওয়ারিস যদি গরীব ও যাকাতের হকদার হয়, তবে তাকে মালিকানার ভিত্তিতে তা দেয়া যেতে পারে। তখন সে সে অর্থের মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছায় তা দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনিভাবে জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম—যেমন কূপ খনন, পুল নির্মাণ কিংবা সড়ক তৈরি প্রভৃতি—যদিও এসবের মাধ্যমে যাকাত পাবার যোগ্য লোকেরাও উপকৃত হয়, কিন্তু এতে তাদের মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

এই মাস'আলার ব্যাপারে চার 'ইমামে-মুজতাহিদীন'—ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এবং মুসলিম ফিকাহ্‌বিদগণ সবাই একমত। শামসুল আয়িম্মা সারাখ্‌সী এ বিষয়টিকে ইমাম মুহাম্মদ (র)-র গ্রন্থরাজির ব্যাখ্যা বা শরাহ্ 'মবসূত' ও 'শরহে সিয়ারে' পূর্ণ গবেষণাসহ সবিস্তারে লিখেছেন এবং শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বলী ফিকাহ্‌বিদগণের সাধারণ কিতাবসমূহে এর বিশ্লেষণ বিদ্যমান রয়েছে।

শাফিয়ী ফিকাহ্‌বিদ ইমাম আবূ ওবাইদাহ্ 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা কিংবা তাকে দাফন-কাফন করার ব্যয় বাবদ এবং মসজিদ নির্মাণ ও নহর-খাল খনন প্রভৃতি কাজে যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েয নয়। সুফিয়ান সওরী (র)-সহ সমস্ত ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, এসব বাবদে ব্যয় করাতে যাকাত আদায় হয় না। কেননা এগুলো সে আটটি খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যার উল্লেখ কোরআনে করীমে এসেছে।

তেমনিভাবে হাম্বলী ফিকাহ্‌বিদ মুওয়াফফিক (র) 'মুগনী' গ্রন্থে লিখেছেন, সেসমস্ত খাত ব্যতীত যা কোরআন করীমে উল্লেখ রয়েছে অন্য কোন সৎকাজেই যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েয নয়। যেমন মসজিদ, পুল, পানির ব্যবস্থা করা কিংবা সড়ক মেরামত অথবা মৃতের কাফন-দাফন বা মেহমানদের খানা খাওয়ানো প্রভৃতি যা সন্দেহাতীতভাবেই সওয়াবের কাজ বটে, কিন্তু যাকাতের খাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মালিকুল-ওলামা তাঁর 'বিদায়া' গ্রন্থে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের পক্ষে দলীল দিয়েছেন যে, কোরআনে সাধারণত যাকাত ও ওয়াজিব সদ্‌কার ক্ষেত্রে اِيْتَاءٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ – اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ – اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ প্রভৃতি আর ايتاء শব্দটি অভিধানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগিব ইসফাহানী (র) 'মুফরাদাতে কোরআন' গ্রন্থে বলেছেন ঃ والايتاء الاعطاء وخص وضع الصدقة فِى القران بالايتاء অর্থাৎ ঈতা' অর্থ দান করা

আর কোরআনে ওয়াজিব সদ্‌কা আদায় করাকে ঈতা শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কাউকে কোন কিছু দান করার মর্ম এটাই যে, তাকে সে বস্তুর মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

তাছাড়া যাকাত ছাড়াও ايتاء শব্দটি কোরআন করীমে মালিক বানিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, اٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে তাদের মোহ্‌রানা দিয়ে দাও। আর একথা সুস্পষ্ট যে, মোহ্‌রানা পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে যখন মোহরের অর্থের উপর স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, কোরআনে করীমে যাকাতকে 'সদ্‌কা' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ আর صدقة (সদকাহ্)-এর প্রকৃত অর্থ তাই যে, কোন ফকীর অভাবগ্রস্তকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

কাউকে খাবার খাইয়ে দেয়া কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দেয়াকে প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে 'সদ্‌কা' বলা হয় না। শায়খ ইবনে হুমাম 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে বলেছেন, সদ্‌কার তাৎপর্যও তাই যে, কোন কাফিরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে। এমনিভাবে ইমাম জাসসাস 'আহ্‌কামুল কোরআনে' বলেছেন, 'সদ্‌কা' শব্দটি হলো মালিক করে দেয়ার নাম। (জাসসাস, ২য় খঃ, ১৫২ পৃ.)

যাকাত পরিশোধ সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা ঃ হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা) হযরত মুআয (রা)-কে সদ্‌কা আদায় করার ব্যাপারে এই হিদায়েত দিয়েছিলেন যে, خذها من اغنياءهم وردها فى فقرائهم অর্থাৎ সদ্‌কা মুসলমানদের ধনী মালদার লোকদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই ফকীর-মিসকীনদের মাঝে ব্যয় কর। এ হাদীসের ভিত্তিতে ফিকাহবিদগণ বলেছেন যে, প্রয়োজন ব্যতীত এক শহর বা জনপদের যাকাত অন্য শহর বা জনপদে যেন পাঠানো না হয়, বরং সে শহর ও জনপদের ফকীর-মিসকীনরাই তার বেশি হকদার। অবশ্য কারো কোন নিকটাত্মীয় যদি গরীব হয় এবং সে অন্য কোন শহর বা জনপদে থাকে, তবে স্বীয় যাকাত তার জন্য পাঠাতে পারে। কারণ রাসূলে করীম (সা) এতে দ্বিগুণ সওয়াবের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তেমনিভাবে যদি অন্য কোন জনপদের লোকদের দৈন্য ও অনাহারক্লিষ্টতা ও নিজের শহর অপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয়তার কথা জানা যায়, তাহলে সেখানেও পাঠানো যেতে পারে। কারণ যাকাত দানের আসল উদ্দেশ্য হলো ফকীর-মিসকীনদের অভাব দূর করা। এজন্যই হযরত মুআয (রা) ইয়ামেনের সদ্‌কার মধ্যে বেশির ভাগ কাপড় নিতেন, যাতে গরীব মুহাজিরদের জন্য তা মদীনায় পাঠাতে পারেন। (দারে কুতনীর উদ্ধৃতিতে কুরতুবী)

যদি কোন একটি লোক এক শহরে থাকে, কিন্তু তার মালামাল থাকে অন্য শহরে তবে যে শহরে সে নিজে থাকে তারই হিসাব করতে হবে। কারণ যাকাত দেয়ার জন্য এ লোকটিকেই সম্বোধন করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ যে মালের যাকাত ওয়াজিব তা আদায় করার জন্য এমন করাও জায়েয যে, সে মালের চল্লিশ ভাগের একভাগ তা থেকে পৃথক করে যাকাতের হকদারকে দিয়ে দেবে। যেমন ব্যবসায়ের কাপড়, বাসন-কোসন, আসবাবপত্র প্রভৃতি। আবার এও হতে পারে যে,

যাকাতের পরিমাণ মালের মূল্য বের করে নিয়ে তা হকদারদের মাঝে বন্টন করে দেবে। সহীহ্ হাদীসমূহের দ্বারা এমন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। —(কুরতুবী)। আর কোন কোন ফিকাহ্বিদ বলেছেন যে, বর্তমান যুগে নগদ মূল্য দান করাই উত্তম। তার কারণ ফকীর-মিসকীনদের বিভিন্ন রকমের প্রচুর প্রয়োজনয়ীতা রয়েছে, নগদ পয়সা পেলে সে যেকোন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।

মাস'আলা ঃ যদি যাকাতের হকদার আপনজন হয়, তবে তাদেরকে যাকাত সদ্কা দান করা অধিকতর উত্তম এবং তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। একটি সওয়াব সদ্কার এবং অপরটি আত্মীয় বৎসলতার। এতে এমন কোন আবশ্যকতাও নেই যে, তাদেরকে একথা জানিয়ে দেবে যে, এদেরকে যাকাত সদ্কা দেয়া হচ্ছে। কোন উপহার-উপঢৌকন হিসেবেও দেওয়া যেতে পারে, যাতে গ্রহীতা ভদ্রলোক নিজের হীনতা অনুভব করতে না পারে।

মাস'আলা ঃ যে লোক নিজকে নিজের কথা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে যাকাত পাবার যোগ্য অভাবী বলে প্রকাশ করে এবং সদ্কা প্রভৃতি চায়, তবে দাতার জন্য কি তার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন ? আর যাচাই না করে কি সদ্কা দেবে না ? এ প্রশ্নে হাদীসের রিওয়ায়েত ও ফিকাহ্বিদগণের বক্তব্য এই যে, এর কোন প্রয়োজন নেই। বরং বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা যদি এ ধারণা প্রবল হয় যে, এ লোকটি প্রকৃতই ফকীর ও অভাবগ্রস্ত, তবে তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। যেমন, হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে অত্যন্ত দুরবস্থায় কিছু লোক এসে উপস্থিত হলো। তিনি তাদের জন্য লোকদের কাছ থেকে সদ্কা সংগ্রহ করতে বললেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ সংগৃহীত হওয়ার পর সেগুলো তাদের দিয়ে দেয়া হয়। মহানবী (সা) সেসব লোকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি।—(কুরতুবী)

অবশ্য কুরতুবী আহ্কামুল কোরআন গ্রন্থে বলেছেন, সদ্কা-যাকাতের ব্যয়খাতগুলোর মধ্যে একটি রয়েছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, আমার উপর এত বিপুল ঋণ, যাকাতের অর্থ দিন, তবে এই ঋণের প্রমাণ তার কাছে দাবি করা উচিত। (কুরতুবী)। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ঋণগ্রস্ত, বিদেশী মুসাফির, ফী-সাবীলিল্লাহ্, প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এ ধরনের যাচাই করে নেয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়। বরং এসব ব্যয়ক্ষেত্র সম্পর্কে সুযোগমত যাচাই অনুসন্ধান করে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

মাস'আলা ঃ যাকাতের মাল নিজের আত্মীয়-আপনজনদের দেয়া সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী এবং পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে পারস্পরিকভাবে একে অপরকে দিতে পারে না। কারণ এদেরকে দেয়া একদিক দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দেয়ার শামিল। কারণ এসব লোকের খাত সাধারণত যৌথই থাকে। স্বামী যদি স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী যদি স্বামীকে নিজের যাকাত দান করে, তবে প্রকৃতপক্ষে তা নিজেরই ব্যবহারে রয়ে গেল। তেমনিভাবে পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপার। সন্তানের সন্তান এবং দাদা-পরদাদারও একই হুকুম; তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ যদি কোন লোক কাউকে নিজের ধারণা অনুযায়ী হকদার ও যাকাতের ব্যয়খাত মনে করে যাকাত দিয়ে দেয় এবং পরে জানা যায় যে, লোকটি তারই ক্রীতদাস ছিল কিংবা

কাফির ছিল, তবে এ যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় দিতে হবে। কারণ ক্রীতদাসের মালিকানা মূলত তার মনিবেরই মালিকানায়। কাজেই তা তার নিজের মালিকানা থেকেই পৃথক হয়নি। তাই এ যাকাতও আদায় হলো না। আর কাফিরকে সদ্কা-যাকাত দেয়া পুণ্যের বিষয় নয়।

এছাড়া পরে যদি জানা যায় যে, যাকে যাকাত দেয়া হয়েছে সে সম্পদশালী, সৈয়দ বা হাশেমী বংশোদ্ভূত ছিল কিংবা নিজেরই পিতা, পুত্র, স্বামী অথবা স্ত্রী ছিল, তবে সে ক্ষেত্রে পুনরায় যাকাত দানের প্রয়োজন নেই। কারণ যাকাতের অর্থ তার মালিকানা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সওয়াবের স্থানে পৌছেছে। তবে খাত নির্ধারণে সন্দেহের কারণে যে ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তা মাফ।–(দুররে মুখতার)। সদ্কার আয়াতের তফসীর এবং তার প্রাসঙ্গিক মাস'আলা-মাসায়েলের প্রয়োজনীয় বিবরণ সমাপ্ত হলো।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ
خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾
يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ
يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ
الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ
بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾
وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ
وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ
بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً
بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

(৬১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয়, এবং বলে, এলোকটি তো কানসর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুত তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহমতবিশেষ। আর যারা আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (৬২) তোমাদের সামনে আল্লাহ্র কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্কে এবং তার রাসূলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী। (৬৩) তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্র সাথে এবং তার রাসূলের সাথে যে মুকাবিলা করে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সবসময় থাকবে। এটিই হলো মহা-অপমান। (৬৪) মুনাফিকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক; আল্লাহ্ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে ? (৬৬) ছলনা করো না; তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ তারা ছিল গুনাহ্গার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সেসব মুনাফিকের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নবী করীম (সা)-কে কষ্ট দান করে। (অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে এমন সব কথা বলে যা শুনে তিনি কষ্ট পান। আর (এ ব্যাপারে যখন কেউ বাধা দেয় কিংবা বারণ করে, তখন) বলে, তিনি সব কথাই কান লাগিয়ে শুনে নেন। (তাঁকে মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দেয়া সহজ ব্যাপার। কাজেই কোন ভাবনা নেই। উত্তরে) আপনি বলে দিন, [তোমরা নিজেরাই প্রতারিত হয়েছ—রাসূলের কোন কথা শুনে নেয়া দু'রকম হয়ে থাকে। (১) সত্য হিসাবে—যাকে মনে মনেও যথার্থ বলে জানেন এবং (২) সদাচার ও মহৎ স্বভাবের তাগিদ হিসাবে অর্থাৎ এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, কথাটি একান্তই ভুল স্বীয় মহৎ স্বভাবের দরুন তা প্রত্যাখ্যান করেন না কিংবা বক্তার প্রতি কটাক্ষও করেন না এবং সরাসরি মিথ্যাও বলেন না। বস্তুত] সে নবী কান দিয়ে (মনোযোগের সাথে) তো সেসব কথাই শুনেন যা তোমাদের পক্ষে (কল্যাণই) কল্যাণকর। (সারমর্ম হচ্ছে এই যে,) তিনি আল্লাহ্র (কথা ওহীর মাধ্যমে জেনে নিয়ে তাঁর) উপর ঈমান আনেন (যার সত্যতা স্বীকার করার কল্যাণ, সমগ্র বিশ্বের জন্যই সুবিদিত। কারণ শিক্ষা ও ন্যায়বিচার সত্যতার স্বীকৃতির উপরই নির্ভরশীল।) আর (তিনি নিষ্ঠাবান) মু'মিনদের (ঈমান ও নিষ্ঠাভিত্তিক) কথায় বিশ্বাস করেন। (বস্তুত এ বিষয়টির কল্যাণকারিতাও স্পষ্ট। কারণ সাধারণ ন্যায়বিচার ঘটনার যথাযথ সংবাদ ও অবগতির উপরই নির্ভরশীল। আর এর মাধ্যমে হচ্ছেন এই নিষ্ঠাবান মু'মিনবৃন্দ। যা হোক, কান দিয়ে

মনোযোগ সহকারে এবং সত্য বিবেচনায় তো শুধু সত্য ও নিষ্ঠাবানদের কথাই শুনেন) তবে (তোমাদের কটু কথাও যে তিনি শুনেন), তার কারণ হলো এই যে, তিনি সেসব লোকের অবস্থার উপর করুণা করেন, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান প্রকাশ করে (যদিও তাদের অন্তরে ঈমান থাকে না। সুতরাং এই করুণা ও সদাচারের কারণেই তোমাদের কথাও শুনে নেন। আর এই বাস্তব সত্যটি জানা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করেন। কাজেই এই শোনা অন্যরকম। তোমরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার দরুন এ শ্রবণকেও প্রথম প্রকারের শ্রবণ বলেই মনে কর। সার কথা এই যে, তোমরা মনে কর যে, প্রকৃত সত্যটি হুযুর বোঝেন না অথচ আসলে সত্য বিষয়টি তোমরাই বুঝতে পার না।) আর যারা রাসূল (সা)-কে কষ্ট দেয় তো সেসব কথার দ্বারাই হোক যা বলার পর أُذُنٌ বলেছিল কিংবা هوازن বলেই হোক—(হুযুরকে اذن বা কালা বলে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য ছিল যে, মাআযাল্লাহ্—তাঁর কোন বুঝ নেই, যা কিছু শুনেন, তাই মেনে নেন)। তাদের বেদনাদায়ক শাস্তি হবে। এসব লোক তোমাদের (মুসলমানদের) সামনে (মিথ্যা) কসম খায় (যে, আমরা অমুক কথা বলিনি কিংবা আমরা অমুক অসুবিধার কারণে যুদ্ধে যেতে পারিনি—) যাতে তোমাদের রাযী করাতে পারে (যাতে তাদের জানমাল নিরাপদ থাকে)। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে বেশি অধিকার রাখেন যে, এরা যদি সত্যিকার মুসলমান হয়, তবে তাঁকে রাযী করবে (যা নিষ্ঠা ও ঈমানের উপর নির্ভরশীল) তাদের কি এ বিষয় জানা নেই যে, যে লোক আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে, (যেমন এরা করছে) একথা স্থিরীকৃত হয়ে আছে যে, এমন সব লোকের ভাগ্যে দোযখের আগুন এমনভাবে ঘটবে যে, তাতে তারা চিরকালই বাস করবে। (বস্তুত) এটি হলো বড়ই অপমানজনক (বিষয়)। যারা মুনাফিক তারা (স্বভাবতই) এ ব্যাপারে আশঙ্কা করে যে, মুসলমানদের উপর (ওহীর মাধ্যমে) এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে যায় যা তাদেরকে মুনাফিকদের অন্তরের গোপন তথ্য অবহিত করে দেবে। (অর্থাৎ তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপাত্মক কথা গোপনে বলেছে মুসলমানদের হিসাবে সেগুলো মনের গোপন রহস্যেরই অনুরূপ—এবং তাদের ভয়, সেগুলো না মুসলমানদের নিকট ফাঁস হয়ে যায়!) আপনি বলে দিন, যাই হোক, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক। (এতে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সম্পর্কে অবগতির বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব পরে বলা হচ্ছে—) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সে বিষয়টি প্রকাশ করবেনই, যার (ফাঁস হয়ে যাবার) ব্যাপারে তোমরা আশঙ্কা করছিলে। বস্তুত আমি প্রকাশ করে দিয়েছি যে, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে। আর (তা ফাঁস হয়ে যাবার পর) আপনি যদি তাদের কাছে (এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের) কারণ জিজ্ঞেস করেন, তবে বলে দেবে, আমরা তো এমনিতেই হাসি-কৌতুক করছিলাম। (এর বাস্তব অর্থ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু সফরটা যাতে সহজ হয়, সে জন্য কেবলমাত্র মনে আনন্দলাভের জন্য এসব কথা মুখে মুখে বলছিলাম।) আপনি (তাদের) বলে দিন যে, তোমরা কি তাহলে আল্লাহ্র সাথে, তাঁর আয়াতসমূহের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে হাসি-তামাশা করছিলে? (অর্থাৎ উদ্দেশ্য যাই থাকুক, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, তোমরা ঠাট্টা কার প্রতি করছ! এ ধরনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ কোন উদ্দেশ্যেই জায়েয নয়। কাজেই) এখন আর তোমরা (নিরর্থক) ওযর করো

না। (অর্থাৎ কোন ওযর-আপত্তিই কবুল হবে না। আর এতদ্বয়ের দরুন ঠাট্টা করা বৈধ হয়ে যাবে না।) তোমরা তো নিজেদের মু'মিন বলে পরিচয় দিয়ে কুফরী করতে শুরু করেছ। (কারণ দীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা একান্তই কুফরী, যদিও তাদের অন্তরে পূর্ব থেকেই ঈমান বিদ্যমান ছিল না। অবশ্য কেউ যদি অন্তরের সাথে তওবা করে নেয় এবং প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায়, তবে অবশ্য কুফরী ও কুফরীর আযাব হতে অব্যাহতি লাভ করবে। কিন্তু সে তওফীকও সবার হবে না। অবশ্য কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাবে এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে,) তোমাদের মধ্যে কারো কারোকে যদি ছেড়েও দেই (যেহেতু তারা মুসলমান হয়ে গেছে) তবু আমি কারো কারোকে (অবশ্যই) শাস্তি দান করব এ কারণে যে, তারা (খোদায়ী জ্ঞান অনুযায়ী) ছিল পাপী (অর্থাৎ তারা মুসলমান হয়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহেও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মত মুনাফিকদের নিরর্থক আপত্তি প্রদর্শন ও রাসূলে করীম (সা)-কে কষ্ট দান এবং অতঃপর মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের ঈমান সম্পর্কে অন্যের বিশ্বাস সৃষ্টির ঘটনা এবং সে ব্যাপারে সতর্কতা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ঠাট্টাস্বরূপ বলে থাকে যে, তিনি তো কান বিশেষ মাত্র। অর্থাৎ কারো কাছে কোন কিছু শুনতে পারলেই তাতে বিশ্বাস করে বসেন। কাজেই আমাদের কোন চিন্তার কারণ নেই। আমাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়লেও পরে আমরা কসম খেয়ে নিজেদের নির্দোষিতা সম্পর্কে বিশ্বাস করিয়ে দেব। তারই উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নির্বুদ্ধিতা বিধৃত করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি যে মুনাফিক ও বিরোধী লোকদের ভ্রান্ত কথা শুনেও নিজের সৎস্বভাবের কারণে চুপ করে থাকেন, তাতে একথা বুঝে না যে, শুধু তোমাদের কথাতেই বিশ্বাস করে থাকেন। বরং তিনি সব বিষয়েরই যথার্থ তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত। তোমাদের ভ্রান্ত কথা শুনে তিনি তোমাদের সত্যবাদিতায় স্বীকৃত হয়ে যান না। অবশ্য নিজের শালীনতা ও সৎস্বভাবের কারণে তোমাদের কথা মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করেন না।

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ আয়াতে এ খবর দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ করে থাকেন তারই একটি হলো গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা, যখন কিছু মুনাফিক মহানবী (সা)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অবহিত করে সে পথ থেকে সরিয়ে দেন যেখানে মুনাফিকরা এ কাজের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল। —(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্তর জন মুনাফিকের নাম, তাদের পিতৃপরিচয় ও পূর্ণ ঠিকানা-চিহ্নসহ বাতলে দিয়েছিলেন, কিন্তু রাহ্‌মাতুললিল্ আলামীন তা লোকদের সামনে প্রকাশ করেন নি।—(মাযহারী)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿৬৭﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ
وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿৬৮﴾ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً
وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ
كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿৬৯﴾ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ
نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ
اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿৭০﴾

(৬৭) মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শিখায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান। (৬৮) ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্‌ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জন্যে দোযখের আগুনের—তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। (৬৯) যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল শক্তিতে এবং ধন-সম্পদের ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীও ছিল বেশি; অতঃপর উপকৃত হয়েছে নিজেদের ভাগের দ্বারা। আবার তোমরা ফায়দা উঠিয়েছ তোমাদের ভাগের দ্বারা—যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ফায়দা উঠিয়েছিল

নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও চলছ তাদেরই চলন অনুযায়ী। তারা ছিল সে লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেষিত হয়ে গেছে দুনিয়া ও আখিরাতে। আর তারাই হয়েছে ক্ষতির সম্মুখীন। (৭০) তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের, আ'দের ও সামুদের সম্প্রদায় এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের ? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেওয়া হয়েছিল ? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুত আল্লাহ্ তো এমন নন যে, তাদের উপর জুলুম করেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা সবাই একই রকম। তারা খারাপ কথার (অর্থাৎ কুফরী ও ইসলাম বিরোধিতার) শিক্ষা দেয়, ভাল কথা (অর্থাৎ ঈমান ও নবীর আনুগত্য) থেকে বারণ করে এবং (আল্লাহ্র রাহে খরচ করতে) নিজের হাতকে বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহ্র প্রতি লক্ষ্য করেনি (অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করেনি) সুতরাং আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহমত করেন নি। নিঃসন্দেহে এসব মুনাফিক অত্যন্ত উদ্ধত। আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও নারীদেরকে এবং যারা (প্রকাশ্য) কুফরী করে তাদের জন্য দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এটি তাদের জন্য (শাস্তি হিসাবে) যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূর করে দেবেন এবং (ওয়াদা অনুযায়ী) তাদের উপর আযাব হবে চিরস্থায়ী। (হে মুনাফিককুল! কুফরী ও কুফরীর সাজাপ্রাপ্তির দিক দিয়ে) তোমাদের অবস্থা তাদেরই মত যারা তোমাদের পূর্ববর্তীকালে বিগত হয়ে গেছে; যারা ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল। তারা নিজেদের (পার্থিব) অংশের দ্বারা প্রচুর ফায়দা লুটেছে। তোমরাও তোমাদের (পার্থিব) অংশের দ্বারা ফায়দা লুটেছ; যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিজেদের (পার্থিব সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্যের) অংশের দ্বারা ফায়দা লুটেছিল। আর তোমরা খারাপ বিষয়ের ভেতরে তেমনি মজে গেছ, যেমন করে তারা (খারাপ) বিষয়ে মজে ছিল। তাদের (সৎ) কর্মসমূহ দুনিয়া ও আখিরাত (সর্ব) ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয়ে গেছে (—দুনিয়াতে তাদের সেসব কাজের জন্য সওয়াবের কোন সুসংবাদ যেমন নেই তেমনি আখিরাতে কোন সওয়াব নেই।) আর (দুনিয়া ও আখিরাতে এহেন বিনষ্টের দরুন) তারা বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে আছে। (উভয় জগতেই সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তেমনি তোমরাও যখন তাদের মতই কুফরী কর, তখন তোমরাও তাদের মতই বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসেনি। তোমাদের এসব বস্তুসামগ্রীও কোন কাজে আসবে না।—এই তো গেল পরকালীন ক্ষতির কথা ; অতঃপর পার্থিব ক্ষতির কথা আলোচনা করে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে,) এদের কাছে কি সেসব লোকের (আযাব ও ধ্বংসের) সংবাদ পৌঁছায়নি যারা এদের পূর্বকালে বিগত হয়েছে ? যেমন, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়, আদ ও সামুদ জাতি এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও মাদইয়ানের অধিবাসীবৃন্দ এবং উল্টে দেয়া জনপদ—(অর্থাৎ লূতের জাতির জনপদ)। সুতরাং (এই ধ্বংসের ক্ষেত্রে)

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর জুলুম করেন নি, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করত। (কাজেই এসব মুনাফিককেও ভয় করা উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিতে মুনাফিকদের একটি অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের হাতকে বন্ধ করে রাখে ঃ يَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, হাত বন্ধ রাখার অর্থ জিহাদ বর্জন ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ-এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তারা যখন আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, তখন আল্লাহ্ও তাদেরকে ভুলে গেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ ভুল বা বিস্মৃতির দোষ থেকে মুক্ত। কাজেই এখানে এর মর্ম এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্‌কামকে এমনভাবে বর্জন করেছে যেন একেবারে ভুলেই গেছে, তাই আল্লাহ্ তা'আলাও আখিরাতের সওয়াবের ব্যাপারে তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন যে, নেকী ও সওয়াবের তালিকায় তাদের নাম থাকেনি।

৬৯তম আয়াত ঃ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ–এতে এক তফসীর অনুযায়ী মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তী ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় তফসীর মতে এতে মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। (অর্থাৎ اَنْتُمْ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ) মর্ম এই যে, তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরই মত। তারা যেমন পার্থিব ভোগ-বিলাসে মজে গিয়ে আখিরাতকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়েছিল এবং নানাবিধ পাপ ও অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তেমনিভাবে তোমরাও তাই করবে।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন তোমরাও সে পন্থা অবলম্বন করবে যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা করেছে—হাতের মধ্যে হাত, বিঘতের মধ্যে বিঘত। অর্থাৎ হুবহু তাদের নকল করবে। এমনকি তাদের মধ্যে যদি কেউ গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তবে তোমরাও ঢুকবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এ রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, এই হাদীসের সত্যায়নকল্পে যদি তোমাদের মন চায়, তবে কোরআনের كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াতটি পাঠ করে নাও।

একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, مَا اَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ অর্থাৎ আজকের রাতটির গত রাতের সাথে কতই না মিল রয়েছে এবং তার সাথে কতই না সামঞ্জস্যশীল। ওরা ছিল বনী ইসরাঈল, আমাদেরকে তাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। (কুরতুবী)

হাদীসের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, শেষ যমানার মুসলমানরাও ইহুদী-নাসারাদেরই মত পথ চলতে আরম্ভ করবে। আর মুনাফিকদের আযাবের বর্ণনার পরে এ বিষয়টির আলোচনায় এ ইঙ্গিতও বোঝা যায় যে, ইহুদী-নাসারাদের মত ও পথের অনুসারী মুসলমান তারাই হবে যাদের অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান নেই। নেফাকের জীবাণু তাদের মধ্যে বিদ্যমান। উম্মতের সৎলোকদের তা থেকে বাঁচার জন্য এ আয়াতে হিদায়েত দেওয়া হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ
اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾ يٰاَيُّهَا
النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

(৭১) আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৭২) আল্লাহ্ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এটিই হলো মহান কৃতকার্যতা। (৭৩) হে নবী, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফিকদের সাথে; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো দোযখ এবং তাহলো নিকৃষ্ট ঠিকানা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীরা হলো পরস্পরের দীনী সহচর। তারা সৎ ও কল্যাণের শিক্ষা দেয় এবং অসৎ ও অকল্যাণ থেকে বারণ করে। নিয়মিত নামায পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করে। অবশ্যই তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত করবেন। (— وعد الله -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শীঘ্রই এ বিষয়ের বিশ্লেষণ আসছে।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা (একক) ক্ষমতাশীল। (তিনি পরিপূর্ণ প্রতিদান দিতে সক্ষম।)

সুকৌশলী (তিনি যথাযথ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। অতঃপর সে রহমতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের সাথে এমন (জান্নাত বা) কানন-কুঞ্জের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণসমূহ বইতে থাকবে। তাতে তারা চিরকাল বাস করতে থাকবে এবং মনোরম পরিচ্ছন্ন বাসগৃহের (প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন) যা সেসব চিরস্থায়ী কানন-কুঞ্জসমূহে অবস্থিত থাকবে। আর (এ সমুদয় নিয়ামতের সাথে সাথে জান্নাতবাসীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সার্বক্ষণিক যে) সন্তুষ্টি বিরাজ করবে তা হবে সেসব নিয়ামত অপেক্ষা বড় বিষয়। এই (উক্ত প্রতিদানই) হলো সবচেয়ে মহান কৃতকার্যতা। হে নবী (সা) কাফিরদের সাথে (সশস্ত্রভাবে) এবং মুনাফিকদের সাথে (মৌখিকভাবে) জিহাদ করুন। এবং তাদের উপর কঠোর হোন (দুনিয়াতে) এরা তারই যোগ্য। আর (আখিরাতে) তাদের ঠিকানা হলো দোযখ এবং তা নিকৃষ্ট স্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের অবস্থা তাদের ষড়যন্ত্র ও কষ্ট দেওয়া এবং সেজন্য তাদের আযাবের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কোরআনের বর্ণনারীতি অনুযায়ী এখানে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের অবস্থা এবং তাদের সওয়াবের বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত। কাজেই আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাই বিবৃত হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে মুনাফিকীন ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু একটি জায়গায় মুনাফিকদের বেলায় بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ বলা হলেও এর তুলনা করতে গিয়ে মু'মিনদের আলোচনা এলে সেখানে بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ শুধুমাত্র বংশগত সমন্বয় ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কাজেই তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয়, না তাতে সে ফল লাভ সম্ভব হতে পারে, যা আন্তরিক ভালবাসা ও আত্মিক সহানুভূতির মাধ্যমে হতে পারে। পক্ষান্তরে মু'মিনগণ একে অপরের আন্তরিক বন্ধু এবং সত্যিকার মহানুভব। —(কুরতুবী)

আর তাদের এ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি যেহেতু একান্তভাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে হয়ে থাকে, কাজেই তা প্রকাশ্যে, গোপনে এবং উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে একই রকম হয় এবং চিরকাল স্থায়ী হয়। নিষ্ঠাবান মু'মিনের লক্ষণও এটিই। ঈমান ও নেক আমলের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাতে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারেই কোরআন করীম বলছে ঃ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলের পাবন্দী অবলম্বন করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিক গভীর বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেন। বর্তমানকালে আমাদের ঈমান ও সৎকর্মের ত্রুটির কারণেই মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে এমনটি দেখা যায় না। বরং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে পড়েছে।

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাফির ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রকাশ্যভাবে যারা কাফির তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হলো মৌখিক জিহাদ অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবিতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। —(কুরতুবী, মাযহারী)

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এতে غلظ -এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোন রকম রিওয়ায়েত বা কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি رافت-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হলো কোমলতা ও করুণা।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন যে, এক্ষেত্রে غلظت শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বুঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরীয়তের হুকুম জারি করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ তা নবী-রাসূলগণের রীতি বিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি করতেন না। এক হাদীসে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولايثرب عليها

"যদি তোমাদের কোন ক্রীতদাসী যিনায় লিপ্ত হয় তবে শরীয়ত অনুযায়ী তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভর্ৎসনা বা গালাগালি করো না।" —(কুরতুবী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

"আপনি যদি কটুবাক ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।" তাছাড়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রীতিনীতিতেও কোথাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফির ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ একান্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইসলাম যেখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে غـلاظت বা কটুবাক্য অবলম্বন করেনি, ইদানীংকালে মুসলমান অপর মুসলমানদের সম্পর্কে অবলীলাক্রমে তাই ব্যবহার করে চলেছে এবং কিছু লোক তো এমনও রয়েছে যারা একে দীনের খিদমত বলে মনে করে আনন্দিত হয়ে থাকে।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَا

مِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ
اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ
وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا
وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ
اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

(৭৪) তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুত এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবেন আল্লাহ্ তা'আলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখিরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী সমর্থক নেই। (৭৫) তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। (৭৬) অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গিয়েছে তা ভেঙ্গে দিয়ে। (৭৭) তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছিল এবং এজন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। (৭৮) তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্ তাদের রহস্য ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কসম খেয়ে ফেলে যে, আমরা অমুক কথা [যেমন, রাসূল (সা)-কে হত্যা করা হোক,] বলিনি। অথচ নিশ্চিতই তারা এ কুফরী কথা বলেছিল। [কারণ রাসূল (সা)-কে হত্যা

করা সম্পর্কে সলাপরামর্শ করা যে কুফর তা বলাই বাহুল্য।] আর (সে কথা বলে তারা) নিজেদের (বাহ্যিক) ইসলামের পর (প্রকাশ্যতও) কাফির হয়ে গেছে। (যদিও তারা তা নিজেদের সমাবেশেই বলেছিল, কিন্তু মুসলমানরাও তা জেনে ফেলে এবং সাধারণের সামনেও তাদের এ কুফরী প্রকাশ হয়ে পড়ে।) আর তারা এমন বিষয়ে ইচ্ছা করেছিল যা তাদের হাতে এলো না। [অর্থাৎ রাসূল (সা)-কে হত্যার ইচ্ছা তারা করেছিল, কিন্তু তাতে বিফল হয়।] আর এমন করে তারা সে বিষয়েই বদলা দিয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে আল্লাহর রিযিকের মাধ্যমে সম্পদশালী করেছিলেন। (তাদের কাছেও এ অনুগ্রহেরই হয়তো বদলা ছিল মন্দ করা।) সুতরাং (তারপরেও) যদি তারা তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য (উভয় জগতে) কল্যাণ (ও মঙ্গল) হবে। [বস্তুত জাল্লাস (রা)-এর তওবা করার তৌফিক লাভ হয়ে যায়।] আর যদি (তওবা করতে) অসম্মত হয় (এবং কুফরীতে অটল থাকে), তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে (উভয় কূলে) বেদনাদায়ক শাস্তি দান করবেন। (সুতরাং সারা জীবন বদনাম, পেরেশান ও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা এবং মৃত্যুকালে কঠিন বিপদ প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতিই হচ্ছে পার্থিব আযাব। আর আখিরাতে দোযখ বাস তো আছেই।) তাছাড়া দুনিয়াতে তাদের জন্য না আছে কোন বন্ধু, না আছে কোন সহায় (যে আযাব থেকে রক্ষা করবে। বস্তুত দুনিয়াতে যখন কোন সমর্থক, সাহায্যকারী নেই যেখানে সাধারণত কেউ না কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেই, সুতরাং আখিরাতে সাহায্য লাভের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।) আর এ সব (মুনাফিক) লোকদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতিজ্ঞা করে—[কারণ রাসূল (সা)-এর সাথে ওয়াদা করাই আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করার শামিল। আর সে ওয়াদা এই যে,] যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে (অনেক ধনসম্পদ) দান করেন, তাহলে আমরা (তা থেকে) যথেষ্ট (পরিমাণে) দান-খয়রাত করব এবং (তার মাধ্যমে) আমরা প্রচুর সৎ কাজ সম্পাদন করব। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে (বিপুল সম্পদ) দান করেন, তখন তাতে কার্পণ্য করতে শুরু করে—(তার যাকাত দানে বিরত থাকে) এবং (আনুগত্যে) বিমুখতা করতে থাকে। তারা যে (পূর্ব থেকেই) বিমুখতায় অভ্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (এ কাজের) শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরে কুটিলতা বদ্ধমূল করে দেন, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তনের দিন পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) বলবৎ থাকবে। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং এ কারণে যে, (তারা এই ওয়াদার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই) মিথ্যা বলছিল (অর্থাৎ তখনও এ ওয়াদা পূরণের নিয়ত ছিল না। কাজেই তখনও তাদের মনে কুটিলতা ও মুনাফিকীই বিদ্যমান ছিল। আর তারই শাখা হলো মিথ্যাচরণ ও ওয়াদা ভঙ্গ করা। অতঃপর এই মিথ্যা ও ওয়াদা ভঙ্গের কারণে তারা অধিকতর গযবের যোগ্য হয়ে পড়ে এবং এই গযবের আধিক্যের পরিণতি হয়েছে এই যে, পূর্ববর্তী কুটিলতাই এখন স্থায়ী হয়ে যায়, যাতে তাদের ভাগ্যে তওবাও জুটবে না এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অনন্তকাল যাবত জাহান্নামবাসী হবে। আর গোপন কুফরী সত্ত্বেও যে তারা ইসলাম প্রকাশ করে তবে) কি সে মুনাফিকরা এ খবর জানে না যে, আল্লাহ্

তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন রহস্য ও তাদের গোপন সলাপরামর্শ সবই জানেন এবং (তারা কি জানে না যে,) গায়েবের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত ? সুতরাং তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও আনুগত্য তাদের কোন কাজেই লাগতে পারে না, বিশেষত আখিরাতে। অতএব, জাহান্নামের শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াত يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ-তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরী সব কথাবার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের শুচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (র) এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) গযওয়ায়ে তাবুকের ক্ষেত্রে এক ভাষণ দান করেন, যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজে বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ (সা) যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রা) নামক এক সাহাবী শুনে ফেলেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রা) এ ঘটনা মহানবী (সা)-কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে কায়েস (রা) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) উভয়কে 'মিম্বরে নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে! হযরত আমের (রা)-র পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ্! আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বলেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীল আমীন ওহী নিয়ে হাযির হন, যাতে উল্লিখিত আয়াতখানি নাযিল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল। আমের ইবনে কায়েস (রা) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়।—(মাযহারী)

কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষত এজন্য যে, আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا অর্থাৎ তারা এমন এক কাজের চিন্তা করল, যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে

প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি এমন কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, যাতে মুনাফিকরা মহানবী (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করেছিল যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বারজন লোক পাহাড়ি এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসে ছিল যে, মহানবী (সা) যখন এখানে এসে পৌঁছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে হযরত জিবরীল আমীন তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীন চক্রান্ত ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াত ঃ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ এটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তাবারানী ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ উমামাহ্ বাহেলী (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবাহ্ ইবনে হাতেব আনসারী রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল যে, হুযূর দোয়া করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দেব। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করে দিলেন, যার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে মহানবী (সা)-এর সঙ্গে আদায় করতো এবং অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিত, যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম'আর নামাযের জন্য সে মদীনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামায সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুমআ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশি বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রাসূলে করীম (সা) একথা শুনে তিনবার বললেন— يَاوَيْحَ ثَعْلَبَةَ অর্থাৎ সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস!

ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদ্‌কার আয়াত নাযিল হয়, যাতে রাসূলে করীম (সা)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে সদ্‌কা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً তিনি পালিত পশুর সদ্‌কার যথাযথ আইন প্রণয়ন করিয়ে দু'জন লোককে সদ্‌কা উসুলকারী বানিয়ে মুসলমানদের পালিত পশুর সদ্‌কা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেন তারা সা'লাবাহ্‌র কাছে যান। এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে যাবার হুকুমও করলেন।

এরা উভয়ে যখন সা'লাবাহ্‌র কাছে গিয়ে পৌঁছাল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিত ফরমান দেখাল তখন সা'লাবাহ বলতে লাগল, এ তো 'জিযিয়া' কর হয়ে গেল যা অমুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। তারপর বলল, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। এঁরা চলে যান।

আর সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী (সা)-এর ফরমান শুনল, তখন নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল তা থেকে সদ্‌কার নিসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রাসূল (সা)-এর সে দুই কর্মকর্তার কাছে হাযির হলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে, পশুসমূহের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বারবার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশিতে এগুলো দিতে চাই; আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন।

অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্যান্য মুসলমানের সদ্‌কা আদায় করে সা'লাবাহ্‌র কাছে এলে সে বলল, দাও দেখি সদ্‌কার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগল যে, এতো এক রকম জিযিয়া করই হয়ে গেল যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া উচিত নয়। যা হোক, এখন আপনারা যান, আমি পরে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব।

যখন এরা মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন, তখন তিনি তাঁদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন যা পূর্বে বলেছিলেন। অর্থাৎ يَاوَيْحَ ثَعْلَبَة يَاوَيْحَ ثَعْلَبَة يَاوَيْحَ ثَعْلَبَة (অর্থাৎ সা'লাবাহ্‌র উপর আফসোস!) কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর সুলাইমীর ব্যাপারে খুশি হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাদের ধনসম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনের প্রাপ্য আদায় করবে। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে। فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফিকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন যাতে তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ এতে বোঝা যায় যে, কোন কোন অসৎ কর্মের এমন অশুভ পরিণতি ঘটে যে, তাতে তওবা করার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। 'নাউযুবিল্লাহ মিনহু' (এহেন অবস্থা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই)।

হযরত আবূ উমামাহ্ (রা)-র সে বিস্তারিত রিওয়ায়েতের পর—যা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো, ইবনে জরীর লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সা'লাবাহ্‌র يا ويح ثعلبة তিন তিনবার বলেন, তখন সে মজলিসে সা'লাবাহ্‌র কতিপয় আত্মীয়-আপনজনও উপস্থিত ছিল। হুযূর (সা)-এর এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবাহ্‌র কাছে গিয়ে পৌছল এবং তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার সম্পর্কে কোরআনে আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সা'লাবাহ্ ঘাবড়ে গেল এবং মদীনায় হাযির হয়ে নিবেদন করল, হুযূর! আমার সদ্‌কা কবূল করে নিন। নবী করীম (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার সদ্‌কা কবূল করতে বারণ করে দিয়েছেন। একথা শুনে সা'লাবাহ্ নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল।

হুযূর (সা) বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। এখন আর তোমার সদকা কবূল হতে পারে না। তখন সা'লাবাহ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই মহানবী (সা)-এর ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা হলে সা'লাবাহ সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তার সদকা কবুল করার আবেদন জানাল। সিদ্দীকে আকবর (রা) উত্তর দিলেন, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-ই কবুল করেন নি, তখন আমি কেমন করে কবুল করব! তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ওফাতের পর সা'লাবাহ ফারূকে আযম (রা)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং সে আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে আকবর (রা) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলেও সে এ নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালেই সা'লাবাহর মৃত্যু হয়। (মাযহারী)

মাসআলা ঃ এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সা'লাবাহ যখন তওবা করে উপস্থিত হয়েছিল তখন তার তওবাটি কবূল হলো না কেন। এর কারণ অতি পরিষ্কার; রাসূলুল্লাহ (সা) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, সে এখনও নিষ্ঠার সাথে তওবা করেনি। তার মনে এখনও নেফাক তথা কুটিলতা রয়ে গেছে। শুধু সাময়িক কল্যাণ কামনায় মুসলমানগণকে প্রতারিত করে রাযী করতে চাইছে মাত্র। কাজেই এ তওবা কবূলযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-ই যখন তাকে মুনাফিক সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, তখন পরবর্তী খলীফাগণের পক্ষে তার সদ্‌কা কবূল করার কোন অধিকারই অবশিষ্ট থাকেনি। কারণ যাকাতের জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর যেহেতু কারো অন্তরে নেফাক বা কুটিলতা নিশ্চিতভাবে কেউ জানতে পারে না, কাজেই পরবর্তীকালের জন্য হুকুম এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে নেবে এবং ইসলাম ও ঈমান স্বীকার করে নেবে তার সাথে মুসলমানদের মতই আচরণ করতে হবে, তার মনে যাই কিছু থাক না কেন। —(বয়ানুল কোরআন)

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ

لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۭ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۡ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

(৭৯) সে সমস্ত লোক যারা ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (৮০) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌কে এবং তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ্ না-ফরমানদেরকে পথ দেখান না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ (মুনাফিক) লোকগুলো এমন যে, নফল সদ্‌কা দানকারী মুসলমানদের প্রতি সদ্‌কার পরিমাণের স্বল্পতার ব্যাপারে বিদ্রূপ-ভর্ৎসনা করে। (বিশেষত) সেসব লোকের প্রতি (আরো বেশি) বিদ্রূপ করে যাদের কাছে শুধুমাত্র মেহনত-মযদুরী (আয়) ব্যতীত আর কোন কিছুই থাকে না। (আর যে বেচারীরা এরই মধ্য থেকে সাহস করে কিছু সদ্‌কা-খয়রাত করে) তাদের প্রতি বিদ্রূপও করে। (অর্থাৎ সাধারণ বিদ্রূপ-ভর্ৎসনা তো সবার প্রতিই করে যে, সামান্য বস্তু খয়রাত করতে নিয়ে এসেছে। তদুপরি এসব মেহনতী গরীবদের প্রতি ঠাট্টাও করে যে, এটাও কি একটা খয়রাত করার মত জিনিস হলো নাকি? আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এসব ঠাট্টা-বিদ্রূপের (বিশেষ ধরনের) বদলা তো দেবেনই, তদুপরি (সাধারণ ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য এই বদলা পাবে যে,) তাদের জন্য (আখিরাতে) হবে বেদনাদায়ক শাস্তি। আপনি সেসব মুনাফিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর না করুন (দুইই সমান—এতে তাদের এতটুকু লাভ হবে না। তারা ক্ষমা পাবে না। এমনকি) আপনি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও (অর্থাৎ অনেক করেও) ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফ্‌রী করেছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এহেন উদ্ধত লোকদেরকে হিদায়েত দান করেন না, যারা কখনো ঈমান ও সৎপথের অন্বেষণ করে না (কাজেই সারা জীবনই এরা কুফরীতে থেকে মরে যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতটিতে নফল সদ্‌কা দানকারী মুসলমানদের প্রতি মুনাফিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ মাসউদ (রা)

বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি এমন অবস্থায় সদ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যখন আমরা মেহনতী-মযদুরী করতাম। (অতিরিক্ত কোন সম্পদ আমাদের কাছে ছিল না; সে শ্রমের কামাই থেকেই যা আমরা পেতাম তারই মধ্য থেকে সদ্কা-খয়রাতের জন্যও কিছু বের করে নিতাম।) সুতরাং আবূ আকীল (রা) অর্ধ সা' (প্রায় পৌনে দুই সের) সদ্কা হিসাবে পেশ করেন। অপর এক লোক এসে কিছু বেশি পরিমাণ সদ্কা দেয়। এরই উপর মুনাফিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে যে, কি সামান্য ও নিকৃষ্ট বস্তু সদ্কা করতে নিয়ে এসেছে দেখ! এমন বস্তুতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। আর যে লোক কিছুটা বেশি সদ্কা করেছিল, তার উপর এ অপবাদ আরোপ করল যে, সে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদ্কা করেছে। তারই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ আয়াতে ঠাট্টার পরিণতিকে ঠাট্টা বলেই বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মহানবী (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, উভয়ই সমান। তাছাড়া ক্ষমা প্রার্থনা যতই করুন না কেন, তাদের ক্ষমা হবে না। এর বিস্তারিত বর্ণনা পরবর্তী আয়াত ঃ وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ -এর আওতায় আসবে।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۭ قُلْ
نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۭ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا
كَثِيْرًا ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَاۗىِٕفَةٍ
مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا
مَعِيَ عَدُوًّا ۭ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

(৮১) পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্র রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে ; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। —বলে দাও উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত। (৮২) অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশি কাঁদবে। (৮৩) বস্তুত আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে

তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে বসেই থাক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পেছনে পড়ে থাকা লোকগুলোও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (চলে যাবার) পর নিজেদের (যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে) বসে থাকার জন্য আনন্দিত হয়েছে এবং তারা নিজেদের মাল ও জানের দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করতে পছন্দ করেনি) (দু'টি কারণে—তার একটি হলো কুফরী এবং অপরটি আরামপ্রিয়তা)। আর (তারা অন্যদেরও) বলতে শুরু করেছে যে, তোমরা (এহেন কঠিন) গরম (ঘর ছেড়ে) বেরিয়ো না। আপনি (উত্তরে) বলে দিন যে, জাহান্নামের আগুন (এর চেয়েও অনেক) বেশি গরম (ও তীব্র। সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমরা এই গরম থেকে বাঁচার চেষ্টা করছ অথচ জাহান্নামে যাবার ব্যবস্থাও নিজেরাই করছ; কুফরী ও বিরোধিতা পরিহার করছ না।) কতই না ভাল ছিল যদি তারা বুঝত! বস্তুত (উল্লিখিত বিষয়টির পরিণতি হলো এই যে, দুনিয়ায়) এরা সামান্য সময় হেসে (খেলে) নিক, (পরবর্তীতে) বহুদিন ধরে (অর্থাৎ চিরকাল) কাঁদতে থাকবে! (অর্থাৎ তাদের হাসি-আনন্দ অল্পকালের আর কান্না হলো চিরদিনের জন্য। তা তাদের) সেসব কাজেরই পরিণতি হিসাবে (পাবে) যা তারা (কুফরী, মুনাফিকী ও বিরোধিতা প্রভৃতি মাধ্যমে) অর্জন করেছে। (তাদের অবস্থার বিষয় যখন জানা হয়ে গেল,) তখন আল্লাহ্ তা'আলা যদি আপনাকে (এ সফর থেকে মঙ্গলমত মদীনায়) এদের কোন দলের নিকট ফিরিয়ে আনেন—(এখানে কোন দলের নিকট কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, হয়তো বা তখনো পর্যন্ত তাদের কেউ কেউ মরেও যেতে পারে কিংবা অন্য কোথাও চলে যেতে পারে।) আর তখন এরা (আপনার মনস্তুষ্টি ও অপরাধ স্খলনের জন্য অন্য কোন জিহাদে আপনার সাথে) যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে (যেহেতু তখনো তাদের মনে এই ইচ্ছাই থাকবে যে, ঠিক কাজের সময়ে কোন ছলছুঁতা করবে। কাজেই,) তখন আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন যে, (যদিওবা এখন তোমরা পার্থিব লাভের ভিত্তিতে বানিয়ে কথা বলছ, কিন্তু) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরের গোপন কথা বাতলে দিয়েছেন। (কাজেই আমি একান্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি যে), তোমরা আর কখনোই আমার সাথে জিহাদে যেতে পারবে না। আর নাইবা আমার সঙ্গী হয়ে (দীনের) কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে (আর এই হলো যাবার আসল উদ্দেশ্য। কারণ) তোমরা পূর্বেও বসে থাকা পছন্দ করেছিলে (এবং এখনো তোমাদের তাই সংকল্প) সুতরাং (অনর্থক মিথ্যা কথা কেন বানাচ্ছ। বরং আগের মত এখনো) তাদের সাথেই বসে থাক (যারা বস্তুতই) পেছনে থাকার যোগ্য। (কোন ওযর অপারকতার দরুন। যেমন, বৃদ্ধ, শিশু ও নারী প্রভৃতি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উপর থেকেই মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, যারা সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও

তাদেরই এক বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এ কারণে তাদের প্রতি আখিরাতের শাস্তি, দুনিয়াতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের নাম মুজাহিদীনের তালিকা থেকে কেটে দেয়া এবং পরবর্তী কোন জিহাদে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

مُخَلَّفُوْنَ শব্দটি مُخَلَّفُ -এর বহুবচন। অর্থ 'পরিত্যক্ত'। অর্থাৎ যাকে পরিহার করা বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জিহাদে শামিল হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেন নি। কাজেই এরা জিহাদ 'বর্জনকারী' নয় ; বরং জিহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন।

خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ এতে خِلَافَ অর্থাৎ 'পেছনে' বা 'পরে'। আবূ ওবায়দা (র) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জিহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। لمقعدهمْ শব্দটি এখানে قعود (বসে থাকা)-এর ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে خِلَافَ অর্থ مـخـالفت তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ এরা রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্য লোকদেরকেও এ কথাই বোঝাল যে, لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ অর্থাৎ (এমন) গরমের সময়ে জিহাদে বেরিয়ো না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। বস্তুত এর ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীর দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না। তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশি ? অতঃপর বলেন ঃ

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا ... ... –এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 'হাসো কম, কাঁদো বেশি'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখিরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে,

الدينا قليل فليضحكوا فيها ماشاؤا فاذا انقطعت الدنيا وصاروا الى الله فليستا نفوا البكاء بكاء لا ينقطع ابدا –

অর্থাৎ দুনিয়া সামান্য কয়েকদিনের অবস্থান স্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।—(মাযহারী)

দ্বিতীয় আয়াতে لَنْ تَخْرُجُوْا বলা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর মর্মার্থ নেয়া হয়েছে যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোন জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতই নানা রকম ছলছুঁতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং মহানবী (সা)-এর প্রতি নির্দেশ হলো যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জিহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জিহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

(৮৪) আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুত তারা না-ফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ মরে যায়, তবে তার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়বেন না (এবং তাদেরকে দাফন করার জন্য) তার কবরেও দাঁড়াবেন না। (কারণ) তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি কুফরী করেছে এবং তারা সেই কুফরী অবস্থায়ই মারা গেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে সহীহ্ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ আয়াতটি মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সহীহাইন (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম)-এর রিওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তার জানাযায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়েন। নামায পড়ার পরই এ আয়াত নাযিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েন নি।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনায় এ আয়াত নাযিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা হলো এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ্ যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন, হুযূর

(সা)-এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হুযূর ! আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। রাসূলে করীম (সা) নিজের জামা মুবারক দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। হুযূর (সা) তাও কবূল করেন। জানাযার নামাযে দাঁড়ালে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হুযূর (সা)-এর কাপড় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন, অথচ আল্লাহ্ আপনাকে মুনাফিকের নামায পড়তে বারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এ ব্যাপারে ইখতিয়ার দিয়েছেন—মাগফিরাতের দোয়া করব অথবা করব না। আর সে আয়াতে যাতে সত্তরবার মাগফিরাতের দোয়া করলেও ক্ষমা হবে না বলে উল্লেখ রয়েছে, তা আমি সত্তরবারের বেশিও ইস্তেগফার করতে পারি। সে আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূরা তওবার ঐ আয়াত যা এইমাত্র পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ— اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায পড়েন এবং নামাযের পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় لَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ ... ... (সুতরাং এরপর কখনও তিনি কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েন নি।)

উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রথম প্রশ্ন উঠে এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক ছিল যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব মুনাফিকের সর্দার। কাজেই এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা মুবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন ?

উত্তর এই যে, এর দু'টি কারণ থাকতে পারে ঃ এক. তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন তাঁর আবেদন। অর্থাৎ শুধুমাত্র তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি এমনটি করেছিলেন। দুই. অপর একটি কারণ এও হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রা)-এর রিওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কুরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী (সা)-এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। হুযূর (সা) দেখলেন, তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদেরকে বললেন তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেয়া হোক। হযরত আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। আবুদল্লাহ্ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিকমত লাগছিল না। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কোর্তা বা কামীস নিয়েই রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের চাচা আব্বাসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সে ইহসানের বদলা হিসেবেই মহানবী (সা) নিজের জামা মুবারকখানা তাকে দিয়ে দেন।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফারুকে আযম (রা) যে মহানবী (সা)-কে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মুনাফিকদের নামায পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন ? কারণ ইতিপূর্বে কোন আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উমর বারণের বিষয়টি উক্ত সূরা তওবার সাবেক আয়াত استغفر لهم থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাযের বারণের প্রতি ইঙ্গিত করে

থাকে, তবে মহানবী (সা) এতে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না কেন ; বরং তিনি বললেন যে, এ আয়াতে আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে।

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলীর বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে ইখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সত্তরবারের উল্লেখ নির্দিষ্টতা বোঝাবার জন্য নয়, বরং আধিক্য বোঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফিরাত হবে না ; যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হুযূরকে বারণও করা হয়নি। কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে যা সূরা ইয়াসীনে উক্ত হয়েছে তাতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ –

এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে দীনের তবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ করা হয়নি, বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যও অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয় ঃ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অথবা اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রভৃতি।

সারকথা এই যে, أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ আয়াতের দ্বারা তো মহানবী (সা)-কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছেই, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলীলের মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী (সা) উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের মাগফিরাত হবে না। কিন্তু অপর কোন আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাঁকে ভীতি প্রদর্শনে বাধাও দেয়া হয়নি।

আর মহানবী (সা) জানতেন যে, আমার কামীসের কারণে কিংবা জানাযা পড়ার দরুন তার মাগফিরাত তো হবে না, কিন্তু এতে অন্যান্য দীনী কল্যাণ সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও অন্য কাফিরগণ যখন হুযূর (সা)-এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করবে, তখন তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু (মুনাফিকের) জানাযা পড়ার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না, সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়ে নেন।

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ বুখারীর বাক্যেও পাওয়া যাবে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে পারতাম, সত্তর বারের বেশি দোয়া ও মাগফিরাত কামনায় তার মাগফিরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সে হাদীস যাতে মহানবী (সা) বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোন কোন তফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খাযরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং হুযূর (সা)-এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের এ কাজের দরুন এই মুনাফিকের মাগফিরাত তথা পাপ মুক্তি হবে না, কিন্তু

যেহেতু আয়াতের শব্দাবলীতে বাহ্যত এই অধিকার দেয়া হয়েছিল; অন্য কোন আয়াতের মাধ্যমে নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপরদিকে একজন কাফিরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্য কাফিরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল, কাজেই তিনি নামায পড়াকেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারুকে আযম (রা) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফিরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাযে জানাযা পড়ে মাগফিরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রাসূলে মকবুল (সা) যদিও এ কাজটিকে মূলত কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতকু ছিল না। এভাবে না রাসূলে করীম (সা)-এর কাজের উপর কোন আপত্তি থাকে, না ফারূকে আযম (রা)-এর কথায় কোন প্রশ্ন উঠতে পারে। —(বয়ানুল কোরআন)

অবশ্য পরিষ্কারভাবে যখন لَا تُصَلِّ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল, তখন প্রতীয়মান হলো যে, যদিও জানাযার নামায পড়ার পেছনে একটি দীনী কল্যাণ নিহিত ছিল, কিন্তু এতে একটি অপকারিতাও বিদ্যমান ছিল। সেদিকে মহানবী (সা)-এর খেয়াল হয়নি। তা ছিল এই যে, স্বয়ং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনে এ কাজের দরুন উৎসাহহীনতা সৃষ্টির আশংকা ছিল যে, তাঁর নিকট নিষ্ঠাবান মুসলমান ও মুনাফিক সবাইকে একই পাল্লায় মাপা হয়। এ আশংকার প্রেক্ষিতে কোরআনে এই নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয়। অতঃপর মহানবী (সা) কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েন নি।

মাসআলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন কাফিরের জানাযার নামায পড়া এবং তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফিরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা যিয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোন মুসলমানের কোন কাফির আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোন ওলী-ওয়ারিস না থাকে, তবে মুসলমান আত্মীয় সুন্নত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে পুঁততে পারে। —(বয়ানুল কোরআন)

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا
بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا
نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ

قُلُوۡبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُوۡنَ ﴿٨٧﴾ لٰكِنِ الرَّسُوۡلُ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ

جٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الۡخَيۡرٰتُ ۫ وَاُولٰٓئِكَ

هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ

خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿٨٩﴾

(৮৫) আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ্ তো এই চান যে, এসবের কারণে তাদের আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফিরই থাকে। (৮৬) আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর রাসূলের সাথে একাত্ম হয়ে, তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিস্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। (৮৭) তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুত তারা বোঝে না। (৮৮) কিন্তু রাসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তার সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে (৮৯) আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কানন কুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হলো বিরাট কৃতকার্যতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে (এমন) বিস্ময়ে না ফেলে (যে, এহেন ধিকৃত ব্যক্তি এই নিয়ামতরাজি কেমন করে পেল ? প্রকৃতপক্ষে এগুলো তাদের জন্য নিয়ামত নয়, বরং আযাবেরই উপকরণ বিশেষ। কারণ) আল্লাহ্ শুধু এ কথাই চান, যেন (উল্লিখিত) এসব বস্তু-সামগ্রীর কারণে দুনিয়াতেও তাদেরকে আযাবে আবদ্ধ করে রাখেন এবং তাদের প্রাণ কাফির অবস্থায় নির্গত হয় (যাতে তারা আখিরাতেও আযাবেই লিপ্ত থাকে)। আর কখনও কোরআনের কোন অংশবিশেষ যখন এ ব্যাপারে নাযিল হয় যে, তোমরা (নিষ্ঠার সাথে) আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ কর, তখন তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা আপনার নিকট অব্যাহতি কামনা করে। আর এ বলে অব্যাহতি চায় যে, আমাদের অনুমতি দান করুন যাতে আমরা এখানে অবস্থানকারী লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। (অবশ্য ঈমান ও নিষ্ঠার দাবি করতে গিয়ে কোন কিছুই করতে হয় না; শুধু বলে দিল যে, আমরা নিষ্ঠাবান।) এসব লোক (চরম অসহযোগী মনোভাবের দরুন) পুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে রাযী হয়ে গেল এবং তাদের অন্তরে মোহর এঁটে গেল, যাতে করে তারা

(সহযোগিতা ও অসহযোগিতাকে) উপলব্ধিই করতে পারে না। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলমান, তারা (অবশ্য এ নির্দেশ মেনে নিলেন এবং) নিজেদের মালামাল ও জানের দ্বারা জিহাদ করলেন। বস্তুত তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। আর এরাই হলেন পরম কৃতকার্য। (আর সে কল্যাণ ও কৃতকার্যতা এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য এমন কাননকুঞ্জ নির্ধারিত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণসমূহ (আর) তারাও অনন্তকাল সেখানে থাকবেন। এটাই হলো মহান কৃতকার্যতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকেছিল। সেসব মুনাফিকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহ্র নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নিয়ামত পাবে ?

এর উত্তরে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন রহমত ও নিয়ামত নয়; বরং পার্থিব জীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাববিশেষ। আখিরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধনসম্পদের মুহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধনসম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখিরাত সম্পর্কে গাফিল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসেবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কোরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত ধনসম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

أُولُوا الطَّوْلِ। শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা যারা সম্পন্ন নয় অর্থাৎ যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বাহ্যিক ওযরও ছিল (যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত।)

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

(৯০) আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফির।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কিছু ছলনাকারী বেদুঈন লোক গ্রাম থেকে এলো (যাতে তারা বাড়িতে থেকে যাবার) অনুমতি লাভ করতে পারে এবং (সেসব গ্রাম্য লোকদের মাঝে) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে (ঈমানের দাবির ব্যাপারে) সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা কথা বলেছিল, তারা একেবারেই বসে রইল (মিথ্যা ওযর দর্শাতেও এলো না), তাদের মধ্যে যারা (শেষ পর্যন্ত) কাফিরই থেকে যাবে, তাদেরকে (আখিরাতে) বেদনাদায়ক আযাব দেয়া হবে (এবং যারা তওবা করে নেবে তারা আযাব থেকে বেঁচে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব গ্রামবাসীর মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। এক—যারা ছলছুতা পেশ করার জন্য মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় যাতে তাদেরকে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতেই বসে থাকে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) যখন বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাদ্দ ইবনে কায়েসকে জিহাদে না যাবার অনুমতি দিয়ে দেন, তখন কতিপয় মুনাফিকও খিদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু ছলছুতা পেশ করে জিহাদ বর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এতে তিনি অনুমতি অবশ্য দিয়ে দেন, কিন্তু একথাও বুঝতে পারেন যে, এরা মিথ্যা ওযর পেশ করছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য এরই সঙ্গে الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে কারো কারো ওযর কুফরী ও মুনাফিকীর কারণে ছিল না; বরং স্বভাবগত আলস্যের কারণে ছিল। এরা এই কাফিরদের আযাবের আওতাভুক্ত নয়।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاۤءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا
يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾ وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ
قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ
الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ؕ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ
يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاۤءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ

وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

(৯১) দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৯২) আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। (৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুত তারা জানতেও পারেনি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্বল্পক্ষম লোকদের উপর কোন গোনাহ্ নেই, রুগ্ন লোকদের উপরও কোন গোনাহ্ নেই এবং সেসব লোকদের উপরও কোন গোনাহ্ নেই যাদের কাছে (জিহাদের উপকরণ প্রস্তুতি বাবদ) ব্যয় করার মত কোন সামর্থ্য নেই—যখন এরা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে (এবং তাঁদের হুকুম-আহ্কামের ব্যাপারে) নিষ্ঠা অবলম্বন করে (এবং অন্তরে আনুগত্য পোষণ করে—) এমন নেককারদের উপর কোন রকম অভিযোগ (আরোপিত) হবে না। কারণ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আর আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (যদি এরা নিজেদের জ্ঞানমতে অপারক হয়ে থাকে এবং নিজেদের দিক থেকে নিষ্ঠা ও আনুগত্যের চেষ্টাও করে, কিন্তু বাস্তবে তাতে সামান্য কমতি থেকে যায়, তবে তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন।) আর না সে সমস্ত লোকের উপর (কোন পাপ ও অভিযোগ আছে–) যারা আপনার নিকট আসে, যাতে আপনি তাদের জন্য কোন বাহন ব্যবস্থা করেন ; অথচ আপনি (তাদের) বলে দেন যে, আমার কাছে যে তোমাদের সওয়ার করাবার মত কোন বাহনই নেই। তখন তারা (ব্যর্থ মনোরথ হয়ে) ফিরে যায় এমন অবস্থায় যে, তাদের চোখে অশ্রুধারা বইতে থাকে এই দুঃখে যে, (আফসোস !) তাদের কাছে (জিহাদের উপকরণ সংগ্রহ) ব্যয় করার মত কিছু নেই। (না আছে নিজের কাছে, না পাওয়া গেল অন্য কোনখান থেকে। বস্তুত এহেন অপারক লোকদের কোন রকম জওয়াবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না।) বস্তুত অপরাধ (ও শাস্তিভোগ) তো শুধু তাদের উপর আরোপ করা হয়, যারা ধন-সম্পদে সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও (ঘরে বসে থাকার) অনুমতি কামনা করে। তারা (চরম অসহযোগী মনোভাবের দরুন) পুরবাসিনীদিরে সাথে এমতাবস্থায় রয়ে যেতে সম্মত হয়ে গেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন যাতে তারা (পাপ-পুণ্যের বিষয়) জানতেই পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত আয়াতসমূহে এমন সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণে অপারক ছিল না, কিন্তু শৈথিল্যবশত অজুহাত দর্শিয়ে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা এমন সব মুনাফিক বিরত থেকেছে, যারা নিজেদের কুফরী ও কুটিলতা হেতু নানারকম ছলছুতার আশ্রয়ে রাসূলে করীম (সা)-এর কাছ থেকে অনুমিত নিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া এতে এমন কিছু উদ্ধত লোকও ছিল যারা অজুহাত দর্শিয়েও অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজনবোধ করেনি, এমনিতেই বিরত থেকে গেছে। এদের অপারক না হওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল, তাদের বেদনাদায়ক আযাব হওয়ার ব্যাপারটি বিগত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে যে সময় নিষ্ঠাবান মুসলমানের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যারা প্রকৃতই অপারকতার দরুন জিহাদে অংশগ্রহণে অসমর্থ ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারক এবং যাদের অপারকতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, বরং জিহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোন জীব ছিল না। বস্তুত সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জিহাদী উদ্দীপনা এবং সওয়ারীর অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপারকতার কথা জানিয়ে রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা করা হোক।

তফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথমে রাসূলে করীম (সা) তাদের কাছে নিজের অপারকতা জানিয়ে দেন যে, আমাদের কাছে সওয়ারী বা যানবাহনের কোন ব্যবস্থা নেই। তাতে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে যায় এবং কেঁদেই সময় কাটাতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেন যে, তখনই হুযূর (সা)-এর নিকট ছয়টি উট এসে যায় এবং তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দেন।—(মাযহারী)। তাদের মধ্যে তিনজনের সওয়ারীর ব্যবস্থা করেন হযরত উসমান গনী (রা)। অথচ ইতিপূর্বে তিনি বিপুল পরিণাম ব্যবস্থা নিজ খরচে করেছিলেন।

আবার অনেক এমন লোকও থেকে যায়, যাদের জন্য শেষ পর্যন্তও কোন সওয়ারীর ব্যবস্থা হয়নি এবং বাধ্য হয়ে তারা জিহাদে বিরত থাকে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যাদের অপারকতা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জিহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মত পছন্দ করে নিয়েছে। إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ -এর মর্মও তাই।

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا

تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ

عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ
لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا
عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

(৯৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছলছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো, ছল করো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহ্ই দেখবেন এবং তাঁর রাসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (৯৫) এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহ্র কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর—নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। (৯৬) তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাযী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ্ তা'আলা রাযী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এসব লোক তোমাদের (সবার) সামনে অপারকতা পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে। অতএব, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি (সবার পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে) বলে দিন যে, (থাক,) এ ওযর পেশ করো না, আমরা কক্ষনো তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করব না। (কারণ) আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের (প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে) সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন (যে, তোমাদের সত্যিকার কোন ওযরই ছিল না)। আর (সে যাহোক,) আগামীতেও আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখে নেবেন। (তখনই দেখা যাবে তোমাদের ধারণামতে তোমরা কতটা অনুগত ও নিষ্ঠাবান।) অতঃপর এমন সত্তার নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সমুদয় বিষয় সম্পর্কে অবগত। (তাঁর সামনে তোমাদের কোন বিশ্বাস এবং কোন কার্যকলাপই গোপন নয়।) তারপর তিনি তোমাদের (সেসবই) বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (আর তার বদলাও দেবেন।)

তবে হ্যাঁ, তারা এখন তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে যাবে (যে, আমরা অপারক ছিলাম)— যখন তোমরা তাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকতে দাও (এবং ভর্ৎসনা প্রভৃতি না কর)। কাজেই তোমরা তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দাও (এবং) তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই থাকতে দাও। (এই ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্য হাসিলে তাদের কোন কল্যাণই সাধিত হবে না। কারণ) সেসব লোক একেবারেই অপবিত্র। (আর শেষ পর্যন্ত) তাদের ঠিকানা হলো দোযখ—সে সমস্ত কাজের পরিণতি হিসেবে যা তারা (কুটিলতা ও বিরোধিতার মাধ্যমে) করছিল। (তাছাড়া এর তাকাদাও এই যে, তাদেরকে স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হোক। কারণ উপেক্ষা করার উদ্দেশ্য হলো সংশোধন। অবশ্য তাদের এহেন দুর্মতিত্বে তারও কোন সম্ভাবনা নেই। আর) এরা এ কারণেও কসম খাবে যাতে তুমি তাদের উপর সন্তুষ্ট বা রাযী হয়ে যাও। (বস্তুত একে তো তুমি আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতি রাযী হতে যাবেই বা কেন। তবে) যদি (মনে করা হয় যে,) তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়েই গেলে (কিন্তু তাতে তাদের কিই লাভ,) আল্লাহ্ তা'আলা যে এমন (দুষ্ট) লোকদের প্রতি রাযী হচ্ছেন না। (অথচ স্রষ্টার সন্তুষ্টি ছাড়া সৃষ্টির সন্তুষ্টি একান্তই অর্থহীন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফিকের আলোচনা ছিল যারা গযওয়ায়ে তাবুকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দর্শিয়ে জিহাদে যাওয়া থেকে অপারকতা প্রকাশ করেছিল। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদীনা তাইয়্যেবায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফিকরা ওযর-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুত ঘটনাও তাই ঘটে।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে—(এক) যখন এরা আপনার কাছে ওযর-আপত্তি পেশ করার জন্য আসে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, খামাখা মিথ্যা ওযর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের দুষ্টুমি এবং তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সবই বাতলে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন রকম ওযর-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন! তারপর বলা হয়েছে ঃ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ ... এতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, এখনও যেন তারা মুনাফিকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন্ ধরনের হয়। যদি তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অনথ্যায় তা তোমাদের কোন উপকারই সাধন করবে না।

(দুই) দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি যেন তাদের জিহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সে জন্য যেন কোন ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এই বাসনা পূরণ করে দিন। فَاعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভর্ৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ ভর্ৎসনা করে কোন ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই বা কি হবে। খামাখা কেন নিজের সময় নষ্ট করা।

(তিন) তৃতীয় আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাযী করাতে চাইবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাযী হবেন না। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাযী হয়ে গেলেন বলে যদি ধরেও নেয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবে না এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী নন। তাছাড়া তারা যখন নিজেদের কুফরী ও মুনাফিকীর উপই অটল থাকল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে রাযী হবেন!

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ
السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ
الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

(৯৭) বেদুঈনরা কুফর ও মুনাফিকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। (৯৮) আবার কোন কোন বেদুঈন এমনও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমাদের উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন

আসুক! আর আল্লাহ্ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (৯৯) আর কোন কোন বেদুঈন হলো তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য এবং রাসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো ! তাই হলো তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এই মুনাফিকদের মধ্যে যারা) বেদুঈন তারা (স্বভাবজাত কঠোরতার কারণে) কুফরী ও মুনাফিকীর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কঠোর এবং (জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী লোকদের থেকে দূরত্বের কারণে) তাদের এমনিটই হওয়া উচিত যে, তাদের সে সমস্ত হুকুম-আহকামের জ্ঞান থাকবে না, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর নাযিল করেন। (কারণ জ্ঞানী লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হচ্ছে মূর্খতা। আর সে কারণেই স্বভাবে কঠোরতা এবং এ সমুদয়ের ফলে কুফরী ও মুনাাফিকীতে প্রবলতা সৃষ্টি হবে।) আর আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন বড়ই জ্ঞানী, বড়ই কুশলী। তিনি এ সমুদয় বিষয়েই অবগত। (ফলে তিনি কুশলতার দ্বারা যথার্থ শাস্তি প্রদান করবেন।) আর (উল্লিখিত মুনাফিক) বেদুঈনদের মাঝে এমনও কেউ কেউ রয়েছে (যারা কুফরী, মুনাফিকী ও মূর্খতার সাথে সাথে কৃপণতা ও হিংসার দোষেও দুষ্ট।) তারা (জিহাদ ও যাকাত প্রভৃতি উপলক্ষে মুসলমানদের দেখাদেখি লজ্জাবশত) যা কিছু ব্যয় করে, তাকে (একান্ত) জরিমানা (বা অর্থদণ্ডের মতই) মনে করে। (এই তো গেল কার্পণ্যের দিক।) আর (হিংসা ও বিদ্বেষের দিক হলো এই যে, তারা) তোমাদের মুসলমানদের জন্য যুগচক্রান্তের অপেক্ষায় থাকে। (যেন তাদের উপর কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা-দুর্বিপাক এসে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। বস্তুত) দুঃসময় এসব মুনাফিকের উপরই আসবে। (সুতরাং বিজয়ের বিস্তৃতি ঘটলে কাফিররা অপদস্থ হয় এবং তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মনেই থেকে যায়। এদের সারা জীবন দুঃখ-বেদনায় কেটে যায়।) আর আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের কুফরী ও মুনাফিকীপূর্ণ কথাবার্তা) শুনেন (এবং তাদের মনের কঠোরতা ও যুগচক্রান্তের সুযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত কামনা-বাসনা সম্পর্কে) অবগত। (সুতরাং এসবের শাস্তিই তিনি দেবেন।) আর কোন কোন বেদুঈন এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে এবং (নেক কাজে) যা কিছু ব্যয় করে সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রাসূলে করীম (সা)-এর দোয়াপ্রাপ্তির অবলম্বন বলে গণ্য করে। [কারণ মহানবী (সা)-এর মহৎ অভ্যাস ছিল যে, তিনি উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যয়কারীদের জন্য দোয়া করতেন। যেমন, হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।] 'মনে রেখো, তাদের এই ব্যয় নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কারণ। (আর দোয়ার বিষয় তো তারা নিজেরাই দেখেশুনে নিতে পারে—তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর নৈকট্য হলো এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাদের স্বীয় (বিশেষ) রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। (কারণ) আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সুতরাং তাদের সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে তাদেরকে স্বীয় রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত আয়াতগুলোতে মদীনার মুনাফিকদের আলোচনা ছিল। বর্তমান আলোচ্য আয়াতসমূহে সেসমস্ত মুনাফিকের কথা বলা হচ্ছে যারা মদীনার উপকণ্ঠে এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত।

اَعْرَابٌ শব্দটি عَرَبٌ শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদবিশেষ যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর একক করতে হলে اَعْـرَابِىٌّ বলা হয়। যেমন, اَنْصَارٌ-এর এক বচন انصارى হয়ে থাকে।

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরী ও মুনাফিকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশি কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা ইলম ও আলিম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা কঠোরতায় ভুগতে থাকার দরুন মনের দিক দিয়েও কঠোর হয়ে পড়ে। (اَجْـدَرُ اَنْ لاَّ يَعْلَمُوْا حُـدُوْدَ مَـا اَنْزَلَ اللّٰهُ) অর্থাৎ এসব লোকের পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ না কোরআন তাদের সামনে আসে, না তার অর্থ-মর্ম ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতেও এ সমস্ত বেদুঈনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা যাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ, তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরীকে লুকাবার জন্য নামাযও পড়ে নেয় এবং ফরয যাকাতও দিয়ে দেয়; কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোন রকমে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। اَلدَّوَائِرَ শব্দটি دَائِرَةٌ-এর বহুবচন। আরবী অভিধান অনুযায়ী دَائِرَةٌ (দায়েরাহ্) এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভাল অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কোরআন করীম তাদের উত্তরে বলেছে ঃ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজকর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত।

বেদুঈন মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনার কোরআনী বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুঈনের আলোচনা সংগত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুঈনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে, তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা যে সদকা-যাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়াপ্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে।

সদ্কা যে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কোরআন-করীমে যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন, পরবর্তী এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ আয়াতে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সদ্কা উসূল করার সাথে সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صلوة শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-এর দোয়াকে صلوة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

(১০০) আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সেসমস্ত লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান কৃতকার্যতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনার ক্ষেত্রে সমস্ত উম্মতের মাঝে) অগ্রবর্তী এবং (বাকি উম্মতের মধ্যে) যারা নিষ্ঠার সাথে (ঈমান গ্রহণে) তাদের অনুসারী, আল্লাহ্ সেসমস্ত লোকের প্রতিই সন্তুষ্ট। (তিনি তাদের ঈমান কবূল করেছেন।) সেজন্য তারা তার সুফলপ্রাপ্ত হবে। আর তাদের সবাই আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে (এবং আনুগত্য করেছে। যার ফলে এই সন্তুষ্টিতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি হবে)। তাছাড়া আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন কাননকুঞ্জ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সদা-সর্বদা বসবাস করবে। (আর) এটাই হলো মহা কৃতকার্যতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পরবর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবান বেদুঈন মু'মিনদের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে সাধারণ নিষ্ঠাবান মু'মিনদের আলোচনা হচ্ছে, যাতে তাঁদের মর্যাদা ও ফযীলতেরও বিবরণ রয়েছে।

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ বাক্যটিতে ব্যবহৃত مِنْ অব্যয়কে অধিকাংশ তফসীরবিদ تبعيض-এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজিরীন ও আনসারদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (১) ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং (২) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম।

এমন করার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে سابقين او لين তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেব্লা (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্)-এর দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন তাঁদেরকে سابقين او لين গণ্য করেছেন। এমনটি হলো সাইদ ইবনে

মূসাইয়্যেব ও কাতদাহ্ (রা)-র। হযরত আ'তা ইবনে আবী রাবাহ্ বলেছেন যে, 'সাবেকীন আওয়ালীন' হলেন সেসমস্ত সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (র)-এর মতে যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার বাইআতে-রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন'। বস্তুত প্রতিটি মতানুযায়ী অন্যান্য সাহাবা মুহাজির হোক বা আনসার—সাবেকীন আওয়ালীনের পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।—(কুরতুবী, মাযহারী)

তফসীরে মাযহারীতে আরো একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি আংশিককে বোঝাবার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং বিবরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম অন্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। আর سابقين او لين হলো তার বিবরণ। বয়ানুল কোরআন থেকে তফসীরের যে সার-সংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম তফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরামের দু'টি শ্রেণী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হলো সাবেকীনে আওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে রিদওয়ানের পরে যারা মুসলমান হয়েছেন তাঁদের; আর দ্বিতীয় তফসীরের মর্ম হলো এই যে, সাহাবায়ে কিরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীন আওয়ালীন। কারণ ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তফসীর অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সেসমস্ত সাহাবায়ে কিরাম, যারা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে হুদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো তাঁদের পরবর্তী সেসমস্ত মুসলমানদের, যারা কিয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا বাক্যে সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تابعى (তাবেয়ী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কিয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

সাহাবায়ে কিরাম জান্নাতী ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ঃ মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রা)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন—যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোত্থেকে বলেছেন (এর প্রমাণ কি) ? তিনি বললেন, কোরআন করীমের আয়াত পড়ে দেখ। اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে اتباع باحسان-এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের সবাই কোনরকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিধন্য হবেন।

তফসীরে মাযহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে এর চাইতেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো ঃ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতে ওয়াদা করেছেন।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে।—(তিরমিযী)

জ্ঞাতব্য ঃ যেসব লোক সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং তাঁদের মাঝে সংঘটিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে কোন কোন সাহাবী সম্পর্কে এমন সমালোচনা করে, যার ফলে মানুষের মন তাঁদের উপর কুধারণায় লিপ্ত হতে পারে, তারা নিজেদেরকে এক আশংকাজনক পথে নিয়ে ফেলেছে।—আল্লাহ রক্ষা করুন।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

(১০১) আর কিছু কিছু তোমার আশপাশের মুনাফিক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফিকীতে অনড় ! তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দু'বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহা আযাবের দিকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনারা আশপাশের লোকদের মধ্যে কিছু এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কিছু এমন মুনাফিক রয়েছে যারা মুনাফিকীর চরম শিখরে (এমনভাবে) পৌছে আছে (যে,) আপনি (-ও) তাদেরকে জানেন না (যে, এরা মুনাফিক। বস্তুত) তাদেরকে আমি জানি। আমি তাদেরকে অন্য মুনাফিকদের তুলনায় আখিরাতের পূর্বে) দ্বিবিধ শাস্তি দেব। (একটি মুনাফিকীর জন্য এবং অপরটি মুনাফিকীতে পরিপূর্ণতার কারণে। আর) অতঃপর (আখিরাতেও) তারা অতি কঠোর ও মহাআযাব (অর্থাৎ অনন্তকাল যাবত জাহান্নামবাস)-এর জন্য প্রেরিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত অনেক আয়াতে সেসব মুনাফিকের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের নেফাক তথা মুনাফিকী তাদের কথা ও কাজে প্রকাশ পেয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও জানতেন যে, এরা মুনাফিক। এ আয়াতে এমন সব মুনাফিকের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যাদের মুনাফিকী অত্যন্ত চরম পর্যায়ের হওয়ার দরুন এখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গোপনই রয়ে গেছে। এ আয়াতে এহেন কঠিন মুনাফিকদের উপরে আখিরাতের পূর্বেই দু'রকম আযাব দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো দুনিয়াতে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের মুনাফিকী গোপন রাখার চিন্তা এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে পতিত থাকা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আর তাদের অনুসরণে বাধ্য থাকাটাও কোন অংশে কম আযাব নয়। দ্বিতীয়ত, কবর ও বরযখ-এর আযাব বা কিয়ামত ও আখিরাতের পূর্বে তারা ভোগ করবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى
اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ
عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾ وَقُلِ
اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى
عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۵﴾ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ
لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰۶﴾

(১০২) আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়! (১০৩) তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া

তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন। (১০৪) তারা কি একথা জানতে পারেন নি যে, আল্লাহ্ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবূল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন ? বস্তুত আল্লাহ্ই তওবা কবূলকারী, করুণাময়। (১০৫) আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে। (১০৬) আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহ্র নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে; তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন না হয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে, যারা মিশ্র কাজ করেছিল; কিছু ছিল ভাল কাজ (যেমন স্বীকারোক্তি যার উদ্দেশ্য ছিল অনুতাপ। আর এটাই হলো তওবা এবং যেমন ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ যা পূর্বে সংঘটিত হয়ে গেছে। যাহোক, এসব তো ছিল ভাল কাজ।) কিন্তু কিছু মন্দ (কাজও করেছে। যেমন, কোন রকম ওযর-আপত্তি ছাড়াই হুকুম অমান্য করা। সুতরাং) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এই আশা (অর্থাৎ তাঁর ওয়াদাও) রয়েছে যে, তাদের (অবস্থার) প্রতি (তিনি রহমতের) দৃষ্টি দেবেন (অর্থাৎ তাদের তওবা কবূল করে নেবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড় ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। [এ আয়াতের মাধ্যমে যখন তাঁদের তওবা কবূল হয়ে যায় এবং তাঁরা খুঁটির বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যান, তখন নিজেদের মালামালসহ মহানবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, এগুলো যেন আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা হয়। তখন ইরশাদ হলো] আপনি তাঁদের মালামাল থেকে (যা তারা নিয়ে এসেছে) সদ্কা গ্রহণ করে নিন, যা গ্রহণ করার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে (পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে) মুক্ত ও পরিষ্কার করে দেবেন। আর (আপনি যখন এগুলো নেবেন, তখন) তাদের জন্য দোয়া করুন। নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য (তাদের) আত্মার প্রশান্তিস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের স্বীকারোক্তি) যথাযথ, শুনেন (এবং তাদের অনুতাপ সম্পর্কে) যথার্থই জানেন। (কাজেই তাদের আত্মার বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আপনাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উল্লিখিত এই সৎকর্ম অর্থাৎ তওবা ও অনুতাপ এবং সৎপথে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান আর মন্দ কাজ অর্থাৎ হুকুম লংঘন প্রভৃতিতে ভবিষ্যতের জন্য ভীতি প্রদর্শনের হুকুম বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, প্রথমে উৎসাহ দান করা হয়েছে যে,) তাদের কি এ খবরও নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর বান্দাদের তওবা কবূল করে থাকেন এবং তিনিই সদ্কাসমূহ কবূল করেন ? এবং (তাদের কি) এ কথাও জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এই তওবা কবূল করার (গুণের) ক্ষেত্রে এবং রহমত করার (গুণের) ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ? (সে কারণেই তাঁদের কবূল করেছেন এবং স্বীয় রহমতে তাদের মাল গ্রহণ করার এবং তাঁদের জন্য দোয়া করার নির্দেশ

দিয়েছেন। সুতরাং ভবিষ্যতের ভুল-ত্রুটি ও পাপ কাজ হয়ে গেলে তওবা করে নেবে। আর যদি সামর্থ্য থাকে তবে খয়রাত করবে।) অতঃপর উৎসাহদানের পর (ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আপনি তাদেরকে একথাও) বলে দিন যে, (তোমরা যা খুশী) আমল করে যাও। বস্তুত (প্রথমে তো) তোমাদের কার্যকলাপ এখনই (অর্থাৎ দুনিয়াতেই) আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ দেখে নিচ্ছেন (ফলে মন্দ কর্মের জন্য দুনিয়াতেই অপমান-অপদস্থতার সম্মুখীন হচ্ছ) এবং অতঃপর (আখিরাতে) অবশ্যই তোমাদেরকে এমন সত্তার (অর্থাৎ আল্লাহ্র) নিকট উপস্থিত হতে হবে, যিনি সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে বাতলে দেবেন। (অতএব, تخلف প্রভৃতি মন্দ কর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যাও। এই ছিল প্রথম প্রকার লোকের বিবরণ। পরবর্তীতে দ্বিতীয় প্রকার লোকের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে—) আর কিছু লোক রয়েছে, যাদের বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ আসা পর্যন্ত মুলতবি রয়েছে যে, (তওবায় তাদের মনের বিশুদ্ধতা না থাকার দরুন) তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে কি (ইখলাস-এর কারণে) তাদের তওবা কবূল করে নেবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা (মনের অশুদ্ধতার অবস্থা খুব ভাল করেই) অবগত (এবং তিনি) বড়ই হিকমতের অধিকারী। (সুতরাং হিকমতের চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ মনের তওবা কবূল করেন এবং বিশুদ্ধতাহীন তওবা কবূল করেন না। আর যদি কখনও তওবা ছাড়াই ক্ষমা করে দেয়ার মধ্যে হিকমত থাকে, তবে তাও করেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গযওয়ায়ে তাবুকের জন্য যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা প্রচার করা হলো এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। গন্তব্যও ছিল দূর-দূরান্তের, আর মুকাবিলা ছিল একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের নিয়মিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে, যা ছিল ইসলামী ইতিহাসের প্রথম ঘটনা। এসব কারণেই এ নির্দেশ সম্পর্কে জনগণের অবস্থায় বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং তাদের দলগুলো কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এক শ্রেণী ছিল নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ লোকদের যারা প্রথম নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় জিহাদের জন্য তৈরী হয়ে যান। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছিলেন সেসব লোক যারা প্রথমে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই সঙ্গী হয়ে যান। আয়াতে— الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ বলে এসব লোকেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী সেসব লোকের যারা প্রকৃতই মা'যুর বা অক্ষম ছিলেন বলে যুদ্ধে যেতে পারেন নি। তাদের উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ অংশে। চতুর্থ শ্রেণী সেসব নিষ্ঠাবান মু'মিনের যারা কোন রকম ওযর না থাকা সত্ত্বেও আলস্যের দরুন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন নি। এঁদের আলোচনা উল্লিখিত وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا ও وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ অংশে এসেছে। আর পঞ্চম শ্রেণীটি ছিল মুনাফিকদের যারা কুটিলতা ও মুনাফিকীর কারণে জিহাদে শরীক হয়নি। এদের আলোচনা কুরআনের বহু আয়াতে এসেছে। সারকথা, বিগত আয়াতসমূহে বেশির ভাগই

পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত মুনাফিকদের আলোচনা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে চতুর্থ শ্রেণীর লোকদের কথা বলা হচ্ছে যারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও শুধু আলস্যের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন নি।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল ও কাজকর্ম সংমিশ্রিত—কিছু ভাল, কিছু মন্দ। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবূল করে নেবেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এমন দশ ব্যক্তি ছিল যারা কোন রকম যথার্থ ওযর-আপত্তি ছাড়াই গযওয়ায়ে তাবুকে যাননি। তারপর তাদের সাতজন নিজেদেরকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তওবা কবূল করে নিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে না খুলবেন, আমরা এভাবেই আবদ্ধ কয়েদী হয়ে থাকব। এঁদের মধ্যে আবূ লুবাবাহ্‌র নামের ব্যাপারে হাদীসের সমস্ত রিওয়ায়েতকারী একমত। অন্যান্য নামের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রিওয়ায়েত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদেরকে এভাবে বাঁধা অবস্থায় দেখলেন এবং জানতে পারলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং তাদেরকে না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন তিনি বললেন, আমিও আল্লাহ্‌র কসম খাচ্ছি যে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এদেরকে খুলব না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আমাকে এদের খোলার নির্দেশ দান করেন। এদের অপরাধ বড় মারাত্মক। এরই প্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াতটি নাযিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এঁদের খুলে দেবার নির্দেশ দান করেন। অতঃপর তাঁদের খুলে দেয়া হয়।—(কুরতুবী)

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আবূ লুবাবাহ্‌কে বাঁধনমুক্ত করার যখন সংকল্প প্রকাশ করা হয়, তখন তিনি অস্বীকার করেন এবং বলেন, যতক্ষণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাযী হয়ে নিজের হাতে না খুলবেন, আমি বাঁধাই থাকব। সুতরাং ভোরে যখন তিনি নামায পড়তে আসেন, তখন পবিত্র হস্তে তাঁকে খুলে দেন।

সদাসৎ মিশ্রিত আমল কি ? ঃ আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের কিছু আমল ছিল নেক, কিছু মন্দ। তাদের নেক আমল তো ছিল তাদের ঈমান, নামায, রোযার অনুবর্তিতা এবং উক্ত জিহাদের পূর্ববর্তী গযওয়াসমূহে মহানবী (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ, স্বয়ং এই তাবুকের ঘটনায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেয়া এবং এ কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা প্রভৃতি। আর মন্দ আমল হলো গযওয়ায়ে তাবুকে অংশগ্রহণ না করা এবং নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা মুনাফিকের সামঞ্জস্য বিধান করা।

যেসব মুসলমানের আমল মিশ্রিত হবে কিয়ামত পর্যন্ত তারাও এ হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত ঃ তফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ জামাআত তথা দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক। যে সমস্ত মুসলমানের আমল ভাল ও মন্দে মিশ্রিত হবে, তারা যদি নিজেদের পাপের জন্য তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্যও মাগফিরাত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করা যায়।

আবূ উসমান (র) বলেছেন, কোরআন করীমের এ আয়াতটি উম্মতের জন্য বড়ই আশাব্যঞ্জক। সামুরাহ্ ইবনে জুনদুব (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে বুখারী শরীফে মি'রাজ সম্পর্কিত এক বিস্তারিত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যখন মহানবী (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তাঁর কাছে এমন কিছু লোককে দেখতে পান যাদের চেহারা ছিল সাদা। আর কিছু লোক যাদের চেহারা ছিল কিছু দাগ—ধাববাযুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর এ লোকেরা একটি নহরে প্রবেশ করল এবং তাতে গোসল করে বেরিয়ে এল। আর তাতে করে তাদের চেহারার দাগগুলোও সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে সাদা হয়ে গেল। হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁকে জানালেন যে, স্বচ্ছ চেহারার এ লোকগুলো হলো যারা ঈমান এনেছে এবং পাপতাপ থেকেও মুক্ত থেকেছে— اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগুলো হলো যারা ভালমন্দ সব রকম কাজই মিশিয়ে করেছে এবং পরে তওবা করে নিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করে নিয়েছেন এবং তাদের পাপ মোচন হয়ে গেছে। —(কুরতুবী)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً আয়াতের ঘটনা হলো এই যে, উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যারা কোন রকম ওযর-আপত্তি ছাড়াই তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে আবদ্ধ করে নেন। অতঃপর উল্লিখিত আয়াতে তাদের তওবা কবূল হওয়ার বিষয় নাযিল হয় এবং বন্ধনমুক্তির পর তাঁরা শুকরিয়াস্বরূপ নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ সদ্‌কা করে দেয়ার জন্য পেশ করেন। তাতে রাসূলে করীম (সা) এই বলে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান যে, এসব মালামাল গ্রহণের নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় যে, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ (অর্থাৎ এদের মাল থেকে গ্রহণ করুন।) ফলে তিনি সমগ্র মালামালের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ মালের সদকা গ্রহণ করতে সম্মত হন। কারণ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেন সমগ্র মাল নেয়া না হয়; বরং তার অংশবিশেষ যেন নেয়া হয়। مِنْ অব্যয়টিই এর প্রমাণ।

মুসলমানদের সদকা-যাকাত আদায় করে তা যথাযথ খাতে ব্যয় করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ঃ এ আয়াতের শানে-নযূল অনুযায়ী যদিও বিশেষ একটি শ্রেণী বা দলের সদ্‌কা বা দান গ্রহণ করার নির্দেশ হয়েছে, কিন্তু তা নিজ মর্ম অনুযায়ী ব্যাপক।

তফসীরে কুরতুবী, আহ্‌কামুল কোরআন জাস্‌সাস, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে একেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কুরতুবী ও জাস্‌সাস, একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এ আয়াতের শানে-নযুল অনুযায়ী যদি সেই বিশেষ ঘটনাকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও কোরআনী মূলনীতির ভিত্তিতে এ হুকুমটি ব্যাপক ও সাধারণই থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য বলবৎ থাকবে। কারণ কোরআনের অধিকাংশ বিশেষ বিশেষ হুকুম-আহ্‌কাম বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে, কিন্তু তার কার্যকারিতা পরিধি কারো মতেই সেই বিশেষ ঘটনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যে পর্যন্ত নির্দিষ্টতার কোন দলীল না থাকবে, এই হুকুম সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক বলেই গণ্য হবে এবং সবাইকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এমনকি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াতে যদিও নির্দিষ্টভাবে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এ হুকুমটি না তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এবং না তাঁর যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বরং এমন প্রতিটি লোক, যিনি হুযুরে আকরাম (সা)-এর নায়েব হিসেবে মুসলমানদের নেতা হবেন, তিনিই এ হুকুমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবেন। মুসলমানদের যাকাত-সদকাসমূহ আদায় করা এবং তা যথাযথ খাত অনুযায়ী ব্যয় করার ব্যবস্থা করা তাঁর দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতের প্রাথমিক আমলে যাকাত দানে বিরত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল, তাতে যাকাত দানে বিরত লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিদ্রোহী ও মুরতাদ। আর কিছু লোক এমনও ছিল যারা নিজেদের মুসলমান বলত সত্য, কিন্তু যাকাত না দেয়ার জন্য এমন ছলছুতা অবলম্বন করত যে, 'এ আয়াতে মহানবী (সা)-এর প্রতি আমাদের কাছ থেকে সদ্কা-যাকাত উসূল করার নির্দেশ ছিল, তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্তই। বস্তুত আমরা তা মান্যও করেছি। তাঁর ওফাতের পর আবূ বকর (রা)-র এমন কি অধিকার থাকতে পারে যে তিনি আমাদের কাছ থেকে যাকাত দাবি করতে পারেন!' তাছাড়া প্রথম দিকে এ বিষয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে হযরত উমর (রা)-র মনেও এ কারণেই দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছিল যে, যতই হোক, এরা মুসলমান এবং একটি আয়াতের আশ্রয় নিয়ে যাকাত থেকে বিরত থাকতে চাইছে। কাজেই এদের সাথে এমন আচরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে না, যা সাধারণ মুরতাদদের সাথে করা যায়। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) পূর্ণ দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে বললেন, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের ব্যাপারে ব্যতিক্রম করবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবই।

এতে এ ইঙ্গিতই ছিল যে, যারা যাকাতের হুকুমকে শুধুমাত্র মহানবী (সা)-এর সাথে নির্দিষ্ট করত এবং তাঁর অবর্তমানে তা রহিত হয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিল, তারা অদূর ভবিষ্যতে এমনও বলতে পারে যে, নামাযও মহানবী (সা)-এর সাথেই নির্দিষ্ট ছিল। কারণ কোরআন করীমে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ আয়াতও এসেছে, যাতে নামায কায়েমের জন্য নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নামায সংক্রান্ত আয়াতের হুকুম যেভাবে গোটা উম্মতের জন্য ব্যাপক এবং একে মহানবী (সা)-এর সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার মত ভ্রান্ত ও অপব্যাখ্যা দানকারীদেরকে কুফরী থেকে বাঁচানো যায় না, তেমনিভাবে خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ আয়াতের ক্ষেত্রে এমন ব্যাখ্যাদান করাও তাদেরকে কুফরী ও ইসলামদ্রোহিতা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এ কথার পর হযরত ফারুকে আযম (রা)-র দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ঘুঁচে যায় এবং সমগ্র উম্মতের ঐকমত্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়।

যাকাত সরকারী কর নয়; বরং ইবাদত ঃ কুরআন মজীদের আয়াত خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ -এর পর صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যাকাত ও সদকা রাষ্ট্রীয় কোন কর নয়, যা সরকার পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র গ্রহণ করে থাকে; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, গুনাহ্ থেকে ধনী লোকদের পবিত্র ও বিশুদ্ধ করা।

এখানে উল্লেখ্য, যাকাত-সদ্‌কা উসূলে দু'ধরনের উপকার পাওয়া যায়। প্রথমত, এক উপকার স্বয়ং ধনী লোকদের জন্য। কারণ এর দ্বারা ধনী লোকরা গুনাহ্ ও অর্থ-সম্পদের মুহব্বাত স্বভাব রোগের বিষাক্ত জীবাণু থেকে পাকসাফ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা সমাজের সেই দুর্বল শ্রেণীর লালন-পালনের ব্যবস্থা হয়, যারা নিজেদের জীবিকা আহরণে অসমর্থ ও অপারগ। যেমন এতীম, বিধবা, বিকলাঙ্গ, ছিন্নমূল, মিসকীন ও গরীব প্রভৃতি।

কিন্তু কোরআনের এ আয়াতে শুধু প্রথমোক্ত উপকারিতার উল্লেখ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেটিই হলো যাকাত ও সদকা উসূলের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকারিতাগুলো হলো আনুষঙ্গিক। সুতরাং কোথাও এতীম, বিধবা ও গরীব-মিসকিন না থাকলেও ধনী লোকদের পক্ষে যাকাতের হুকুম রহিত হয়ে যাবে না।

পূর্ববর্তী উম্মতগণের দান-খয়রাতের রীতিনীতি থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। সেকালে দান-খয়রাত ভোগ করা কারো পক্ষেই জায়েয ছিল না। বরং নিয়ম ছিল যে, কোন পৃথক স্থানে সেগুলো রেখে দেয়া হতো এবং আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তা পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে যেত। এ ছিল কবূল হওয়ার আলামত। কিন্তু যেখানে আগুন দ্বারা ভস্ম হতো না, সেখানে তা অগ্রাহ্য হওয়ার আলামত মনে করা হতো। অতঃপর এই অপয়া মালামাল কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতো না। এ থেকে পরিষ্কার হলো যে, যাকাত ও সদ্‌কার আয়াতের হুকুম মূলত কারো অভাব মোচনের জন্য নয়; বরং তা মালের হক ও ইবাদত। যেমন, নামায-রোযা হলো শারীরিক ইবাদত। তবে উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, যে মালামাল আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তার ভোগ-ব্যবহার সে উম্মতের ফকীর-মিসকীনদের জন্য জায়েয করে দেয়া হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক সহী হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে।

একটি প্রশ্ন ঃ এখানে প্রশ্ন উঠে যে, উপরোক্ত ঘটনায় তাঁদের তওবা যখন কবূল হয়েছে বলে আয়াতে বলা হলো, তখন বোঝা গেল যে, তওবার ফলেই গুনাহ্‌র মার্জনা ও পরিশুদ্ধি হয়ে গেল। এরপরও সদ্‌কা উসূলকে পরিশুদ্ধির মাধ্যম বলা হলো কেন? জবাব এই যে, তওবা দ্বারা গুনাহ্ মাফ হলো, কিন্তু তার পরেও গুনাহ্‌র কিছু কালিমা, মলিনতা থাকা সম্ভব, যা পরবর্তীকালে গুনাহ্‌র কারণ হতে পারে। সদ্‌কা আদায়ে সে মলিনতা দূর হয়ে পূর্ণতর বিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে।

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ বাক্যে صَلٰوة অর্থ তাদের জন্য রহমতের দোয়া করা। হুযুরে আকরাম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কারো কারোর জন্য صَلٰوة (সালাত) শব্দ দ্বারা দোয়া করেছিলেন। যেমন, হাদীস শরীফে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِى اَوْفٰى কিন্তু পরবর্তীকালে صلوة শব্দটি নবীগণের বিশেষ আলামতে পরিণত হয়। সে জন্য অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে অন্য কারো জন্য صَلٰوة শব্দ দ্বারা দোয়া করা যাবে না। বরং শব্দটি নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, যাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয়। —(বয়ানুল কোরআন প্রভৃতি)

এ আয়াতে মহানবী (সা)-এর প্রতি সদ্‌কা আদায়কারীদের জন্য দোয়া করার আদেশ হয়। এ কারণে কতিপয় ফিকাহ্‌বিদ বলেন, ইমাম ও আমীরদের পক্ষে সদকা দাতাগণের জন্য দোয়া করা ওয়াজিব। আর কেউ কেউ এ নির্দেশকে মুস্তাহাবও মনে করেন। —(কুরতুবী)

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ যে দশজন মু'মিন বিনা ওযরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাতজন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا আয়াতে। বাকি তিন জনের হুকুম রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন নি। রাসূলে করীম (সা) তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শুধরে যায় এবং ইখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেওয়া হয়।—(বুখারী, মুসলিম)

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ
اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ
لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ
رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ اَفَمَنْ
اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ
بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ
قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾

(১০৭) আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। (১০৮) তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (১০৯) যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি

রেখেছে আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর সে উত্তম ; না সে ব্যক্তি উত্তম, যে স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর তা ওকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয় ? আর আল্লাহ্ জালিমদের পথ দেখান না। (১১০) তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ—প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কিছু লোক এমন রয়েছে যারা (ইসলামের) ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে আর (এতে বসে বসে) কুফর (রাসূলের শত্রুতা)-এর আলোচনা করবে এবং (এর দ্বারা) মু'মিনদের (জামা'আতের মধ্যে) বিভেদ সৃষ্টি করবে (কেননা, যখন অন্য একটি মসজিদ নির্মিত হবে এবং বাহ্যত সদিচ্ছা প্রকাশ করবে, তখন অবশ্যই প্রথম মসজিদের জামা'আতে কিছু না কিছু বিভক্তি আসবে) আর (মসজিদ নির্মাণের এও একটি উদ্দেশ্য যে,) যাতে সেই ব্যক্তির আবাসের ব্যবস্থা হয়, যে (মসজিদ নির্মাণের) পূর্ব থেকে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরোধী (অর্থাৎ আবূ আমের পাদ্রী), আর (জিজ্ঞেস করলে) শপথ করবে, (যেমন ইতিপূর্বে এক জিজ্ঞাসার উত্তরে শপথ করেছিল) যে কল্যাণ ব্যতীত আর কোন নিয়্যতই আমাদের নেই। (কল্যাণ অর্থ আরাম ও সুবিধা), আর আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা (এ দাবিতে) সম্পূর্ণ মিথ্যুক। (এ মসজিদ যখন প্রকৃত মসজিদ নয়; বরং ইসলামের ক্ষতিসাধনের মাধ্যম, তখন) আপনি এতে কখনো (নামাযের উদ্দেশ্যে) দাঁড়াবেন না। তবে যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকে (অর্থাৎ প্রস্তাবের দিন থেকে) তাকওয়া (ও ইখলাস)-র উপর রাখা হয় (অর্থাৎ মসজিদে কোবা) তা (প্রকৃতই) উপযুক্ত যে, আপনি তথায় (নামাযে) খাড়া হবেন। [সুতরাং মহানবী (সা) সময় সময় সেখানে যেতেন ও নামায আদায় করতেন।] এতে (মসজিদে কোবায়) এমন (পুণ্যবান) লোকেরা আছে যারা পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন। (উভয় মসজিদের নির্মাতাগণের অবস্থা যখন জানা গেল, তখন চিন্তা যে), সেই ব্যক্তি কি উত্তম যে নিজের ইমারত (মসজিদ)-এর ভিত্তি রেখেছে আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর, না সে ব্যক্তি (উত্তম) যে নিজের ইমারত (মসজিদ)-এর ভিত্তি রেখেছে কোন ঘাঁটি (গর্ত)-এর কিনারায়, যা পতনোন্মুখ ? (অর্থাৎ বাতিল ও কুফরী উদ্দেশ্যে, যাকে অস্থায়িত্বের দিক দিয়ে পতনোন্মুখ গৃহের সাথেই তুলনা করা হয়েছে)। অতঃপর এটি (এ ইমারতটি) তাকে (নির্মাতাকে) নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয় (অর্থাৎ গর্তের মুখে হওয়ায় সে ইমারত তো পতিত হলোই, সাথে সাথে নির্মাতাও পতিত হলো। কারণ সেও সে ইমারতে ছিল। আর যেহেতু তাদের কুফরী উদ্দেশ্যাবলী জাহান্নামে পৌঁছার সহায়ক, সেহেতু বলা হলো, ইমারতটি তাকে নিয়ে জাহান্নামে পতিত হলো।) আর আল্লাহ্ এমন জালিমদের (দীনের) জ্ঞান দেন না। (ফলে তারা নির্মাণ তো করলো মসজিদ যা দীনের মহৎ আলামত, কিন্তু উদ্দেশ্য রাখলো মন্দ।) তারা সে গৃহ (মসজিদ) নির্মাণ করলো, তা তাদের অন্তরে (কাঁটার মত) বিঁধতে থাকবে। (কারণ তাদের উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে গেল এবং গোপনীয়তা ফাঁস হলো, তদুপরি মসজিদটিকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। মোটকথা, কোন

আশাই পূরণ হলো না। তাই) সারা জীবন তাদের অন্তরে হাহুতাশ থাকবে। অবশ্য তাদের (সে আশাভরা) অন্তর যদি লয়প্রাপ্ত হয়, তবে ভিন্ন কথা (সে হাহুতাশও আর থাকবে না)। আর আল্লাহ্ বড় জ্ঞানী, বড় প্রজ্ঞাময় (তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, সে মতে উপযুক্ত সাজা দেবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুনাফিকদের অবস্থা ও তাদের ইসলামবিরোধী তৎপরতার কথা উপরের অনেক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে রয়েছে তাদের এক ষড়যন্ত্রের বর্ণনা। তা'হলো ঃ মদীনায় আবূ আমের নামের এক ব্যক্তি জাহিল যুগে—খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আবূ আমের 'পাদ্রী' নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রা), যাঁর মরদেহকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও খৃস্টবাদের উপর অবিচল ছিল।

হযরত নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবূ আমের তাঁর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। মহানবী (সা) তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার সান্ত্বনা আসলো না। অধিকন্তু সে বলল, "আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে।" সে একথা বলল যে, আপনার যেকোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো। সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযিনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। কারণ তখন এটি ছিল খ্রিস্টানদের কেন্দ্রস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল, তা ভোগ করলো। আসলে লাঞ্ছনা ভোগ কারো অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় নিজেই লাঞ্ছিত হয়।

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোমান সম্রাটকে মদীনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের দেশান্তরিত করার প্ররোচনাও দিয়েছিল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোমান সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথাসময় সম্রাটের সাহায্য হয় মত কোন সম্মিলিত শক্তি তোমার থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনার মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যাতে মুসলমানদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর।"

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বারজন মুনাফিক মদীনার কোবা মহল্লায়, যেখানে হুযূরে আকরাম (সা) হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন—তথায় অপর একটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইসহাক (র) প্রমুখ ঐতিহাসিক এ বারজনের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যা হোক, অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত

নিল যে, স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামায সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্ধারিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রাসূলে করীম (সা) তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে নামায আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলো। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হলো। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর তিনি কতিপয় সাহাবীকে—যাদের মধ্যে আমের বিন সকস্ এবং হযরত হামযা (রা)-এর হন্তা 'ওয়াহশী'ও উপস্থিত ছিলেন—এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুনি গিয়ে মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমত তাঁরা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

তফসীরে মাযহারীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা) মদীনা পৌঁছে দেখেন যে, সে মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম বিন আ'দীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যে জায়গা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগদখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, পাখিকূল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

ঘটনার বিবরণ জানার পর এবার আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রথম আয়াতে বলা হয় ঃ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا অর্থাৎ উপরে অপরাপর মুনাফিকের আযাব ও লাঞ্ছনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য মুনাফিকরাও ওদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমত, ضِرَارًا অর্থাৎ মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। "ضِرَارٌ" ও "ضَرَرٌ" শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে কতিপয় অভিধান প্রণেতা এ দু'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য রেখেছেন। তারা বলেন, ضرر সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক;

আর ضِرَارًا হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। সেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে একই পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ضِرَارًا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করা। একটি দল সে মসজিদে নামায আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য; اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ। অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ্ ও রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কোরআন মজীদ 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী (সা)-এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্ম করা হয়েছে তা মূলত মসজিদই ছিল না, নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, যা কোরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোন মসজিদের মুকাবিলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তকরণ ও পূর্বতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাতার সওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে! একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েয হবে না। এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলত গুনাহ্র কাজ হলেও যারা এতে নামায আদায় করবে, তাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের সওয়াব সে পাবে না বরং গুনাহ্গার হবে; কিন্তু একে আয়াতে উল্লিখিত 'মসজিদে যিরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে যিয়ার' নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদে যিরার'-এর মত বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত রাখা যেতে পারে। যেমন, হযরত উমর ফারুক (রা) এক আদেশ জারি করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, যাতে পূর্বতন মসজিদের জামাত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়।—(কাশ্শাফ)

উপরোক্ত মসজিদে যিরার সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতে মহানবী (সা)-কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا এখানে দাঁড়ানো অর্থ নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। অর্থাৎ আপনি এই তথাকথিত মসজিদে কখনো নামায আদায় করবেন না।

মাসআলা ঃ এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমানকালেও যদি কেউ পূর্বতন মসজিদের নিকটে নিছক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা জিদের বশে কোন মসজিদ নির্মাণ করে, তবে সেখানে নামায শুদ্ধ হলেও নামায পড়া ভাল নয়।

এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনার নামায সে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথম দিন থেকে তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতির উপর। আর

সেখানে এমন লোকেরা নামায আদায় করে, যারা পাক-পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। বস্তুত আল্লাহ্ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বোঝা যায় যে, সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী (সা) তখন নামায আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রিওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। كما راوه ابن مرد ويه عن عباس وعمروبن شيبة عن سهل الانصارى وابن خزيمة فى صحيحة عن عويمربن ساعده—(তফসীরে মাযহারী)

অপর কতিপয় রেওয়ায়েত মতে এর অর্থ যে মসজিদে নববী নেওয়া হয়েছে, তা' আয়াতের মর্মের পরিপন্থী নয়। কেননা মসজিদে নববীর ভিত্তি মহানবী (সা) নিজ দস্তে মুবারকে ওহীর আদেশ মতে রেখেছিলেন। সুতরাং এর ভিত্তি যে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা' বলাই বাহুল্য। কেননা তাঁর চেয়ে অধিক পবিত্র আর কে হতে পারে ? অতএব এ মসজিদটিও আয়াতের উদ্দেশ্য।—(তিরমিযী, কুরতুবী)

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী (সা)-এর নামাযের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসাবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লিগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ্ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লিগণ সাধারণত এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

ফায়দা ঃ উক্ত আয়াত থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, কোন মসজিদের মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, তা ইখলাসের সাথে শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে নির্মিত হওয়া এবং তাতে কোন লোক দেখানো মনোবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্যের সামান্যতম দখলও না থাকা। আর একথাও জানা গেল যে, নেক্কার, পরহিযগার এবং আলিম ও আবিদ মুসল্লীর গুণেও মসজিদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাই যে মসজিদেরর মুসল্লিগণ আলিম, আবিদ ও পরহিযগার হবে, সে মসজিদে নামায আদায়ে অধিক ফযীলত লাভ করা যাবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সেই মকবুল মসজিদের মুকাবিলায় মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদে যিরারের নিন্দা করে বলা হয়েছে, তার তুলনা নদীর তীরবর্তী এমন মাটির সাথেই করা যায়, যাকে পানির ঢেউ নিচের দিকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু উপর থেকে মনে হয় যেন সমতল ভূমি। এর উপর কোন গৃহ নির্মাণ করলে যেমন অচিরেই তা' ধসে যাবে, মসজিদে যিরার-এর ভিত্তিও ছিল তেমনি নড়বড়ে। সুতরাং অচিরেই সেটি ধসে গেল এবং জাহান্নামে পতিত হলো। জাহান্নামে পতিত হওয়ার কথাটি রূপক অর্থেও নেওয়া যায় এ হিসেবে যে, এর নির্মাতারা যেন জাহান্নামে পৌঁছার পথ পরিষ্কার করলো। তবে কতিপয় মুফাস্সির এর আক্ষরিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ মসজিদটিকে ধ্বংস করার পর তা' প্রকৃত প্রস্তাবেই জাহান্নামে চলে গেল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

শেষের আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের এই নির্মাণ কর্ম সর্বদা তাদের সন্দেহ ও মুনাফিকীকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলবে, যতক্ষণ না তাদের অন্তরগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যায়। অর্থাৎ

তাদের জীবন শেষ না হওয়া অবধি তাদের সন্দেহ, কপটতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সমানভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ
الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا
عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ
وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ
السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّا
هُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

(১১১) আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক। সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য। (১১২) তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কছেদকারী, রুকূ ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহ্র দেয়া সীমাসমূহের হিফাযতকারী। বস্তুত সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুসলমানদের জান ও মালামালকে এ ওয়াদার বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জান্নাত লাভ হবে। (আল্লাহ্র কাছে জান-মাল বিক্রির অর্থ হলো এই যে,) তারা আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ (জিহাদ) করে, এতে তারা (কখনো শত্রুকে) হত্যা করে এবং (কখনো নিজে) নিহত হয়। (অর্থাৎ এ বেচা-কেনা জিহাদের জন্য। চাই অন্যকে হত্যা করুক বা নিজে নিহত হোক।) এ (যুদ্ধ) প্রসঙ্গে (তাদের সাথে) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে; ইঞ্জিলে এবং কোরআনে (ও)। আর (একথা সর্বজনস্বীকৃত যে,) আল্লাহ্র চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আছে? (তিনি এই লেনদেনের ভিত্তিতে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন।) সুতরাং (এ অবস্থায়) তোমরা (যে জিহাদে লিপ্ত রয়েছ) নিজেদের এই লেনদেনের উপর (যা আল্লাহর সাথে হয়েছে) আনন্দ প্রকাশ কর। (কেননা প্রতিশ্রুতি মতে তোমরা অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে।) আর এ (জান্নাত লাভই) হলো মহান সাফল্য। (তাই এ বেচা-কেনা অবশ্যই তোমাদের করা উচিত।) তারা (সে মুজাহিদগণ) এমন যে, তারা জিহাদ করা ছাড়াও আরো কিছু গুণে গুণান্বিত। তা হলো এই যে, তারা গুনাহ থেকে তওবাকারী, আল্লাহর ইবাদতকারী, (আল্লাহর) প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকূ ও সিজদাকারী (অর্থাৎ নামায আদায়কারী), সৎকাজের আদেশদানকারী, মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমাগুলোর (অর্থাৎ হুকুম-আহকামের রক্ষণাবেক্ষণ) ব্যাপারে যত্নবান। আর আপনি এমন মু'মিনদের সুসংবাদ দান করুন (যারা জিহাদ ও এসব গুণে গুণান্বিত যে, তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিনা ওযরে জিহাদ থেকে বিরত থাকার নিন্দা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে রয়েছে মুজাহিদগণের ফযীলতের বর্ণনা।

শানে নুযুল ঃ অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে 'বায়'আতে আকাবায়' অংশগ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ বায়'আত নেওয়া হয়েছিল মক্কায় মদীনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মদনী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বোঝায় 'মিনা'র জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জমরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেয়া হয়েছে। এখানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফে বায়'আত নেওয়া হয়। প্রথম দফে নেওয়া হয় নবূয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত নিয়ে মদীনা ফিরে যান। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম (সা)-এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজ্জের মৌসুমে বারজন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচজন ছিলেন পূর্বের এবং সাতজন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী (সা)-এর হাতে বায়'আত নেন। এর ফলে মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ চল্লিশজনেরও বেশি। তারা নবী করীম (সা)-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কোরআনের তালীম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা)-কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কোরআন পড়ান ও ইসলামের তবলীগ করেন। ফলে মদীনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতঃপর নবূয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তরজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়'আতে আকাবা। সাধারণত বায়'আতে আকাবা বলতে একেই বোঝানো হয়। এ বায়'আতটি ইসলামের মৌল আকীদা ও আমল বিশেষত কাফিরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী (সা) হিজরত করে মদীনা গেলে তাঁর হিফাযত ও সাহায্য-সহযোগিতার

জন্য নেওয়া হয়। বায়'আত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে; আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোন শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া হোক। হুযুর (সা) বলেন, আল্লাহ্র ব্যাপারে শর্তারোপ করছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করবে, তাকে ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হিফাযত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হিফাযত কর। তাঁরা আরয করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব ? তিনি বললেন, জান্নাত! তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাযী, এমন রাযী যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনদিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

বায়'আতে আকাবা'র ব্যাপারটি দৃশ্যত লেনদেনের মত বিধায় এ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ আয়াত শুনে সর্বপ্রথম হযরত বরা বিন মা'রুর, আবুল হায়সম ও আস্আদ (রা) নিজেদের হাত মহানবী (সা)-এর হস্ত মুবারকের উপর রেখে বললেন, এ অঙ্গীকার পালনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনার হিফাযত করব নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের মত। আর আপনার বিরুদ্ধে সমগ্র দুনিয়ার সাদা-কালো সবাই সমবেত হলেও আমরা সবার সাথে যুদ্ধ করে যাব।

জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত ঃ মহানবী (সা)-এর মক্কা অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় ঃ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ (সূরা হজ্জ ঃ ৩৯)। মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফিরদের অগোচরে যখন বায়'আতে আকাবা সম্পাদিত হয় তখনই মহানবী (সা) মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতঃপর ক্রমশ সাহাবায়ে কিরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (সা) নিজে আল্লাহ্র অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মত নিবৃত্ত রাখেন।—(মাযহারী)

فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ থেকে يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জিহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাযিল হয়েছিল। ইঞ্জিলে (বাইবেলে) জিহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবত এজন্য যে, পরবর্তী খৃস্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো খারিজ হয়ে যায়—আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمْ বায়'আতে আকাবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা দৃশ্যত ক্রয়-বিক্রয়ের মত। তাই আয়াতের শুরুতে 'ক্রয়' শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য

লাভজনক ও বরকতময়। কেননা এর দ্বারা অস্থায়ী জানমালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকী থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল হলো আল্লাহ্রই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত উমর ফারুক (রা) বলেন, "এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদেরকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ্।" হযরত হাসান বসরী (রা) বলেন, "লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ্ সকল মু'মিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।"

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ ..... এ গুণাবলী হলো সেসব মু'মিনের, যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে—"আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন।" আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বায়'আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর اَلتَّائِبُوْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ আল্লাহ্র রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এসকল গুণেরও অধিকারী হয়। বিশেষত বায়'আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের এ সকল গুণ ছিল।

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে اَلسَّائِحُوْنَ -এর অর্থ صَائِمُوْنَ অর্থাৎ রোযা পালনকারী। শব্দটি سَيَاحَتْ (দেশ ভ্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলামপূর্ব যুগে খৃস্টধর্মে দেশ ভ্রমণকে ইবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ মানুষ পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ি ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোযা পালনের ইবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ। অথচ রোযা এমন এক ইবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রিওয়ায়েতে জিহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাজা, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হুযুরে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের দেশভ্রমণ سَيَاحَةُ أُمَّتِى اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্।"

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) বলেন, কোরআন মজীদে ব্যবহৃত سَائِحِيْن শব্দের অর্থ রোযাদার। হযরত ইকরিমা (রা) سَائِحِيْن শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো ইলমে দীনের শিক্ষার্থী, যারা ইলম হাসিলের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ, যথা ঃ تَائِبُوْنَ ، عَابِدُوْنَ ، حَامِدُوْنَ ، سَائِحُوْنَ ، رَاكِعُوْنَ ، سَاجِدُوْنَ ، اٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ উল্লেখ করে অষ্টম গুণ হিসাবে বলা হয়েছে اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللهِ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ।

অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্তসার হলো এই যে, এঁরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরীয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হিফাযতকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয় وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যে সকল মু'মিনের উপরোক্ত গুণাবলী রয়েছে, তাদের এমন নিয়ামতের সুসংবাদ দান করুন, যা ধারণার অতীত, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না এবং যা এ পর্যন্ত কেউ শোনেওনি অর্থাৎ জান্নাতের নিয়ামত।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ
كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ
الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ
وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ
اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾

(১১৩) নবী এবং মু'মিনের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক—একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। (১১৪) আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফিরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পয়গম্বর (সা) ও অপরাপর মুসলমানের পক্ষে মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা জায়েয নয় যদি সে আত্মীয়ও হয়, একথা পরিষ্কার হওয়ার পর যে, তারা দোযখী (কারণ তারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।) আর [হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ঘটনা থেকে যদি সন্দেহ হয়, তবে তার উত্তর হলো এই যে,] ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফিরাত কামনা ছিল (পিতার দোযখী হওয়ার ব্যাপারটি পরিষ্কার হওয়ার আগে এবং তাও) সেই প্রতিশ্রুতির দরুন যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। (তিনি বলেছিলেন ঃ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ মোটকথা, তাঁর মাগফিরাত কামনা জায়েয হওয়ার কারণ ছিল পিতার দোযখী হওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট না হওয়া। আর সে মাগফিরাতও চেয়েছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন বিধায়। নতুবা মাগফিরাত

কামনা জায়েয থাকলেও তিনি তা করতেন না) অতঃপর যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু (অর্থাৎ কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে) তখন সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। (এবং মাগফিরাত কামনাও পরিহার করলেন। কেননা এমতাবস্থায় দোয়া করা নিরর্থক। কারণ কাফিরের মাগফিরাতের আদৌ সম্ভাবনা নেই। তবে জীবিত অবস্থার কথা ভিন্ন। তখন মাগফিরাতের অর্থ হতে পারে হিদায়েত লাভের তওফীক কামনা করা। কারণ হিদায়েতের তওফীকপ্রাপ্ত হলে মাগফিরাত অবশ্যম্ভাবী হতো। আর অঙ্গীকার করার কারণ হলো) ইব্রাহীম (আ) ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল (তিনি পিতার অত্যাচার-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করে গেছেন। অধিকন্তু পিতৃভক্তির দরুন মাগফিরাত কামনার অঙ্গীকার করেছেন এবং দোয়ার সুফল লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত সে অঙ্গীকার পালনও করে গেছেন। কিন্তু পিতা থেকে যখন নিরাশ হয়ে পড়লেন, তখন মাগফিরাত কামনাও পরিহার করলেন। কিন্তু মুশরিকদের জন্য তোমাদের যে মাগফিরাত কামনা, তা হলো তাদের মৃত্যুর পর। অথচ জানা কথা যে, শিরক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাই ইব্রাহীম (আ)-এর ঘটনার সাথে একে তুলনা করা ঠিক নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোটা সূরা তওবাই কাফির ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম-আহ্কাম সম্বলিত। সূরাটি শুরু হয় بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ বাক্য দিয়ে। এজন্য এটি সূরা 'বরাআত' নামেও খ্যাত। এ পর্যন্ত যতগুলো হুকুম বর্ণিত হয়েছে তা ছিল পার্থিব জীবনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত সম্পর্কচ্ছেদের হুকুম হলো পরজীবন সংক্রান্ত। তা হলো এই যে, মৃত্যুর পর কাফির ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনাও জায়েয নেই। যেমন, পূর্ববর্তী এক আয়াতে নবী করীম (সা)-কে মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়তে বারণ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত অবতরণের পটভূমি হলো, হুযুরে আকরাম (সা)-এর চাচা আবূ তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তথাপি তিনি আজীবন ভ্রাতুষ্পুত্রের হিফাযত ও সাহায্যকারী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে স্বগোত্রের কারো এতটুকু তোয়াক্কা করেন নি। এ জন্য মহানবী (সা) তার দ্বারা অন্তত কলেমাটি পাঠ করিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিলেন। কারণ ঈমান আনলে রোজ হাশরে সুপারিশ করার একটা সুযোগ হবে এবং দোযখের আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। অতঃপর চাচা যখন মৃত্যুশয্যায় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত, তখন তাঁর চেষ্টা ছিল যদি শেষ মুহূর্তেও কোন উপায়ে কলেমাটি পাঠ করিয়ে নেওয়া যায়, তবে একটা সদগতি হয়। তাই তিনি চাচার শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু দেখলেন, আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত। তবুও তিনি বললেন, চাচাজান, কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করুন। আমি আপনার মাগফিরাতের জন্য চেষ্টা করবো। তখন আবূ জাহল বলে উঠল, আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কথাটি আরো কয়েকবার বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই আবূ জাহল নিজের বক্তব্য পেশ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবূ তালিব একথা বলেই মৃত্যুবরণ করে

যে, "আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি।" পরে রাসূলে করীম (সা) শপথ করে বলেন, কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত আমি তোমার জন্য নিয়মিত মাগফিরাত কামনা করবো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। এ আয়াতে রাসূলে করীম (সা) ও সকল মুসলমানকে কাফির ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে বারণ করা হয়েছে—যদিও তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়।

এতে কোন কোন মুসলমানের মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে ইবরাহীম (আ) নিজের কাফির পিতার জন্য দু'আ করেছিলেন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হয় ঃ مَاكَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) পিতার জন্য যে দু'আ করেছিলেন, তা ছিল এ কারণে যে, পিতা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কুফরের উপর যে অটল থাকবে এবং কুফরী অবস্থায়ই যে মৃত্যুবরণ করবে, সেকথা তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি আপনার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবো— سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র শত্রু অর্থাৎ কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনিও সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন এবং মাগফিরাতের দু'আও ত্যাগ করেন।

কোরআনে যে সকল আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্বীয় পিতার জন্য দু'আ করার উল্লেখ রয়েছে, তা' সবই ছিল উপরোক্ত কারণের প্রেক্ষিতে, অর্থাৎ তাঁর দু'আর উদ্দেশ্য ছিল যাতে পিতা ঈমান ও ইসলামের তওফীক লাভ করে, এবং তাতে তাঁর মাগফিরাত হতে পারে।

উহুদ যুদ্ধে যখন কাফিররা মহানবী (সা)-এর চেহারা মুবারকে আঘাত করে তখন তিনি নিজ হাতে গণ্ডদেশের রক্ত মুছতে মুছতে দু'আ করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ اِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তারা অবুঝ। কাফিরদের জন্য মহানবী (সা)-এর উক্ত দু'আর উদ্দেশ্য হলো, তাদের যেন ঈমান ও ইসলামের তওফীক লাভ হয় এবং তার ফলে যেন তারা মাগফিরাতের যোগ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, জীবিত কাফিরের জন্য ঈমানের তওফীক লাভের নিয়তে দু'আ করা জায়েয রয়েছে, যাতে সে মাগফিরাতের যোগ্য হতে পারে। اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ - اَوَّاهٌ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা কুরতুবী (র) এর ১৫টি অর্থ উল্লেখ করেছেন, তবে সবই সমার্থবোধক। প্রকৃতপক্ষে তাতে তেমন ব্যবধান নেই। তন্মধ্যে কয়েকটি অর্থ এই—অতিশয় হা-হুতাশকারী, অত্যধিক প্রার্থনাকারী, মানুষের প্রতি দয়াশীল। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ (রা) থেকে শেষোক্ত অর্থ বর্ণিত রয়েছে।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ

مَّا يَتَّقُوْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۱۶﴾

(১১৫) আর আল্লাহ্ কোন জাতিকে হিদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না —যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা' থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। (১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আল্লাহ এমন নন যে, কোন জাতিকে হিদায়েত দান করার পর গোমরাহ করবেন, যতক্ষণ না পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করে দেন, যা থেকে তাদের বাঁচতে হবে। [(অতএব) আমি যখন তোমাদের (মুসলমানদের) হিদায়েত করেছি এবং এর পূর্বাহ্নে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিনি, তখন এজন্য তোমাদের এমন সাজা দেওয়া হবে না, যাতে তোমাদের মধ্যে গোমরাহী সংক্রামিত হতে পারে।] নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে বিশেষ অবগত। (তাই এ বিষয়েও তিনি অবগত যে, তাঁর বলা ছাড়া এমন হুকুম-আহকাম কেউ জানতে পারবে না। অতএব এ সকল কাজের ক্ষতিকর দিক তোমাদের স্পর্শ করতে দেবেন না। আর) নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনে আল্লাহ্রই সাম্রাজ্য বিদ্যমান। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান । (অর্থাৎ সমস্ত কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র তাঁরই। তাই তিনি যেমন ইচ্ছা আদেশ করেন এবং যে অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার ইচ্ছা বাঁচান।) আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের না কোন সহায়ক আছে, আর না কোন সাহায্যকারী। (তিনিই সহায়ক। কাজেই নিষেধাজ্ঞার আগে অনিষ্ট থেকে তোমাদের বাঁচান। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার পর তা তোমরা মান্য না করলে তোমাদের জন্য সাহায্যকারী আর কেউ নেই।)

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ
فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَّعَلَى
الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۚ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

(১১৭) আল্লাহ্ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। (১১৮) এবং অপর তিন জনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো ; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই—অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দয়াময় করুণাশীল। (১১৯) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ পয়গম্বর (সা)-এর অবস্থার প্রতি শুভদৃষ্টি রেখেছেন (যে, তাঁকে নবুয়ত, জিহাদের নেতৃত্ব ও অপরাপর গুণাবলী দান করেছেন) এবং মুহাজির ও আনসারের প্রতি (দৃষ্টি রেখেছেন যে, এমন কঠিন যুদ্ধেও তাদের সুদৃঢ় রেখেছেন) যারা এমন সংকটকালে নবীর অনুগামী হয়েছেন যখন তাদের এক দলের অন্তর বিচলিত হয়ে উঠেছিল (এবং যুদ্ধে গমনের সাহস প্রায় হারিয়ে বসেছিল)। অতঃপর আল্লাহ্ এই দলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, (সাহস যোগান। ফলে তারাও জিহাদে শরীক হন।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকলের প্রতি দয়াবান ও অতিশয় করুণাময়। (অবস্থানুসারে প্রত্যেকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি রেখেছেন।) আর অপর তিন জনের প্রতিও (দয়ার দৃষ্টি রেখেছেন) যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল—এমনকি (তাদের দুরবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে,) পৃথিবী (এত) বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তারা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো, আর বুঝতে পারল যে, আল্লাহ (-র ধরপাকড়) থেকে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া। (এ সময় তারা বিশেষ দৃষ্টি লাভের উপযুক্ত হয়।) তিনি তাদের অবস্থার প্রতি (বিশেষ) দৃষ্টিপাত করেন, যাতে তারা ভবিষ্যতেও (এমন বিপদ ও নাফরমানীকালে আল্লাহ্র দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই দয়ালু, করুণাময়। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং (কাজ-কর্মে) সত্যবাদীদের সাথে থাক (অর্থাৎ যারা নিয়ত ও কথায় সৎ তাদের পথে চল, যাতে তোমরাও সততা অবলম্বন করতে পার)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াত وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে, তাবুক যুদ্ধের আদেশ ঘোষিত হলে মদীনাবাসীরা পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দু'দল ছিল মুনাফিকের, যাদের বর্ণনা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে এসেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে রয়েছে নিষ্ঠাবান মু'মিনের তিনটি দলের বর্ণনা। প্রথম দল ছিল তাদের যারা যুদ্ধের আদেশ হওয়া মাত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাদের আলোচনা রয়েছে প্রথম আয়াতের اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ বাক্যে। দ্বিতীয় দল যারা প্রথম দিকে রয়েছে অত্র আয়াতের مِنْۢ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ বাক্যে।

তৃতীয় দল হলো তাদের, যারা সাময়িক অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু পরে অনুতাপ ও অনুশোচনার সাথে তওবা করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের তওবা কবুলও হয়। কিন্তু পরে তারা আবার দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সর্ব সাকুল্যে তাদের সংখ্যা ছিল দশজন। তাদের সাত জন জিহাদ থেকে রাসূলে করীম (সা)-এর প্রত্যাবর্তনের পর নিজেদের মনস্তাপ ও তওবাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁরা মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকবেন। তখনই তাঁদের তওবা কবূল হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়, যার বিবরণ ইতিপূর্বে এসেছে। তাঁদের বাকী তিনজন নিজেদের মনস্তাপ সেভাবে প্রকাশ করেন নি। রাসূল (সা) তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও সালামের আদান-প্রদান থেকে বিরত থাকার আদেশ দান করেন। ফলে তাঁরা ভীষণভাবে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতের শুরুতে وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا বাক্যে তাঁদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং অবশেষে তাঁদের তওবা কবূল হওয়ার বিষয়ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের সমাজচ্যুত করার হুকুম রহিত হয়ে যায়। বলা হয় ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ-

অর্থাৎ আল্লাহ্ তওবা কবূল করেছেন নবীর এবং সেসব মুহাজির ও আনসারগণের যাঁরা একান্ত সংকটকালে নবীর অনুগমন করেছে।

প্রশ্ন আসে, তওবা করতে হয় পাপাচার ও নাফরমানীর কারণে। অথচ রাসূলে করীম (সা) হলেন নিষ্পাপ ; তাঁর তওবা কবূলের অর্থ কি? এছাড়া মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যাঁরা শুরুতেই জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁদের তো কোন দোষ ছিল না। এ সত্ত্বেও তাঁদের তওবা কোন্ অপরাধে ছিল—যা কবূল হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ্ গুনাহ্ থেকে তাঁদের রক্ষা করেছেন, যাকে তওবা নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিংবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাঁদেরকে তওবাকারীতে পরিণত করেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন মানুষ তওবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারে না, তা স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) কিংবা তাঁর বিশিষ্ট সাহাবা যেই হোন না কেন? যেমন, অপর আয়াতে আছে تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا "তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর।" এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্র নৈকট্যের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। যে যেখানেই পৌঁছাক না

কেন, তারপরেও অন্য স্তর থেকে যায়। তাই বর্তমান স্তরে স্থির থাকা অলসতার নামান্তর। মাওলানা রুমী (র) বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

ائے برادر بے نہایت درگہی ست
هرچه بروئے می رسی بروئے مایست

অর্থাৎ "হে আমার ভাই, আল্লাহ্‌র দরবার বহু উচ্চে, তাই যেখানে পৌছাবে, সেখানেই স্থির হয়ে থেকো না।" অতএব আল্লাহ্‌র মা'রেফতে বর্তমান স্তরে থেকে যাওয়া হতে তওবার আবশ্যক আছে, যাতে পরবর্তী স্তরে পৌছা যায়। سَاعَةَ الْعُسْرَةِ কোরআন মজীদ জিহাদের এ মুহূর্তকে সংকটময় মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছে। কারণ সেসময় মুসলমানগণ বড় অভাব অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (র) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালাবদল করে তাঁরা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ আয়াতের এ বাক্যে যে কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মান্তর নয়, বরং এর অর্থ হলো, কড়া গ্রীষ্ম ও সম্বলের স্বল্পতা হেতু সাহস হারিয়ে ফেলা এবং জিহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রিওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাঁদের অপরাধ, যেজন্য তাঁরা তওবা করেন এবং তা কবূল হয়।

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا এখানে خُلِّفُوا অর্থ যাদের পেছনে রাখা হয়েছে। তবে মর্মার্থ হলো, যাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলো। এঁরা তিনজন হলেন হযরত কা'আব বিন মালেক, শা-এর মুরারা বিন রবি এবং হেলাল বিন উমাইয়া (রা), তাঁরা তিনজনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতিপূর্বে বায়'আতে আ'কাবা ও মহানবী (সা)-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো। অতঃপর যখন হুযুরে আকরাম (সা) জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল, আর মহানবী (সা)-ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন। ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হুযুর (সা)-কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহর নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন, যে অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেওয়া হয়। আর এদিকে কোরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সূরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ .... পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম

পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিনজন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাযিল হয় তাঁদের তওবা কবূল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিষহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হন।

সহী হাদীসের আলোকে ঘটনার বিবরণ

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে হযরত কা'আব বিন মালিক (রা)-র এ ঘটনার এক দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, যা বহু ফায়দা ও মাসায়েল সম্বলিত এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সে জন্য পুরা হাদীসের তরজমা এখানে পেশ করা সমীচীন মনে করছি। সে বিদগ্ধ তিন শ্রদ্ধেয়জনের একজন ছিলেন কা'আব বিন মালিক (রা)। তিনি ঘটনার নিম্ন বিবরণ পেশ করেনঃ

"রাসূলে করীম (সা) যতগুলো যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, একমাত্র তাবুক যুদ্ধ ছাড়া বাকী সবগুলোতেই আমি তাঁর সাথে যোগদান করি। তবে বদর যুদ্ধ যেহেতু আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় এবং এতে যোগ না দেওয়ায় কেউ হযরত (সা)-এর বিরাগভাজন হয়নি তাই এ যুদ্ধেও আমি শরীক হতে পারিনি। অবশ্য আমি বায়'আতে আকাবার রাতে সেখানেও উপস্থিত ছিলাম এবং আমরা ইসলামের সাহায্য ও হিফাযতের অঙ্গীকার করেছিলাম। বদর যুদ্ধের খ্যাতি যদিও সর্বত্র, তথাপি বায়'আতে আকাবার মর্যাদা আমার কাছে অধিক। তবে তাবুক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার কারণ হলো এই যে, তখনকার মত এত প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা পরবর্তী কোন কালেই আমার ছিল না।—আল্লাহ্র কসম করে বলছি, বর্তমানের মত দু'টি বাহন ইতিপূর্বে কখনো একত্রে আমার ছিল না।

"যুদ্ধের ব্যাপারে হুযুরে আকরাম (সা)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, মদীনা থেকে বের হবার সময় গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তিনি রণাঙ্গনে বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করতেন, যাতে মুনাফিক গুপ্তচরেরা সঠিক গন্তব্য সম্পর্কে শত্রুপক্ষকে হুঁশিয়ার করতে না পারে। আর প্রায়ই তিনি বলতেন, যুদ্ধে (এ ধরনের) ধোঁকা জায়েয আছে।

"এমতাবস্থায় তাবুক যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। (এ যুদ্ধটি কয়েকটি কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত) মহানবী (সা) প্রকট গ্রীষ্ম ও দারুণ অভাব-অনটের মধ্যে এ যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করেন। সফরও ছিল বহু দূরের। শত্রুসেনার সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশি। তাই তিনি যুদ্ধের ব্যাপক ও সাধারণ ঘোষণা দিলেন যাতে মুসলমানরা যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে।"

মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েতমতে এ জিহাদে যোগদানকারী মুসলমানের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি। আর হাকেম কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে হযরত মু'আয (রা) বলেন, 'নবী করীম (সা)-এর সাথে এ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় আমাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারেরও বেশি।'

"এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কোন তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। ফলে জিহাদে যেতে যারা অনিচ্ছুক, তাদের এ সুযোগ হলো যে, তাদের অনুপস্থিতির কথা কেউ জানবে না। যখন রাসূলে করীম (সা) জিহাদে রওয়ানা হলেন, তখন ছিল খেজুর পাকার মওসুম। তাই খেজুর বাগানের

মালিকরা এ নিয়ে মহাব্যস্ত ছিল। ঠিক এ সময় নবী করীম (সা) ও সাধারণ মুসলমানগণ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। বৃহস্পতিবার তিনি যুদ্ধে যাত্রা করেন। যেকোন দিকের সফরে তা যুদ্ধের হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার দিনটিকেই মহানবী (সা) পছন্দ করতেন।

"এদিকে আমার অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিদিন সকালে জিহাদের প্রস্তুতির ইচ্ছা পোষণ করতাম, কিন্তু কোনরূপ প্রস্তুতি ছাড়াই ঘরে ফিরে আসতাম। মনে মনে বলতাম জিহাদের সামর্থ্য আমার আছে, বের হয়ে পড়াই আবশ্যক। কিন্তু 'আজ, না কালে'র চক্করে পড়ে থাকলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম (সা) ও অপরাপর মুসলমানগণ জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তবুও মনে আসতো, এক্ষুণি রওয়ানা হয়ে যাই, পরে কোনখানে তাঁদের সাথে মিলিত হবো। হায়! যদি তাই করতাম, কতইনা ভাল হতো! কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হলো না।

"রাসূলে করীম (সা)-এর জিহাদে চলে যাওয়ার পর মদীনার যেকোন পথে চলতে গিয়ে একটি কথা আমাকে পীড়া দিত। আমি দেখতাম, মদীনায় রয়েছে মুনাফিক, সফরের অযোগ্য অসুস্থ কিংবা মা'যুর লোকেরা। অপরদিকে চলার পথে মহানবী কখনো আমাকে স্মরণ করেন নি, অবশেষে তাবুক পৌঁছে তিনি বললেন, কা'আব বিন মালিকের কি হলো? (সে কোথায়?)

"উত্তরে বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি জানালেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তম পোশাক ও তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার দরুন জিহাদ থেকে নিবৃত্ত রয়েছে।' হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা) ওকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি মন্দ কথা বললে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, তার মাঝে ভাল ব্যতীত আমি আর কিছুই পাইনি।' এ কথা শুনে নবী করীম (সা) নীরব হয়ে গেলেন।"

হযরত কা'আব (রা) বলেন, "যখন শুনতে পেলাম যে, হুযুরে আকরাম (সা) জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন বড়ই চিন্তিত হয়ে পরলাম এবং তাঁর বিরাগভাজন না হওয়ার জন্য যুদ্ধে না যাওয়ার কোন একটি বাহানা দাঁড় করবার ইচ্ছাও করছিলাম এবং প্রয়োজনবোধে বন্ধুদের সাহায্যও নিতাম। কিন্তু (এ জল্পনা-কল্পনায় কিছু সময় অতিবাহিত করার পর) যখন শুনলাম, নবী করীম (সা) মদীনায় ফিরে এসেছেন, তখন মনের জল্পনা-কল্পনা সব তিরোহিত হয়ে গেল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, কোন মিথ্যা বাহানার আশ্রয় নিয়েই হযরত (সা)-এর রোষানল থেকে বাঁচা যাবে না। তাই সত্য বলার সংকল্প গ্রহণ করি। কারণ সত্য কখন আমাকে বাঁচাতে পারে।

"সূর্য কিছু উপরে উঠলে হুযূরে আকরাম (সা) মদীনায় প্রবেশ করেন। ঠিক এমনি সময় যেকোন সফর থেকে ফিরে আসা ছিল তাঁর অভ্যাস। আরেকটি অভ্যাস ছিল এই যে, কোনখান থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন। অতঃপর হযরত ফাতিমা (রা)-এর সাথে দেখা করতে যেতেন। তারপর স্ত্রীগণের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

"এ অভ্যাসমতে তিনি প্রথমে মসজিদে গমন করেন এবং দু'রাকআত নামায আদায় করেন, অতঃপর মসজিদেই বসে পড়েন। যখন যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক মুনাফিকের দল—যাদের সংখ্যা ছিল আশিজনের কিছু অধিক—হুযুর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে মিথ্যা বাহানা গড়ে, মিথ্যা শপথ করতে থাকে। রাসূলে করীম (সা) তাদের এই বাহ্যিক অজুহাত ও মৌখিক

শপথকে কবূল করে নিয়ে তাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের গোপন বিষয়কে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করেন।

"ঠিক এ সময় আমিও তাঁর খিদমতে হাযির হই এবং তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়ি। আমি যখন তাঁকে সালাম দেই, তখন তিনি এমন ভঙ্গিতে একটু হাসলেন যেমন অসন্তুষ্ট লোকেরা হাসে।" কতিপয় রিওয়ায়েতমতে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? আল্লাহর কসম আমি মুনাফিকী করিনি। আমার মনে দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এবং দীনের মধ্যে কোন পরিবর্তনও আনিনি। এবার তিনি বললেন, তা'হলে জিহাদে গেলে না কেন? তুমি কি সওয়ারী খরিদ করনি?

"আরয করলাম, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দুনিয়ার আর কোন মানুষের সামনে যদি বসতাম, তবে নিশ্চয় কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে বিরাগভাজন হওয়া থেকে বাঁচতাম। কেননা বাহানা গড়ার ব্যাপারে আমি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমার বুঝতে বাকি নেই যে, কোন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হয়ত আপনার সাময়িক সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব, কিন্তু বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ আমার প্রকৃত অবস্থার কথা আপনাকে জানিয়ে দিয়ে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি, তবে আপনি সাময়িকভাবে অসন্তুষ্ট হলেও আশা করি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং সত্য কথা হলো এই যে, জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার যথার্থ কোন ওযর আমার ছিল না এবং এমনকি সে সময় যে আর্থিক ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্য আমার ছিল, তা' অন্য কোন সময় ছিল না।

"রাসূলে করীম (সা) বললেন, এ সত্য কথা বলেছে। অতঃপর বললেন, এখন যাও, দেখি আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি চলে আসলাম। চলার পথে বনু সালমার কিছু লোক আমাকে বলল, 'আমাদের জানামতে ইতিপূর্বে তুমি কোন অপরাধ করনি। এ কেমন নির্বুদ্ধিতা? অন্যান্য লোকের মত তুমিও তো কোন একটি বাহানা গড়ে নিলে পারতে এবং তোমার অপরাধের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মাগফিরাত কামনা করলে যথেষ্ট হতো।' আল্লাহর কসম তারা আমার এই সত্যবাদিতার বারংবার নিন্দা করেছে। এমনকি আমারও মনে হয়েছে, আবার গিয়ে নবী করীম (সা)-কে বলে আসি যে, আমার পূর্ব বক্তব্য মিথ্যা; আমার যথার্থ ওযর রয়েছে।

"কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে বলেছি, অপরাধের উপর অপরাধ কেন করব? এক অপরাধ করেছি জিহাদে না গিয়ে। দ্বিতীয় অপরাধ হবে মিথ্যা কথা বলে। কাজেই আমি তাদের বললাম, আমার মত আর কি কেউ আছে, যারা নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে? তারা বলল, হ্যাঁ দু'জন আরো আছে; একজন মুরারা বিন রবি আল আমেরী অপরজন হেলাল বিন উমাইয়া ওয়াকেফী।"

ইবনে আবী হাতেম (র)-র রিওয়ায়েতমত হযরত মুরারা (রা)-র জিহাদ থেকে বিরত থাকার কারণ ছিল এই যে, তাঁর বাগানের ফল তখন পাকছিল। মনে মনে ভাবলেন, ইতিপূর্বে অনেক জিহাদেই তো শরীক হয়েছি। এ বছর বিরত থাকলে কি আর হবে? কিন্তু পরে যখন নিজের অপরাধ বুঝতে পারলেন, তখন আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে বললেন, এই বাগান আল্লাহর রাহে সদকা করে দিলাম।

হযরত হেলাল বিন উমাইয়া (রা)-র ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁর পরিবারবর্গ ছিল দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন। এ সময় তাঁরা পরস্পর মিলিত হন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, এ বছর জিহাদ থেকে বিরত থেকে পরিবার-পরিজনের সাথে কাটিয়ে নিই। কিন্তু পরে যখন অপরাধ বুঝতে পারলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করলেন, এখন থেকে পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবো।

হযরত কা'আব বিন মালিক (রা) বলেন, "লোকেরা এমন দু'জন সম্মানী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল, যাঁরা বদর যুদ্ধের মুজাহিদ। তাই আমি একথা বলে তাদের ত্যাগ করলাম যে, এ দু'জন শ্রদ্ধেয়জনের আমলই আমার অনুসরণীয়।

"এদিকে রাসূলে করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে আমাদের তিনজনের সাথে সালাম-কালাম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। অথচ পূর্বের মতই আমাদের অন্তরে মুসলমানদের ভালবাসা ছিল। কিন্তু তারা সবাই আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"ইবনে আবি শায়বার রিওয়ায়েতে আছে—এখন আমাদের অবস্থা এমন হলো যে, আমরা লোকদের কাছে যেতাম, কিন্তু কেউ আমাদের সাথে না কথা বলতো, না সালাম দিত, আর না সালামের জবাব দিত।"

মুসনাদে আবদুর রাযযাকে বর্ণিত আছে, কা'আব বিন মালিক (রা) বলেন, 'তখন দুনিয়াই যেন আমাদের জন্য বদলে গেল। মনে হচ্ছিল যেন এক অচেনা জগতে বাস করছি। নিজের ঘর-বাড়ি, উদ্যান, পরিচিত লোকজন বলতে কিছুই যেন আমাদের নেই। সর্বাধিক চিন্তার বিষয় হলো যে, এ অবস্থায় যদি মৃত্যুবরণ করি তবে নবী করীম (সা) আমার জানাযার নামায আদায় করবেন না। কিংবা আল্লাহ না করুন যদি ইতিমধ্যে হযরত (সা)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়, তবে সারা জীবন এ লাঞ্ছনার মধ্যেই ঘুরে ফিরতে হবে। এ চিন্তায় আমি বড় কাহিল হয়ে পড়লাম। এমনি অবস্থায় আমাদের পঞ্চাশ রাত কেটে গেল। আমার অপর দু'সঙ্গী (মুরারা ও হেলাল) এ অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে ঘরে বসে দিবা-রাত্রি কান্না-কাটিতে মত্ত থাকে। তবে আমি ছিলাম যুবক, বাইরে ঘুরাফেরা করতাম, নামাযের জামাআতে শরীক হতাম এবং বাজারেও যেতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না, সালামের জওয়াব দিত না। নামাযের পর হুযুর (সা)-এর মজলিসে বসতাম এবং সালাম দিয়ে দেখতাম জবাবে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ছে কিনা। অতঃপর তাঁর পাশেই নামায আদায় করতাম এবং আড় চোখে তাঁকে দেখতাম, যখন আমি নামাযে মশগুল তখন তিনি আমার প্রতি সময় সময় দৃষ্টি রাখতেন, কিন্তু আমি তাঁর দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিতেন।

"মুসলমানদের এই বয়কট দীর্ঘতর হয়ে উঠলে একদিন চাচাত ভাই কাতাদাহ (রা)-র কাছে যাই, তিনি ছিলেন আমার বড় আপনজন। আমি তাঁর বাগানের দেয়াল টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি এবং তাঁকে সালাম দেই। আল্লাহর কসম, তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। বললাম, কাতাদাহ তোমার কি জানা নেই, আমি নবী করীম (সা)-কে কত ভালবাসি? কাতাদাহ তখনো নিশ্চুপ। কথাটি আরো কয়েকবার বললাম, অবশেষে তৃতীয় কি চতুর্থবার তিনি শুধু এতটুকু বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম আর দেয়াল টপকে বাইরে চলে এলাম। একদিন মদীনার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ

সিরিয়া থেকে আগত জনৈক ব্যবসায়ীর প্রতি আমার নজর পড়ল। সে লোকদের জিজ্ঞেস করছিল, কা'আব ইবনে মালিকের ঠিকানা কেউ দিতে পার ? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করলে সে আমার কাছে এসে গাসসানের রাজার একটি পত্র আমার হাতে দেয়। পত্রটি রেশম বস্ত্রের উপর লিখিত ছিল। বিষয়বস্তু ছিল এই ঃ

"অতঃপর জানতে পারলাম যে, আপনার নবী আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং আপনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন, অথচ আল্লাহ্ আপনাদের এহেন লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের স্থানে রাখেন নি। আমার এখানে আসা যদি ভাল মনে করেন চলে আসুন। আমরা আপনাদের সাহায্যে থাকবো।"

"পত্রটি পাঠ করে বললাম, হায়! এতো আরেক পরীক্ষা। কাফিররা আমার প্রতি আশাবাদী হয়ে উঠেছে (যাতে তাদের সাথে একাত্ম হই)। পত্রটি হাতে নিয়ে এগিয়ে চলি। কিছুদূর গিয়ে রুটির এক চুলোয় তা নিক্ষেপ করলাম।"

হযরত কা'আব (রা) বলেন, "পঞ্চাশ রাতের মধ্যে যখন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হলো তখন হঠাৎ নবী করীম (সা)-এর জনৈক দূত খুযাইমা বিন সাবিত (রা) আমার কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ, নিজ স্ত্রী থেকেও দূরে সরে থাক। আমি বললাম, তাকে তালাক দিয়ে দেব, না অন্য কিছু? তিনি বলেন, না। তবে কার্যত তার থেকে দূরে থাকবে; নিকটে যাবে না। এ ধরনের আদেশ অপর সঙ্গীদ্বয়ের কাছে পৌঁছে। আমি স্ত্রীকে বললাম, পিতৃগৃহে চলে যাও, সেখানে থাক এবং আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা কর।

ওদিকে হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী খাওলা বিনতে আসেম এ আদেশ শুনে সোজা হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার স্বামী হেলাল বিন উমাইয়া বৃদ্ধ ও দুর্বল, তার সেবা করার কেউ নেই। ইবনে আবি শায়বার রিওয়ায়েত মতে তিনি চোখেও কম দেখতেন। আসেম আরো বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, তাঁর খিদমত করা কি আপনার পছন্দ নয়? তিনি বলেন, খিদমতে আপত্তি নেই, তবে সে যেন তোমার কাছে না যায়। আমি আরয করি, সে তো বার্ধক্যের এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, নড়া চড়ার শক্তি নেই। আল্লাহর কসম, সে তো দিন-রাত শুধু কেঁদে চলেছে।

কা'আব বিন মালিক (রা) বলেন, 'বন্ধুজনেরা আমাকেও পরামর্শ দিয়েছিল যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে স-পরিবারে থাকার অনুমতি চেয়ে নেই, যেমন তিনি হেলালকে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে বললাম, আমি তা পারব না। জানিনা নবী করীম (সা) কি জবাব দেবেন। তা'ছাড়া আমি তো যুবক (স্ত্রী সাথে রাখা সতর্কতার পরিচায়ক নয়)। এমনিভাবে আরো দশটি রাত কাটিয়ে দিলাম। এতে মোট পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো। (মাসনাদে আবদুর রাযযাকের রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে,) সে সময়ই রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের তওবা কবূল হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, অনুমতি থাকলে এ সময় কা'আব বিন মালিক (রা)-কে সংবাদটি দেওয়ার ব্যবস্থা করি? হুযূর (সা) বললেন, না। লোকেরা ভীড় জমাবে, ঘুমানো দুষ্কর হবে।'

কা'আব বিন মালিক (রা) বলেন, 'পঞ্চাশতম রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় করার পর ঘরের ছাদে বসেছিলাম আর কোরআনের ভাষায় অবস্থা ছিল এই ঃ 'পৃথিবী এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকুচিত হয়ে গেল।" হঠাৎ সিলা سلع পর্বতের চূড়া থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম—কে যেন বলছে, 'কা'আব বিন মালিকের জন্য সু-সংবাদ।'

মুহাম্মদ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ই সেই পর্বতের চূড়ায় উঠে চীৎকার করে বলছিলেন, আল্লাহ্ কা'আবের তওবা কবূল করেছেন, তার জন্য সুসংবাদ। হযরত ওকবার রিওয়ায়েত মতে কা'আবকে এ সংবাদ দেওয়ার জন্য দু'জন সাহাবী দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের একজন আগে চলে গেলেন। কিন্তু পেছনে যিনি ছিলেন তিনি 'সিলা' পর্বতের চূড়ায় উঠে সজোরে চীৎকার করে সংবাদটি প্রচার করে দিলেন। কথিত আছে, তাঁরা দুজন হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রা)। কা'আব বিন মালিক বলেন, 'আমি এ চীৎকার শুনে সিজদায় চলে পেলাম। আনন্দাশ্রু দু'গণ্ড বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, সংকট কেটে গেছে। রাসূলে করীম (সা) ফজরের নামাযের পর আমাদের তওবা কবূল হওয়ার সংবাদটি সাহাবাগণকেও দিলেন। তখন সবাই মোবারকবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে ত্রস্তপদে আমাদের তিনজনের দিকে ছুটে আসেন। কেউ ঘোড়া নিয়ে আমার দিকে ছুটলেন। তবে পাহাড়ে চীৎকারকারী ব্যক্তির আওয়াযও সবার আগে আমার কানেই পৌছেছিল।"

কা'আব বিন মালিক বলেন, 'আমি রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার জন্য বাইরে এসে দেখি, লোকেরা দলে দলে মোবারকবাদ জানতে আসছেন। অতঃপর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখি, মহানবী (সা) সেখানেই অবস্থান করছেন আর চারদিকে সাহাবায়ে কিরামের ভীড়। আমাকে দেখে সবার আগে তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ আমার কাছে এসে করমর্দন করলেন এবং তওবা কবূল হওয়ার জন্য মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন। আমি তালহার এই দয়া কখনো ভুলব না। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম জানাই, তখন তাঁর পবিত্র চেহারা আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি বললেন, কা'আব, তোমার সুসংবাদ আজকের এই মোবারক দিনের জন্য, যা তোমার গোটা জীবনের দিনগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এ সংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ? ইরশাদ হলো, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তুমি সত্য কথা বলেছ বলে আল্লাহ্ তোমার সততা প্রকাশ করে দিলেন।

'আমি তাঁর সামনে বসে নিবেদন করলাম, আমার তওবা হলো, অর্থ-সম্পদ যা আছে সমুদয় ত্যাগ করব, সবই আল্লাহ্র রাহে করে দিব। তিনি বলেন, না, নিজের জন্যও কিছু রেখো, এটিই উত্তম। আরয করলাম, অর্ধেক সম্পদ দান করে দেব ? তিনি এতেও বারণ করলেন। অতঃপর এক-তৃতীয়াংশ সদকার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাতে সম্মত হলেন। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) সত্য বলায় আল্লাহ্ আমাকে নাজাত দিয়েছেন, তাই আমার প্রতিজ্ঞা হলো এই যে, আমি জীবনে সত্য ছাড়া টু শব্দটিও করব না। হযরত কা'আব (রা) বলেন, 'আল্লাহ্র একান্ত শুকরিয়া যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে প্রতিজ্ঞা করার

পর থেকে এ পর্যন্ত একটি কথাও মিথ্যা বলিনি।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্র কসম ! ইসলাম গ্রহণের পর এর চাইতে বড় নিয়ামত আর একটিও লাভ করিনি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে সত্য কথা বলেছি, মিথ্যাকে ত্যাগ করেছি। কারণ যদি মিথ্যা বলতাম, তবে সেই মিথ্যা শপথকারী লোকদের মতই আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যাদের সম্পর্কে কোরআন ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ ... ... فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাঁদের বয়কট অব্যাহত থাকার মাঝে হয়ত এ রহস্য রয়েছে যে, তাবুক যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিল।

(পূর্ণ রিওয়ায়েত ও বিস্তারিত ঘটনা তফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

উল্লিখিত হাদীসের তাৎপর্য

সাহাবী হযরত কা'আব বিন মালিক (রা) সবিস্তারে নিজের যে ইতিবৃত্তান্ত পেশ করেছেন, তাতে মুসলমানদের জন্য অগণিত ফায়দা ও হিদায়েত নিহিত রয়েছে। তাই উপরে পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত করা হলো। এখানে কতিপয় ফায়দা ও হিদায়েতের উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণত যুদ্ধের ব্যাপারে হুযুরে আকরাম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, মদীনা থেকে তার বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করতেন, যাতে শত্রুরা কোন্ জাতি বা গোত্রের সাথে মুকাবিলা হবে তা টের না পায়। একেই তিনি বলেছেন ঃ اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ অর্থাৎ যুদ্ধে ধোঁকা দেওয়া জায়েয আছে। এ থেকে অনেকের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, যুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে শত্রুদের প্রতারিত করা জায়েয। অথচ এটা যথার্থ নয়। বরং হুযুর (সা)-এর বলার উদ্দেশ্য ছিল, কাজেকর্মে এমন ভাব দেখানো যাতে শত্রুরা ধোঁকায় পড়ে। যেমন, যুদ্ধের জন্য বিপরীত দিক থেকে যাত্রা করা। কিন্তু পরিষ্কার মিথ্যা বলে ধোঁকা দেওয়া যুদ্ধের বেলায়ও জায়েয নেই। তেমনিভাবে একথা জানা থাকা দরকার যে, এমন ক্ষেত্রে কাজেকর্মে যে ধোঁকা দেওয়া জায়েয তা যেন কোন চুক্তি বা অঙ্গীকারের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। কারণ অঙ্গীকার বা চুক্তি ভঙ্গ করা যুদ্ধ বা শান্তি কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়।

(২) সফর তথা বিদেশ গমনের জন্য মহানবী (সা)-এর পছন্দের দিন ছিল বৃহস্পতিবার। তা সে সফর জিহাদের জন্যই হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে।

(৩) নিজের কোন সম্মানিত ব্যক্তি, পীর, ওস্তাদ বা পিতাকে রাযী করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া জায়েয নয় এবং এর পরিণতি ভালও হবে না। ওহীর দ্বারা হুযুর পাক (সা) প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতেন বিধায় মিথ্যার পরিণতি অবশ্যই মন্দ হতো। কা'আব বিন মালিক (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হলো। কিন্তু মহানবী (সা)-এর পরে অপরাপর বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে ওহী না এলেও কিংবা ইলহাম ও কাশফের মাধ্যমে অবগত হওয়ার কোন নিশ্চয়তা না থাকলেও একথা পরীক্ষিত সত্য যে, মিথ্যার মন্দ প্রভাবে অবলীলাক্রমে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, যাতে উক্ত বুযুর্গ শেষ পর্যন্ত নারায হয়ে উঠেন।

(৪) এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, কোন গুনাহ্র শাস্তিস্বরূপ সালাম-কালাম বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার মুসলিম নেতৃবর্গের রয়েছে।

(৫) নবী করীম (সা)-এর সাথে সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তাও এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল। তাঁদের সাথে সালাম-কালাম সবই বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু হুযুর (সা)-এর কাছে নিয়মিত হাযিরা দিয়ে যেতেন এবং নানা কৌশলে তাঁর মনোভাব যাচাই করতে থাকতেন।

(৬) কা'আব বিন মালিক (রা)-এর একান্ত আপনজন কাতাদাহ্ (রা)-র অবস্থা লক্ষ্য করা যাক, তিনিও যে সালাম-কালাম থেকে বিরত ছিলেন, তা কোন শত্রুতা কিংবা বিদ্বেষের কারণে ছিল না বরং তা যে একান্তই নবী করীম (সা)-এর আনুগত্যের কারণেই ছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, মহানবী (সা)-এর আইন-কানুন শুধু মানুষের বাহ্যিক দিককেই নয়, বরং তাদের অন্তরকেও ভেদ করে যেত। ফলে যেমন চোখের সামনে এবং অন্তরালেও তেমনিভাবে আইন মেনে চলতেন, তা একান্ত আপনজনের স্বার্থের যতই বিরোধী হোক না কেন।

(৭) গাস্সান রাজার পত্রকে আগুনে পুড়ে ভস্ম করার ব্যাপার থেকে সাহাবায়ে কিরামের ঈমান যে কতখানি পরিষ্কার ছিল, তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। রাসূলে করীম (সা) ও সকল মুসলমান সমাজচ্যুত থাকার অসহ্য গ্লানি সত্ত্বেও একজন রাজার প্রলোভন বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি।

(৮) তওবা কবূল হওয়ার আয়াত নাযিলের পর কা'আব বিন মালিক (রা)-কে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুকসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর দৌড়ে যাওয়া এবং আয়াত নাযিলের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সালাম-কালাম ইত্যাদি বন্ধ রাখার বিষয়টি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এ সময়েও তাঁদের অন্তরে হযরত কা'আব (রা)-এর জন্য যথেষ্ট দরদ ছিল, কিন্তু নবীর হুকুমের সামনে তা গৌণ হয়ে যায়। বস্তুত আয়াত নাযিলের পরে বোঝা গেল তাঁদের পরস্পর সম্পর্ক কত গভীর।

(৯) সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক হযরত কা'আব (রা)-কে সুসংবাদ ও মোবারকবাদ দানের উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহে গমন থেকে জানা যায়, কোন আনন্দঘন মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধবকে মোবারকবাদ দেওয়া সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত।

(১০) কোন গুনাহের তওবাকালে মালামাল সদকা করা গুনাহের দোষ নিবারণের জন্য উত্তম। কিন্তু সমুদয় মাল সদকা করা ভাল নয়। এক-তৃতীয়াংশের অধিক সদকা করা রাসূলে করীম (সা)-এর অপছন্দ ছিল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে বিরত থাকার যে ত্রুটি কতিপয় নিষ্ঠাবান সাহাবীর দ্বারাও সংঘটিত হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তওবা কবূল হলো, এ ছিল তাঁদের তাকওয়া ও আল্লাহ্ ভীতিরই ফলশ্রুতি। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে তাকওয়ার হিদায়েত দান করা হয়েছে। আর وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য

এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। এখানে এমনও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ঐ সকল সাহাবীর পদস্খলনের মধ্যে মুনাফিকদের সাথে উঠাবসা ও তাদের পরামর্শেরও একটা দখল ছিল। তাই নাফরমানদের সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোরআনের এ আয়াতে আলিম ও সালিহ্গণের পরিবর্তে 'সাদিকীন' শব্দ ব্যবহার করে আলিম ও সালিহ্-এর প্রকৃত পরিচয় দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই যথার্থ সালিহ্ বা নেককার যে ভিতরে ও বাইরে সমান এবং নিয়ত ও ইচ্ছায় এবং কথা ও কর্মে সমান সত্য হয়।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ
رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا
يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ
مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ
عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُوْنَ
نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

(১২০) মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহ্র সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্র পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়—তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (১২১) আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মদীনার অধিবাসী ও আশেপাশের বাসিন্দাদের উচিত ছিল না রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করা কিংবা নিজেদের প্রাণকে তাঁর প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করাও (উচিত ছিল না যে, তিনি কষ্টভোগ করবেন আর তারা দিব্যি আরামে বসে থাকবে; বরং তাঁর সাথে যাওয়াই

ছিল কর্তব্য) আর (এ আবশ্যকতা) এ জন্য যে, (এতে নবীর প্রতি ভালবাসার দাবি পূরণ হওয়া ছাড়াও প্রতি পদক্ষেপে মুজাহিদগণের সওয়াব হাসিল হতো। তাই এরাও যদি নিষ্ঠার সাথে তাঁর সহযাত্রী হতো, তবে এ প্রতিদান পেত। সুতরাং আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করতে গিয়ে) তাদের যে তৃষ্ণা ক্লান্তি ও ক্ষুধা পেয়েছে এবং তাদের যে পদক্ষেপ শত্রুদের ক্রোধের কারণ হয়েছে এবং তারা শত্রুপক্ষের উপর যে আঘাত হেনেছে, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একেকটি নেক আমল লেখা হয়েছে। (যদিও এর কয়েকটি বিষয় মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত নয়, তা সত্ত্বেও মকবুল ও প্রীত হওয়ার দাবি মতে ইখতিয়ার বহির্ভূত আমলের জন্য ইখতিয়ারী আমলের মতই সওয়াব দেওয়া হয়েছে। আর এ অঙ্গীকারের সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখার সম্ভাবনা নেই। কেননা) আল্লাহ্ নিষ্ঠাবান মু'মিনদের প্রাপ্য বিনষ্ট করেন না। (এ প্রতিশ্রুতি তো দেওয়া হলোই) তদুপরি (এ কথাও নিশ্চিত যে,) তারা ছোট-বড় যা ব্যয় করেছে এবং যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, সে সবই তাদের নামে (নেক আমল হিসাবে) লিখিত হয়েছে, যাতে আল্লাহ্ (এসব) নেক আমলের সর্বোত্তম বিনিময় তাদের দান করেন। (কেননা সওয়াব যখন লিখিত হলো, বিনিময় অবশ্যই পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য দু'টি আয়াতে জিহাদ থেকে পেছনে পড়ে থাকার নিন্দা, জিহাদকারীদের ফযীলত এবং জিহাদের ব্যাপারে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কথা ও কর্মে এবং যাবতীয় পরিশ্রমের সর্বোত্তম বিনিময়ের উল্লেখ রয়েছে। ফলে জিহাদকালে শত্রুর প্রতি কোন আঘাত হানা এবং শত্রুকে ক্রোধান্বিত করার ভঙ্গিতে চলা প্রভৃতি সব বিষয়েই নেক আমলের সওয়াব হয়।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) আর সমস্ত মু'মিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সার্বক্ষণিকভাবে) মুসলমানদের সকলের (সমবেতভাবে জিহাদে) বের হয়ে পড়া সঙ্গত নয়। (কারণ এতে অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাদি বিঘ্নিত হয়।) কাজেই তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একেকটি ছোট দলের (জিহাদে) গমন করা (এবং কিছু লোকের দেশে থাকাই) সমীচীন,

যাতে অবশিষ্ট লোকেরা [মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে এবং তাঁর পর স্থানীয় ওলামায়ে কিরামের কাছ থেকে] দীনের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং যাতে তারা স্বজাতিকে (যারা যুদ্ধে গমন করেছে দীনের কথা শুনিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে) ভীতি প্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা (দীনের কথা শুনে পাপাচার থেকে) বাঁচতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা তওবায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাবুক যুদ্ধের ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হয়। বিনা ওযরে এ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ জায়েয ছিল না। যারা আদেশ লংঘন করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। এ সূরার অনেক আয়াতে তাদের আলোচনা এসেছে। আর কিছু নিষ্ঠাবান মু'মিনও ছিলেন, যারা সাময়িক অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদের তওবা কবূল করেছেন। এ সমস্ত ঘটনা থেকে বাহ্যত বোঝা যেতে পারে যে, প্রত্যেক জিহাদে গমন করাই প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য ফরয এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম, অথচ শরীয়তের হুকুম তা নয়। বরং শরীয়ত মতে সাধারণ অবস্থায় জিহাদ "ফরযে কিফায়া"। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ নিলেই অবশিষ্ট মুসলমানদের পক্ষ থেকেও এ ফরয আদায় হয়ে যায়। কিন্তু জিহাদকারী যদি যথেষ্ট সংখ্যক না হয় এবং যদি তাদের পরাজিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে আশপাশের মুসলমানদের জিহাদে যোগ দেওয়া এবং দলের শক্তি বৃদ্ধি করা ফরয হয়ে দাঁড়ায়। তারাও যদি যথেষ্ট না হয়, তবে তাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের এবং তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণ এমনকি প্রয়োজনবোধে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানের পক্ষে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া 'ফরযে আইন' হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম। তেমনিভাবে মুসলমানদের আমীর যদি প্রয়োজনবোধে সকল মুসলমানকে জিহাদে যোগ দেওয়ার সাধারণ আদেশ জারি করেন, তবুও জিহাদ সবার উপরে ফরয হয়ে যায়। তখনও জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম। যেমন তাবুক যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আদেশ জারি হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধের ঘোষণা ছিল এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে, অথচ সাধারণ অবস্থায় জিহাদ 'ফরযে আইন' নয় এবং এতে সকলের সমবেতভাবে যোগ দেওয়াও ফরয নয়। কেননা জিহাদের মত ইসলাম ও মুসলমানদের আরো অনেক সমষ্টিগত সমস্যা রয়েছে, যার সমাধান জিহাদের মতই ফরযে কিফায়া। আর তা হবে দায়িত্ব বন্টনের নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থাৎ মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। তাই সকল মুসলমানের পক্ষে একই সময়ে জিহাদে যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এ আলোচনা থেকে 'ফরযে কিফায়া'র পরিচয় জানা গেল। অর্থাৎ যে কাজ ব্যক্তিগত নয়, বরং সমষ্টিগত এবং সকল মুসলমানের পক্ষে তা সমাধা করা কর্তব্য, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকেই ফরযে কিফায়া বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে দায়িত্ব বন্টনের নীতি অনুসারে যাবতীয় কার্য

স্ব-স্ব গতিতে চলতে পারে এবং সমষ্টিগত দায়িত্বগুলোও আদায় হয়ে যায়। মুসলমান পুরুষের পক্ষে জানাযার নামায, কাফনদাফন, মসজিদ নির্মাণ, তার হিফাযত ও সীমান্ত রক্ষা প্রভৃতি হলো ফরযে কিফায়া। সাধারণত বিশ্বের সকল মুসলমানের উপরই এ দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু যদি কিছুসংখ্যক লোক তা আদায় করে তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

ফরযে কিফায়ার মধ্যে দীনের তা'লীম সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে তা'লীমে-দীনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে যে, জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালেও যেন দীনের তা'লীম স্থগিত না হয়। সে জন্য প্রত্যেক বড় দল থেকে একেকটি ছোট দল জিহাদে বের হবে এবং অবশিষ্ট লোকেরা দীনী ইলম হাসিলে নিয়োজিত থাকবে। অতঃপর তারা ইলম হাসিল করে মুজাহিদ ও অপরাপর লোককে দীনী তা'লীম দেবে।

দীনের ইলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নিয়ম

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, এ আয়াতটি দীনের ইল্‌ম হাসিলের মৌলিক দলীল। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এতে দীনী ইলমের এক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী এবং ইলম হাসিলের পর আলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দীনী ইলমের ফযীলত ঃ দীনী ইল্‌মের অগণিত ফযীলত ও সওয়াব সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম ছোট-বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে আবুদ্‌দারদা (রা) রিওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ্ এই চলার সওয়াব হিসাবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ দীনী জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলিমের জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করে। অধিক হারে নফল ইবাদতকারী লোকের উপর আলিমের ফযীলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলিম সমাজ নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ সোনা রূপার মীরাস রেখে যান না। তবে ইল্‌মের মীরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি ইল্‌মের মীরাস পায়, সে যেন মহা সম্পদ লাভ করলো।
—(কুরতুবী)

ইমাম দারেমী (র) স্বীয় 'মাসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ বনী ইসরাঈলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলিম। তিনি শুধু নামায ও লোকদের দীনী তা'লীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দু'জনের মধ্যে কার ফযীলত বেশি ? হুযূর (সা) বলেন, সেই আলিমের ফযীলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফযীলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর।—(কুরতুবী)। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন, শয়তানের মুকাবিলায় একজন ফিকাহবিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারী।—(তিরমিযী, মাযহারী)। তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। এক.

সদকায়ে জারিয়া-(যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান)। দুই. ইল্‌ম—যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। (যেমন, শাগরিদ রেখে গিয়ে ইল্‌মে দীনের চর্চা জারি রাখা বা কোন কিতাব লিখে যাওয়া।) তিন. নেককার সন্তান—যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে।—(কুরতুবী)।

দীনী ইল্‌ম ফরযে-আইন অথবা ফরযে-কিফায়া হওয়ার বিবরণ

ইবনে আ'দী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয।" বলা বাহুল্য, এ হাদীস ও উপরোক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লিখিত 'ইল্‌ম' শব্দের অর্থ দীনের ইল্‌ম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দীনী ইল্‌ম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বোঝায় না; বরং তা বহু বিষয়েরই উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লিখিত হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের উপরই যে ইল্‌ম তলব ফরয করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানের জন্য দীনী ইলমের শুধু সে অংশটি আয়ত্ত করাই ফরয করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরী এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরযসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয় থেকে বাঁচতে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়, কোরআন-হাদীসের মাসআলা মাসায়েল, কোরআন-হাদীস থেকে আহরিত শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরযে-আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরযে কিফায়া। তাই প্রত্যেকটি শহরেই যদি শরীয়তের উপরোক্ত ইল্‌ম ও আইন-কানুনের একজন সুদক্ষ আলিম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যে শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলিম না থাকেন, তবে তাদের কাউকেই আলিম বানানো বা অন্যাখান থেকে কোন আলিমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরয, যাতে করে যেকোন প্রয়োজনীয় মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমত আমল করা যায়। দীনী ইল্‌ম সম্পর্কে ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়ার তফসীল নিম্নরূপ ঃ

ফরযে আইন ঃ ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদত বা শরীয়ত যেসব বিষয় ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম বা মকরূহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নিসাবের মালিক, তার জন্য যাকাতের মাস'আলা-মাসায়েল জানা, যে হজ্জ আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার আহকাম ও মাসায়েল জেনে নেয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাবেচা বা শিল্প কারখানায় নিয়োজিত, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্ক অবগত হওয়া ফরয। এক

কথায় শরীয়ত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।

ইল্‌মে তাসাউফও ফরযে-আইনের অন্তর্ভুক্ত ঃ শরীয়তের জাহিরী হুকুম তথা নামায-রোযা প্রভৃতি যে ফরযে আইন তা সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর ইল্‌ম রাখাও ফরযে-আইন। হযরত কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরযে আইন, তাই বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর ইল্‌ম—যাকে পরিভাষায় 'ইলমে তাসাউফ' বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরযে-আইন।

অধুনা বিভিন্ন ইল্‌ম, তত্ত্বজ্ঞান, কাশ্‌ফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে ইল্‌মে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরযে-আইন বলতে বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বোঝায়, যা ফরয-ওয়াজিবের তফ্‌সীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকীদা, যার সম্পর্ক বাতিন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এক বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরয, কিংবা গর্ব-অহঙ্কার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি কোরআন ও হাদীস মতে হারাম। এগুলোর গতি-প্রকৃতি, অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। এ সকল বিষয়ের উপরই হলো ইল্‌মে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরযে আইন।

ফরযে কিফায়া ঃ পূর্ণ কোরআন মজীদের অর্থ ও মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বোঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা, কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল সম্পর্কে অবগত হওয়া। বস্তুত এটি এত বড় কাজ যে, গোটা জীবন এতে নিয়োজিত থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরীয়ত একে ফরযে-কিফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমত এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দীনী ইলমের সিলেবাস ঃ কোরআন মজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি মাত্র শব্দে দীনী ইল্‌মের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ অথচ يَتَعَلَّمُوْنَ الدِّيْنَ (যেন দীনের জ্ঞান হাসিল করে)-ও বলা যেত। কিন্তু কোরআন এখানে تَعَلُّمْ-এর স্থলে تَفَقُّهْ শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দীনের ইল্‌ম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ ইহুদী ও খৃস্টানেরাও তা' পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের আগে; বরং ইল্‌মে দীনের উদ্দেশ্য হলো দীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تَفَقُّهْ শব্দের অর্থও তাই। এটি فِقْهٌ থেকে উদ্ভূত। فِقْهٌ অর্থ বোঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদ এ আয়াতে صيفه مجرد ব্যবহার করে لِيَفْقَهُوْا فِى الدِّيْنِ (যেন তারা দীনকে বুঝে নেয়) বলেনি; বরং একে باب تفعل এ নিয়ে لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ বলেছে। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনাও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে বাক্যের মর্ম হবে "তারা যেন দীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলা

বাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাতের মাস'আলা-মাসায়েল জানাকেই দীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না। বরং দীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বুঝে, তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে। দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে, মূলত এ চিন্তাই হলো দীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র) 'ফিকহ্'-এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা হলো এই যে, "ফিকাহ্ সেই শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বুঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বুঝে নেয়, যা থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরী।" অধুনা মাস'আলা-মাসায়েলের বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে 'ইলমে-ফিকহ্" বলা হয় তা পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফিকহ্র তাৎপর্য তা-ই, যা ইমাম আবূ হানীফা (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলিম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় দীনের ইল্ম হাসিল করার অর্থ হলো, দীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলিমগণের সাহায্যে যে কোন উপায়েই হোক—সব একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কিরামের দায়িত্ব ঃ দীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কিরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ (যেন তারা জাতিকে আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে ভয় প্রদর্শন করে) বাক্যটিতে। উল্লেখ্য, এখানে আলিমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে اِنْذَار বা ভয় প্রদর্শন। এটি اِنْذَار-এর শাব্দিক তরজমা, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুত ভয় প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতি প্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত শত্রু, হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয় প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয় প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয় প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবীতে একেই বলা হয় اِنْذَار-এজন্য নবী-রাসূলগণ نَذِيْر উপাধিতে ভূষিত। আলিমগণের উপর জাতিকে ভয় প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা মূলত নবীগণের আংশিক মীরাস, যা হাদীসমতে ওলামায়ে কিরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য, নবীগণ "بَشِيْر" ও "نَذِيْر" উভয় উপাধিতেই ভূষিত। "نَذِيْر"-এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর "بَشِيْر" অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলীলের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, আলিমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেক্কার বান্দাদিগকে সুসংবাদ দেওয়া। তবে এখানে শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দু'টি। (এক) দুনিয়া ও আখিরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং (দুই) অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলিম ও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ফিকাহ্বিদগণের পরিভাষায় একে جلب منفعت (উপকার লাভ) دفع مضرت (লোকসান পরিহার) নামে অভিহিত করে

দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসান পরিহারেও উপকার লাভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কেননা যে কাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর ও বাঞ্ছনীয় তা ত্যাগ করা বড়ই ক্ষতিকর। সুতরাং ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে যে বাঁচতে চায়, সে করণীয় কর্মে অলসতা থেকেও দূরে থাকবে।

এ-আলোচনা থেকে আরও একটি কথা জানা যায়। বর্তমান যুগে ওয়ায ও নসীহতের কার্যকারিতা যে খুব কম পরিলক্ষিত হয়, তার প্রধান কারণ হলো, ভয় প্রদর্শনের নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য না রাখা। যে ওয়ায়েযের কথা ও ভাবভঙ্গি থেকে দয়া-প্রীতি ও কল্যাণ কামনা পরিস্ফুট হবে, শ্রোতার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে যে, এ ওয়াযের উদ্দেশ্য তাকে নিন্দা ও খাটো করাও নয় এবং মনের রোষ মেটানোও নয়, বরং তার পক্ষে যা কল্যাণকর ও আবশ্যকীয় তাই বলা হচ্ছে পরম স্নেহভরে। শরীয়তের প্রতি অমনোযোগী লোকদের সংশোধন এবং দীন প্রচারে যদি উপরোক্ত নীতি অবলম্বিত হয়, তবে কখনো শ্রোতাবৃন্দ জেদের বশবর্তী হবে না। তারা তর্কে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের আমলের বিচার-বিশ্লেষণ ও পরিণাম চিন্তায় নিয়োজিত হবে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে একদিন ওয়ায-নসীহত কবূল করে বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত আর কিছু না হলেও অন্তত পরস্পরের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না, যার অভিশাপে আজ গোটা জাতি জর্জরিত।

আয়াতের শেষে لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ বলে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, আলিম সমাজের দায়িত্ব শুধু ভয় প্রদর্শন করাই নয় ; বরং ওয়ায-নসীহতের ক্রিয়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে। একবার ক্রিয়া না হলে বারংবার তাকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যেন يَحْذَرُوْنَ -এর সুফল লাভ হয়। আর তা হলো পাপ ও নাফরমানী থেকে জাতির বেঁচে থাকা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ
وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۗ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (১২৩) وَاِذَا
مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ اِيْمَانًا ۚ
فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ (১২৪)
وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى
رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ (১২৫) اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ
يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ

يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ ۚ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ۚ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

(১২৩) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো ? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। (১২৫) বস্তুত যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলো। (১২৬) তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা, দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। (১২৭) আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কি-না—অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ্ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের আশপাশে বসবাসকারী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং (এমন ব্যবস্থা কর, যাতে) অবশ্যই তোমাদের মধ্যে তারা কঠোরতা অনুভব করে। (অতএব, জিহাদ চলাকালে তোমাদের শক্ত থাকা উচিত। এছাড়া সন্ধিবিহীন কালেও যেন তারা কোনরূপ প্রশ্রয় না পায়) আর বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ্ (-এর সাহায্য) মুত্তাকীদের সাথে রয়েছে। (সুতরাং তাদের ভয় করো না।) আর যখন কোন (নতুন) সূরা নাযিল হয়, তখন কতিপয় মুনাফিক (গরীব মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপ করে) বলে (বল তো দেখি) এই সূরা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে ? (আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমরা কি জবাব চাও ?) তা'হলে-(শোন) যারা ঈমানদার, এই সূরা তাদের ঈমানকে (তো) উন্নত করেছে এবং তারা (এ উন্নতি উপলব্ধি করে) আনন্দিত (-ও বটে। কিন্তু এ হলো অন্তরের অনুভূতি, যা থেকে তোমরা বঞ্চিত বিধায় হাসি-বিদ্রূপ করছ।) আর যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) ব্যাধি বিদ্যমান, এ সূরা তাদের (পূর্ব) কলুষতার সাথে আরো (নতুন) কলুষতা বৃদ্ধি করেছে। (পূর্ব কলুষতা হলো কোরআনের এক অংশের প্রতি অস্বীকৃতি আর নতুন কলুষতা হলো, সদ্য অবতীর্ণ অংশের অস্বীকার।) এবং তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (অর্থাৎ তাদের এ পর্যন্ত যারা মরেছে এবং যারা কুফরীর উপর অবিচল থাকবে, তারাও কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। সারকথা, ঈমান বর্ধনের

গুণাবলী—অবশ্যই কোরআনে রয়েছে, কিন্তু সেজন্য চাই পাত্রের যোগ্যতা। অন্যথায় পূর্ব থেকেই যদি কলুষতা পাকাপোক্ত থাকে, তবে তা আরো অধিক পোক্ত হয়ে উঠবে। যেমন, পলিমাটিতে হয় ফুলের বাগান আর লোনা মাটিতে হয় আগাছা)। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, প্রতিবছরই তারা দু'একবার কোন-না-কোনভাবে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে (অথচ) তারপরও তারা (পাপাচার থেকে) ফিরে আসে না এবং তারা একথাও বোঝে না [যাতে ভবিষ্যতে ফিরে আসার আশা করা যায়। অর্থাৎ এ সকল বিপদাপদ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজেদের সংশোধন করা আবশ্যক ছিল। এ হচ্ছে তাদের বিদ্রূপের বিবরণ। পরবর্তী আয়াতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর মজলিসে তাদের ঘৃণা প্রকাশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে—] আর যখন কোন (নতুন) সূরা নাযিল হয়, তখন তারা একে অন্যের (মুখের) দিকে তাকায় (এবং ইশারা-ইঙ্গিতে বলে,) তোমাদেরকে কোন মুসলমান দেখছে না তো [যে উঠে গিয়ে, নবী (সা)-কে তা বলে,] অতঃপর (আকার-ইঙ্গিতে যা বলার, তা বলে সেখান থেকে) প্রস্থান করে। (তারা যে মসজিদে নববী থেকে ফিরে গেল, তার ফলে) আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে (ঈমান থেকে) ফিরিয়ে রেখেছেন এজন্য যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায় (ফলে নিজের কল্যাণ থেকেও পলায়নপর থাকে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল জিহাদের প্রেরণা। আলোচ্য প্রথম আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا-এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, কাফিররা দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। তবে কোন নিয়মে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে ? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। নিকটবর্তী দু'রকমের হতে পারে। (এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ কর। (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটবর্তী অন্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। কারণ ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয়-স্বজন অগ্রগণ্য। যেমন, কোরআনে রাসূলে করীম (সা)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে— وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ "হে রাসূল, নিজের নিকটাত্মীয়গণকে আল্লাহ্র আযাবের ভয় প্রদর্শন করুন।" তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ্র বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশপাশের কাফির তথা বনূ-কুরায়যা, বনূ-নযীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বোঝাপড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জিহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً - غِلْظَةً অর্থ কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হলো কাফিরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا বাক্য থেকে বোঝা যায়, কোরআনের আয়াতের তিলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফরমাবরদারী সহজ হয়ে উঠে। ইবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়।

হযরত আলী (রা) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মত দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমন কি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ্ ও মুনাফিকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরীর তীব্রতার সাথে সাথে সে কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কাল হয়ে যায়।—(মাযহারী)। এজন্য সাহাবায়ে কিরাম একে অন্যকে বলতেন ঃ আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ বাক্যে মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফির মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোন বিশেষ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়, বরং বলা হচ্ছে যে, তাদের এই দুর্ভোগের পালা শেষ হওয়ার নয়। এ সত্ত্বেও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ
اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

---

(১২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (১২৯) এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মানবকুল!) তোমাদের কাছে এমন এক রাসূল আগমন করেছেন তোমাদের (নিজ সম্প্রদায়ের) মধ্য থেকেই (যাতে তোমাদের পক্ষে উপকার লাভ করা সহজ হয়)। তাঁর কাছেও তোমাদের দুঃখ-কষ্ট (বড়ই) দুঃসহ। (তোমরা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হও তা-ই তাঁরও কাম্য।) যিনি তোমাদের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত। (তবে বিশেষভাবে) মু'মিনদের প্রতি বড় স্নেহশীল (এবং) দয়াময়। (তাই এমন রাসূল থেকে উপকৃত না হওয়া সত্যই দুর্ভাগ্যজনক।) এ সত্ত্বেও যদি তারা (আপনাকে স্বীকার করা কিংবা আপনার আনুগত্য থেকে) বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দিন, (আমার এতে কোন পরোয়া নেই) আমার জন্য (হিফাযতকর্তা ও সাহায্যকারী

হিসাবে) আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কেউ মা'বুদ হওয়ার যোগ্য নেই। (সুতরাং সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী যখন একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি যখন জ্ঞান ও শক্তিতে অদ্বিতীয়, তখন কারো শত্রুতার পরোয়া নেই।) আমার ভরসা তাঁরই উপর। তিনি মহা আরশের অধিপতি। (সুতরাং সকল সৃষ্ট বস্তুরও যে তিনিই মালিক, তা বলাই বাহুল্য। অতএব তাঁর প্রতি ভরসা করার পর আমি আশঙ্কামুক্ত। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করে তোমাদের ঠিকানা কোথায় হবে তাও একবার চিন্তা করে নাও।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ দু'টি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত। তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষত মুসলমানদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন।

সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই যে, এর সর্বত্র রয়েছে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ-জিহাদের বর্ণনা, যা আল্লাহ্র প্রতি আহবানের সর্বশেষ পন্থারূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ-তবলীগে হিদায়েতের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহ্র পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে তা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। এখানে 'আরশে আযীমের অধিপতি' বলার উদ্দেশ্য একথা বোঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই বিন কা'আব (রা)-এর মতে এ দু'টি আয়াত হলো কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত। এরপর আর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকাল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-ও এ মতই পোষণ করেন।—(কুরতুবী)

হাদীস শরীফে আয়াত দু'টির অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাতবার করে আয়াত দু'টি পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত কাজ সহজ করে দেবেন।—(কুরতুবী) আল্লাহ্ মহান, পবিত্র, সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - اللهم وفقني لتكميله كما تحب وترضى والطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير .

سُوْرَةُ يُوْنُس

সূরা ইউনুস

মক্কায় অবতীর্ণ ॥ আয়াত সংখ্যা ১০৯ ॥ রুকূ সংখ্যা ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝١ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ
مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ
مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَ
كَّرُوْنَ ۝٣ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝٤

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) الٓرٰ। এগুলো হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত। (২) মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে যেন তিনি মানুষকে ভয়ের কথা শুনিয়ে দেন এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ঈমানদারকে যে, তাদের জন্য সত্য মর্যাদা রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের কাছে। কাফিররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর। (৩) নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি তৈরি করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি

পরিচালনা করেন কাজের। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তবে তাঁর অনুমতির পর। আল্লাহ্ হচ্ছেন তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না ? (৪) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার, পুনর্বার তৈরি করবেন তাদেরকে বদলা দেওয়ার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এ জন্য যে, তারা কুফরী করছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-রা (এর অর্থ তো আল্লাহ্ই জানেন)। এগুলো (যা একটু পরেই পরিবেশিত হবে) হিকমতপূর্ণ কিতাবের (অর্থাৎ কোরআন মজীদের) আয়াত (যা সত্য হওয়ার কারণে জানবার এবং মানবার উপযুক্ত। আর যেহেতু এই কোরআন যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর নবুয়তকে কাফিররা অস্বীকার করছিল তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরই উত্তর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মক্কার) এ লোকদের কি আশ্চর্য লেগেছে যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে (তাদেরই মতো) একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়েছি-(যার সারমর্ম হলো এই) যে, (সাধারণভাবে) তিনি সব মানুষকে (আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালনের বরখেলাফ করার ব্যাপারে) ভীতি প্রদর্শন করবেন এবং যারা ঈমান আনবে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেবেন যে, তারা তাদের পরওয়ারদিগারের কাছে (গিয়ে) পূর্ণ মর্যাদা পাবে। (অর্থাৎ এ ধরনের কোন বিষয় যদি ওহীর মাধ্যমে কোন মানুষের কাছে নাযিল হয়ে যায়, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু) কাফিররা [এতে এতো বেশি আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, হুযূরে পাক (সা) সম্পর্কে] বলতে আরম্ভ করেছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর, (তিনি) নবী নন; কেননা নবুয়ত মানুষের জন্য হতে পারে না। (নিঃসন্দেহে) আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীনকে (মাত্র) ছয় দিনে (সময়ে) তৈরি করেছেন। (এ থেকে বোঝা গেলো যে, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী।) অতঃপর আরশের উপর (যাকে রাজসিংহাসনের সাথে তুলনা করা যায় এমনভাবে) অধিষ্ঠিত হয়েছেন যেভাবে আরোহণ করা তাঁর শাসনের উপযুক্ত। যাতে করে সেই আরশ থেকে যমীন এবং আসমানে হুকুম জারি করতে পারেন। (যেমন একটু পরেই ইরশাদ করেছেন ঃ) তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের (উপযুক্ত) ব্যবস্থা করে থাকেন। (সুতরাং আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত জ্ঞানীও বটেন। তাঁর সামনে) তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন সুপারিশকারীর (সুপারিশ করার) ক্ষমতা নেই। (সুতরাং তিনি সুমহানও বটেন।) অতএব, এমন আল্লাহ্ই তোমাদের (প্রকৃত) পালনকর্তা। কাজেই তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। (শিরক মোটেও করো না।) তোমরা কি (এতো প্রমাণাদি শোনার পরেও) বুঝতে পারছো না ? তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক সত্য ওয়াদা করে রেখেছেন।) নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করে থাকেন, (এবং কিয়ামতের সময়) তিনিই আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন, যাতে করে যাঁরা ঈমান এনেছে এবং ইন্‌সাফের সাথে সৎকাজও

করেছে তাঁদেরকে (যথাযথ) প্রতিদান দেওয়া যায়। (তাতে যেন একটুও কমতি না হয়, বরং কিছু বেশি বেশিই দেওয়া যায়)। আর যারা (আল্লাহ্র সাথে) কুফরী করেছে তারা (আখিরাতে) পান করার জন্য পাবে ফুটন্ত পানি। আর (তাদের জন্য) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে; তাদেরই কুফরীর দরুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইউনুস মক্কী সূরা। কেউ কেউ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে মদনী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল হয়েছে। এই সূরার মধ্যেও কোরআন পাক এবং ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী—তওহীদ, রিসালত, আখিরাত ইত্যাদি বিষয় বিশ্বচরাচর এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং কাহিনীর অবতারণা করে সে সমস্ত লোকের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার এসব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসঙ্গে অংশীবাদের খণ্ডন এবং তৎসম্পর্কিত কিছু সন্দেহেরও উত্তর দেওয়া হয়েছে। এই সূরার সার বিষয়বস্তু তাই। এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা আর এ সূরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বোঝা যায়। সূরা তওবায় এসব উদ্দেশ্য (তওহীদ, রিসালত, আখিরাত ইত্যাদি) হাসিল করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফিরদের সাথে জিহাদ করা এবং কুফর ও শিরকের শক্তিকে সাধারণ উপকরণের মাধ্যমে পরাস্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জিহাদের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীকে মক্কী যিন্দেগীর রীতি অনুযায়ী শুধু দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। الٓرٰ এগুলোকে হরফে 'মুকাত্তাআহ্' বলা হয়, যা কোরআন মজীদের অনেক সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, الٓمٓ - عٓسٓقٓ - قٓ - حٰمٓ ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তফসীরকারগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরুফে মুকাত্তাআহ্ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং অধিকাংশ বুযুর্গানে কিরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুপ্ত কথা, যার অর্থ হয়তো বা হুযুর (সা)-কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ উম্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সম্বন্ধেই অবহিত করেছেন, যা তারা সহ্য করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারত। আর হরুফে মুকাত্তাআহ্র গূঢ় তত্ত্ব এমন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উম্মতের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্ত্বকথা না জানলে উম্মতের কোন ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যই হুযূর (সা)-ও এগুলোর অর্থ উম্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করে যাননি। অতএব আমাদের পক্ষেও এগুলোর অর্থ বের করার পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত হবে না। কারণ এটা তো সত্য কথা যে, এ সব শব্দের অর্থ জানার মধ্যে যদি আমাদের কোন রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে রহমতে-আলম (সা) অন্তত এগুলোর অর্থ বিশ্লেষণে কোন রকম কার্পণ্য করতেন না।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ বাক্যে تلك শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ সূরার সে সমস্ত আয়াতের প্রতি, যা একটু পরেই পরিবেশিত হতে যাচ্ছে। আর কিতাব অর্থ এখানে কোরআন। এর প্রশংসা এখানে حكيم শব্দ দ্বারা করা হয়েছে, যার অর্থ হলো হিকমতপূর্ণ কিতাব।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরিকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহটি ছিল এই যে, কাফিররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রাসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। কোরআন পাক বিভিন্ন জায়গায় তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا অর্থাৎ যমীনের উপর যদি ফেরেশতারা বাস করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য কোন ফেরেশতাকেই রাসূল বানিয়ে পাঠাতাম। যার মূল কথা হলো এই যে, রিসালতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল এবং যাদের মধ্যে রাসূল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুত ফেরেশতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রাসূল পাঠানোটাই উদ্দেশ্য, তখন কোন মানুষকেই রাসূল বানানো উচিত।

এই আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রাসূল বানানো হলো এবং সে মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহ্র ফরমাবরদার তাদেরকে সওয়াবের সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো ? এই বিস্ময় প্রকাশ্যই একটা বিস্ময়ের বিষয়। কারণ মানুষের কাছে মানুষকে রাসূল করে পাঠানোই তো বুদ্ধিমত্তার কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো হতো।

এ আয়াতে ঈমানদারদেরকে اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ শব্দের দ্বারা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে قَدَمٌ অর্থ পা। যেহেতু পা'ই মানুষের চেষ্টা-তদবীর এবং উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসাবে উচ্চমর্যাদাকে আরবীতে 'কদম' (পদমর্যাদা) বলে দেওয়া হয়। আর 'সত্যের পা' বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, এই উচ্চমর্যাদা যা তাঁরা পাবে তা সত্য ও সুনিশ্চিত এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার মতো নয় যে, কোন কাজের বিনিময়ে প্রথমত সে সম্মান পাবার কোন নিশ্চয়তাই থাকে না, আর যদিও বা পাওয়া যায় তবুও তা চিরকাল থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং সেই সম্মান বা পদমর্যাদা শেষ হয়ে গিয়ে ধুলোয় মিশে যাওয়াটাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। অনেক সময় দেখা যায়, তার জীবিত অবস্থায়ই তা শেষ হয়ে যায়, আর মৃত্যুর সময় তো পৃথিবীর সমস্ত পদমর্যাদা এবং ধন-সম্পদ থেকে মানুষ খালি হাত হয়ে যায়ই। মোটকথা, صدق শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, আখিরাতের পদমর্যাদা যেমন সত্য, সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ীও

বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাঁদের জন্য তাঁদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তাঁরা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না (অর্থাৎ চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে)। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এক্ষেত্রে صدق শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্যনিষ্ঠা ও ইখলাসের কারণেই পেয়ে থাকবে, শুধু মুখের জমাখরচ এবং মুখে কলেমায়ে ঈমান পড়ে নিলেই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ এবং অন্তর উভয়টি দিয়েই নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে, যার অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দী করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আয়াতে তওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক-অংশীদার নেই, তখন ইবাদত-বন্দেগী এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরীক হতে পারে? বরং এতে (ইবাদতে) অন্য কাউকে শরীক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালঙ্ঘনের শামিল। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে (আল্লাহ্ পাক) মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাণকেই দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা প্রকাশ্য যে, আসমান-যমীন ও তারকা-নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডোবার হিসাব কি করে হবে? কাজেই (দিন বলতে) এখানে ঐ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এই পৃথিবীতে সূর্য ওঠা এবং ডোবার মাঝখানে হয়ে থাকে।

এই ছয় দিনের সামান্য সময়ে এতো বড় বিশ্ব যা আসমান, যমীন, তারা এবং এই বিশ্বে যত কিছু আছে সমস্তকে তৈরি করে দেওয়া একমাত্র পবিত্র 'যাতে—খোদাওয়ান্দী'র পক্ষেই সম্ভব ছিল, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে কুদরত রাখেন। তাঁর সৃষ্টিকার্যের জন্য না আগে থেকে কোন উপকরণের প্রয়োজন, না কোন কারিগর বা খাদেমের প্রয়োজন। বরং আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের এমনই শান যে, যখনই তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোন বস্তু বা কারো সাহায্য ছাড়াই এক মুহূর্তে তৈরি করে ফেলেন। এই ছয় দিনের অবকাশও হয়ত কোন বিশেষ হিকমত এবং মঙ্গলের জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল। না হয় তিনি এই আসমান, যমীন এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু এক মুহূর্তে তৈরি করে দিতে পারতেন। তারপর বলেছেন : ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কোরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাকের আরশ এমন এক সৃষ্টি যা আসমান, যমীন এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। গোটা বিশ্ব তারই বেষ্টনীর মধ্যে আবর্তিত।

এ বিষয়ে এর চাইতে বেশি কিছু তাৎপর্য জানা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে নেই। যে মানুষ নিজেদের বিজ্ঞানের চরম উন্নতি-উৎকর্ষের যুগেও শুধুমাত্র অতি নিম্নে অবস্থিত তারকাপুঞ্জে পৌঁছার প্রস্তুতি পর্বেই পরিব্যাপ্ত এবং আজো পর্যন্ত তাও সম্ভব হয়নি বরং তাঁরা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তারাগুলো আমাদের থেকে এতো দূরে অবস্থিত যে, দূরবীক্ষণ দ্বারাও এগুলো

সম্বন্ধে যা জানা যায়, তাও অনুমান-আন্দাজের অতিরিক্ত কিছুই নয়। তাছাড়া অনেক তারকা এমনও রয়েছে, যার আলোকরশ্মি এখনো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়নি। অথচ আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষাধিক মাইল বলে বলা হয়ে থাকে। যখন তারাদের পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে মানুষের এ অবস্থা, তখন সে আসমান সম্পর্কে যা এই তারাদের থেকেও অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত এই দুর্বল মানুষ কি জানতে পারে ? আর যে আরশ সাত আসমান থেকেও অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত এবং গোটা বিশ্বকে ঘিরে রেখেছে তার অবস্থা এ মানুষ কি করে জানবে ? আলোচ্য আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ পাক (মাত্র) ছয় দিন সময়ের মধ্যে আসমান-যমীন এবং গোটা সৃষ্টজগৎ তৈরী করেছেন এবং আরশে (পাকে) অধিষ্ঠিত হয়েছেন। একথা সত্য-সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পাক শরীর বা শরীরী বস্তু কিংবা তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে। তাঁর অস্তিত্ব না কোন বিশেষ দিগ্বলয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না কোন জায়গার সাথে যুক্ত। তাঁর অধিষ্ঠান পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের অধিষ্ঠানের মত নয়, যা তাদের আপন আপন জায়গায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে আরশের উপর আল্লাহ্র অধিষ্ঠিত হওয়াটা কি ধরনের এবং কোন্ প্রকারের ? এটা এমন একটা জটিল প্রশ্ন যে, মানুষের সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির পক্ষে এর সমাধান পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। এ জন্যই এ সমস্ত ব্যাপারে কোরআন পাকের ইরশাদ হচ্ছে এই যে ঃ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلاَّ اللهُ وَالرَّسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّابِهِ অর্থাৎ এগুলো সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ পাক ছাড়া আর কেউ জানে না। বস্তু যারা প্রগাঢ় এবং সঠিক জ্ঞানের অধিকারী তারা এ সমস্ত ব্যাপারে ঈমান আনার কথা স্বীকার করে। কখনো এগুলোর তত্ত্ব-রহস্য নিয়ে মাথা ঘামায় না।

সুতরাং এ ধরনের সমস্ত বিষয়ে যেখানে আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে কোন জায়গা বা কোন বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথবা যেখানে আল্লাহ্ পাকের অঙ্গ বিশেষের কথা যেমন ঃ হাত-পা, মুখমণ্ডল প্রভৃতি শব্দ কোরআন পাকে নাযিল হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ আলিম সমাজের অভিমত হলো এই যে, এগুলোর উপর যথাযথ ঈমান আনা কর্তব্য যে, এ সমস্ত শব্দ যথাস্থানে ঠিক আছে। আর এ সমস্ত শব্দের দ্বারা আল্লাহ্ পাকের যা উদ্দেশ্য তাও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে যেহেতু এগুলো নিজেদের সীমিত জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে, তাই এগুলোর প্রকার ও তত্ত্ব সম্পর্কে জানার চিন্তা ত্যাগ করাই উত্তম। যেমন, কোন কবি বলেছেন ঃ

نه هرجائے مرکب توان تاختن
که جا هاسپر باید انداختن

'সব সওয়ারী প্রত্যেক জায়গায় সমান চলতে পারে না।' পরবর্তী সময়ের যেসব আলিম এসব বাক্যের কোন অর্থ করেছেন বা বলেছেন তাঁরাও সেসব অর্থ শুধুমাত্র একটা সম্ভাবনার পর্যায়ে বলে উল্লেখ করেছেন যে, 'সম্ভবত এর অর্থ এই'। এ সমস্তের অর্থ তারা কখনো 'এটাই হবে' এভাবে নির্দিষ্ট করে বলেন নি। আর শুধু সম্ভাবনা কখনো তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে পারে না। অতএব, সোজা-সরল পথ হবে সেটিই যা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং সলফে-সালেহীন বলেছেন। তাঁরা এ সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য 'আল্লাহ্ই ভালো জানেন' বলে ছেড়ে দিয়েছেন।

তারপর বলেছেন يُدَبِّرُ الْأَمْرَ অর্থাৎ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ পাক সমস্ত জাহানের এন্তেযাম বা ব্যবস্থাপনা, স্বয়ং নিজের কুদরতের হাতে সম্পাদন করেছেন।

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ অর্থাৎ কোন নবী-রাসূলেরও আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিজ ইচ্ছানুযায়ী সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই; যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাকের কাছ থেকে সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবেন, তারাও কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না। চতুর্থ আয়াতে আখিরাতের বিশ্বাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا অর্থাৎ তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে। وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا এটা আল্লাহ্র সত্য এবং সঠিক ওয়াদা إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টজগতকে প্রথমবারও তিনি তৈরী করেছেন এবং কিয়ামতের সময় তিনিই আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন। এ বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যাপারে বিস্মিত হবার কিছুই নেই যে এই গোটা সৃষ্টজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার কেমন করে পুনরুজ্জীবিত হবে ? কেননা যে পবিত্র সত্তা কোন নমুনা বা উপকরণ ছাড়াই প্রথমবার কোন বস্তু তৈরী করার ক্ষমতা রাখেন, তাঁর পক্ষে একবার তৈরী করা বস্তুকে ধ্বংস করে দিয়ে আবার পুনরুজ্জীবিত করা এমন কি কঠিন ব্যাপার ?

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُورًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥

(৫) তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে চমকদার, আর চন্দ্রকে আলো হিসেবে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ্ পাক এই সমস্ত কিছু এমনিই বানিয়ে দেননি–কিন্তু তদবীরের সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সেই সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে। (৬) নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হলো নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সেই আল্লাহ্ এমন, যিনি সূর্যকে করেছেন দীপ্তিমান আর চাঁদকে করেছেন আলোময়, আর তার (চলার) জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন মনযিলসমূহ, (সে প্রতিদিন এক মনযিল করে অতিক্রম করে থাকে।) যাতে করে (এই সমস্ত গ্রহাবর্তের মাধ্যমে) তোমরা বছরগুলোর গণনা

ও হিসাব জেনে নিতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত জিনিস অমূলক সৃষ্টি করেন নি। তিনি এ সব প্রমাণ সেসব লোককে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যারা জ্ঞান রাখে) নিঃসন্দেহে রাত এবং দিনের ক্রমাগমনের মাঝে এবং যা কিছু আল্লাহ্ (পাক) আসমান ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন, সেসবের মধ্যে (তওহীদের) প্রমাণাদি রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা (আল্লাহ্র) ভয় মানে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের বহু নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে, যা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হিকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবির প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ্ পাক বিশ্বকে ধ্বংস করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন জারি করবেন ; আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের চাহিদা।

এভাবে এই তিনটি আয়াত ঐ সংক্ষেপের বিশ্লেষণ, যা পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতে আসমান-যমীনকে ছয় দিনে তৈরী করা অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার পর يُدَبِّرُ الْأَمْرَ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয় যে, তিনি শুধু এই বিশ্বকে তৈরী করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক জিনিসের পরিচালনা এবং শাসনব্যবস্থাও তাঁর হাতেই রয়েছে।

এই ব্যবস্থা ও পরিচালনার একটি অংশ হলো هُوَالَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا এখানে ضيا এবং نور উভয়টির অর্থই জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য। সেজন্যই অভিধানের অনেক ইমাম এ দু'টি শব্দকে একই অর্থবোধক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যামাখ্শারী এবং তায়েবী প্রমুখ বলেছেন যে, যদিও উভয় শব্দের মাঝেই জ্যোতি অর্থ বিদ্যমান, তথাপি نور শব্দটি ব্যাপক। দুর্বল-সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ণ যেকোন জ্যোতিকেই নূর বলা যায়। কিন্তু ضـوء এবং ضـيـاء যে আলোতে তীক্ষ্ণতা বিদ্যমান শুধু তাকেই বলা হয়। আর মানুষের উভয় রকমের আলোরই প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ কাজকর্মের জন্য দিনের প্রখর আলোর প্রয়োজন, আর ছোট ছোট কাজের জন্য রাতের ক্ষীণ আলোই বেশী পছন্দনীয়। যদি দিনের বেলায়ও শুধু চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোই থাকতো, তাহলে কাজ-কর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতো। পক্ষান্তরে যদি রাতেও সূর্যের তীক্ষ্ণ আলো থাকতো, তাহলে ঘুম এবং রাতের উপযুক্ত কাজে অসুবিধা হতো। কাজেই আল্লাহ্ পাক দু'ধরনের আলোর ব্যবস্থাই এমনভাবে করেছেন যে, সূর্যের আলোকে ضو (যাও) এবং ضـيـا (যিয়া)-এর পর্যায়ে রেখেছেন। কাজ-কর্মের সময়ে তারই বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাঁদকে হালকা এবং মৃদু আলো দিয়ে বানিয়েছেন এবং রাতে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। সূর্য এবং চাঁদের আলোর পার্থক্যের কথা কোরআন একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

সূরা নূহে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا সূরা ফুরকানে বলেছেন ঃ وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا 'সিরাজ' শব্দের অর্থ চেরাগ (অর্থাৎ প্রদীপ)। যেহেতু প্রদীপের আলো তার নিজস্ব আলো, অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা নয়, সেহেতু কোন কোন

মুফাস্সির বলেছেন যে, কোন বস্তুর নিজস্ব আলোকে ضيا বলা হয়। আর نور বলা হয় সে সমস্ত আলোকে যা অন্য কারো থেকে অর্জন করে আলোকিত হয়। কিন্তু এ মতের পেছনে গ্রীক দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান। অন্যথায় এর কোন আভিধানিক ভিত্তি নেই। আর স্বয়ং কোরআন করীমও এর কোন শেষ সমাধান দেয়নি।

মুফাস্সির যুজ্জাজ ضياء শব্দকে ضوء শব্দের বহুবচন বলেছেন। এই প্রেক্ষিতে হয়তো এখানে একথা বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যে, আলোর সাতটি প্রসিদ্ধ রং এবং অন্যান্য যত রং পৃথিবীতে পাওয়া যায় সূর্যই হলো সেগুলোর উৎস, যা বৃষ্টির পর রংধনুর মধ্যে প্রকাশ পায়। —(মানার)

সূর্য ও চন্দ্রের পরিচালনা ব্যবস্থার মাঝে স্রষ্টার মহান নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে ঃ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

قدر শব্দটি تقدير শব্দ থেকে ঘটিত ; تقدير অর্থ হলো কোন বস্তুকে স্থান কাল অথবা গুণাবলী অনুযায়ী একটা বিশেষ পরিমাণের উপর স্থাপন করা। রাত এবং দিনের সময়কে একটা বিশেষ পরিমাণের উপর রাখার জন্য কোরআন করীমে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ জায়গার দূরত্বকে একটা বিশেষ পরিমাপমত রাখার জন্য অন্য জায়গায় শাম দেশ ও সাবার মধ্যবর্তী বস্তিসমূহ সম্পর্কে বলেছে ঃ وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ আর সাধারণ পরিমাণ সম্পর্কে বলেছে। وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا

مَنَازِلَ শব্দটি منزل-এর বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ নাযিল হওয়ার জায়গা। আল্লাহ্ পাক চন্দ্র-সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার প্রত্যেকটিকেই একেক منزل বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতিমাসে তার নিজস্ব পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল হলো ত্রিশ অথবা ঊনত্রিশটি। অথবা যেহেতু চাঁদ প্রতি মাসে কমপক্ষে একদিন লুকায়িত থাকে সেজন্যে সাধারণত চাঁদের মনযিল আটাশটি বলা হয়। আর সূর্যের পরিক্রমণ বছরান্তে পূর্ণ বলে তার মনযিল হলো তিনশ' ষাট অথবা পঁয়ষট্টি। আরবের প্রাচীন জাহিলিয়াত যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনযিলগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম যেসব নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে, যেগুলো সেসব মনযিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কোরআন করীম এ সমস্ত প্রচলিত নামের বহু ঊর্ধ্বে। বস্তুত কোরআনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ঐটুকু দূরত্ব বোঝানো, যা চন্দ্র-সূর্য বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে অতিক্রম করে থাকে।

উপরোল্লিখিত আয়াতে قَدَّرَهُ مَنَازِلَ একবচনের ضمير (সর্বনাম) ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ মনযিল কিন্তু চন্দ্র-সূর্য উভয়েরই। কাজেই কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, যদিও এখানে একবচনের সর্বনাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকটি একক হিসেবে উভয়টি বোঝানোই উদ্দেশ্য, যার দৃষ্টান্ত কোরআন এবং আরবী পরিভাষায় অনেক অনেক পাওয়া যায়।

আবার কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন ঃ যদিও আল্লাহ্ পাক চন্দ্র-সূর্য উভয়ের জন্য মনযিলসমূহ কায়েম রেখেছেন, কিন্তু এখানে চাঁদের মনযিল বোঝানোই উদ্দেশ্য। অতএব قَدَّرَهُ শব্দের সর্বনাম চাঁদের সাথেই সম্পৃক্ত। একটির সঙ্গে খাস করার কারণ হলো এই যে, সূর্যের

মনযিল দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং হিসাব ছাড়া জানা যায় না। সূর্যের উদয়াস্ত বছরের প্রতিদিন একই অবস্থানে হয়ে থাকে। শুধু চোখে দেখে একথা বোঝা যাবে না যে, আজ সূর্য কোন্ মনযিলে অবস্থিত। কিন্তু চাঁদের অবস্থা অন্য রকম। তার অবস্থা প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মাসের শেষের দিকে তো চাঁদ মোটেই দেখা যায় না। এ ধরনের পরিবর্তন দেখে একজন বিদ্যাহীন লোকও চাঁদের তারিখগুলো বলে দিতে পারে। উদাহরণত যদি ধরা যায়, আজ মার্চ মাসের আট তারিখ, তবে কোন মানুষই সূর্য দেখে এ কথা বুঝতে পারবে না যে, আজ আট তারিখ কি একুশ তারিখ। কিন্তু চাঁদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা—চাঁদকে দেখেও তার তারিখটা বলে দেয়া যেতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতে যেহেতু এ কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলার এ সমস্ত মহান নির্দেশের সাথে মানুষের এসব উপকারিতাও সম্পর্কযুক্ত যে, তারা এগুলোর মাধ্যমে বছর, মাস এবং এর তারিখের হিসাব জানবে। বস্তুত এ হিসাব যদিও চন্দ্র-সূর্য উভয়টির দ্বারাই জানা যেতে পারে এবং পৃথিবীতে চান্দ্র ও সৌর উভয় প্রকার বর্ষ-মাসই প্রাচীনকাল থেকে পরিচিতও রয়েছে এবং স্বয়ং কোরআন মজীদেও সূরা 'ইস্‌রা'-এর দ্বাদশতম আয়াতে তা বলেছে ঃ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ এ আয়াতে اٰيَةَ اللَّيْلِ -এর মর্মার্থ হলো চাঁদ আর اٰيَةَ النَّهَارِ -এর মর্মার্থ সূর্য। এতদুভয়ের উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে, এগুলোর দ্বারা তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও মাসের তারিখ হিসাব করতে পার। আর সূরা রহমানে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ —এতে বলা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়টির মাধ্যমেই তারিখ, মাস ও বর্ষের হিসাবে জানা যেতে পারে।

কিন্তু চাঁদের দ্বারা যে মাস ও তারিখের হিসাব করা যায়, তা চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতার আলোকে সপ্রমাণিত। পক্ষান্তরে সূর্যের হিসাব সৌর বিজ্ঞানীদের ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে চন্দ্র ও সূর্যের উল্লেখের পর যখন এগুলোর মনযিল নির্ধারণের কথা বলা হলো, তখন একবচন সর্বনাম ব্যবহারে قَدَّرَهٗ বলে শুধু চাঁদের মনযিলসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়।

আর যেহেতু ইসলামের নির্দেশাবলীতে প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কাজে এ বিষয় লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যাতে তার অনুশীলন প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে সহজ হয়–তা লেখাপড়া জানা লোকই হোক কিংবা অশিক্ষিত হোক, শহরে হোক কিংবা পল্লীবাসী হোক। এজন্যই সাধারণত ইসলামী হুকুম-আহকামে (বিধি-বিধানে) চান্দ্র বর্ষ, মাস ও তারিখের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ইসলামী ফরয ও নির্দেশাবলীও চাঁদের হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সৌর হিসাব রক্ষা করা কিংবা ব্যবহার করা জায়েয নয়। বরং কেউ যদি নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত ও ইদ্দতের ক্ষেত্রে শরীয়ত মুতাবিক চান্দ্র হিসাব ব্যবহার করে এবং তার ব্যক্তিগত কাজ–কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সৌর হিসাব ব্যবহার করতে চায়,

তবে তার সে অধিকার রয়েছে। তবে শর্ত হলো এই যে, সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের মাঝে যেন চান্দ্র হিসাব প্রচলিত থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে করে রমযান, হজ্জ প্রভৃতির সময় জানতে পারা যায়। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ছাড়া অন্য কোন মাসই জানা থাকবে না এমনটি যেন না হয়। ফিকাহ্‌বিদগণ চান্দ্র হিসাবকে বাঁচিয়ে রাখা মুসলমানদের জন্য ফরযে কিফায়াহ্ সাব্যস্ত করেছেন।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নবীগণের রীতি, মহানবী (সা)-এর সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশিদীনের কর্মধারায় চান্দ্র হিসাবই ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এর অনুবর্তিতা সওয়াব ও বরকতের কারণ।

যা হোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মহান কুদরত ও পরিপূর্ণ হিকমতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি আলোর এ দু'টি মহা উৎস অবস্থানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং অতঃপর সেগুলোর পরিক্রমণের জন্য এমন পরিমাপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে বর্ষ, মাস, তারিখ ও সময়ের প্রতিটি মিনিটের হিসাব জানা যেতে পারে। এদের গতিতে না কখনো পরিবর্তন সাধিত হয়, না কোনদিন আগপাছ হয় আর না কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। এরই অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য হিসাবে ইরশাদ হয়েছে ঃ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা অনর্থক সৃষ্টি করেন নি, বরং এগুলোর মাঝে বিরাট বিরাট হিকমত এবং মানুষের জন্য অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এরা অতি পরিচ্ছন্নভাবে এ সমস্ত প্রমাণ সেসব লোকের সামনে তুলে ধরে যারা বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান।

এমনিভাবে দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, রাত ও দিনের ক্রমাগমন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সে সমুদয়ের মাঝে সে সমস্ত লোকের জন্য (তওহীদ ও পরকালের) প্রমাণ বিদ্যমান, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে।

তওহীদের বা একত্ববাদের প্রমাণ তো হলো ক্ষমতা ও সৃষ্টিনৈপুণ্যের অনন্যতা, কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে সে সমুদয়কে সৃষ্টি করা এবং এমন ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলোর পরিচালনা, যা না কখনো বিঘ্নিত হয়, না পরিবর্তিত হয়।

আর আখিরাত তথা পরকালের প্রমাণ এজন্য যে, যে বিজ্ঞ সত্তা এ সমুদয় সৃষ্ট সামগ্রীকে মানুষের ফায়দার জন্য বানিয়ে একটা সুগঠিত ব্যবস্থার অনুবর্তী করে দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এমনটি হতেই পারে না যে, এই সেবাব্রতী বিশ্বকে তিনি অহেতুক শুধু খাবার-দাবার জন্য কিংবা ভোগবিলাসের নিমিত্ত সৃষ্টি করে থাকবেন। এদের জন্য করণীয় কিছুই নির্ধারণ করে দেবেন না। সুতরাং যখন সাব্যস্ত হলো যে, সেবাব্রতী এ বিশ্বের উপরও কিছু বাধ্যবাধকতা থাকা আবশ্যক তখন একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, এ সমস্ত বাধ্যবাধকতা (তথা আরোপিত দায়দায়িত্ব) সম্পাদনকারী ও লংঘনকারীদের কোথাও কখনো একটা হিসাব-নিকাশ হবে এবং যারা তা সম্পাদনকারী হবে তারা ভাল প্রতিদান পাবে আর যারা লংঘনকারী তারা শাস্তির অধিকারী হবে। সাথে সাথে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ পৃথিবীতে প্রতিদান ও শাস্তির এ নিয়ম নেই—এখানে অনেক সময় অপরাধী ব্যক্তি সৎ-সজ্জনের চেয়েও ভালভাবে জীবন-যাপন

করে। কাজেই হিসাব-নিকাশের একটা দিন নির্ধারিত হবে। তাই নাম হলো কিয়ামত ও আখিরাত।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَٰرُ فِي جَنَّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

(৭) অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বেখবর। (৮) এমন লোকদের ঠিকানা হলো আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল। (৯) অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে হিদায়েত করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ঈমানের মাধ্যমে। তাদের তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ সুখময় কাননকুঞ্জে। (১০) সেখানে তাদের প্রার্থনা হলো 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্'। আর শুভেচ্ছা হলো সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, সমস্ত প্রশংসা 'বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য' বলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেসব লোকের মনে আমার সাক্ষাৎ লাভের প্রেরণা নেই এবং তারা পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট (প্রকৃতপক্ষেই যাদের মনে পরকালের বাসনা নেই) বরং এতেই বিভোর হয়ে আছে (আগত দিনের কোনই খবর নেই) এবং যারা আমার নির্দেশসমূহ (যা নবী আগমনের প্রমাণ) সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল, এমন লোকদের ঠিকানা হলো দোযখ (তাদেরই গর্হিত এসব) কার্যকলাপের দরুন। (আর) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ঈমান আনার ফলশ্রুতিতে তাদের উদ্দিষ্ট (জান্নাত) পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। তাদের (এ বাসস্থানের) তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে শান্তিনিকুঞ্জে। (বস্তুত তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানকার বিস্ময়কর বস্তুসামগ্রী হঠাৎ দেখতে পাবে, তখন) তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে—"সুবহানাল্লাহ্"। আর (অতপর যখন তাদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হবে,

তখন) তাদের পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় হবে 'আস্সালামু আলায়কুম' বলে। তারপর (যখন নিশ্চিন্তে সেখানে গিয়ে বসবে এবং নিজেদের অতীত বিপদাপদ আর বর্তমানের পরিচ্ছন্ন চিরন্তন বিলাসের মাঝে তুলনা করবে, তখন) তাদের (তখনকার আলাপের) শেষ বাক্য হবে, আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (যেমন, অন্যান্য আয়াতে রয়েছে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য, যিনি আমাদের কষ্টের অবসান করেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তিনৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশক্ষেত্র আসমান-যমীন ও চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে তওহীদ ও আখিরাতের আকীদা ও বিশ্বাসকে এক সালঙ্কার ভঙ্গিতে প্রমাণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম তিনটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের এমন মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, নিদর্শন ও প্রমাণসমূহের পরে মানবকুল দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। (এক) সে শ্রেণী যারা কুদরতের এসব নিদর্শনের প্রতি আদৌ মনোনিবেশ করেনি। না চিনেছে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সাধারণ জীব-জন্তুর মতই কোন জীব নই, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু অপেক্ষা বহুগুণ বেশি চেতনাভূতি ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তো বা আমাদের প্রতিও কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সেসবের জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে হবে আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন, কোরআনের পরিভাষায় যাকে কিয়ামত ও হাশর-নশর বলে অভিহিত করা হয়েছে। বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব-জানোয়ারের পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ "আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে কোন ধারণা-কল্পনাও নেই, তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, 'পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না, চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনো তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কারো কোন সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেয়া কর্তব্য ছিল।"

তৃতীয়ত, "এসব লোক আমার নির্দেশাবলী ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফলতী করে চলেছে। এরা যদি আসমান-যমীন কিংবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হতো না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনোচিত গাফলতির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।"

এ সমস্ত লোক যাদের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখিরাতে তাদের শাস্তি হলো এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আর এ শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি।

পরিতাপের বিষয় যে, কোরআন করীম কাফির ও মুনকিরদের যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছে, আজকের দিনে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের জীবন ও আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যকলাপ ও চিন্তা-কল্পনার প্রতি লক্ষ্য করলে একথা কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের মাঝেও এ দুনিয়া ছাড়া অন্য কোন ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এতদসত্ত্বেও আমরা নিজেদেরকে সত্য ও পাকা মুসলমান প্রতিপন্ন করে চলেছি। পক্ষান্তরে সত্য ও পাকা মুসলমান ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ, তাঁদের চেহারা দেখার সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং মনে হতো, এঁর মনে অবশ্যই কোন মহান সত্তার ভয় এবং কোন হিসাব-কিতাবের চিন্তা বিদ্যমান। অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর যাবতীয় পাপপঙ্কিলতা থেকে মাসুম হওয়া সত্ত্বেও এমনি অবস্থা ছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় বিষণ্ণ ও চিন্তান্বিত থাকতেন।

(দুই) এ আয়াতে সেসব ভাগ্যবান লোকেরও আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত তথা মহাশক্তির নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা মুতাবিক সৎকর্ম সম্পাদনে নিয়ত নিয়োজিত রয়েছে।

কোরআন করীম সেসব মহান ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যে কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে اُولٰئِكَ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ অর্থাৎ তাঁদের পরওয়ারদিগার তাঁদেরকে তাঁদের ঈমানের কারণে মনযিলে-মকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন যেখানে সুখ ও শান্তিময় কাননকুঞ্জে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।

এতে 'হিদায়েত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হলো পথ প্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর মনযিলে-মকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে, যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণীর লোকদের শাস্তি যেমন তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মু'মিন শ্রেণীর প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তাঁরা তাদের ঈমানের জন্য পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে, কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার সাথে সৎকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানই ছিল সুখ-শান্তির আলয় জান্নাত।

চতুর্থ আয়াতে জান্নাতে পৌঁছার পর জান্নাতবাসীদের কয়েকটি বিশেষ অবস্থা ও আচরণের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত— دَعْوٰهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ এখানে دعوى শব্দটি তার নির্ধারিত দাবি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোন বাদী তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে, বরং এখানে دعوى অর্থ হলো দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হলো এই যে, জান্নাতে পৌঁছার পর জান্নাতবাসীদের

দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো 'দোয়া' বলা হয় কোন বিষয়ের আবেদন এবং কোন উদ্দেশ্য যাঞ্চা করাকে, কিন্তু سبحنك اللهم (সুবহানাকাল্লাহুম্মা)-তে কোন আবেদন কিংবা কোন কিছুর প্রার্থনা নেই। একে দোয়া বলা যায় কেমন করে ?

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এক কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, জান্নাতবাসিগণ জান্নাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেতে থাকবেন। কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা-প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য তাদের মুখে আবৃত্ত হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মত অবশ্যকরণীয় কোন ইবাদত হিসাবে নয়, বরং তারা এ বাক্যের জপ করে স্বাদানুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলতে থাকবেন। এছাড়া এক হাদীসে কুদ্সীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সতত নিয়োজিত থাকে এবং এমনকি নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তার থাকে না, আমি তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব। এ হিসাবেও সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা)-এর সামনে যখনই কোন কষ্ট কিংবা পেরেশানী উপস্থিত হতো, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন।

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ – لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ –
لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ –

আর ইমাম তাবারী বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে 'দোয়ায়ে কারব' তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোন বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানীর সময় এ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া-প্রার্থনা করতেন। —(তফসীরে কুরতুবী)

ইমাম ইবনে জারীর ও ইবনে মানযার প্রমুখ এমন এক রিওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন যে, জান্নাতবাসীদের যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন কিংবা বাসনা হবে, তখন তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ বাক্যটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের কাম্য বস্তু এনে উপস্থিত করে দেবেন। বস্তুত সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটি যেন জান্নাতবাসীদের একটি পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে থাকবেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন।—(রূহুল মা'আনী, কুরতুবী) সুতরাং এ হিসাবেও 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ প্রচলিত অর্থে تَحِيَّةٌ বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে, যার মাধ্যমে কোন আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। যেমন, সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা 'আহ্লান ওয়া সাহ্লান' প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অথবা ফেরেশতাদের

পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে سلام-এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেয়া হবে যে, তোমরা যেকোন রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হিফাজতে থাকবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, সূরা ইয়াসীনে রয়েছে : سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দুটি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরীত্য নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। 'সালাম' শব্দটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জান্নাতে পৌছে যখন যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে।—(রূহুল মা'আনী)

জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দোয়া হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফত বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে (বিপুল) উন্নতি লাভ করবে। যেমন, হযরত শিহাব উদ্দীন সুহ্রাওয়াদী (র) তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন যে, জান্নাতে পৌছে সাধারণ জান্নাতবাসীদের জ্ঞান ও মা'রিফতের এমন স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবনে ওলামাদের হয়ে থাকে। আর ওলামাগণ সে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী-রাসূলগণের হতো। আর নবী-রাসূলগণ সে স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে 'মাকামে মাহমুদ' যার জন্য আযানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

সারকথা হলো এই যে, জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দোয়া হবে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ আর সর্বশেষ দোয়া হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের দু'টি প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি 'সিফাতে জালালী' তথা পরাক্রম ও মহত্ত্ব গুণ, যাতে যাবতীয় দোষত্রুটি হতে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হলো 'সিফাতে কারম' যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কোরআন করীমের تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ আয়াতে এতদুভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, 'সুবহানত্ব' আল্লাহ্ তা'আলার জালালী গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর তা'রীফ প্রশংসার অধিকারী হওয়া মহানুভবতা সংক্রান্ত গুণের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক বিন্যাস অনুযায়ী জালালী বৈশিষ্ট্য করুণা ও মহানুভবতা গুণের অগ্রবর্তী। সে কারণেই জান্নাতবাসীরা প্রথমে তাঁর জালালী গুণ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ বাক্যে বর্ণনা করবেন এবং সর্বশেষে মহানুভবতা গুণ প্রকাশ করবেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। আর এই হবে তাঁদের রাত-দিনের কর্ম।

এ তিনটি আয়াতের স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাস হচ্ছে এই যে, জান্নাতবাসীরা যখন سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ বলবেন, তখন এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম দেয়া হবে এবং এর ফলে তারা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলবেন। —(রূহুল-মা'আনী)

আহ্কাম ও মাসায়েল

কুরতুবী আহ্কামুল কোরআন গ্রন্থে বলেছেন যে, জান্নাতবাসীদের আমল অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজ 'বিসমিল্লাহ্'-এর মাধ্যমে আরম্ভ করা এবং 'আলহামদুলিল্লাহ্'-এর মাধ্যমে শেষ করা সুন্নত। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন—বান্দা যখন কোন কিছু পানাহার করবে, তখন তা বিস্‌মিল্লাহ্ দিয়ে শুরু করবে আর যখন সমাপ্ত করবে, তখন আলহামদুলিল্লাহ্ বলবে। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ।

দোয়া-প্রার্থনাকারীর পক্ষে দোয়া শেষে وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলা মুস্তাহাব। কুরতুবী বলেছেন যে, এতদসঙ্গে সূরা সাফ্‌ফাতের শেষ আয়াতগুলো অর্থাৎ ঃ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ – وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে নেয়া অধিকতর উত্তম।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۖ
فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١﴾ وَاِذَا
مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا
عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۖ كَذٰلِكَ زُيِّنَ
لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۖ
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ
مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ
قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ۖ
قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا
يُوْحٰۤى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

(১১) আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যথাশীঘ্র অকল্যাণ পৌঁছে দেন, যত শীঘ্র তারা কল্যাণ কামনা করে, তাহলে তাদের আশাই শেষ করে দিতে হতো। সুতরাং যাদের মনে আমার সাক্ষাতের আশা নেই, আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টামিতে ব্যতিব্যস্ত ছেড়ে দিয়ে রাখি। (১২) আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয়, কখনো কোন কষ্টের সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপূত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে। (১৩) অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালিম হয়ে গেছে। অথচ রাসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে! (১৪) অতঃপর আমি তোমাদেরকে যমীনে তাদের পর প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি কর। (১৫) আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক বলে, যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া, অথবা একে পরিবর্তিত করে দাও। তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। আমি যদি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নাফরমানী করি, তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি। (১৬) বলে দাও, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না ? (১৭) অতঃপর তার চেয়ে বড় জালিম কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করছে ? কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর (তাদের তাড়াহুড়া অনুযায়ী) যথাশীঘ্র অকল্যাণ আরোপ করে দিতেন, যেমনটি তারা লাভের জন্য করে থাকে (এবং তাদের সে তাড়াহুড়া অনুযায়ী সে কল্যাণ যথাশীঘ্র তিনি দিয়েও দেন), তাহলে তাদের উপর প্রতিশ্রুত (আযাব)

করেই পুরা হয়ে যেত। (কিন্তু আমার প্রজ্ঞা ও হিকমত, যার বিবরণ একটু পরেই আসছে, তা চায় না)। কাজেই আমি তাদেরকে যাদের মনে আমার নিকট ফিরে আসার ভাবনাটিও নেই, (আযাব না দিয়ে কয়েকদিনের জন্য) নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখি, যাতে তারা নিজেদের ঔদ্ধত্যের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে (এবং আযাবপ্রাপ্তির উপযোগী হয়ে যায়)। আর (সে হিকমত হলো এই যে,) যখন মানুষকে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন কোন লোককে) কোন কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তখন আমাকে ডাকতে আরম্ভ করে—(কখনো) শুয়ে, (কখনো) বসে, (কখনো) দাঁড়িয়ে। (অথচ তখন কোন মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদির কথা মনেই থাকে না— ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ অতঃপর যখন (তার দোয়া-প্রার্থনার পর আমি তার কষ্ট দূর করে দেই, তখন আবার স্বীয় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে (এবং আমার সাথে এমনভাবে নিঃসম্পর্ক হয়ে যায় যে,) সে যে কষ্টে পতিত হয়েছিল, তা দূর করার জন্য যেন আমাকে কখনো ডাকেইনি। (সুতরাং আবারো তেমনি শির্‌কী কথাবার্তা বলতে শুরু করে— نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا এসব সীমালংঘনকারীদের (অসৎ) কার্যকলাপ তাদের কাছে এমন মনঃপূত মনে হয় (যেমন এখনই আমরা বর্ণনা করছি)। বস্তুত আমি তোমাদের পূর্বে বহু দলকে (বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে) ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা জুলুম (অর্থাৎ কুফরী-শির্‌কী) করেছে। অথচ তাদের কাছে তাদের পয়গম্বরও দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন। তারা (চরম বিদ্বেষবশত) এমন ছিলই বা কবে যে, ঈমান আনতে পারে ? আমি অপরাধীদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি (যেমন, আমরা এখনই বর্ণনা করলাম)। তারপর আমি পৃথিবীতে তাদের স্থলে তোমাদেরকে আবাদ করেছি যাতে (বাহ্যিকভাবেও) আমি দেখে নিতে পারি যে, তোমরা কি ধরনের কার্যকলাপ কর—(তেমনি শির্‌কী-কুফরীই কর, না ঈমান আন)। আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, যা একান্তই পরিষ্কার, তখন এসব লোক যাদের আমার কাছে প্রত্যাবর্তনের কোন ভাবনাই নেই (আপনার কাছে) বলে, (হয়) একে বাদ দিয়ে (পূর্ণ) দ্বিতীয় কোন কোরআন নিয়ে আসুন (যাতে আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য থাকবে না) না হয় (অন্তত) এ কোরআনেই কিছু সংশোধন করে দিন। [অর্থাৎ আমাদের মতবাদ বিরোধী বক্তব্য এর থেকে বিলুপ্ত করে দিন। তাদের এ যুক্তির মর্মার্থ হলো এই যে, তারা কোরআনকে মুহাম্মদ (সা)-এর কালাম বলেই জানত। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সা)-কে উত্তর শিখিয়ে দিতে গিয়ে বলেন—] আপনি বলে দিন যে, (এ থেকে এ ধরনের বক্তব্য মুছে দিলে প্রকৃতপক্ষে কেমন হবে, না হবে সে বাদ দিলেও) আমার দ্বারা এমনটি হতেই পারে না যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন রকম সংশোধন করি। (তদুপরি কোন অংশের বিলোপ করাই যখন সম্ভব নয়, তখন গোটাটা বিলোপ করা তো আরো বেশি অসম্ভব। কারণ এটি আমার কালাম তো নয়ই; বরং আল্লাহ্‌র এমন কালাম যা ওহীর মাধ্যমে এসেছে। বিষয়টা যখন এরূপ, তখন) আমি তো তারই অনুসরণ করব যা আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পৌঁছেছে। (আর খোদা না করুন,) যদি আমি (ওহীর অনুসরণ না করে; বরং) স্বীয় পালনকর্তার না-ফরমানী করি, তাহলে আমি এক বড় কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করি (যা পাপীদের জন্য নির্ধারিত

রয়েছে এবং যা পাপের দরুন তোমাদেরও ভাগ্যে রয়েছে। সুতরাং আমি তো এ আযাব কিংবা তার কারণ অর্থাৎ পাপ কার্যের দুঃসাহস করতেই পারি না। আর যদি এর ওহী হওয়ার ব্যাপারে কোন বক্তব্য থাকে কিংবা যদি এরা একে আপনার কালাম বলেই মনে করে, তবে) আপনি এভাবে বলুন যে, (একথা তো সুস্পষ্ট যে, এ কালাম অনন্য; এমনটি তৈরি করার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই—তা আমি হই বা তোমরাই হও। অতএব,) আল্লাহ্ তা'আলা যদি চাইতেন (যে, আমি তোমাদেরকে এ অনন্য কালাম শোনাতে না পারি এবং আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে এর সন্ধান না দিতে ইচ্ছা করতেন,) তবে (আমার উপর একে অবতীর্ণই করতেন না।) না আমি তোমাদেরকে এটি পড়ে শোনাতাম, আর না আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এর সন্ধান দিতেন। (অতএব, যখন আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি এবং আমার মাধ্যমে তোমরা এর সন্ধান পাচ্ছ, তখন এতেই বোঝা যায় যে, এ অনন্যসাধারণ কালাম শোনানো এবং এর সন্ধান দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলার অনভিপ্রেত। আর ওহী ব্যতীত এটি শোনানো কিংবা এর সন্ধান দেওয়া এর মু'জিযা বা অনন্যতার কারণেই সম্ভব নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটি অবতীর্ণ ওহী এবং আল্লাহ্ তা'আলারই কালাম।) কারণ আমি তো (এ কালাম প্রকাশ করার) পূর্বেও বয়সের একটা বিরাট অংশ তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি (যদি এটি আমার কালাম হয়ে থাকে, তবে হয়, এতকাল পর্যন্ত এ ধরনের একটি বাক্যও আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি, না হয়, এমন বিরাট কালাম হঠাৎ করে তৈরি করে ফেলেছি–অথচ এমনটি একান্তই বিবেকবিরুদ্ধ ব্যাপার–) তারপরও কি তোমাদের মধ্যে এতটুকু বিবেক-বুদ্ধি নেই ? যাক, এটি আল্লাহ্র কালাম বলে প্রমাণিত হয়ে যাবার পরেও আমার কাছে তোমরা এর সংশোধন, পরিবর্তন দাবি করছ এবং একে মানছ না, তখন জেনে রাখ,) সে ব্যক্তির চেয়ে জালিম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে (যেমন, তোমরা আমাকে পরিবর্তনের প্রস্তাব দিচ্ছ) কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে (যেমন, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে প্রস্তাব দিচ্ছ)। নিঃসন্দেহে এহেন অপরাধীদের প্রকৃতই পরিত্রাণ নেই (বরং এরা অনন্ত শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথমটির সম্বন্ধ সেসব লোকের সাথে, যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী। সেজন্যই যখন তাদেরকে আখিরাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন বিদ্রূপচ্ছলে বলতে থাকে যে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে এখনই আযাব ডেকে আন। অথবা বলে, এ আযাব শীঘ্র কেন আসে না ? যেমন, নযর ইবনে হারেস বলেছিল ঃ "আয় আল্লাহ্, এ কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা এর চেয়েও কোন কঠিন আযাব পাঠিয়ে দিন।"

প্রথম আয়াতে এরই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত সে আযাব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হিকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মূর্খরা নিজের জন্য যে বদ্‌দোয়া করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা

করে তা নাযিল করেন না। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বদ্‌দোয়াগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবূল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দোয়াগুলো কবুল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দোয়া-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবূল করে নেন। অবশ্য কখনো কোন হিকমত ও কল্যাণের কারণে কবূল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজান্তে এবং কখনো দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজেদের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদ্‌দোয়া করে বসে অথবা আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আযাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবূল করেন না বরং অবকাশ দেন যাতে অস্বীকৃতরাও বিষয়টি চিন্তাভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদ্‌দোয়া করে বসে, তাহলে সে যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে, তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে।

ইমাম জরীর তাবারী (র) কাতাদাহ্ (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে এবং বুখারী ও মুসলিম মুজাহিদ (র)-র রিওয়ায়েতে উদ্ধৃত করছেন যে, এ ক্ষেত্রে বদদোয়ার মর্ম এই যে, কোন কোন সময় কেউ রাগত নিজের সন্তান-সন্ততি কিংবা অর্থ-সম্পদের ধ্বংসপ্রাপ্তির জন্য বদদোয়া করে বসে কিংবা বস্তু-সামগ্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরম্ভ করে—আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশত সহসাই এ সব দোয়া কবূল করেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী একটি রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ "আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছি, যেন তিনি কোন বন্ধু-স্বজনের বদদোয়া তার বন্ধু-স্বজনের ব্যাপারে কবূল না করেন।" আর শাহর ইবনে হাওশাব (র) বলেছেন, আমি কোন কোন কিতাবে পড়েছি, যেসব ফেরেশতা মানুষের প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আমার বান্দা দুঃখ-কষ্টের দরুন কিংবা রাগবশত কোন কথা বলে ফেললে তা লিখবে না।—(কুরতুবী)

তারপরেও কোন কোন সময় এমন কবূলিয়ত বা প্রার্থনা মঞ্জুরীর সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যেকোন কথা বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে কবূল হয়ে যায়। সেইজন্য রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, নিজের সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। এমন যেন না হয় যে, সে সময়টি হয় মঞ্জুরীর সময় এ দোয়া সাথে সাথে কবূল হয়ে যায় আর পরে তোমাদের অনুতাপ করতে হয়। সহীহ্ মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে গযওয়ায়ে 'বাওয়াত'-এর ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

এ সমুদয় রিওয়ায়েতের সারমর্ম হলো এই যে, উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য যদিও আখিরাতে অস্বীকৃত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের দাবি তাৎক্ষণিক আযাবের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু সাধারণভাবে এতে সেসব মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত, যারা কোন দুঃখ-কষ্ট ও রাগের দরুন নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের জন্য বদদোয়া করে বসে। আল্লাহ্ তা'আলার রীতি স্বীয় অনুগ্রহ

ও করুণাবশত উভয়ের সাথে একই রকম যে, তিনি এ ধরনের বদদোয়া সাথে সাথে কার্যকর করেন না, যাতে করে মানুষ চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় আয়াতে একত্ববাদ ও আখিরাতে অস্বীকৃত লোকদেরকে আরেক অপরূপ সালঙ্কার ভঙ্গিতে স্বীকার করানো হয়েছে। তা হলো এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, অন্যদেরকে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করে এবং তাদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহ্কেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তাঁরই সাথে তাদের অনুগ্রহ-বিমুখতার অবস্থা হলো এই যে, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে এমন মুক্ত নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাঁকে ডাকেইনি, তার কাছ যেন কোন বাসনাই প্রর্থনা করেনি। এতে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যারা অপর কাউকে শরীক করে তারা নিজেও তাদের সে বিশ্বাসের অসারতা উপলব্ধি করে, কিন্তু একান্ত বিদ্বেষ ও জেদের বশেই সে বাতিল বিশ্বাসে অটল তাকে।

তৃতীয় আয়াতে দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই অধিকতর বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ্ তা'আলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আযাব আসতেই পারে না। বিগত জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার শাস্তিস্বরূপ বিভিন্ন রকম আযাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, কোন সাধারণ ব্যাপক আযাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহ্র আযাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবি করতে তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আযাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের আযাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আযাব নেমে আসা অসম্ভব নয়।

চতুর্থ আয়াতে বলেছেন ঃ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীর খিলাফত (শুধু) তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া যে, তোমরা কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন কর—বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধনদৌলতের

নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়। এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়, বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়দায়িত্ব।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম—এ চার আয়াতে আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃত লোকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খণ্ডন করা হয়েছে। এ সব লোক না জানত আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাত, না ওহী ও রিসালত সম্পর্কিত কোন পরিচয়। নবী-রাসূলগণকেও সাধারণ মানুষের মত মনে করত। যে কোরআন করীম রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছেছে তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তাঁরই কালাম, তাঁরই রচনা। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা মহানবী (সা)-এর কাছে দাবি জানায়, এই যে কোরআন, এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী; যে মূর্তি-বিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সতত সম্মান করে এসেছে এবং এগুলোকে সিদ্ধিদাতা হিসাবে মান্য করে এসেছে, কোরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কোরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাযী নই। সুতরাং হয় আপনি এ কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোরআন তৈরি করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্তত এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন।

কোরআন করীম প্রথমে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী (সা)-কে হিদায়েত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিন ঃ এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামত আমি এতে কোন পরিবর্তনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহ্র ওহীর তাঁবেদার। আমি আমার ইচ্ছামত এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গোনাহ্গার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্য যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব।

তারপর বললেন, আমি যাই কিছু করি আল্লাহ্র নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে করি। তোমাদেরকে এ কালাম শোনানো না হোক এটাই যদি আল্লাহ্ তা'আলা চাইতেন, তাহলে না আমি শোনাতাম, না আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে তোমাদের অবহিত করতেন। সুতরাং তোমাদেরকে এ কালাম শোনানো হোক এটাই যখন আল্লাহ্র অভিপ্রায়, তখন কার এমন সাধ্য আছে যে, এতে কোন রকম কম-বেশি করতে পারে ?

অতঃপর কোরআন যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত ঐশী কালাম তা এক প্রকৃষ্ট দলীলের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়টিও তো একটু চিন্তা কর, যে, কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছি। এ সময়ের মধ্যে তোমরা কখনো আমার কাছ থেকে কাব্য-কবিতা বলতে কিংবা কোন কথিকা প্রবন্ধ রচনা করতে শোননি। যদি আমি নিজের পক্ষ থেকে এমন কালাম বলতে পারতাম, তবে এই চল্লিশ বছরের মধ্যে কিছু না কিছু তো বলতাম। তাছাড়া চল্লিশ বছরের এই সুদীর্ঘ জীবনে তোমরা আমার চাল-চলনের বিশ্বস্ততাও প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ।

সারা জীবনেই যখন কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তখন আজ চল্লিশ বছর পর মিথ্যা বলার কি এমন হেতু থাকতে পারে। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) সত্য ও বিশ্বস্ত। কোরআনে যা কিছু রয়েছে সেসব আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে আগত তাঁরই কালাম। কোরআন করীমের এ দলীল-যুক্তি শুধু কোরআনের ঐশী বাণী হওয়ারই পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ নয়, বরং সাধারণ আচার-অনুষ্ঠানে ভালমন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় যাচাইয়েরও একটি নীতি বাতলে দিয়েছে। কাউকে কোন পদ বা নিয়োগ দান করতে হলে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য যাচাই করার উত্তম পদ্ধতি হলো তার বিগত জীবনের পর্যালোচনা। যদি তাতে সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকে, তবে ভবিষ্যতেও তা আশা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বিগত জীবনে যদি সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর প্রমাণ পাওয়া না যায়, তবে আগামীতে শুধু তার বলা-কওয়ায় তার উপর ভরসা করা কোন বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়; ইদানীং নিয়োগ ও পদ বন্টনে এবং দায়িত্ব সমর্পণে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে এবং সেকারণে যেসব হাঙ্গামা-উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি হচ্ছে, সেসবের কারণও এই প্রকৃতিগত পদ্ধতি পরিহার করে প্রথাগত বিষয়াদির পেছনে পড়া।

অষ্টম আয়াতে এই একই বিষয়ের অতিরিক্ত তাকীদ এসেছে যাতে কোন বাণী বা কালামকে ভ্রান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে জুড়ে দেওয়ার জন্য কঠিন আযাবের কথা বলা হয়েছে।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ
النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ
مِّن رَّبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

(১৮) আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পূতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (১৯) আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। আর একটি কথা যদি তোমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত না হয়ে যেত; তবে তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেত। (২০) বস্তুত তারা বলে, তার

কাছে তার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল না কেন? বলে দাও, গায়েবের কথা আল্লাহ্ই জানেন! আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর এরা আল্লাহ্ (তা'আলার তওহীদ)-কে পরিহার করে এমন সব বস্তুর উপাসনা করছে, যা (উপাসনা-ইবাদত না করার ক্ষেত্রে) না তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে, আর নাইবা (ইবাদত করার কারণেও) তাদের কোন উপকার করতে পারে। (এরা নিজের পক্ষ থেকে যুক্তিহীনভাবে একটা উপকারিতা দাঁড় করিয়ে) বলে যে, এ (উপাস্য)-গুলো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের (জন্য) সুপারিশকারী—(সেইজন্য আমরা এগুলোর ইবাদত করি।) আপনি বলে দিন, (তাহলে) তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন বস্তু সম্পর্কে অবহিত করছ, যা আল্লাহ্ জানেন না আসমানে কিংবা যমীনে? (অর্থাৎ যে বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার অবগতির ভেতরে নেই তার অস্তিত্ব অসম্ভব। কাজেই তোমরা এক অসম্ভব বস্তুর পেছনে পড়ে আছ।) আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত লোকের শির্‌ক (ও অংশীবাদ) থেকে পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। আর (প্রথমে) সমস্ত মানুষ একই পন্থাবলম্বী ছিল। (অর্থাৎ সবাই ছিল একত্ববাদী। কারণ আদম (আ) তওহীদের আকীদা নিয়েই এসেছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিরাও সুদীর্ঘকাল তাঁরই আকীদা ও পন্থায় রয়েছে।) পরে (নিজেদের দুর্মতিত্বের দরুন) তারা (অর্থাৎ কেউ কেউ) মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। (অর্থাৎ তওহীদ থেকে ঘুরে গিয়ে মুশরিক হয়ে গেছে। বস্তুত মুশরিকরা এমন আযাবের যোগ্য যে,) যদি একটি কথা না হতো, যা আপনার পালনকর্তার পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে (অর্থাৎ তাদেরকে পরিপূর্ণ আযাব আখিরাতেই দেওয়া হবে), তাহলে যে বিষয়ে এরা মতবিরোধ করছে, তার সর্বশেষ মীমাংসা (দুনিয়াতেই) হয়ে যেত। আর এরা বিদ্বেষবশত শত শত মু'জিযা প্রকাশের পরও বিশেষত কোরআনের মু'জিযা দেখার এবং এর কোন উদাহরণ উপস্থাপনে অপারক হওয়া সত্ত্বেও) যে, এঁর প্রতি [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আমাদের ফরমায়েশী মু'জিযাগুলোর মধ্য থেকে] কোন মু'জিযা কেন অবতীর্ণ হলো না? তাহলে আপনি বলে দিন, (মু'জিযার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো রাসূলের সত্যতা প্রমাণ করা। তা তো বহু মু'জিযার মাধ্যমেই হয়ে গেছে। কাজেই এখন আর ফরমায়েশী মু'জিযার কোন প্রয়োজনই নেই। তবে এসব প্রকাশ হওয়া কিংবা না হওয়ার উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে, যার সম্পর্ক হলো গায়েবের সাথে। আর) গায়েবের ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ্রই রয়েছে (আমার নেই)। সুতরাং তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম (যে, তোমাদের আবদার পূরণ হয় কিনা)। ফরমায়েশী মু'জিযা প্রকাশ না করার তাৎপর্য কোরআনের একাধিক জায়গায় বলে দেয়া হয়েছে যে, এগুলো প্রকাশের পর আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম হলো এই যে, এরপরেও যদি ঈমান না আনে, তবে গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। বর্তমান এ উম্মতের জন্য এ ধরনের ব্যাপক ও সাধারণ আযাব আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রেত নয়; বরং একে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফির ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি—বর্ণ ও দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন ঃ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً। অর্থাৎ সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার সময়কাল কত দিন এবং কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আ)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। নূহ (আ)-এর যুগে এসেই কুফর ও শিরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আ)-কে এর মুকাবিলা করতে হয়। (তফসীরে মাযহারী)

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম থেকে নূহ (আ)-এর যুগ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ কাল। এ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তায় ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোরআন করীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক—উম্মতের ঐক্যের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সন্তানকে বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি; বরং 'উম্মতে ওয়াহিদাহ' তথা একই জাতি বলে অভিহিত করেছে।

অবশ্য যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শিরকী বিস্তার লাভ করে, তখন কাফির ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে ঃ فَاخْتَلَفُوْا। কোরআন করীমের هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ। আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট আদম সন্তানদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন জাতিসমূহ পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্রবর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মূর্খতার একটা নয়া নিদর্শন, যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখাপড়া জানা লোক এই ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পেছনে লেগে আছে। অথচ এরা হাজার রকমের দাঙ্গা বিশৃংখলায় জড়িয়ে রয়েছে। اَعَاذَ اللّٰهُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُ

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِىٓ اٰيَاتِنَا ط

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ط اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ

فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰىٓ اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ

وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا
اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ۗ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا
مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ
اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ
وَالْاَنْعَامُ ۗ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ
قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ
لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

(২১) আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর, যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলাকলা তৈরি করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তৈরি করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছল-চাতুরী (২২) তিনিই তোমাদেরকে ভ্রমণ করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং এতে তারা আনন্দিত হলো, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহ্কে তার ইবাদতে নিঃস্বার্থ হয়েঃ 'যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। (২৩) তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে।—পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও—অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে। (২৪) পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম,

পরে তা মিলিত-সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল, যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য-সুষমায় ভরে উঠল আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাতে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকার করে দিল যেন কালও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য, যারা লক্ষ্য করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আভিধানিক বিশ্লেষণ ঃ عَاصِفٌ তীব্র বায়ু। حَصِيْدٌ কর্তিত ফসল। كَأَنْ لَمْ تَغْنَ এটি غَنِيَ بِالْمَكَانِ থেকে গঠিত যার অর্থ হলো বসবাস করার কোন স্থান।

আর যখন আমি মানুষকে তাদের উপর কোন বিপদ পড়ার পর কোন নিয়ামতের স্বাদাস্বাদন করিয়ে দেই, তখন সাথে সাথেই আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে অনাচার করতে আরম্ভ করে। **(অর্থাৎ তার প্রতি পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করতে শুরু করে, তার প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাসাত্মক** আচরণ করতে থাকে এবং আপত্তি ও বিদ্বেষবশত অন্য মু'জিযার ফরমায়েশ করে এবং বিগত বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ আয়াত মু'জিযাসমূহের প্রতি পরাঙ্মুখতাই হলো তাদের আপত্তির আসল কারণ। বস্তুত এই পরাঙ্মুখতা সৃষ্টি হয় পার্থিব নিয়ামতসমূহে উন্মত্ত হয়ে পড়ার দরুন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে,) **আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ শীঘ্রই এই অনাচারের শাস্তি দেবেন। নিশ্চিতই আমার ফেরেশতাগণ** তোমাদের সমস্ত অনাচার লিখে রাখছে। (অতএব, আল্লাহ্র জ্ঞানে সংরক্ষিত থাকা ছাড়াও এগুলো দফতরে সংরক্ষিত রয়েছে।) **তিনি** (অর্থাৎ আল্লাহ্) **এমন যে, তোমাদেরকে ডাঙ্গায় ও নদীতে নিয়ে ফিরেন।** (অর্থাৎ যেসব যন্ত্র-উপকরণের মাধ্যমে তোমরা চলাফেরা কর, তা সবই আল্লাহ্র দেয়া) **এমন কি** (অনেক সময়) **তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ কর আর সে নৌকা অনুকূল হাওয়ার টানে লোকদেরকে নিয়ে যেতে থাকে এবং তারা সেগুলোর গতিতে আনন্দিত হতে থাকে** (এমনি অবস্থায় হঠাৎ) **সেগুলোর উপর** (প্রতিকূল) **বাতাসের** (প্রবল) **ঝাপটা এসে পড়ে এবং তাদের উপর চারদিক থেকে** (উত্তাল) **তরঙ্গ আসতে থাকে। আর তারা ধারণা করে যে,** (বড় কঠিনভাবে) **আটকে পড়েছি,** (তখন) **সবাই নির্ভেজাল বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ্কেই ডাকতে আরম্ভ করে,** (যে, হে আল্লাহ্) **আপনি যদি আমাদেরকে এ** (বিপদ) **থেকে উদ্ধার করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ন্যায়পন্থী** (অর্থাৎ একত্ববাদী) **হয়ে যাব।** (অর্থাৎ এই ক্ষণে আমাদের মনে তওহীদের যে বিশ্বাস হয়ে গেছে, তাতে স্থির থাকব। কিন্তু) **পরে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে** (এই ধ্বংসলীলা থেকে) **বাঁচিয়ে তোলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর** (বিভিন্ন এলাকার) **মাঝে অন্যায় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে।** (অর্থাৎ তেমনি পূর্ব শিরক ও পাপাচার শুরু করে দেয়।) **হে মানুষ,** (শুনে নাও), **তোমাদের এ ঔদ্ধত্য তোমাদেরই জন্য** (প্রাণের) **বিপদ হতে যাচ্ছে।** (সুতরাং) **পার্থিব জীবনে** (এতে সামান্যই) **লাভ করছ, তারপর তোমাদেরকে আমার নিকটই আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদেরকে**

বাতলে দেব (এবং সেগুলোর শাস্তি প্রদান করব।) বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, তারপর সে পানিতে যমীনের উদ্ভিদরাজি যা মানুষ ও জীবজন্তুরা ভক্ষণ করে, যথেষ্ট ঘন হয়ে উঠল। এমনকি যখন সে যমীনের তার পূর্ণ সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠল আর তার সৌন্দর্য চরমে পৌঁছে গেল (অর্থাৎ সবুজের সমারোহে সুদর্শন দেখাতে লাগল) আর সে যমীনের মালিকরা বুঝতে পারল যে, এবার আমরা এ যমীনের (উৎপন্ন ফসলের) উপর পূর্ণ দখল পেয়ে গেছি, তখন (এমতাবস্থায়) দিনে কিংবা রাতে তার উপর আমার তরফ থেকে কোন ধ্বংস (যেমন, তুষার, খরা বা অন্য কিছু) নেমে এল (এবং) তাতে আমি তাকে এমনিভাবে পরিষ্কার করে দিলাম যেন কালও (এখানে) তা মওজুদ ছিল না। (সুতরাং পার্থিব জীবনও এ উদ্ভিদেরই মত।) আমি এমনিভাবে আয়াতসমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকি এমন লোকদের (বোঝাবার) জন্য যারা চিন্তা করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا আরবী অভিধান অনুসারে مَكْرٌ বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দু (কিংবা বাংলা) পরিভাষায় দরুন ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দু (কিংবা বাংলায়) مكر বলা হয় ধোঁকা, প্রতারণা, ফেরেববাজি প্রভৃতি অর্থে, যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র।

اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ—অর্থাৎ তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়-বাৎসল্য ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (আখিরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। তেমনিভাবে) অন্যায়-অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।) অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার ওবাল (অশুভ পরিণতি) তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তা হলো জুলুম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ধোঁকা-প্রতারণা।—(আবুশ্-শায়খ ইবনে মারদুবিয়াহ্ কর্তৃক তাঁর তফসীরে বর্ণিত ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ
اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ

وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا

مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ

نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَكَفٰى بِاللّٰهِ

شَهِيْدًاۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ

تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا

كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ

السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ

الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۖۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾

(২৫) আর আল্লাহ্ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (২৬) যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশি। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হলো জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল। (২৭) আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ ও অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহ্র হাত থেকে। তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হলো দোযখবাসী। এরা এতেই থাকতে পারবে অনন্তকাল। (২৮) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব; আর যারা শিরক করত তাদেরকে বলব ঃ তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও—অতঃপর তাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব, তখন তাদের শরীকরা বলবে তোমরা তো আমাদের উপাসনা-বন্দেগী করনি। (২৯) বস্তুত আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা তোমাদের বন্দেগী

সম্পর্কে জানতাম না। (৩০) সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যা কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল এবং আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক আর তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে, যারা মিথ্যা বলত। (৩১) তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক ? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন ? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা ? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্। তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না ? (৩২) অতএব, এ আল্লাহ্ই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্ভ্রান্ত ঘোরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া—সুতরাং কোথায় ঘুরছে ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতি আহবান করেছেন এবং যাকে চান সরল পথে চলার তওফীক দান করেন। (যাতে অনন্ত আশ্রয়ে পৌঁছা সম্ভব হয়। অতঃপর শাস্তি ও প্রতিদানের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে–) যেসব লোক সৎকাজ করেছে (অর্থাৎ ঈমান এনেছে) তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (অর্থাৎ জান্নাত) এবং এর অতিরিক্ত (আল্লাহ্ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ)। আর না (দুঃখের) কালিমা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে, না অপমান। এরাই জান্নাতবাসী। এতে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা (কুফরী-শিরকী প্রভৃতি) অসৎ কর্ম করেছে তাদের অসৎ কর্মের শাস্তি পাবে সমান সমান—(অসৎ কর্মের বেশি নয়।) আর তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে অপমান। তাদেরকে আল্লাহ্র (আযাবের) হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। (তাদের চেহারার কালিমা এমন হবে যেন) তাদের চোহারার উপর আঁধার রাতের পরত পরত, (অর্থাৎ টুকরা) দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়েছে। এরা হলো দোযখের অধিবাসী। তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। এছাড়া সে দিনটিও স্মরণযোগ্য, সেদিন আমি এ সমুদয় (সৃষ্টিকে) কিয়ামতের মাঠে সমবেত করব। অতঃপর (সমস্ত সৃষ্টির মধ্য থেকে।) মুশরিকদের বলব যে, তোমরা এবং তোমাদের নির্ধারিত অংশীদাররা (যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদতে শরীক সাব্যস্ত করতে ক্ষণিক) নিজেদের জায়গায় দাঁড়াও (যাতে তোমাদেরকে তোমাদের বিশ্বাসের স্বরূপ জানিয়ে দেওয়া যায়)। তারপর আমি এ উপাসক ও উপাস্যদের মাঝে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করে দেব। তখন তাদের অংশীদাররা (তাদেরকে উদ্দেশ্য করে) বলবে, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে না (কারণ ইবাদতের উদ্দেশ্য হয় মা'বুদকে রাযী করা)। সুতরাং আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে আমরা জানতামই না (রাযী হওয়া তো দূরের কথা। অবশ্য এসব শয়তানদেরই তালীম ছিল এবং এরাই রাযী ছিল। এদিক দিয়ে তোমরা তাদেরই ইবাদত করতে)। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজেদের কৃতকর্মের যাচাই করে নেবে (যে, বাস্তবিকই তাদের সে কর্ম লাভজনক ছিল, না অলাভজনক। অতএব, মুশরিকদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে,

সুপারিশের ভরসায় আমরা যাদের ইবাদত-উপাসনা করতাম, তারাই তো আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে দিল—লাভের আর কি আশা করব!) বস্তুত এরা আল্লাহ্‌র (আযাবের) দিকে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক— প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যাদেরকে এরা উপাস্য গড়ে রেখেছিল সেসব তাদের থেকে সরে পড়বে (এবং হারিয়ে যাবে। কেউই কোন কাজে আসবে না)। আপনি (এসব মুশরিক-অংশীবাদীদের) জিজ্ঞেস করুন, (বল দেখি,) তিনি কে যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক পৌঁছে দেন (অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন যাতে তোমাদের রিযিক তৈরি হয়)? অথবা (বল দেখি,) তিনি কে যিনি (তোমাদের) কান ও চোখের উপর পরিপূর্ণ অধিকার রাখেন? অর্থাৎ কে তা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোকে রক্ষাও করেন আর ইচ্ছা করলে সেগুলোকে অকেজো করে দেন? আর তিনিই বা কে যিনি জীবন্ত (বস্তু)-কে নির্জীব (বস্তু) থেকে বের করে আনেন এবং নির্জীব (বস্তু)-কে জীবন্ত (বস্তু) থেকে বের করেন (যেমন, বীর্য ও ডিম্ব যা জীবন্তের ভেতর থেকে বের হয় এবং তা থেকে জীবের জন্ম হয়)? আর তিনিই বা কে যিনি যাবতীয় কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন? (তাদেরকে এসব প্রশ্ন করুন—) নিশ্চয়ই এরা (উত্তরে) বলবে যে, (এ সমুদয় কর্মের কর্তা হচ্ছেন) আল্লাহ। তখন তাদেরকে বলুন, তাহলে কেন (শরীকদেরকে) বর্জন করছ না? বস্তুত (যার এসব কর্মবৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো) তিনিই হলেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। (আর যখন এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল,) তখন সত্য (বিষয়) প্রতিষ্ঠার পর (এর বাইরে) গোমরাহী ছাড়া আর কি রইল? (অর্থাৎ যাই কিছু সত্য বিষয়ের বিপরীত হবে, তাই হবে পথভ্রষ্টতা। আর তওহীদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাই এখন শিরক নিঃসন্দেহে গোমরাহী।) অতঃপর (সত্যকে ছেড়ে) কোথায় (মিথ্যার দিকে) ফিরে যাচ্ছ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত আয়াতে পার্থিব জীবন এবং তার ক্ষণস্থায়িত্বের উদাহরণ এমন আবাদের দ্বারা দেওয়া হয়েছিল যা আকাশ থেকে বর্ষিত পানিতে সঞ্চিত হয়ে লকলক করতে থাকে, আর ফুলে-ফলে ভরে উঠে এবং তা থেকে কৃষাণ আনন্দিত হতে থাকে যে, এবার আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনাদি এর দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের কৃতঘ্নতার দরুন রাতে কিংবা দিনে আমার আযাবের কোন দুর্ঘটনা এসে উপস্থিত হয় যা সেগুলোকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়, যেন এখানে কোন বস্তুর অস্তিত্বই ছিল না। এ তো হলো পার্থিব জীবনের অবস্থা। এর পরবর্তী আয়াতে তার বিপরীতে পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহবান করেন। অর্থাৎ এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ জানান যাতে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোন রকম দুঃখ-কষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয় আর নাইবা আছে ধ্বংস।

'দারুসসালাম'-এর মর্মার্থ হলো জান্নাত। একে 'দারুসসালাম' বলার এক কারণ হলো এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করবে। দ্বিতীয়ত কোন কোন

রিওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতের নাম দারুসসালাম এ জন্য রাখা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌঁছতে থাকবে। বরং সালাম শব্দই হবে জান্নাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দেবেন। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাআয (র) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে নসীহত হিসাবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ হে আদম সন্তানগণ, তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দারুসসালামের দিকে আহবান করেছেন, তোমরা এ আল্লাহ্র আহবানে কবে এবং কোথা থেকে সাড়া দেবে? ভাল করে জেনে রাখ, এ আহবান গ্রহণ করার জন্য যদি তোমরা পৃথিবী থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলে সফলকাম হবে এবং তোমরা দারুসসালামে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পার্থিব এ বয়স নষ্ট করার পর মনে কর যে, কবরে পৌঁছে এই আহবানের প্রতি চলতে আরম্ভ করব, তাহলে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। তখন সেখান থেকে আর এক ধাপও আগাতে পারবে না। কারণ তা কর্মস্থল নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, 'দারুসসালাম' হলো জান্নাতের সাতটি নামের একটি। (তফসীরে কুরতুবী)

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়াতে কোন ঘরের নাম 'দারুসসালাম' রাখা সমীচীন নয়। যেমন, জান্নাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা জায়েয নয়।

অতঃপর উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌঁছে দেন।

এর মর্মার্থ হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দারুসসালামের দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হিদায়েতও ব্যাপক। কিন্তু হিদায়েতের বিশেষ প্রকার সরল-সোজা পথে তুলে দেওয়া এবং তাতে চলার তওফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে।

উল্লিখিত দু'টি আয়াতে পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবনের তুলনা এবং পৃথিবীবাসী ও পরলোকবাসীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছিল। পরবর্তী চার আয়াতে এতদুভয় শ্রেণীর লোকদের প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে জান্নাতবাসীদের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, যারা সৎপথ অবলম্বন করেছে, অর্থাৎ সবচেয়ে বৃহত্তর সৎকর্ম ঈমান এবং পরে সৎকর্মে সুদৃঢ় রয়েছে তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময়ে শুভ ও উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। আর শুধু বিনিময় দানই নয় তার চেয়েও কিছু বেশি দেওয়া হবে।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তা হলো এই যে, এ ক্ষেত্রে ভাল বদলা বা বিনিময় বলতে অর্থ হলো জান্নাত। আর زِيَادَةٌ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ যা জান্নাতবাসীরা প্রাপ্ত হবে। [হযরত আনাস (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে কুরতুবী]

জান্নাতের এটুকু তাৎপর্য সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানই অবগত যে, তা এমন আরাম-আয়েশ ও নিয়ামতের কেন্দ্র যার ধারণা-কল্পনাও মানুষ জীবনে করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ হলো সে সমুদয় নিয়ামত অপেক্ষা মূল্যবান।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত সুহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (সা) বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে সারবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমাদের কি আরো কোন কিছুর প্রয়োজন রয়েছে? যদি (কারো) থাকে, তবে বল, আমি তা পূরণ করে দেব। এতে জান্নাতবাসিগণ জওয়াব দেবে যে, আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, জাহান্নাম থেকে নাজাত বা অব্যাহতি দান করেছেন, এর চেয়ে বেশি আর এমন কি প্রার্থনা করব? তখন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যবর্তী পর্দা তুলে দেওয়া হবে এবং সমস্ত জান্নাতবাসী আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে। এতে বোঝা গেল যে, বেহেশতের যাবতীয় নিয়ামত অপেক্ষা বড় ও উত্তম নিয়ামত ছিল এটাই, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন আবেদন-নিবেদন ব্যতীত দান করেছেন। মাওলানা রুমীর ভাষায় ঃ

ما نبوديم وتقاضۂ ما نبود
لطف تو نا گفتۂ ما می شنود

আমরাও থাকব না এবং আমাদের কোন চাহিদাও থাকবে না, (বরং) তোমার অনুগ্রহই আমাদের অব্যক্ত নিবেদন শুনবে।

অতঃপর জান্নাতবাসীদের এ অবস্থা বিবৃত করা হয়েছে যে, তাদের মুখমণ্ডলে কখনো মলিনতা কিংবা দুঃখ-বেদনার প্রতিক্রিয়া অথবা অপমানের ছাপ পড়বে না, যেমনটি দুনিয়ার বুকে কোন না কোন সময় সবারই হয়ে থাকে এবং আখিরাতে জান্নাতবাসীদের হবে।

এর বিপরীতে জান্নাতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যেসব লোক অসৎ কর্ম করেছে তাদেরকে সে অসৎ কর্মের বদলা সমানভাবে দেওয়া হবে তাতে কোন রকম বৃদ্ধি হবে না। তাদের চেহারায় কলঙ্ক-লাঞ্ছনা ছেয়ে থাকবে। কেউই তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের চেহারার মলিনতা এমন হবে যেন রাতের আঁধার ভাঁজে ভাঁজে তাতে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর পরবর্তী দুই আয়াতে একটি সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা জান্নাতবাসী এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টকারী মূর্তি-বিগ্রহ কিংবা শয়তানের মাঝে হাশরের ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। ইরশাদ হয়েছে, "সেদিন আমি সবাইকে একত্র সমবেত করে দেব এবং অংশীবাদীদেরকে বলব, তোমরা এবং তোমাদের নির্বাচিত উপাস্যরা একটু নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াও, যাতে তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের তাৎপর্য জেনে নিতে পার। অতঃপর তাদের এবং তাদের উপাস্যদের মাঝে পৃথিবীতে যে ঐক্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তা ছিন্ন করে দেওয়া হবে, যার ফলে তাদের (উপাস্য) মূর্তি-বিগ্রহগুলো নিজেই বলে উঠবে, তোমরা আমাদের উপাসনা করতেই না। এরা আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে বলবে, তোমাদের শিরকী উপাসনার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না। কারণ আমাদের মধ্যে না ছিল কোন চেতনা স্পন্দন, না ছিল আমাদের কোন বিষয় বুঝবার বুদ্ধি-বিবেচনা।

ষষ্ঠ আয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয় শ্রেণীর একটা যৌথ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে অর্থাৎ হাশরের ময়দানে প্রতিটি লোক নিজ নিজ কৃতকর্ম যাচাই করে নেবে যে, তা লাভজনক ছিল, কি ক্ষতিকর। সবাইকে সত্য-সঠিক মা'বুদের দরবারে হাযির করে দেওয়া হবে এবং যেসব ভরসা ও আশ্রয় পৃথিবীতে মানুষ খুঁজে বেড়াত, তা সবই শেষ করে দেওয়া হবে। মুশরিক তথা অংশীবাদীরা যেসব মূর্তি-বিগ্রহকে নিজেদের সহায় ও সুপারিশকারী বলে মনে করত, সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সপ্তম আয়াতে কোরআন হাকীম স্বীয় অভিভাবকসুলভ পন্থায় মুশরিকদের চৈতন্যোদয় করার লক্ষ্যে তাদের প্রতি কিছু প্রশ্ন রেখেছেন। মহানবী (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—আপনি তাদেরকে বলুন যে, আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে কে রিযিক সরবরাহ করে? কিংবা কান ও চোখের সে মালিক কে, যিনি যখন ইচ্ছা করেন, তাতে শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি সৃষ্টি করে দেন, আর যখন ইচ্ছা করেন তা ফিরিয়ে নেন? এবং কে তিনি, যিনি মৃত বস্তু থেকে জীবিতকে সৃষ্টি করেন? যেমন, মাটি থেকে ঘাস, বৃক্ষ, কিংবা বীর্য থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু অথবা ডিম থেকে পাখি প্রভৃতি। আর কেই বা জীবিত থেকে মৃত বস্তু সৃষ্টি করেন, যেমন মানুষ ও জীব-জন্তু থেকে নিষ্প্রাণ বীর্য? আর কে আছেন যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের যাবতীয় কার্যাদির ব্যবস্থাপনা করেন?

অতঃপর বলে দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যখন মানুষকে এ প্রশ্ন করবেন, তখন সবাই একথাই বলবে যে, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তাই এক আল্লাহ্! তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন, তাহলে তোমরা কেন আল্লাহ্কে ভয় করছ না? যখন এ সমুদয় বস্তু সামগ্রীর সৃষ্টিকর্তা, এগুলোর রক্ষাকারী এবং এগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থাকারী শুধুমাত্র আল্লাহ্, তখন ইবাদত-উপাসনা পাবার অধিকারী তাঁকে ছাড়া অন্যকে কেন সাব্যস্ত কর?

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে : فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ অর্থাৎ ইনিই হলেন সেই মহান সত্তা, যাঁর গুণ-পরাকাষ্ঠার বিবরণ এইমাত্র বর্ণিত হলো, তারপরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন সে নিশ্চিত সত্যকে পরিহার করে অন্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নির্বুদ্ধিতার কাজ।

এ আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাসায়েলসমূহের মধ্যে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, আয়াতে مَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে কোন সংযোগ নেই। যা সত্য ও ন্যায় হবে না, তাই মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন কোন কাজ থাকতে পারে না, যা না হবে সত্য, না হবে পথভ্রষ্টতা আবার এমনও হতে পারে না যে, দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুই সত্য হবে। আকায়িদের সমস্ত নীতিশাস্ত্রে একথা সর্বজন স্বীকৃত। অবশ্য আনুষঙ্গিক মাস'আলা-মাসায়েল ও ফিকাহ্-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষীর মতে ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সত্য ও সঠিক বলা হবে। আর অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইজতিহাদী মাস'আলা-মাসায়েলের ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ্ বলা যাবে না।

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৩) এমনিভাবে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে তোমার পরওয়ারদিগারের বাণী সেসব নাফরমানের ব্যাপারে যে, এরা ঈমান আনবে না। (৩৪) বল, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মাঝে যে সৃষ্টিকে পয়দা করতে পারে এবং আবার জীবিত করতে পারে ? বল, আল্লাহ্ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং অতঃপর তার পুনরুদ্ভব করবেন। অতএব, কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ? (৩৫) জিজ্ঞেস কর, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মধ্যে যে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? বল, আল্লাহ্ই সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং এমন যে লোক সঠিক পথ দেখাবে তার কথা মান্য করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখানো কর্তব্য। অতএব, তোমাদের কি হলো, কেমন তোমাদের বিচার? (৩৬) বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আভিধানিক বিশ্লেষণ ঃ لَا يَهِدِّيْ এ বাক্যটি আসলে ছিল لَا يَهْتَدِيْ এতে তা'লীল বা সন্ধি-বিচ্ছেদ করে لَا يَهِدِّيْ করা হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে لَا يَهْتَدِيْ এর অর্থই প্রকাশ করে। অর্থাৎ সে লোক যে হিদায়েতপ্রাপ্ত হয় না।

[পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে। কেননা তিনি তাদের ভ্রান্ত মতবাদের দরুন দুঃখিত হতেন। ইরশাদ হচ্ছে-এরা যেমন ঈমান আনছে না] এমনিভাবে আপনার পরওয়ারদিগারের (শাশ্বত) কথা—সমস্ত উদ্ধত লোকের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, 'এরা ঈমান আনবে না'। (তাহলে কেন আপনি দুঃখিত হবেন।) আপনি (তাদেরকে) এভাবে (-ও) বলুন, তোমাদের (প্রস্তাবিত) শরীকদের মধ্যে (তা সেটি সচেতনই হোক-যেমন, শয়তান

কিংবা অচেতনই হোক–যেমন, মূর্তি-বিগ্রহ) এমন কেউ আছে কি প্রথমবার (সৃষ্টিকে) উদ্ভব করবে (এবং) পরে (কিয়ামতের সময়) আবারও তৈরি করবে ? (এতে শরীকদের অপমানবোধ করে যদি এরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধা করে তবে) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ প্রথমবারও সৃষ্টি করেন (এবং) আবার দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করবেন। সুতরাং এর (অর্থাৎ একথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার) পরেও তোমরা (সত্যবিমুখ হয়ে) কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ ? (আর) আপনি (তাদেরকে এ কথাও) বলুন যে, তোমাদের (প্রস্তাবিত) সচেতন শরীকদের মধ্যে (যেমন শয়তান) এমন কেউ আছে কি যে সত্য ও ন্যায়ের পথ বাতলে দেয় ? আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ (মানুষকে) সত্য ও ন্যায়ের পথ (-ও) বাতলে দেন। (বস্তুত তিনি বিবেক দিয়েছেন, নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। পক্ষান্তরে শয়তান একে তো এসব বিষয়ে সক্ষমই নয়, আর শুধু মন্ত্রণাদানের যে ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে সে তা গোমরাহী ও বিভ্রান্তিকরণের কাজেই ব্যয় করে।) কাজেই আবার (তাদেরকে) বলুন যে, আচ্ছা যে সত্য সঠিক পথ দেখায় সে বেশি অনুসরণযোগ্য, না সে লোক (বেশি যোগ্য) যে বাতলানো ছাড়া নিজেই পথ পায় না–(তদুপরি পথ বাতলানোর পরেও তাতে চলে না–যেমন,) শয়তান ? বস্তুত যখন এগুলো অনুসরণযোগ্যই সাব্যস্ত হলো না, তখন উপাসনার যোগ্য কেমন করে হতে পারে ? সুতরাং (হে মুশরিক সম্প্রদায়, তোমাদের কি হলো) কি সব প্রস্তাব তোমরা উত্থাপন কর ? (হাস্যকর বিষয় এই যে, নিজেদের এসব প্রস্তাব বিশ্বাসের পক্ষে এদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণও নেই–) তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক শুধু ভিত্তিহীন কল্পনার উপর চলছে। (অথচ) নিশ্চিতভাবেই ভিত্তিহীন ধারণা-কল্পনা সত্য বিষয়ের (প্রতিষ্ঠার) ব্যাপারে এতটুকুও ফলপ্রসূ নয়। (যাহোক,) এরা যা কিছু করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সমস্ত বিষয়ে অবগত। (যথাসময়ে এর শাস্তি দেবেন।)

وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿৩৭﴾
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم
مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿৩৮﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ
وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿৩৯﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا
يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿৪০﴾

(৩৭) আর কোরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই—তোমার বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে। (৩৮) মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ্ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (৩৯) কিন্তু কথা হলো এই যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে যাকে বুঝতে তারা অক্ষম। অথচ এখনো এর বিশ্লেষণ আসেনি। এমনিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা। অতএব, লক্ষ্য করে দেখ, কেমন হয়েছে পরিণতি! (৪০) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না। বস্তুত তোমার পরওয়ারদিগার যথার্থই জানেন দুরাচারদেরকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর এ কোরআন মানুষের উদ্ভাবিত বস্তু নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা রচিত হয়ে থাকবে, বরং এটি তো সে গ্রন্থাবলীর সত্যায়নকারী যা ইতিপূর্বে (অবতীর্ণ) হয়ে গেছে। (আর এটি) প্রয়োজনীয় (আল্লাহ্‌র) নির্দেশাবলীর বিশ্লেষক। এতে সন্দেহ (সংশয়) যুক্ত কোন কথা নেই (এবং) এটি আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ। সুতরাং এর মান উদ্ভাবিত না হওয়া সত্ত্বেও)। এরা কি একথা বলে যে, (নাউযুবিল্লাহ্ আপনি এটি উদ্ভাবন করে নিয়েছেন? আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, (আচ্ছা তাই যদি হয়) তাহলে তোমরাও (তো আরববাসী এবং চারুবাক, বাগ্মীও বটে,) এর মত একমাত্র সূরাই (তৈরি করে) নিয়ে এসো না! আর (একা না পারলে) আল্লাহ্‌কে ছাড়া যাদের যাদের ডেকে নিতে পার সাহায্যের জন্য ডেকে নাও না—যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (নাউযুবিল্লাহ্, আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তাহলে তোমরাও রচনা করে আন! কিন্তু মুশকিল তো হলো এই যে, এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণে ফায়দা তাদেরই হয়, যারা বুঝতে চায়। অথচ তারা যে কখনো বুঝতেই চায়নি।) বরং (এরা) এমন বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করতে আরম্ভ করেছে যাকে ((অর্থাৎ যার ভুল-শুদ্ধের বিষয়টিকে) নিজেদের জ্ঞান-বেষ্টনীতেই আনেনি (এবং তার অবস্থা উপলব্ধি করার ইচ্ছাও করেনি। তাহলে এমন লোকদের থেকে বোঝার কি আশা করা যেতে পারে?) বস্তুত (তাদের এই নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতার কারণ এই যে,) এখনো এরা (কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ)-এর শেষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়নি। (অর্থাৎ আযাব আসেনি। অন্যথায় সমস্ত নেশা উবে যেত এবং চোখ খুলে যেত। সত্য ও মিথ্যা চিহ্নিত হয়ে যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত) একদিন তা (সে পরিণতি) উপস্থিত হবেই। (অবশ্য তখনকার ঈমান লাভজনক হবে না। সুতরাং) যেসব (কাফির) লোক এদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে (এবং যেভাবে এরা বিনা যাচাইয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে) তেমনিভাবে তারাও (সত্য ও ন্যায়কে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অতএব দেখুন, সে জালিমদের পরিণতি কেমন (মন্দ) হয়েছে! (এমনি হবে এদেরও) আর (আমি যে মন্দ পরিণতির কথা বলছি এতে সবাই উদ্দেশ্য নয়। কারণ) তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যারা (কোরআন)-এর

উপর ঈমান নিয়ে আসবে। আবার এমনও কেউ কেউ রয়েছে যারা এর উপর ঈমান আনবে না। বস্তুত আপনার পরওয়ারদিগার (এসব) দুরাচারদের ভাল করেই জানেন (যারা ঈমান আনবে না। অতএব, প্রতিশ্রুত সময়ে বিশেষ করে তাদেরকেই শাস্তি দিবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ এখানে-تَأْوِيلُ-এর মর্মার্থ হলো প্রতিফল ও শেষ পরিণতি । অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফলতি ও নির্লিপ্ততার দরুন কোরআন সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং নিজেদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাঁস হয়ে যাবে।

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

(৪১) আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বল, আমার জন্য আমার কর্ম, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমার দায়দায়িত্ব নেই তোমরা যা কর সেজন্য। (৪২) তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি; তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে। (৪৩) আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে; তুমি অন্ধদেরকে কি পথ দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে। (৪৪) আল্লাহ্ জুলুম করেন না মানুষের উপর, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি (এ সমস্ত দলীল-প্রমাণের পরেও) আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে, তবে (শেষ কথা) এই বলে দিন যে, আমার কৃতকর্ম আমি পাব, আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমরা পাবে। তোমরা আমার কর্মের জন্য দায়ী নও, আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। যে মতে থাকতে চাও থাক, নিজেই বুঝতে পারবে। (আর আপনি তাদের ঈমানের আশাও বর্জন করুন।) তাদের মধ্যে (অবশ্য) কিছু কিছু লোক এমন(ও) রয়েছে, যারা (বাহ্যত) আপনার প্রতি কান লাগিয়ে বসে থাকে (কিন্তু মনে ঈমানের ইচ্ছা এবং সত্যান্বেষা নেই। কাজেই এদিক

দিয়ে তাদের শোনা, না শোনা দু-ই সমান। তাদের অবস্থা হলো বধিরদেরই মত।) সুতরাং আপনি কি বধিরদেরকে শুনিয়ে (তাদের পক্ষে এটা মান্য করার অপেক্ষায়) থাকেন তাদের মধ্যে বুদ্ধিজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও। (অবশ্য যদি বুদ্ধিজ্ঞান থাকত, তবে এ বধিরতা সত্ত্বেও কিছুটা কাজ হতো।) আর (এমনিভাবে) তাদের কেউ কেউ এমনও রয়েছে যে, (বাহ্যত) আপনাকে (যাবতীয় মু'জিযাও পরিপূর্ণতাসহ) দেখেছে, (কিন্তু সত্যান্বেষা না থাকার দরুন তাদের অবস্থা অন্ধদেরই মত। তাহলে) আপনি কি অন্ধদেরকে পথ দেখাতে চান, অথচ তাদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিও নেই ? (হ্যাঁ, যদি তাদের অন্তর্দৃষ্টি থাকত, তবে এ অন্ধ অবস্থায়ও কিছুটা কাজ চলতে পারত। বস্তুত তাদের বুদ্ধিজ্ঞান যখন এমনিভাবে বিলুপ্ত নিঃশেষিত হয়ে গেছে, তখন) একথা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ মানুষের উপর জুলুম করেন না। (যে, তাদেরকে হিদায়েত তথা পথপ্রাপ্তির যোগ্যতা না দিয়েও জওয়াবদিহি করতে আরম্ভ করবেন) বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের (প্রদত্ত যোগ্যতাকে বিনষ্ট করে দিয়ে এবং তার দ্বারা কোন কাজ না নিয়ে) ধ্বংস করে দেয়।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ط
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ
بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلٰى
مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ج فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾
قُلْ لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ط إِذَا جَآءَ
أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ
أَتٰىكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا
وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهِ ط آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ
ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ج هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾
وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ط قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ لَحَقٌّ ج وَمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ أَنَّ

لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا
الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾
هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٦﴾

(৪৫) আর যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদণ্ড। একজন অপরজনকে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতকে এবং সরলপথে আসেনি। (৪৬) আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সে ওয়াদাসমূহের মধ্য থেকে কোন কিছু যা আমি তাদের সাথে করেছি, অথবা তোমাকে মৃত্যুদান করি, যাইহোক, আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ্ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে। (৪৭) আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রাসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল ন্যায়দণ্ডসহ উপস্থিত হলো, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না। (৪৮) তারা আরো বলে, এ ওয়াদা কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (৪৯) তুমি বল, আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি ওয়াদা রয়েছে, যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে, তখন না একদণ্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে ফসকাতে পারবে। (৫০) তুমি বল, আচ্ছা দেখ তো দেখি, যদি তোমাদের উপর তাঁর আযাব রাতারাতি অথবা দিনের বেলায় এসে পৌঁছে যায়, তবে এর আগে পাপীরা কি করবে? (৫১) তাহলে কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার করলে? অথচ তোমরা এরই তাকাদা করতে? অতঃপর বলা হবে গোনাহ্‌গারদেরকে, ভোগ করতে থাক অনন্ত আযাব–তোমরা যা কিছু করতে তার তাই প্রতিফল। (৫৩) আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে এটা কি সত্য? বলে দাও, অবশ্যই আমার পরওয়ারদিগারের কসম এটা সত্য। আর তোমরা পরিশ্রান্ত করে দিতে পারবে না। (৫৪) বস্তুত যদি প্রত্যেক গোনাহ্‌গারের কাছে এত পরিমাণ থাকে যা আছে সমগ্র যমীনের মাঝে, আর অবশ্যই যদি সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুত তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর জুলুম হবে না। (৫৫) শুনে রাখ; যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্‌র। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে অনেকেই জানে না। (৫৬) তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদেরকে সে দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে এমনভাবে সমবেত করবেন, (যাতে তারা মনে করবে) যেন তারা (দুনিয়া ও বরযখ তথা মৃত্যুর পর থেকে হাশর পর্যন্ত সময়ে) গোটা দিনের (মাত্র) এক-আধ দণ্ড অবস্থান করেছিল। (কারণ সে দিনটি যেমন হবে দীর্ঘ, তেমনি হবে কঠিন। তাই দুনিয়া ও বরযখের সময়ে সব কষ্ট ভুলে গিয়ে এমন মনে করবে যে, সে সময়টি অতি দ্রুত কেটে গেছে)। আর পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে চিনতে পারবে (কিন্তু একজন অন্যজনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না। এতে তাদের মনে দুঃখ হবে। কারণ পরিচিত লোকের প্রতি একটা উপকারের সহজাত আশা থাকে) বাস্তবিকই (সে সময়) সেসব লোক (কঠিন) ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যারা আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং তারা (পৃথিবীতেও) হিদায়েতপ্রাপ্ত ছিল না। (সে কারণেই আজ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যাহোক,) এটিই তাদের প্রকৃত শাস্তির দিন। (তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন।) আর (পৃথিবীতে তাদের উপর আযাব পতিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে কথা হলো এই যে,) তাদের প্রতি আমি যে (আযাবের) ওয়াদা করছিলাম, তারা তার মধ্য থেকে সামান্য কিছু (আযাব) যদি আমি আপনাকে দেখিয়ে দেই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায়ই যদি তা তাদের উপর নেমে আসে) কিংবা (তা নেমে আসার পূর্বেই যদি) আমি আপনাকে মৃত্যুদান করি। (পরে তা আসুক বা না আসুক) তবে (দুটিরই সম্ভাবনা রয়েছে। কোন একটা দিকই নির্ধারিত নয়–কিন্তু যেকোন অবস্থায়) আমার কাছে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর (একথা সর্বজনবিদিত যে,) আল্লাহ্ তাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। (সুতরাং তাদেরকে শাস্তি দেবেন। সারকথা, দুনিয়াতে শাস্তি হোক বা না হোক, কিন্তু আসল সময়ে তা অবশ্য হবে।) আর (এই যে শাস্তি তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে তা সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের পূর্ণতা ও আপত্তি খণ্ডনের পরেই হয়েছে। তাছাড়া তাদেরই কি বৈশিষ্ট্য; বরং সর্বদাই আমার রীতি এই রয়েছে যে, যে সমস্ত উম্মতকে আমি জবাবদিহির যোগ্য সাব্যস্ত করেছি তাদের মধ্য থেকে) প্রতি উম্মতের জন্য একজন বার্তাবাহক হয়েছেন। বস্তুত যখন তাদের সে রাসূল (তাদের নিকট) এসে যান (এবং নির্দেশাবলী পৌঁছে দেন, তারপরে) তাদের ফয়সালা ইনসাফের সাথেই করা হয়। (আর সে ফয়সালা এই যে, অমান্যকারীদেরকে অনন্ত আযাবের সম্মুখীন করে দেওয়া হয়)। বস্তুত এদের প্রতি (সামান্যও) জুলুম করা হয় না। (কারণ পরিপূর্ণ যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যাবার পর শাস্তি দান ইনসাফের পরিপন্থী নয়।) আর এসব লোক (আযাবসংক্রান্ত ভীতির কথা শুনে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে) বলে যে, (হে নবী, এবং হে মুসলমানগণ, আযাবের) এ ওয়াদা কবে (বাস্তবায়িত) হবে? যদি তোমরা সত্যবাদীই হয়ে থাক তাহলে বাস্তবায়িত করে দিচ্ছ না কেন? আপনি (সবার পক্ষ থেকে উত্তরে) বলে দিন যে, আমি (নিজেই) নিজের জন্য কোন ফায়দা (লাভ) করার কিংবা কোন ক্ষতি (সাধন) করার অধিকার রাখি না, তবে যতটা (অধিকার) আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (সেটুকু অধিকার অবশ্য সংরক্ষণ করি। সুতরাং আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরই যখন মালিক নই, তখন অন্যের লাভ-ক্ষতির মালিক হব কেমন করে! যাহোক, আযাব সংঘটন

আমার অধিকারে নেই। তবে তা কবে সংঘটিত হবে—সে ব্যাপারে কথা হলো এই যে, এর জন্য) একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে (তা দুনিয়াতেই হোক কিংবা আখিরাতে।) যখন সে নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন এক মুহূর্ত পিছাতেও পারবে না, এক মুহূর্ত আগাতেও পারবে না (বরং সঙ্গে সঙ্গে আযাব সংঘটিত হয়ে যাবে। তেমনিভাবে তোমাদের আযাবেরও সময় নির্দিষ্ট আছে, তখনই তা সংঘটিত হবে। আর তারা যে আবদার করে যে, যা কিছু হবার শীঘ্রই হয়ে যাক। যেমন مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ এবং رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا আয়াতে তাদের এ তাড়াহুড়ার কথা বলা হয়েছে। তাহলে) আপনি (এ ব্যাপার তাদেরকে) বলে দিন যে, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার আযাব রাতে কিংবা দিনে এসে উপস্থিত হয়ই, তবে (একথা বল দেখি) এ আযাবে (এমন) কোন্ বিষয়টি রয়েছে, যার দরুন অপরাধী লোকগুলো তা যথাশীঘ্র কামনা করছে? (অর্থাৎ আযাব তো হলো কঠিন বিষয় এবং তা থেকে পরিত্রাণ কামনার বস্তু; যথাশীঘ্র কামনা করার জিনিস নয়। যেহেতু এ তাড়াহুড়ার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, সেহেতু বলা হচ্ছে যে, এখন তো একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ যা কিনা বিশ্বাসের ফলপ্রসূ হওয়ার সময়, কিন্তু) পরে যখন সেই (প্রকৃত ও প্রতিশ্রুত বিষয়) এসেই যাবে তাহলে কি (সেসময়) এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে (যখন সে বিশ্বাস ফলপ্রসূ হবে না এবং বলা হবে) হ্যাঁ এখন মানলে; অথচ (পূর্ব থেকে) তোমরা (মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসে) তার জন্য তাড়াহুড়া করছিলে? কাজেই জালিম (তথা মুশরিকদের) বলা হবে যে, চিরকালীন আযাবের মজা দেখ। তোমরা তোমাদেরই কৃতকর্মের বিনিময় পেয়েছ। তখন তারা (অবাক বিস্ময় ও অস্বীকৃতিবশত) আপনার কাছে জানতে চায় যে, এ আযাব কি কোন বাস্তব বিষয়? আপনি বলে দিন, হ্যাঁ। আমার পালনকর্তার কসম, তা একান্তই বাস্তব বিষয়। বস্তুত তোমরা কোনক্রমেই আল্লাহ্কে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করতে পারবে না (যে, তিনি আযাব দিতে চাইবেন অথচ তোমরা বেঁচে যাবে—তা হবে না।) আর এ আযাবের ভয়াবহতা হবে এমন যে, যদি এক একজন মুশরিকের কাছে এত পরিমাণ (অর্থ সম্পদ) থাকে যাতে সারা পৃথিবী ভরে যেতে পারে, তবুও তার বিনিময়ে তারা নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চাইবে। (অবশ্য তখন কোন ধনভাণ্ডার থাকবেও না, আর তা গ্রহণও করা হবে না, কিন্তু ভয়াবহতা এমন হবে যে, অর্থ-সম্পদ থাকলে তার সবই দিয়ে দিতে সম্মত হয়ে যেত।) আর যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন (অধিকতর অপমান-অপদস্থতার ভয়ে) লজ্জাকে (নিজের মনে মনেই) লুকিয়ে রাখবে। (অর্থাৎ কথা ও কাজে তার প্রকাশ ঘটতে দেবে না, যাতে করে দর্শকরা আরো বেশি উপহাস না করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আযাবের কঠোরতার সামনে সহ্য করা কিংবা চেপে রাখাও সম্ভব হবে না।) বস্তুত তাদের বিচার ন্যায়ভিত্তিকই হবে এবং তাদের উপর (সামান্যতমও) জুলুম হবে না। মনে রেখো, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু বিদ্যমান সমস্তই আল্লাহ্র স্বত্ব। (এতে যেভাবে ইচ্ছা তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এতে এসব অপরাধীও অন্তর্ভুক্ত—তাদের বিচারও উল্লিখিত পদ্ধতিতে করতে পারেন।) মনে রেখো, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। (সুতরাং কিয়ামত অবশ্যই আসবে) কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। তিনিই প্রাণ দান করেন, তিনি প্রাণ সংহার করেন। (অতএব, তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি

করা কি এমন কঠিন ব্যাপার?) আর তোমরা সবাই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে (এবং হিসাব-নিকাশের পর সওয়াব বা আযাব প্রদত্ত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ কিয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

ইমাম বগভী (র) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পরিচয় হবে প্রথমদিকে। পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী সামনে চলে আসলে পর এসব পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু ভয় সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না।—মাযহারী)

اَثُمَّ اِذَا مَاوَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ اٰلْئٰنَ অর্থাৎ তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আযাব পতিত হয়ে যাবে? তা মৃত্যুর সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে বলা হবে اٰلْئٰنَ কি এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে? যেমন, জলমগ্ন হবার সময়ে ফিরাউন যখন বলল ঃ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ (অর্থাৎ আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোন উপাস্য নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাইলরা।) উত্তরে বলা হয়েছিল اٰلْئٰنَ (অর্থাৎ এতক্ষণে ঈমান আনলে?) বস্তুত তার ঈমান কবূল করা হয়নি। এক হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা কবূল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুকালীন গরগরা বা ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আযাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তওবা কবূল হতে পারে। কিন্তু আযাব এসে যাবার পর আর তওবা কবূল হয় না। সূরার শেষাংশে ইউনুস (আ)-এর কওমের যে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছিল, তা এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল, কারণ তারা দূরে থেকে আযাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে-কেটে তওবা করে নিয়েছিল। তাই আযাব সরে যায়। যদি আযাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবূল হতো না।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ
وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ
فَلْيَفْرَحُوْا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ
فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۗ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٩﴾

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ
شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا
اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاۗءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾

(৫৭) হে মানবকূল, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। (৫৮) বল, আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ। (৫৯) বল, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল, তোমাদেরকে কি আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করছ? (৬০) আর আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কিয়ামত সম্পর্কে? আল্লাহ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তু অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬১) বস্তুত যেকোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কোরআনের যেকোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যেকোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদিগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানবকুল, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এমন এক বস্তু আগমন করেছে, যা (মন্দ কাজ থেকে বাধাদান করার জন্য) উপদেশবাণী-স্বরূপ। আর (যদি এর উপর আমল করে কেউ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে, তবে) অন্তরে (মন্দ কর্মের দরুন) যে ব্যাধি (সৃষ্টি) হয়, সেগুলোর জন্য এটি নিরাময় আর (সৎকাজ করার জন্য) পথপ্রদর্শনকারী। বস্তুত (এর উপর আমল করে যদি সৎকাজ অবলম্বন করা হয়, তবে এটি রহমত (এবং সওয়াবের কারণ। আর এসব বরকত হলো) ঈমানদারদের জন্য। (কারণ তারাই আমল করে থাকে। সুতরাং কোরআনের এসব বরকতের কথা শুনিয়ে) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, (যখন)

কোরআন এমনি জিনিস তখন (মানুষকে) আল্লাহ্‌র এহেন দান ও রহমতের উপর আনন্দিত হওয়া উচিত (এবং একে মহাসম্পদ মনে করে বরণ করে নেওয়া কর্তব্য)। এটি এ (দুনিয়া) অপেক্ষা শতগুণে উত্তম, যা তোমরা সঞ্চয় করছ। (কারণ দুনিয়ার ফায়দা স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী; আর কোরআনের ফায়দা অধিক ও স্থায়ী।) আপনি (তাদেরকে) বলুন যে, বল দেখি, আল্লাহ তোমাদের (লাভের) জন্য যা কিছু রিযিক (হিসাবে) পাঠিয়েছিলেন, পরে তোমরা (নিজের মনগড়া মত) তার কিছু অংশ হারাম আর কিছু অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিয়েছ। (অথচ তা হারাম হওয়ার কোনই দলীল প্রমাণ নেই। কাজেই) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, তোমাদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি (শুধু) আল্লাহ্‌র প্রতি (নিজের পক্ষ থেকে) মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছ? কিয়ামত সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? (যারা মোটেই ভয় করে না। তারা কি মনে করে যে, কিয়ামত আসবে না কিংবা এলেও আমাদের জওয়াবদিহি করতে হবে না?) সত্যই মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে (যে, সাথে সাথেই শাস্তি দেন না; বরং তওবা করার অবকাশ দিয়ে রেখেছেন।) কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ (তা না হলে তওবা করে নিত)। আর আপনি যেকোন অবস্থায়ই থাকুন না কেন এবং (সে সমুদয় অবস্থা সত্ত্বেও) আপনি যেকোনখান থেকে কোরআন পাঠ করুন না কেন (এমনিভাবে অন্য যত লোকই হোক না কেন) তোমরা যে কাজই কর, আমি সবকিছুরই খবর রাখি, যখন তোমরা সে কাজ আরম্ভ কর। আর আপনার পালনকর্তার (জ্ঞান) থেকে কোন অণু কণা পরিমাণও গোপন নেই। না যমীনে না আসমানে। (বরং সবকিছুই তাঁর জ্ঞানে সমুপস্থিত।) আর না(উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা) কোন ক্ষুদ্র বস্তু, না (তার চেয়ে) কোন বড় বস্তু আছে, কিন্তু সে সবই (আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ব্যাপকতার কারণে) কিতাবে মুবীন (তথা লওহে মাহফূযে ক্ষোদিত) রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত আয়াতসমূহে কাফিরদের দুরবস্থা এবং আখিরাতে তাদের উপর নানা রকম আযাবের বর্ণনা ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম দু'টিতে তাদের সে দুরবস্থা ও পথভ্রষ্টতা থেকে বেরিয়ে আসার পন্থা এবং আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি লাভের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। আর তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআন ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর আনুগত্য।

মানব ও মানবতার জন্য এ দু'টি বিষয় এমন সুদৃঢ় যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোরআনের নির্দেশাবলী এবং রাসূলের সুন্নতের অনুবর্তিতা মানুষকে সত্যিকার অর্থেই মানুষ বানিয়ে দেয় এবং যখন মানুষ সত্যিকার অর্থেই মানুষ হয়ে যায়, তখন সমগ্র বিশ্ব সুন্দর হয়ে উঠে এবং এ পৃথিবীই বেহেশতে পরিণত হতে পারে।

প্রথম আয়াতে কোরআন করীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

এক— مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ — مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ -এর প্রকৃত অর্থ হলো এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি প্রণত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতির পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখিরাতের ভাবনা উদয় হয়। কোরআন করীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

এই 'মাওয়েযায়ে হাসানাহ্'-র অত্যন্ত সালংকার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি-প্রদর্শন, সওয়াবের সাথে সাথে আযাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কোরআন করীমের অন্যান্য বর্ণনা-বিশ্লেষণও এমন যা মনের কায়া পাল্টে দিতে অদ্বিতীয়।

مَوْعِظَةٌ-এর সাথে مِنْ رَّبِّكُمْ বলে কোরআনী ওয়াযের মর্যাদাকে অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়ায নিজেদেরই মত কোন দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি কিংবা পাপ-পুণ্য কিছু নেই; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে, যার কোথাও ভুল-ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই এবং যার প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি ও ভীতি-প্রদর্শনে কোন দুর্বলতা কিংবা আপত্তি-ওযরের আশংকা নেই।

কোরআন করীমের দ্বিতীয় গুণ شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। شِفَاءٌ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া। আর صُدُوْرٌ হলো صدر-এর বহুবচন, যার অর্থ বুক। আর এর মর্মার্থ হলো অন্তর।

সারার্থ হচ্ছে যে, কোরআন করীম অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন যে, কোরআনের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি বিশেষত অন্তরের রোগের শেফা; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়।—(রূহুল-মা'আনী)

কিন্তু অন্যান্য মনীষী বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশি মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়, সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়।

হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলিম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কোরআন করীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক লোক রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী (সা) বললেন, কোরআন পাঠ কর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ অর্থাৎ কোরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য যা বুকের মাঝে হয়ে থাকে। (রূহুল-মা'আনী—ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে)

এমনিভাবে হযরত ওয়াসিলাহ্ ইবনে আশ'কা' (র)-র রিওয়ায়েতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে এসে জানালো যে, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কোরআন পড়তে থাক।

উম্মতের ওলামাগণ কিছু রিওয়ায়েত, কিছু উদ্ধৃতি এবং কিছু নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে কোরআনের আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা পৃথক গ্রন্থে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ইমাম গাযযালী (র) রচিত গ্রন্থ 'কাওয়াসে-কোরআনী' এ বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধ একখানি গ্রন্থ। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (র) গ্রন্থটি সংক্ষেপ করে 'আমলে কোরআনী' নামে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে যা দেখা যায়, তাতে এ বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না যে, কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও নিরাময় হিসাবে প্রমাণিত হয়ে থাকে। অবশ্য একথা সত্য যে, আত্মার রোগ-ব্যাধি দূর করাই কোরআন নাযিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে আনুষঙ্গিকভাবে এটি দৈহিক রোগ-ব্যাধিরও উত্তম চিকিৎসা।

এতে সেসব লোকের নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রষ্টতাও স্পষ্ট হয়ে গেছে, যারা কোরআন করীমকে শুধু দৈহিক রোগের চিকিৎসা কিংবা পার্থিব প্রয়োজনের ভিত্তিতেই পড়ে বা পড়ায়। না এরা আত্মিক রোগ-ব্যাধির প্রতি লক্ষ্য করে, না কোরআনের হিদায়েতের উপর আমল করার প্রতি মনোনিবেশ করে। এমনি লোকদের ব্যাপারে আল্লামা ইকবাল বলেছেন ঃ

ترا حاصل زیٰسٓ اش جزیں نیست : که از هم خواندنش اساں بمیری

অর্থাৎ তোমরা কোরআনের সূরা ইয়াসীনের দ্বারা এতটুকুই উপকৃত হয়েছ যে, এর পাঠে মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ হয়। অথচ এ সূরার মর্ম, তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্যের প্রতি যদি লক্ষ্য করতে, তাহলে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি উপকারিতা ও বরকত হাসিল করতে পারতে।

কোন কোন গবেষক তফসীরকার বলেছেন যে, কোরআনের প্রথম গুণ مَوْعِظَةٌ-এর সম্পর্ক হলো মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে—যাকে শরীয়ত বলা হয়। কোরআন করীম সে সমস্ত আমল সংশোধনের সর্বোত্তম উপায়। আর شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ-এর সম্পর্ক হলো মানুষের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথে, যাকে তরীকত ও তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়।

এ আয়াতে কোরআনের তৃতীয় গুণ هُدًى আর চতুর্থ গুণ هُدًى বলা হয়েছে। رَحْمَةٌ অর্থ হিদায়েত। অর্থাৎ পথপ্রদর্শন। কোরআন করীম মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানায়। সে মানুষকে বলে যে, সমগ্র বিশ্ব এবং স্বয়ং মানবসত্তার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যে মহান নিদর্শনসমূহ দিয়ে রেখেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, যাতে তোমরা সেসব বিষয়ের স্রষ্টা ও মালিককে চিনতে পার।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধনসম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনটাই প্রকৃতপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। কারণ একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, (সবই) অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়ত, সততই তার পতনাশংকা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধনসম্পদ ও সম্মান-সাম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে।

এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হলো فضل (ফজল), অপরটি رحمة (রহমত)। এতদুভয়ের মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র 'ফযল'-এর মর্ম হলো কোরআন, আর রহমত-এর মর্ম হলো এই যে, তোমাদেরকে তিনি কোরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তওফিক দান করেছেন।—(রূহুল-মা'আনী, ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে)

এ বিষয়টি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, 'ফযল' অর্থ কোরআন; আর রহমত হলো ইসলাম। বস্তুত এর মর্মার্থও তা-ই, যা উল্লিখিত হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্যও দিয়েছেন। কারণ ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র এক রিওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ফযল-এর মর্ম হলো কোরআন, আর রহমত হলো নবী করীম (সা)। কোরআন করীমের আয়াত وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ-এর মাঝেও তারই সমর্থন পাওয়া যায়। বস্তুত এর সারমর্মও প্রথম ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কারণ কোরআন কিংবা ইসলামের উপর আমল করা রাসূলে করীম (সা)-এর আনুগত্যেরই বিভিন্ন শিরোনাম।

এ আয়াতের সুপ্রসিদ্ধ কিরাআত (পাঠ) অনুযায়ী فَلْيَفْرَحُوْا গায়েবের সীগা বা নামপুরুষ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এর প্রকৃত লক্ষ্য হলো তখনকার উপস্থিত লোকেরা, যার চাহিদা মুতাবিক এখানে মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করাই সমীচীন ছিল। যেমন, কোন কোন কিরাআত বা পাঠে তাও রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ পাঠে নামপুরুষই ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, রাসূলে করীম (সা) কিংবা ইসলামের ব্যাপক রহমত শুধু তখনকার উপস্থিত লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। (রূহুল-মা'আনী)

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কোরআন করীমের অপর এক আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলীর দ্বারা বোঝা যায় যে, এ পৃথিবীতে আনন্দ-হরষের কোন স্থান নেই। ইরশাদ হয়েছে ঃ لاَ تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ অর্থাৎ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেয়ো না, আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না। অথচ, আলোচ্য আয়াতে নির্দেশবাচক শব্দ ব্যবহার করে আনন্দিত হওয়ায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বাহ্যত দু'টি আয়াতের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। এর এক উত্তর হলো এই যে, যেখানে আনন্দিত হতে বারণ করা হয়েছে, সেখানে আনন্দের সংযোগ হলো পার্থিব সম্পদের সাথে। পক্ষান্তরে যেখানে আনন্দিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আনন্দের সংযোগ হলো আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহের সাথে। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো এই যে, নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আনন্দই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় আয়াতে সেসব লোকের প্রতি সতর্কীকরণ করা হয়েছে, যারা হালাল-হারামের ব্যাপারে নিজে ব্যক্তিগত মতকে প্রশ্রয় দেয় এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সনদ ব্যতীতই নিজের

ইচ্ছামত যে-কোন বস্তুকে হালাল কিংবা হারাম সাব্যস্ত করে নেয়। এদেরই উপর কিয়ামতে কঠিন আযাব হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে বোঝা যাচ্ছে, কোন বস্তু কিংবা কোন কর্মের হালাল অথবা হারাম হওয়া প্রকৃতপক্ষে মানুষের মতের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা একান্তভাবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের অধিকারভুক্ত। তাঁদের হুকুম ছাড়া কোন জিনিসকে হালাল বলাও জায়েয নয়, হারাম বলাও জায়েয নয়।

চতুর্থ আয়াতে মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক জ্ঞান এবং তার অতুলনীয় বিস্তৃতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আপনি সর্বক্ষণ যে কর্মে এবং যে অবস্থায় থাকেন অথবা কোরআন থেকে যা পাঠ করেন, তার কোন অংশই আমার নিকট গোপন নেই। তেমনিভাবে সমস্ত মানুষ যা কিছু করে, তা আমার দৃষ্টির সামনে রয়েছে। বস্তুত আসমান ও যমীনের কোন একটি বিন্দুবিসর্গও আমার কাছে গোপন নেই, বরং প্রত্যেকটি বিষয় كتب مبين অর্থাৎ 'লওহে-মাহফূযে' (সুরক্ষিত পটে) লিখিত রয়েছে।

বাহ্যত এখানে আল্লাহ্র জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং সর্ববিষয়ে ব্যাপকতার বর্ণনা দেওয়ার তাৎপর্য হলো এর মাধ্যমে নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, যদিও আপনার বিরোধী ও শত্রুসংখ্যা অনেক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ আপনার সাথে আছে, তাতে আপনার কোনই ক্ষতি সাধিত হবে না।

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى
ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

---

(৬২) মনে রেখো, যারা আল্লাহ্র বন্ধু, তাদের না কোন ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। (৬৩) যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে (৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহ্র কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হলো মহা সফলতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ তো গেল আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের বর্ণনা। পরবর্তীতে নিষ্ঠাবান ও আনুগত্যপরায়ণ লোকদের সংরক্ষিত হওয়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে,) স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধুজনদের উপর না কোন আশঙ্কা (-জনক ঘটনা পতিত হবার ভয়) আছে, না তারা (কোন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার দরুন) দুঃখিত বা মর্মাহত হবে। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে ভয়াবহ ও আশঙ্কাজনক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেন। আর তারা আল্লাহ্র বন্ধু) যারা ঈমান এনেছে এবং (পাপকর্ম থেকে) বিরত থাকে। (অর্থাৎ ঈমান ও পরহিযগারীর মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে

সমর্থ হয়। আর ভয় ও শংকা থেকে তাদের মুক্ত থাকার কারণ এই যে,) তাদের জন্য পার্থিব জীবনেও এবং আখিরাতেও (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুঃখ-কষ্ট থেকে বেঁচে থাকার) সুসংবাদ রয়েছে। (বস্তুত) আল্লাহ্র কথায় (অর্থাৎ ওয়াদায়) কোন ব্যতিক্রম হয় না। (সুতরাং যখন সুসংবাদ দান প্রসঙ্গে তাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র ওয়াদা সব সময় সঠিক হয়ে থাকে, কাজেই ভয় ও দুঃখমুক্ত হওয়া অনিবার্য। আর) এটি (অর্থাৎ এ সুসংবাদ যা উল্লিখিত হলো) মহান কৃতকার্যতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্র ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখিরাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—যারা আল্লাহ্র ওলী তাদের না থাকবে কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহ্র ওলী হলেন সে সমস্ত লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া পরহিযগারী অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখিরাতেও।

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

এক. আল্লাহ্র ওলীগণের উপর ভয় ও শংকা না থাকার অর্থ কি? দুই. ওলী আল্লাহ্র সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? তিন. দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি?

প্রথম বিষয় 'আল্লাহর ওলীদের কোন ভয়-শংকা থাকে না' অর্থ এও হতে পারে যে, আখিরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাঁদেরকে তাঁদের মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশঙ্কা থেকে চিরতরে তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। না থাকবে কোন রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশংকা, আর না থাকবে কোন প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ। বরং তাদের প্রতি জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী, অনন্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের কোন বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছাবে তাদের সবাইকে ওলী-আল্লাহ্ বলা হবে। পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর সবাই ওলী-আল্লাহ্র তালিকায় গণ্য হবে।

কিন্তু অনেক তফসীরকারক বলেছেন, ওলী-আল্লাহ্দের জন্য দুঃখ-ভয় না থাকা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলী-আল্লাহ্দের বৈশিষ্ট্যও তাই যে, পৃথিবীতেও তারা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত। এ ছাড়া আখিরাতে তাদের মনে কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকা তো সবারই জানা। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হলো এই যে, পৃথিবীতে তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থী দেখা যায়। কারণ ওলী-আল্লাহ্র তো কথাই নেই স্বয়ং নবী-রাসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত নন বা ছিলেন না বরং তাঁদের ভয়ভীতি অন্যদের তুলনায়

বেশিই ছিল। যেমন কোরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্কে ভয় করেন। অন্যত্র ওলী-আল্লাহ্গণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ অর্থাৎ এরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র আযাবের ভয় করে। কারণ তাদের পালনকর্তার আযাব এমন জিনিস যার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে-তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা)-কে অধিকাংশ সময় বিষণ্ন-চিন্তান্বিত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহ্কে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি ভয় করি।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারূক (রা)-সহ অন্য সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও ওলী-আল্লাহ্গণের কান্নাকাটির ঘটনাবলী ও আখিরাতের ভয়ভীতি সন্ত্রস্ত থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।

তাই রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র) বলেছেন, পার্থিব জীবনে ওলী আল্লাহ্গণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হলো এ হিসাবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণত যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন ; পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুষড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে—আল্লাহ্র ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এ সবের বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্ভ্রম ও আরাম-আয়েশের কোন গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা ব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ-কষ্ট পরিশ্রম কোন লক্ষ্য করার মত বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে। বরং তাদের অবস্থা হলো ঃ

نہ شادی داد سامانے نہ غم أورد نقصانے
بہ پیش همت ماهرچہ امد بود مهمانے

(না কোন সম্পদ-সামগ্রী আনন্দ দিতে পারে, না তার কোন ক্ষতিতে দুঃখ আনতে পারে, আমার সৎসাহসের সামনে যা কিছুই আসে, সবই ক্ষণিকের অতিথি মাত্র।)

মহান আল্লাহ্ তা'আলারও প্রেম-মহত্ত্ব, আর তাঁর ভয়ভীতি এসব মনীষীর উপর এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, এর মুকাবিলায় তাদের পার্থিব দুঃখ-বেদনা, আরাম-আয়েশ ও লাভ-ক্ষতির গুরুত্ব তৃণ-কণিকার মত নয়। কবির ভাষায় ঃ

بہ ننگ عاشقی هیں سود وحاصل دیکھنے والے
یہاں گمراہ کہلاتے هیں منزل دیکھنے والے

অর্থাৎ 'প্রেমের চলার পথে যারা লাভের প্রত্যাশা করে, তারা প্রেমের কলংক। এ প্রান্তরে চলতে গিয়ে যারা মনযিলের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তারা পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত।'

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহ্র ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাঁদের লক্ষণ সংক্রান্ত। 'আউলিয়া' শব্দটি 'ওলী' শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় 'ওলী' অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। আল্লাহ্ তা'আলার প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোন মানুষ কোন জীবজন্তু এমনকি কোন বস্তু-সামগ্রীই বাদ পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোন একটি বস্তুও অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের প্রকৃত উপকরণ হলো সেই সংযোগ যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে রয়েছে। যদিও এই সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এই অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু 'আউলিয়াহ্' শব্দে নৈকট্যের ঐ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। বরং নৈকট্য প্রেম ও ওলিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ বিশেষ বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সে নৈকট্যকে মুহব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র ওলী। যেমন হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, সে যা কিছু শোনে, আমার মাধ্যমেই শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা কিছু সে দেখে আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হাত-পা হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।" এর মর্ম হলো এই যে, তার কোন গতি-স্থিতি ও অন্য যেকোন কাজ আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ হয় না।

বস্তুত এই বিশেষ ওলিত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর সর্বোচ্চ স্তর নবী-রাসূলগণের প্রাপ্য। কারণ প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ স্তর হলো সাইয়েদুল আম্বিয়া নবী করীম (সা)-এর এবং এ বেলায়েতের সর্বনিম্ন স্তর হলো সূফী-সাধকগণের পরিভাষায় 'দরজায়ে ফানা তথা আত্মবিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হলো এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহ্র স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালবাসে, আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাও আল্লাহ্র জন্য করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালবাসা ও শত্রুতা কোনটাই নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণে হয় না। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো যে তাঁর দেহ মন, বাহ্যাভ্যন্তর সবই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অন্বেষায় নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই হলো যিকরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম-আহকামের অনুগত থাকা। এ দু'টি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান তাঁকেই ওলী বলা হয়। যার মধ্যে এ দু'টির কোন একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ দু'টিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্নতা ও উচ্চতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এ সব স্তরের দিক দিয়েই ওলী-আল্লাহ্গণের মর্যাদার বেশকম হয়ে থাকে।

এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে 'আউলিয়াল্লাহ' (আল্লাহ্র ওলীগণ) বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?

তিনি বললেন, সে সমস্ত লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা পোষণ করে; কোন পার্থিব উদ্দেশ্য এর মাঝে থাকে না। (ইবনে মারদুবিয়াহ্ থেকে—মাযহারী)। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সমস্ত লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কি?

হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে বলেছেন, উম্মতের লোকদের এই স্তর রাসূলে করীম (সা)-এরই সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কের সেই রূপ, যা মহানবী (সা) পেয়েছিলেন, স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুত মহানবী (সা)-এর সংসর্গের ফযীলত সাহাবায়ে কিরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণেই তাঁদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী-কুতুব অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। পরবর্তী লোকেরা এ ফযীলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণেই বাড়তে থাকে। এই মাধ্যম শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই হতে পারেন, যারা রাসূলে করীম (সা)-এর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাঁদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র যিকরেও আধিক্য ঘটে তখনই তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। (১) কোন ওলীর সংসর্গ, (২) তাঁর আনুগত্য ও (৩) আল্লাহ্‌র অধিক যিকর। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, এ যিকর সুন্নত তরীকা অনুযায়ী হতে হবে। কারণ অধিক যিকরের দ্বারা যখন অন্তরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিস বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পন্থা রয়েছে, অন্তরের শিরিস হলো আল্লাহ্‌র যিকর। এ কথাই ইবনে উমর (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন।

আর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে প্রশ্ন করল যে, আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে মুহব্বত রাখে, কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তাঁর স্তরে পৌঁছাতে পারে না। হুযূর বললেন ঃ المـــرء مع من احب। অর্থাৎ "প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে ভালবাসে।" এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলী-আল্লাহ্গণের সংসর্গ ও তাদের প্রতি মুহব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ইমাম বায়হাকী 'শা' আবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত রাযীন (রা)-এর এক রিওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) হযরত রাযীন (রা)-কে বললেন যে, তোমাকে দীনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি যাতে করে তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে—তা হলো এই যে, যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ করে তাদের মজলিস ও সংসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যত বেশি সম্ভব আল্লাহ্‌র যিকরে নিজের জিহ্বা নাড়তে থাকবে। যার সাথে মুহব্বত রাখবে–আল্লাহ্‌র জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, আল্লাহ্‌র জন্য করবে।—(মাযহারী)

কিন্তু এ সঙ্গ-সান্নিধ্য তাদেরই লাভজনক, যারা নিজেরাও সুন্নতের অনুসারী ওলী আল্লাহ্। পক্ষান্তরে যারা রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নতের অনুসারী নয়, তারা ওলীত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, তাদের দ্বারা কাশ্ফ-কারামত যতই প্রকাশ পাক না কেন। আর সে লোক উল্লিখিত গুণাবলী অনুযায়ী ওলী হবেন, তাঁর দ্বারা কোন কাশ্ফ-কারামত প্রকাশ না হলেও তিনি ওলী-আল্লাহ্।—(মাযহারী)

ওলী-আল্লাহ্গণের লক্ষণ ও পরিচয় প্রসঙ্গে তফসীরে মাযহারীতে একখানি হাদীস হাদীসে কুদসীর উদ্ধৃতিক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে সেসব লোকই আমার আউলিয়া, যারা আমার স্মরণের সাথে স্মরণে আসে এবং যাদের স্মরণের সাথে আমি স্মরণে আসি।" আর ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা)-র রিওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ওলী আল্লাহ্দের পরিচয় বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ اَلَّذِيْنَ اِذَا رَءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ অর্থাৎ যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র কথা মনে হয়, তারাই ওলী।

সারমর্ম এই যে, যাদের সান্নিধ্যে বসে মানুষ আল্লাহ্র যিকরের তওফীক লাভ করতে পারে এবং দুনিয়ার মায়া কম অনুভূত হয়, এই হলো তাদের ওলী-আল্লাহ্ হওয়ার লক্ষণ।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশ্ফ-কারামত ও গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা একান্ত ভুল ও ধোঁকা। হাজার হাজার ওলী-আল্লাহ্ এমন ছিলেন এবং রয়েছেন যাঁদের দ্বারা এ ধরনের কোন বিষয় সংঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে এমন লোকের দ্বারাও কাশ্ফ ও গায়েবী সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান পর্যন্ত ঠিক নেই।

আয়াতের শেষাংশে যে বিষয়টি বলা হয়েছে, ওলী-আল্লাহ্দের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই সুসংবাদ—তাতে আখিরাতের সুসংবাদ হলো এই যে, মৃত্যুর পর তাঁর রূহ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। পরে কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উঠবে তখনও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। যেমন, তিবরানী (র) হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন "যারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর অনুসারী মৃত্যুকালেও তাদের কোন ভয় হবে না, কবরেও নয় এবং কবর থেকে উঠার সময়েও নয়। আমার চোখ যেন তখনকার অবস্থা দর্শন করছে, যখন মানুষ কবর থেকে মাটি (ধূলাবালি) ঝাড়তে ঝাড়তে এবং একথা বলতে বলতে উঠবে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ সে আল্লাহ্র শুকরিয়া যিনি আমাদের চিন্তা-ভাবনা দূর করে দিয়েছেন।

আর দুনিয়ার সুসংবাদ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন, সমস্ত সত্য স্বপ্ন যা মানুষ নিজে দেখে কিংবা তাদের জন্য অন্য কেউ দেখতে পায়, যাতে তাদের জন্য সুসংবাদ বিদ্যমান থাকে।—[এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন।]

এ ছাড়া পৃথিবীর অপর সুসংবাদ হলো এই যে, সাধারণ মুসলমান কোন রকম স্বার্থপরতা ব্যতিরেকে তাকে ভালবাসে এবং ভাল মনে করে। এ ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

تلك عاجل بشرى المؤمنين অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানের ভাল মনে করা এবং প্রশংসা করা অপর মু'মিনের একটি নগদ সুসংবাদ। —(মুসলিম ও বগবী।)

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

(৬৫) আর তাদের কথায় দুঃখ নিয়ো না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্‌র। তিনিই শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (৬৬) শুনছ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র। আর এরা যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে—তা আসলে কিছুই নয়; এরা নিজেরই কল্পনার পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনাকে যেন তাদের কথায় দুঃখিত না করে (অর্থাৎ আপনি তাদের কুফরী কার্যকলাপে দুঃখিত হবেন না। কারণ জ্ঞান এবং উল্লিখিত রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও)। সমস্ত বিজয় (ও ক্ষমতাও) শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য (নির্ধারিত। তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনার হিফাযত করবেন)। তিনি (তাদের কথা) শুনেন (এবং তাদের অবস্থা) জানেন, (তিনি তাদের কাছ থেকে আপনার প্রতিশোধ নিজেই নিয়ে নেবেন) মনে রেখো যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে (অর্থাৎ ফেরেশতা, জিন ও মানব) এসবই আল্লাহ্‌র (মালিকানাভুক্ত)। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা নির্ধারিত বিধানকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (সুতরাং সর্বদিক দিয়ে আপনার আশ্বস্ত থাকা উচিত) আর (যদি কারো এমন কোন সন্দেহ হয় যে, হয়তো যাদেরকে শরীক করা হচ্ছে তারা কোন রকম অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে, তবে একথা শুনে রাখ) যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অপরাপর শরীকের উপাসনা ইবাদত করছে—(আল্লাহ্ জানেন,) এরা কিসের অনুসরণ করছে? (অর্থাৎ তাদের এ বিশ্বাসের যুক্তি কি? প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়—) শুধুমাত্র যুক্তিহীনভাবে (নিজেদের অলীক) কল্পনার আনুগত্য করছে এবং কল্পনাপ্রসূত কথাবার্তা বলছে। (বস্তুতপক্ষে এদের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির মত খোদায়ী কোন গুণই নেই। কাজেই এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করারও কোন সম্ভাবনা নেই।)

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا
سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِىُّ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنْ
عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾
قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾ؕ
مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ
الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

(৬৭) তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা শ্রবণ করে। (৬৮) তারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছেন—তিনি পবিত্র। তিনি অমুখাপেক্ষী। যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই তাঁর। তোমাদের কাছে তার কোন সনদ নেই। কেন তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ কর—যার কোন সনদই তোমাদের কাছে নেই? (৬৯) বলে দাও, যারা এরূপ করে তারা অব্যাহতি পায় না। (৭০) পার্থিব জীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন আযাব—তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন, যিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন রাত, যাতে তোমরা তাতে আরাম করতে পার। আর দিনকেও তেমনি বানিয়েছেন (তার আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কারণে) দেখাশোনার উপায় হিসাবে। এই নির্মাণের পেছনে (তওহীদের) প্রমাণসমূহ রয়েছে, সেসমস্ত লোকের জন্য যারা (মনোনিবেশ সহকারে এ বিষয়গুলো) শুনে থাকে। (মুশরিকরা এসব দলীল-প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করে না এবং শিরকী কথাবার্তাই বলতে থাকে। সুতরাং) তারা বলে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার সন্তান-সন্ততি রয়েছে (সুবহানাল্লাহ্ কি কঠিন কথা)! তিনি যে কোনকিছুরই মুখাপেক্ষী নন (বরং সবই তাঁর মুখাপেক্ষী)। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে বিদ্যমান সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। সুতরাং যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তিনিই সব কিছুর

মালিক; আর সবকিছুই তাঁর অধিকারভুক্ত, তখন একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠায় তাঁর কোন শরীক-অংশীদার কিংবা সমকক্ষ নেই। অতএব, সন্তানকে যদি আল্লাহ্‌র সমপর্যায়ভুক্ত বলা হয়, তবে তা পূর্বেই বাতিল হয়ে গেছে। আর যদি অসমপর্যায়ভুক্ত বলা হয়, তবে অসমপর্যায়ভুক্ত সন্তান হওয়া দূষণীয় বা ত্রুটি। অথচ আল্লাহ্‌ সমস্ত দোষত্রুটি থেকে মুক্ত, পবিত্র। যেমন, سُبْحٰنَهٗ তে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়ে গেল। আমরা যে সন্তান না হওয়ার দাবি করেছিলাম, তার উপর আমরা দলীলও উপস্থাপন করে দিয়েছি। এখন রইল তোমাদের দাবি—বস্তুত) তোমাদের কাছে (ইহুদী দাবি ছাড়া) এ (দাবির) উপর কোন দলীলই নেই। (অতএব) তোমরা কি আল্লাহ্‌র প্রতি এমন বিষয় আরোপ করছ যার (প্রমাণস্বরূপ কোন) জ্ঞানই তোমাদের নেই ? (এতে তাদের অপবাদ আরোপকারী হওয়া প্রমাণ করে ঐ অপবাদের কারণে ভীতিপ্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে) বলে দিন যে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে (যেমন, মুশরিকরা) তারা (কখনো) কৃতকার্য হবে না। (আর যদি এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ হয় যে, এ ধরনের লোকদেরকে পৃথিবীতে যথেষ্ট কৃতকার্যতা ও আরাম-আয়েশ ভোগ করতে দেখা যায়, তবে তার উত্তর এই যে,) সেটি (ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে) যৎসামান্য আরাম-আয়েশ (যা অতিশীঘ্র নিঃশেষ হয়ে যায়)। অতঃপর (মৃত্যুর পর) আমারই নিকট তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন (আখিরাতে) আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বদলা হিসাবে কঠিন শাস্তি (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাব।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ
وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾ فَاِنْ
تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ
خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

(৭১) আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা—যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকেও সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয়

না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। (৭২) তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হলো আল্লাহ্র দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি। (৭৩) তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ করেছি। আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি; যারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি তাদেরকে নূহ (আ)-এর কাহিনী পড়ে শোনান (যা তখন সংঘটিত হয়েছিল—) যখন তিনি নিজের সম্প্রদায়কে বললেন যে, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের কাছে আমার (ওয়ায করতে) থাকা এবং আল্লাহ্র হুকুম-আহ্কামের নসীহত করা ভারী (ও অসহনীয়) মনে হয়, তবে (তাই হতে থাক,) আমি সেজন্য পরোয়া করি না। কারণ আমার তো আল্লাহ্র উপরই ভরসা রয়েছে। অতএব, তোমরা (আমার ক্ষতি-সাধনের ব্যাপারে) নিজেদের চেষ্টা-তদবীর (যাই কিছু করতে পার) নিজেদের (শরীকদের সমন্বয়ে) পাকা করে নাও। (অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের শরীক উপাস্যরা সবাই মিলে আমার ক্ষতিসাধনে নিজেদের বাসনা পূর্ণ করে নাও—) তারপর যেন আর তোমাদের সে চেষ্টা-তদবীর তোমাদের অপমানের (ও মনোবেদনার) কারণ না হয়। (অর্থাৎ অধিকাংশ সময় গোপন অভিসন্ধিতে মন ছোট হয়ে যায়। কাজেই গোপন চেষ্টা-তদবীরের প্রয়োজন নেই। যে চেষ্টাই কর, মন খুলে প্রকাশ্যই কর, আমার দিকটি চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমার চলে যাবার কিংবা বেরিয়ে যাবার আশংকা করো না। আর এত লোকের পাহারার ভেতর থেকে একটা লোকের বেরিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তাছাড়া গোপনীয়তার প্রয়োজনই বা কি?) তারপর আমার সাথে (যা কিছু করতে হয়) করে ফেল এবং আমাকে (একটুও) অবকাশ দিও না। (সারমর্ম হলো এই যে, আমি তোমাদের কথায় না ভয় করি, আর না তবলীগ থেকে বিরত হতে পারি। এ পর্যন্ত তো ভয় না করার কথা বললেন। অতঃপর লোভহীনতা প্রসঙ্গে বলেছেন—অর্থাৎ) এরপরেও যদি তোমার পরাঙ্মুখতাই প্রদর্শন করতে থাক, তাহলে (একথা জেনে রাখ,) আমি তোমাদের কাছে (এ তবলীগের জন্য) কোন পারিশ্রমিক তো চাইছি না। (তাছাড়া চাইবই বা কেন ? কারণ) আমার পারিশ্রমিক তো শুধুমাত্র (প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে) আল্লাহ্রই দায়িত্বে রয়েছে। (সারকথা, আমি না তোমাদেরকে ভয় করি, না তোমাদের কাছে কোন প্রত্যাশা রাখি।) আর (যেহেতু) আমার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যাতে আমি আনুগত্যকারীদের সঙ্গে থাকি (সে কারণেই তবলীগের ব্যাপারে হুকুম পালন করছি। যদি তোমরা না মান, তাতে আমার কি ক্ষতি!) বস্তুত (এহেন মনোমুগ্ধকর উপদেশাবলীর পরেও) তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করতে থেকেছে (ফলে তাদের তুফানজনিত আযাব পতিত

হয়েছে এবং) আমি (এ আযাব থেকে) তাঁকে এবং তাঁর সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দান করি এবং তাদেরকে (যমীনের বুকে) আবাদ করি। আর (বাকি অন্য যারা ছিল,) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে (এ তুফানে) জলমগ্ন করে দিয়েছি। কাজেই লক্ষ্য করা উচিত, কি (মন্দ) পরিণতি হয়েছে তাদের, যাদেরকে (আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে) ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (অর্থাৎ তাদেরকে অজান্তে ধ্বংস করা হয় না– প্রথমে বলে দেওয়া হয়, বুঝিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তারপরেও যখন অমান্য করে তখনই শাস্তি নেমে আসে।)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟
لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

(৭৪) অনন্তর আমি নূহের পরে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি। তারপর তাদের কাছে তারা প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি হয়নি যে, ঈমান আনবে সে ব্যাপারে, যাকে তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এভাবেই আমি মোহর এঁটে দেই সীমালংঘনকারীদের অন্তরসমূহের উপর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনন্তর নূহ (আ)-এর পর আমি অন্যান্য আরো রাসূল পাঠিয়েছি তাঁদের জাতি সম্প্রদায়ের প্রতি। তাঁরা তাঁদের কাছে মু'জিযাসমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন (কিন্তু) তাতেও (তাদের জেদ ও হঠকারিতার অবস্থা ছিল এই যে,) যে বিষয়টি তারা প্রথম (ধাপে) মিথ্যা বলে দিয়েছে, এমনটি আর হলো না যে, পরে আর তা মেনে নেবে। (তাছাড়া যেমনি এরা ছিল অন্তরের দিক দিয়ে কঠোর) তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সে কাফিরদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে (বন্ধ করে) দেন।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟
وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰذَا
لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا ۖ
وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ
فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ
أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ
سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

(৭৫) অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মূসা ও হারূনকে ফিরাউন ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলী সহকারে। অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে। (৭৬) বস্তুত তারা ছিল গোনাহগার। তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত হলো, তখন বলতে লাগলো, এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু। (৭৭) মূসা বলল, সত্যের ব্যাপারে একথা বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌছার পর ? এ কি যাদু ? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না। (৭৮) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে ? আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার ? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না। (৭৯) আর ফিরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদেরকে। (৮০) তারপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। (৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ্ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দুষ্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। (৮২) আল্লাহ্ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপূত নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (উল্লিখিত) সে পয়গম্বরগণের পরে আমি মূসা ও হারূনকে পাঠিয়েছি ফিরাউন এবং তার সর্দারদের প্রতি স্বীয় মু'জিযা (আ'ছা ও ইয়াদে বায়দা তথা লাঠি ও দীপ্তিময় হাতের মু'জিযা) দিয়ে। তারা (এ দাবির সাথে সাথেই তাদের সত্যতা স্বীকার করার ব্যাপারে) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল (এবং সত্য গ্রহণের বিষয়ে চিন্তাটি পর্যন্ত করলো না)। বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত। (কাজেই আনুগত্য করল না।) তারপর যখন (দাবির পর) তাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে [মূসা (আ)-এর নবুয়তের উপর] সঠিক দলীল-প্রমাণ (অর্থাৎ মু'জিযা) এসে পৌছাল, তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, নিঃসন্দেহে এটি প্রকাশ্য যাদু। মূসা (আ) বললেন, তোমরা

এই প্রকৃষ্ট দলীল সম্পর্কে তোমাদের কাছে এসে পৌঁছার পরও কি এমন মন্তব্য করবে (যে, এটি যাদু) ? এটি কি যাদু ? অথচ যাদুকর (যখন নবুয়ত দাবি করে, তখন মু'জিযা প্রকাশে) কৃতকার্য হয় না। (পক্ষান্তরে আমি কৃতকার্য হয়েছি যে, প্রথমে দাবি করেছি এবং তারপর মু'জিযাও প্রকাশ করে দিয়েছি।) ওরা (এ বক্তব্যের কোন উত্তর দিতে পারল না বরং মূর্খজনোচিতভাবে) বলতে লাগল, তোমরা কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সে মত ও পথ থেকে সরিয়ে দেবে, যাতে আমরা আমাদের বড়দেরকে দেখছি ? আর (তোমরা কি এ কারণে এসেছ যে) তোমরা দু'জনে রাজ্য ও সর্দারী পেয়ে যাবে ? (তারা আরও বলল) কিন্তু (তোমরা ভাল করে জেনে রাখ,) আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনো স্বীকার করব না। আর ফিরাউন (তার সর্দারদের উদ্দেশ করে) বলল, আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরকে (যারা আমার সাম্রাজ্যে রয়েছে) এনে উপস্থিত কর। (অতএব, সমবেতই করা হলো।) যখন তারা এল [এবং মূসা (আ)-এর সাথে মুকাবিলা হলো, তখন] মূসা (আ) তাদেরকে (লক্ষ্য করে) বললেন, যা কিছু তোমরা নিয়ে এসেছ সব (মাঠে) নিক্ষেপ কর। যখন তারা (নিজেদের যাদুর উপকরণাদি) নিক্ষেপ করল, তখন মূসা (আ) বললেন, যা কিছু তোমরা (বানিয়ে) এনেছ যাদু হলো এগুলো (ফিরাউনের লোকেরা যাকে যাদু বলে সেগুলো নয়)! একথা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই (যাদু) এখনই তছনছ করে দেবেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা এমন ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না (যা মু'জিযার মুকাবিলায় উপস্থিত হয়)। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা (যেমন মিথ্যাপন্থীদের মিথ্যাকে সত্য মু'জিযার মুকাবিলায় বাতিল করে দেন, তেমনিভাবে) সত্য-সঠিক প্রমাণ (অর্থাৎ মু'জিযা)-কে স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী (নবী-রাসূলগণের নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ) প্রতিষ্ঠিত করে দেন, অপরাধী (কাফির) লোকদের কাছে তা যতই খারাপ লাগুক না কেন।

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰىٓ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ
اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾
وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ
مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

(৮৩) আর কেউ ঈমান আনল না মূসার প্রতি, তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া—ফিরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফিরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। (৮৪) আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে

তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদারও হয়ে থাক। (৮৫) তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ জালিম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না। (৮৬) আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই কাফিরদের কবল থেকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (যখন আছা'-র মু'জিযা প্রকাশ পেল, তখন) মূসা (আ)-এর উপর (প্রথম প্রথম) তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মাত্র গুটিকতক লোক ঈমান আনল। তাও ফিরাউন এবং শাসকবর্গের ভয়ে যে, না জানি (একথা প্রকাশ হয়ে গেলে) তাদেরকে এরা কোন কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে (তাদের এ ভয় অমূলকও ছিল না। কারণ) ফিরাউন ছিল সে দেশে (রাজ) ক্ষমতার অধিকারী। তদুপরি সে ন্যায় ও ইনসাফের (গণ্ডি ছাড়িয়ে) বাইরে চলে যেত—(অত্যাচার উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করে দিত। কাজেই যে লোক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসহ অত্যাচার করে তার প্রতি ভয় লাগাই স্বাভাবিক।) আর মূসা (আ) (যখন তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখলেন, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি (তোমরা সত্য মনে) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখ তবে (চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে বরং) তাঁর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা (তাঁর) অনুগত হয়ে থাক। (তারা উত্তরে) নিবেদন করল, আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছি—(এ প্রার্থনা করার পর যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে অত্যাচারী লোকদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না এবং স্বীয় রহমতে আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে নাজাত দান কর।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ
مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ
أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ

حَتّٰٓى اِذَآ اَدۡرَكَهُ الۡغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنۡتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىۡۤ اٰمَنَتۡ بِهٖ بَنُوۡۤا اِسۡرَآءِيۡلَ وَاَنَا مِنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ ﴿۹۰﴾ آٰلۡـٰٔنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنۡتَ مِنَ الۡمُفۡسِدِيۡنَ ﴿۹۱﴾

(৮৭) আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তার ভাইদের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কিবলামুখী করে এবং নামায কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর। (৮৮) মূসা বলল, হে আমার পরওয়ারদিগার, তুমি ফিরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ এবং সম্পদ দান করেছ—হে আমার পরওয়ারদিগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে! হে আমার পরওয়ারদিগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়। (৮৯) বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে। অতএব, তোমরা দু'জন অটল থাক এবং তাদের পথে চলো না যারা অজ্ঞ। (৯০) আর বনী ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা। বস্তুত আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (৯১) এখন এ কথা বলছ ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানী করছিলে। এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি (সে দোয়া কবূল করার ব্যবস্থা করলাম।) মূসা (আ) ও তাঁর ভাই [হারুন (আ)]-এর নিকট ওহী পাঠালাম যে, তোমরা উভয়ে নিজেদের লোকদের জন্য (যথাবিহিত) মিসরেই বাসস্থান স্থায়ী রাখ। (অর্থাৎ তারা যেন ভীত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে না যায়। আমি তাদের রক্ষাকারী।) আর (নামাযের সময় হলে) তোমরা সবাই নিজেদের সে বাসস্থানকেই নামাযের স্থান নির্দিষ্ট করে নাও—ভয়ভীতির দরুন মসজিদে উপস্থিতি ক্ষমা করা গেল। তবে নামাযের অনুবর্তিতা (অপরিহার্যভাবে) করবে। (যাতে নামাযের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'আলা যথাশীঘ্র এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেন।) আর (হে মূসা,) আপনি মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন (যে, শীঘ্রই এ বিপদ দূর হয়ে যাবে)। বস্তুত মূসা (আ) (স্বীয় প্রার্থনায় নিবেদন করলেন,) হে আমাদের পরওয়ারদিগার, (আমরা জানতে পেরেছি যে,) আপনি ফিরাউন

এবং তার সর্দারদেরকে আড়ম্বরের উপকরণ এবং পার্থিব জীবনের বিভিন্ন রকমের মালামাল দিয়েছেন, হে আমাদের পালনকর্তা, একারণেই দিয়েছেন যে, তারা আপনার পথ থেকে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। (সুতরাং তাদের ভাগ্যে যখন হিদায়েত প্রাপ্তি নেই এবং এর পেছনে যে হিকমত ছিল তাও যখন বাস্তবায়িত হয়ে গেছে, তখন তাদের মালামাল এবং অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাই হবে কেন। সুতরাং) হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তাদের সমস্ত মালামাল ও ধনসম্পদ নাস্তানাবুদ করে দিন, আর (স্বয়ং তাদের ধ্বংসের এমন ব্যবস্থা করে দিন যে,) তাদের অন্তরসমূহে (অধিক) কঠোর করে দিন যাতে তারা ধ্বংসের যোগ্য হয়ে পড়ে এবং যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে, (বরং ক্রমাগত তাদের কুফরীই যেন বেড়ে যায়) এমনকি এরা যেন মহা আযাব (এর যোগ্য) হয়ে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে নেয় [বস্তুত এমন পর্যায়ে ঈমান আনা হলে তাতে কোনই লাভ হয় না। যা হোক, হযরত মূসা (আ) যখন এই দোয়া করেন, তখন হযরত হারূন (আ) তাঁর সাথে সাথে 'আমীন' বলে যাচ্ছিলেন।—(দুররে-মনসুর)। আল্লাহ্ বললেন,] তোমাদের উভয়ের দোয়া কবূল করা হয়েছে। (কারণ আমীন বললেই দোয়ায় অংশগ্রহণ করা হয়ে যায়। উভয়ের দোয়া কবূল হওয়া অর্থ এই যে, আমি তাদের ধনসম্পদ ও অস্তিত্বকে শীঘ্রই ধ্বংস করতে যাচ্ছি।) যাহোক, তোমরা (তোমাদের দায়িত্বে অর্থাৎ প্রচারকার্যে) অটল থাক। (অর্থাৎ তাদের ভাগ্যে হিদায়েত না থাকলেও প্রচারে তোমাদের লাভ রয়েছে।) আর তোমরা সেসব লোকের পথে চলো না, (আমার ওয়াদার সত্যতা কিংবা কোন বিষয়কে বিলম্বিত করার মাঝে বিশেষ হিকমত থাকা অথবা তবলীগ তথা ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে) যাদের জ্ঞান নেই। (অর্থাৎ আমার ওয়াদাকে সত্য জানবে এবং তাদের ধ্বংসে যদি বিলম্বও ঘটে, তবে তাতে কোন হিকমত রয়েছে বলে মনে করবে এবং দায়িত্ব হিসাবে তোমাদের যে কাজ তাতে লেগে থাকবে।) বস্তুত [আমি যখন ফিরাউনকে ধ্বংস করতে চাইলাম, তখন মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলাম যে, বনি ইসরাইলকে মিসর থেকে যেন বের করে নিয়ে যায়। সুতরাং তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলেন। পথে লোহিত সাগর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ায় তাতে পথ হয়ে গেল। তারপর] আমি বনি ইসরাইলকে (সেই) নদী পার করে দিলাম। অতঃপর তাদের পেছনে পেছনে ফিরাউন তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে তাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে (নদীর মধ্য দিয়ে) এগিয়ে চলল (যে, নদীর ভেতর থেকে বেরিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। কিন্তু তারা নদী পার হতে পারল না)। শেষ পর্যন্ত যখন ডুবতে আরম্ভ করল (এবং আযাবের ফেরেশতাদের দেখতে পেল), তখন (ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে) বলতে লাগল, আমি ঈমান আনছি যে, একমাত্র তাঁকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাইলরা এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। (অতএব, আমাকে এই ডোবা এবং আখিরাতের আযাব থেকে নাযাত দান করা হোক) অথচ (আখিরাতের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করার) পূর্ব পর্যন্ত অবাধ্যতা প্রদর্শন করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। পক্ষান্তরে এখন মুক্তি চাইছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে হযরত মূসা ও হারুন (আ) এবং বনি ইসরাইল ও ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে। তা হলো এই যে, বনি ইসরাইল যারা মূসা (আ)-এর দীনের উপর আমল করত তাদের সবাই অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের 'সওমাআহ' তথা উপাসনালয়েই নামায আদায় করত। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই। তাদের নামায ঘরে পড়লে আদায় হতো না। তবে এই বিশেষ সুবিধা মহানবী (সা)-এর উম্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যেকোনখানে ইচ্ছা নামায আদায় করে নিতে পারে। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলে করীম (সা) তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও উল্লেখ করেছেন যে, আমার জন্য গোটা যমীনকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব জায়গাতেই নামায আদায় হয়ে যায়। তবে এটা আলাদা কথা যে, ফরয নামাযসমূহ মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আক্কাদাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু ফরয নামাযই মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। যাহোক, বনি ইসরাইলরা তাদের মাযহাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের উপাসনালয়ে গিয়ে নামায আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফিরাউন যে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত সে বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপাসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল যাতে এরা নিজেদের ধর্মানুযায়ী নামায পড়তে না পারে। এরই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বনি ইসরাইলের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারুন (আ)-কে এ নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মিসরে বনি ইসরাইলদের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা হোক যা কিবলামুখী হবে, যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামায আদায় করতে পারে।

এতে বোঝা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে, তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপাসনালয়েই নামায পড়তে হবে, কিন্তু এই বিশেষ দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বনি ইসরাইলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামায আদায় করে নেওয়ার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিকটা কিবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা যেতে পারে যে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নির্ধারিত সে ঘরেই নামায পড়ার কথা বলা হয়েছিল যা কিবলামুখী করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামায পড়ার অনুমতি তখনও ছিল না, যেমনটি মহানবী (সা)-এর উম্মতের জন্য রয়েছে যে, যেকোন নগরে কিংবা মাঠে যেকোন স্থানে নামায আদায় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।—(রূহুল মা'আনী)

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মত যে, এ আয়াতে বনি ইসরাইলদেরকে যে কিবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে তা কোন্ কিবলা ছিল—কা'বা ছিল, না বায়তুল মুকাদ্দাস? হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, এতে কা'বাই উদ্দেশ্য এবং কা'বাই ছিল

হযরত মূসা (আ) ও তাঁর আসহাবের কিবলা।—(কুরতুবী,রূহুল মা'আনী)। বরং কোন কোন উলামা এমনও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূলের কিবলাই ছিল কা'বা শরীফ।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা নিজেদের নামাযে 'সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে'র দিকে মুখ করত, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যখন হযরত মূসা (আ) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তাঁর কিবলা বায়তুল্লাহ্ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামায পড়ার জন্য কিবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে পূববর্তী সমস্ত নবী-রাসূলের শরীয়তেই নামাযের জন্য পবিত্রতা ও আবরু ঢাকা যে শর্ত তাও নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আবাসগৃহসমূহে কিবলামুখী করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাতেই যেন নামায আদায় করা হয়। সেজন্য তার পরে পরেই اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ -এর নির্দেশ দানের মাধ্যমে হিদায়েত দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফিরাউন যদি নির্ধারিত উপাসনালয়ে নামায আদায় করতে বাধা দান করে, তবে তাতে নামায রহিত হয়ে যাবে না, বরং নিজ নিজ ঘরে তা আদায় করতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, আপনি মু'মিনগণকে সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে; শত্রুর উপর তাদের জয় হবে এবং আখিরাতে তারা জান্নাতপ্রাপ্ত হবে।—(রূহুল মা'আনী)

আয়াতের শুরুতে হযরত মূসা ও হারুন (আ)-কে দ্বিবচন পদের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে। তার কারণ, আবাসগৃহগুলোকে কিবলামুখী করে তাতে নামায পড়ার অনুমতিদান ছিল তাঁদেরই কাজ। অতঃপর বহুবচন পদের মাধ্যমে সমস্ত বনি ইসরাঈলকে অন্তর্ভুক্ত করে নামায প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার কারণ, এ নির্দেশে পয়গম্বর ও উম্মত সবাই শামিল। সবশেষে সুসংবাদ দানের নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে হযরত মূসা (আ)-কে। তার কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন শরীয়তের অধিকারী নবী; জান্নাতের সুসংবাদ দান তাঁরই হক বা অধিকার ছিল।

দ্বিতীয় আয়াতে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হযরত মূসা (আ) যে বদদোয়া করেছিলেন, তা বর্ণিত হয়েছে। এর প্রারম্ভে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিবেদন করেন যে, আপনি ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের পার্থিব আড়ম্বরের সাজ-সরঞ্জাম ও ধন-দৌলত যথেষ্ট পরিমাণেই দিয়েছেন। মিসর থেকে শুরু করে আবিসিনিয়া পর্যন্ত সোনা-চাঁদী, হীরা-জহরতের খনিসমূহ দিয়ে রেখেছেন।—(কুরতুবী)। যার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে গোমরাহ্ করে দিচ্ছে। কারণ সাধারণ মানুষ তাদের বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ-বিলাস দেখে এমন সংশয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে যে, সত্যি যদি এরা গোমরাহীর মধ্যেই থাকবে, তবে এরা আল্লাহ্ তা'আলার এসব নিয়ামত কেমন করে পেতে পারে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এই তাৎপর্যের গভীরে পৌঁছাতে পারে না যে, নেক আমল

ব্যতীত যদি কারো পার্থিব উন্নতি হয়, তবে তা তার ন্যায়-নিষ্ঠার লক্ষণ হতে পারে না। হযরত মূসা (আ) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ার পর, তার ধনৈশ্বর্যে অন্য লোকদের গোমরাহ হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে বদদোয়া করেন– رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তার ধনৈশ্বর্যের রূপকে পরিবর্তিত করে বিকৃত ও নিষ্ক্রিয় করে দাও।

হযরত কাতাদাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, এই দোয়ার প্রতিক্রিয়ার ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত হীরা-জহরত, নগদ মুদ্রা এবং বাগ-বাগিচা, শস্য-ক্ষেত্রের সমস্ত ফল-ফসল পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-র আমলে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল যাতে ফিরাউনের আমলের কিছু জিনিসপত্র রক্ষিত ছিল। তাতে ডিম এবং বাদামও দেখা যায় যে সম্পূর্ণ পাথর হয়ে গিয়েছিল।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সমস্ত ফল-মূল, তরিতরকারি ও খাদ্যশস্যকে পাথর বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটি ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সেই নয়টি (মু'জিযাসুলভ) নিদর্শনের একটি যার আলোচনা কোরআন করীমের وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ আয়াতে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বদদোয়া হযরত মূসা (আ) তাদের জন্য করছিলেন এই وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ অর্থাৎ ইয়া পরওয়ারদিগার, তাদের অন্তরগুলোকে এমন কঠিন করে দাও, যেন তাতে ঈমান এবং অন্য কোন সৎকর্মের যোগ্যতা না থাকে; যাতে তারা বেদনাদায়ক আযাব আসার পূর্বে ঈমান আনতে না পারে।

কোন নবী-রাসূলের মুখে এমন বদদোয়া বাহ্যত অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ মানুষকে ঈমান ও সৎকর্মের আমন্ত্রণ জানানো এবং সেজন্য চেষ্টা-সাধনা করাই হয়ে থাকে নবী-রাসূলগণের জীবনের ব্রত।

কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটনা হলো এই যে, হযরত মূসা (আ) যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের পরে তাদের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই কামনা করছিলেন যে, এরা যেন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। এতে এমন একটা সম্ভাবনাও বিদ্যমান ছিল যে, এরা না আবার আযাব আসতে দেখে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে দেয় এবং তাতে করে আযাব স্থগিত হয়ে যায়—তাই কুফরের প্রতি ঘৃণাবিদ্বেষই ছিল এই প্রার্থনার কারণ। যেমন, ফিরাউন ডুবে মরার সময় ঈমানের স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করলে জিবরাঈল আমীন তার মুখ বন্ধ করে দেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও করুণায় সে আযাব থেকে বেঁচে যেতে না পারে।

তাছাড়া এমন হতে পারে যে, এই বদদোয়াটি প্রকৃতপক্ষে বদদোয়াই নয়, বরং শয়তানের উপর যেমন লা'নত করা হয় তেমনি বিষয়। সে যখন কোরআনের প্রকৃষ্ট বর্ণনা মতই লা'নতপ্রাপ্ত তখন তার উপর লা'নত করার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার উপর লা'নত চাপিয়ে দিয়েছেন, আমরাও তার উপর লা'নত করি। এ ক্ষেত্রে মর্ম দাঁড়াবে এই যে, তাদের অন্তরসমূহের কঠোর হয়ে পড়া এবং ঈমান ও সংশোধনের যোগ্য না

থাকা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল। হযরত মূসা (আ) বদদোয়ার আকারে সে বিষয়টিই প্রকাশ করেছেন মাত্র।

তৃতীয় আয়াতে হযরত মূসা (আ)-এর উক্ত দোয়া কবূল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত হারূন (আ)-কেও দোয়ার অংশীদার সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে : قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا অর্থাৎ তোমাদের দু'জনের দোয়া কবূল করে নেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায়, কোন দোয়ায় 'আমীন' বলাও দোয়ারই অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু কোরআন করীমে নিঃশব্দ দোয়া করাকেই দোয়ার সুন্নত নিয়ম বলে অভিহিত করা হয়েছে, কাজেই এতে 'আমীন'ও নিঃশব্দে বলাই উত্তম বলে মনে হয়।

এ আয়াতে দোয়া কবূল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গম্বরকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাঁদেরকে সামান্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, দোয়া কবূল হওয়ার লক্ষণ আল্লামা বগভীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এ আয়াতে দোয়া কবূল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হিদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ। অর্থাৎ নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দাওয়াত ও তবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয়া কবূল হওয়ার প্রতিক্রিয়া যদি দেরীতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহিলদের মত তাড়াহুড়া করবেন না।

চতুর্থ আয়াতে হযরত মূসা (আ)-এর বিখ্যাত মু'জিযা সাগর পাড়ি দেওয়া এবং ফিরাউনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে : حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনছি যে, যে আল্লাহ্র উপর বনি ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে : آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ কি এখন মুসলমান হচ্ছ ! অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ?

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে মহানবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবূল করতে থাকেন, যতক্ষণ না মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়।—(তিরমিযী)

মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখিরাতের হুকুম-আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং এবং কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মু'মিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফিরাউনের

এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফিরাউনের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কোরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। তাই যারা ফিরাউনের এই ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন, হয় তার কোন ব্যাখ্যা করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে।—(রূহুল মা'আনী)

এমনিভাবে খোদানাখাস্তা যদি এমনি মুমূর্ষু অবস্থায় কারো মুখ দিয়ে কুফরী বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাফিরও বলা যাবে না। বরং তার জানাযার নামায পড়ে তাকে মুসলমানদের মত দাফন করতে হবে এবং তার সে কুফরী বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, কোন কোন ওলীআল্লাহ্র অবস্থার দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায় যে, এমন বাক্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরী বাক্য মনে করে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরে যখন তাঁর কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাতলে দেন, তখন সবাই নিশ্চিত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল বটে।

সার কথা এই যে, যখন রূহ্ বেরোতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সে সময়টি পার্থিব জীবনে গণ্য হয় না। তখনকার কোন আমল বা কার্যকলাপ শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত এর পূর্বেকার যাবতীয় আমলই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ এ বিষয়টির সঠিক অনুমান করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি রূহ্ বেরোবার কিংবা উর্ধ্বশ্বাসের সময়—কি তার পূর্ব মুহূর্ত।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ
صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾
فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ
الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ

كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۚ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾

(৯২) অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাৎবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। (৯৩) আর আমি বনি ইসরাঈলদেরকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং তাদেরকে আহার্য দিয়েছি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্তু-সামগ্রী। বস্তুত তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সংবাদ। নিঃসন্দেহে তোমার পরওয়ারদিগার তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন কিয়ামতের দিন, যে ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছিল। (৯৪) সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়াদিগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। (৯৫) এবং তাদের অন্তর্ভুক্তও হয়ো না যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর বাণীকে। তাহলে তুমিও অকল্যাণে পতিত হয়ে যাবে। (৯৬) যাদের ব্যাপারে তোমার পরওয়ারদিগারের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না। যদি তাদের সামনে সমস্ত নিদর্শন এসে উপস্থিত হয় তবুও যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় বেদনাদায়ক আযাব। (৯৭) সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হলো না যা ঈমান এনেছে অতঃপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর ? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতএব (প্রার্থিত মুক্তির বদলে) আজ আমি তোমার মৃতদেহকে (পানিতে তলিয়ে যাওয়া থেকে) বঁচিয়ে দেব, যাতে তাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ হও, যারা তোমার পরে (বর্তমান) রয়েছে। (তারা যেন তোমার দুরবস্থা ও ধ্বংস দেখে আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে।) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (এসবের পরেও) বহু লোক আমার (এমন সব) শিক্ষণীয় বিষয়ে অমনোযোগী (এবং আল্লাহর হুকুম-আহকামের বিরোধিতায় নির্ভীক)। আর আমি (ফিরাউনের

জলমগ্নতার পর) বনি ইসরাঈলদেরকে বসবাস করার জন্য অতি উত্তম ঠিকানা দান করেছি। (তাৎক্ষণিকভাবে তো তারা মিসরের আধিপত্য লাভ করেছেই, তদুপরি তাদের প্রথম বংশধরকেই আমালিকা সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দানের মাধ্যমে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়ার আধিপত্য দান করেছি।) তাছাড়া আমি এখানে তাদেরকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন বস্তুসামগ্রী খাবার জন্য দিচ্ছি। (বস্তুত মিসরেও বাগ-বাগিচা, নহর-নালা ছিল এবং সিরিয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে بٰرَكْنَا فِيْهَا অর্থাৎ এতে আমি বরকত দিয়েছি। সুতরাং (এ সমুদয় কারণে আমার আনুগত্যে অধিকতর ব্যাপৃত থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু তার বিপরীতে তারা দীনের ব্যাপারে বিরোধ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তদুপরি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে,) তারা (কোন অজ্ঞতার দরুন) এ মতবিরোধ করেনি; বরং তাদের কাছে (বিধি-বিধান সংক্রান্ত) জ্ঞান পৌঁছে যাবার পরই মতবিরোধ করেছে। অতঃপর এ মতবিরোধের উপর ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, আপনার পরওয়ারদিগার ঐ (মতবিরোধকারী) লোকদের মাঝে কিয়ামতের দিন সে সমস্ত বিরোধীয় বিষয় (কার্যকর) মীমাংসা করে দেবেন যাতে তারা বিরোধ করছিল। অতঃপর (দীনে মুহাম্মদীর বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য আমি এমন এক যথার্থ পন্থা বাতলে দিচ্ছি যে, যারা ওহীপ্রাপ্ত নয় তাদের জন্য তা কেন যথেষ্ট হবে না, আপনি যে ওহীপ্রাপ্ত, কিন্তু আপনাকেও যদি শর্তসাপেক্ষে এ সম্পর্কে সম্বোধন করা হয় তবে এভাবে করা যেতে পারে যে,) যদি (মেনে নেওয়া হয়,) আপনি এর (অর্থাৎ এ কিতাবের) ব্যাপারে সন্দেহ (সংশয়)-এ পতিত হয়ে থাকেন যা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছি, তবে (এ সন্দেহের অপনোদনের জন্য এও একটি সহজ পন্থা রয়েছে যে,) আপনি সেসব লোককে জিজ্ঞেস করে দেখুন যারা আপনার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে থাকে। (উদ্দেশ্য তওরাত ও ইঞ্জীল। তারা পাঠক হিসাবে তার ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে এই কোরআনের সত্যতা বাতলে দেবে।) নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার নিকট সত্য কিতাব এসেছে। আপনি কস্মিনকালেও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না এবং সন্দেহকারীদের অতিক্রম করে সে সমস্ত লোকেরও অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ,) আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, যাদের ব্যাপারে আপনার পরওয়ারদিগারের (এই চিরাচরিত) বাক্য (যে, এরা ঈমান আনবে না) নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা (কখনই) ঈমান আনবে না যদিও তাদের কাছে (সত্য প্রমাণের) যাবতীয় দলীল পৌঁছে যায়; যতক্ষণ না তারা বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেবে (কিন্তু তখনকার ঈমান আনায় কোনই লাভ হবে না)। সুতরাং (যেসব জনপদের উপর আযাব এসে গেছে, সেগুলোর মধ্য থেকে) কোন জনপদই ঈমান আনেনি যা তার জন্য উপকারী বা লাভজনক হতে পারত। কারণ তাদের ঈমান আনার সাথে আল্লাহর ইচ্ছার সংযোগ ঘটেনি। অবশ্য ইউনুস (আ)-এর জাতি (যাদের ঈমানের সাথে আল্লাহর ইচ্ছা সংযোজিত হয়েছিল, সে কারণে তারা প্রতিশ্রুত আযাবের প্রাথমিক লক্ষণ দেখেই ঈমান নিয়ে আসে এবং) যখন তারা ঈমান নিয়ে আসে, তখন আমি অপমানজনক

পার্থিব জীবনে তাদের উপর থেকে আযাব রহিত করে দেই এবং তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ মৃত্যুকাল) পর্যন্ত (কল্যাণজনক) স্বাচ্ছন্দ্য দান করি। বস্তুত অন্যান্য জনপদের ঈমান আনা এবং ইউনুস (আ)-এর জাতির ঈমান আনা উভয়টিই হয়েছিল ইচ্ছাভিত্তিক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে ফিরাউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পশ্চাৎবর্তীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

ঘটনাটি এই যে, সাগড় পাড়ি দেবার পর হযরত মূসা (আ) যখন বনি ইসরাঈলদেরকে ফিরাউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফিরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফিরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফিরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এল এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপরে এই লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফিরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল আজো সে স্থানটি 'জাবালে ফিরাউন' নামে পরিচিত।

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফিরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত তা কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফিরাউনই সে ফিরাউন যার সাথে হযরত মূসা (আ)-এর মুকাবিলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনও ফিরাউন। কারণ ফিরাউন শব্দটি কোন একক ব্যক্তির নাম নয়; সে যুগে মিসরের সব বাদশাহ্কে ফিরাউন পদবী দেওয়া হতো।

কিন্তু এটাও কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে জলমগ্ন লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসাবে সাগর তীরে এনে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে, বহু লোক আমার আয়াতসমূহ এবং নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে অমনোযোগী, সেগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা করে না এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। অন্যথায় পৃথিবীর প্রতিটি অণুকণায় এমন সব নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে , যা লক্ষ্য করলে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে ফিরাউনের করুণ পরিণতির মুকাবিলায় সে জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে যাদেরকে ফিরাউন হীন ও পদদলিত করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনি ইসরাঈলকে উত্তম আবাস দান করেছি। একদিকে তারা মিসর রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করেছে এবং অপরদিকে জর্দান ও ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিও তারা পেয়ে গেছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম ও তাঁর সন্তানবর্গের জন্য মীরাস বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কোরআন করীমে مُبَوَّأَ صِدْقٍ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে صِدْقٍ অর্থ কল্যাণজনক ও উপযোগী।

অর্থাৎ এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ আমি তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহার্য দান করেছি। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তুসামগ্রী ও আরাম-আয়েশ তাদের দিয়ে দিয়েছি।

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ভ্রান্ত আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তাঁর আনুগত্যে বিমুখতা অবলম্বন করেছে। এরা রাসূলে করীম (সা) সম্পর্কে তওরাতে যেসব নিদর্শন পাঠ করত তাতে তাঁর আগমনের সর্বাগ্রে তাদেরই ঈমান আনা উচিত ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করত, তাঁর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলত, নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ যমানার নবীর ওসীলা দিয়ে দোয়া করত, কিন্তু যখন শেষ যমানার নবী (সা) তাঁর যাবতীয় প্রমাণ এবং তাওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্য সবাই অস্বীকার করল। এ আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-এর আগমনকে جَاءَهُمُ الْعِلْمُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে علم বলতে 'নিশ্চিত বিশ্বাস' ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে বিশ্বাসের উপরকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন তারা মতবিরোধ করতে লাগল।

কোন কোন তফসীরবিদ এ কথাও বলেছেন যে, এখানে علم অর্থ معلوم যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হলো যা তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে আরম্ভ করল।

আয়াতের শেষ ভাগে বাহ্যত মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করা হলেও একথা অতি স্পষ্ট যে, ওহী সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ করার কোন সম্ভাবনাই নেই। কাজেই এই সম্বোধনের মাধ্যমে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; স্বয়ং তিনি উদ্দেশ্য নন। আবার এমনও হতে পারে যে, এতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, হে মানবকুল এই ওহীর ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থেকে থাকে, যা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, তাহলে তোমরা সেসব লোকের কাছে জিজ্ঞেস কর, যারা তোমাদের পূর্বে আল্লাহ্র কিতাব তওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করত। তাহলে তারা তোমাদেরকে বলে দেবে যে, পূববর্তী সমস্ত নবী (আ) ও তাঁদের কিতাবসমূহ মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর সুসংবাদ দিয়ে এসেছে। তাতে তোমাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে লোকের মনে দীনী ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ উদয় হয়, তার কর্তব্য হলো এই যে, সত্যপন্থী আলিমগণের নিকট জিজ্ঞেস করে সন্দেহ-দূর করে নেবে, সেগুলো মনের মাঝে লালন করবে না।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে একই বিষয়বস্তুর সমর্থন ও তাকীদ এবং এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদের প্রতি সতর্কতা উচ্চারণ করা হয়েছে।

সপ্তম আয়াতে শৈথিল্যপরায়ণ মুনকিরদিগকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, জীবনের অবকাশকে গনীমত মনে কর, অস্বীকার এবং অবাধ্যতা থেকে এখনও বিরত হও। অন্যথায় এমন এক সময় আসবে, যখন তওবা করলেও তা কবূল হবে না কিংবা ঈমান আনলেও তা কবূল হবে না। আর সে সময়টি হলো যখন মৃত্যুকালে আখিরাতের আযাব সামনে এসে উপস্থিত হয়। এ প্রসঙ্গেই হযরত ইউনুস (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এমনটি কেন হলো না যে, অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী জাতিসমূহ এমন এক সময়ে ঈমান নিয়ে আসত, যখন তাদের ঈমান তাদের জন্য লাভজনক হতো। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় কিংবা আযাব অনুষ্ঠান ও আযাবে পতিত হয়ে যাবার পর অথবা কিয়ামত সংঘটনের সময় যখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কারও ঈমান কবূল হবে না। কাজেই তার পূর্বাহ্নেই নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে যেন বিরত হয়ে যায় এবং ঈমান নিয়ে আসে। অবশ্য ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় যখন এমন সময় আসার পূর্বাহ্নে যখন আল্লাহ্ তা'আলার আযাব আসতে দেখল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিল এবং ঈমান গ্রহণ করে ফেলল, যার ফলে আমি তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব সরিয়ে নিলাম।

তফসীরের সারমর্ম এই যে, দুনিয়ার আযাব সামনে এসে উপস্থিত হলেও তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় না; বরং তখনও তওবা কবূল হতে পারে। অবশ্য আখিরাতের আযাবের উপস্থিতি হয় কিয়ামতের দিন হবে কিংবা মৃত্যুকালে। তা সে মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু হোক অথবা কোন পার্থিব আযাবে পতিত হওয়ার মাধ্যমেই হোক, যেমনটি হয়েছিল ফিরাউনের ক্ষেত্রে।

সে কারণেই হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবূল হওয়া সাধারণ আল্লাহ্র রীতি বিরোধী হয়নি, বরং তারই আওতায় হয়েছে। কারণ তারা যদিও আযাবের আগমন প্রত্যক্ষ করেই তওবা করেছিল, কিন্তু তারা সে আযাবে পতিত হওয়ার কিংবা মৃত্যুর পূর্বাহ্নেই তওবা করে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে যেহেতু ফিরাউন ও অন্য লোকদের যারা আযাবে পতিত হওয়ার পর মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস শুরু হওয়ার সময় তওবা করেছে এবং ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছে, সেহেতু তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং সে তওবাও কবূল হয়নি।

ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনার উদাহরণ স্বয়ং কোরআন করীমে বর্ণিত বনি ইসরাঈলদের সে ঘটনা যাতে তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর টাঙ্গিয়ে দিয়ে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং তওবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর তাতে তারাও তওবা করে নেয় এবং সে তওবা কবূল হয়ে যায়। সূরা বাকারায় এ ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ.

অর্থাৎ আমি তাদের মাথার উপর তূর পর্বতকে টাঙ্গিয়ে দিয়ে নির্দেশ দান করলাম যে, যেসব হুকুম-আহকাম তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর।

এর কারণ ছিল এই যে, তারা আযাব সংঘটিত হওয়ার এবং মৃত্যুতে পতিত হওয়ার পূর্বাহ্নে শুধু আযাবের আশঙ্কা প্রত্যক্ষ করে তওবা করে নিয়েছিল। তেমনিভাবে ইউনুস

(আ)-এর সম্প্রদায় আযাবের আগমন লক্ষ্য করেই নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে তওবা করে নেয় (এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে)। কাজেই ঐ তওবা কবূল হয়ে যাওয়াটা উল্লিখিত রীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয় নয়। —(কুরতুবী)

এ ক্ষেত্রে সমকালীন কোন কোন লোকের কঠিন বিভ্রান্তি ঘটে গেছে। তারা হযরত ইউনুস (আ)-এর প্রতি রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যকে যুক্ত করে দেন এবং পয়গম্বরের শৈথিল্যকেই সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব সরে যাবার কারণ সাব্যস্ত করেন। তদুপরি এই শৈথিল্যকেই আল্লাহ্‌র রোষের কারণ বলে সাব্যস্ত করেন। সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তা এরূপ ঃ "কোরআনের ইঙ্গিত এবং ইউনুস (আ)-এর গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার জানা যায় যে, ইউনুস (আ)-এর দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য আযাবের লক্ষণাদি দেখেই তাঁর সঙ্গীসাথীগণ তওবা-ইস্তিগফার করে দেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব রীতি-মূলনীতির কথা বলা হয়েছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট ধারা এও রয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন জাতি-সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আযাবে লিপ্ত করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের উপর স্বীয় প্রমাণাদি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সুতরাং নবীর দ্বারা যখন রিসালতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি নিজেই যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহ্‌র ন্যায়নীতি তাঁর সম্প্রদায়কে সেজন্য আযাব দান করতে সম্মত হয়নি। —(তাফ্‌হীমুল কোরআন ঃ মাওলানা মওদুদী, পৃষ্ঠা ৩১২, জিলদ ২)

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের পাপ থেকে মা'সুম হওয়ার বিষয়টি এমন একটি সর্বসম্মত বিশ্বাস, যার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য বিদ্যমান। এর বিশ্লেষণে কিছু আংশিক মতবিরোধও রয়েছে যে, এই নিষ্পাপত্ব কি সগীরা-কবীরা সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকেই, না শুধু কবীরা গোনাহ্ থেকে। তাছাড়া এ নিষ্পাপত্বে নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত কি না? কিন্তু এতে কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কারোরই কোন মতবিরোধ নেই যে, নবী রাসূলগণের কেউই রিসালতের দায়িত্ব পালনে কোন রকম শৈথিল্য করতে পারেন না। তার কারণ, নবী রাসূলগণের জন্য এর চাইতে বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না যে, যে দায়িত্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন, তাঁরা নিজেই তাতে শৈথিল্য করে বসবেন। এটা সে মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খিয়ানত, যা সাধারণ শালীনতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ত্রুটি থেকেও যদি নবীগণ নির্দোষ না হবেন, তবে অন্যান্য পাপের বেলায় নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ!

কোরআন ও সুন্নাহ্ সমর্থিত মূলনীতি ও নবীগণের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে সর্বসম্মত বিশ্বাসের পরিপন্থী বাহ্যিক কোন কথা যদি কোরআন-হাদীসের মাঝেও কোনখানে দেখা যায়, তবে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে তার এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল, যাতে তা কোরআন-হাদীসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়।

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উল্লিখিত গ্রন্থকার মহোদয় যে বিষয়টি কোরআন করীম ও হযরত ইউনুস (আ)-এর সহীফার বিশ্লেষণের উদ্ধৃতিক্রমে উপস্থাপন করেছেন, তা সহীফায়ে-ইউনুসে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের নিকট তার কোন গুরুত্ব বা গ্রাহ্যতা নেই। তবে এ ব্যাপারে কোরআনী ইঙ্গিত একটিও নেই। বরং ব্যাপারটি হলো এই যে, কয়েকটি প্রেক্ষিত জড়ো করে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বের করা হয়েছে একান্তই জবরদস্তিমূলকভাবে।

প্রথমে তো ধরে নেয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আ)-এর কওমের উপর থেকে আযাব রদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ হয়েছে। অথচ এমন মনে করা এ আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতারও সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি তফসীরশাস্ত্রের গবেষক ইমামগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও পরিপন্থী। তারপর এর সাথে এ কথাও ধরে নেয়া হয়েছে যে, ঐশী রীতি এ ক্ষেত্রে এ কারণে লঙ্ঘন করা হয়েছে যে, স্বয়ং নবী দ্বারা রিসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল, তৎসঙ্গে এ কথাও ধরে নেয়া হয়েছে যে, পয়গম্বরের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করার জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি নির্ধারিত সে সময়ের পূর্বেই দীনের প্রতি আহবান করার দায়িত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সামান্যতম বিচার-বিবেচনাও যদি করা যায়, তবে একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কোরআন ও সুন্নাহ্র কোন ইঙ্গিত এসব মনগড়া প্রতিপাদ্যের পক্ষে খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বয়ং কোরআনের আয়াতের বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করুন, আয়াতে বলা হয়েছে فَلَوْ لاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ -এর পরিষ্কার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোসের প্রকাশ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনইবা এমন হলো না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হতো ! অর্থাৎ আযাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হওয়ার আগে আগে যদি ঈমান নিয়ে আসত, তবে তাদের ঈমান কবূল হয়ে যেত। কিন্তু ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তারা আযাবের লক্ষণাদি দেখে আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তওবা কবূল হয়ে যায়।

আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে কোন ঐশীরীতি লংঘন করা হয়নি; বরং একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম অনুযায়ী তাদের ঈমান ও তওবা কবূল করে নেয়া হয়েছে।

অধিকাংশ তফসীরকার বাহরে-মুহীত, কুরতুবী যখমশরী, মাযহারী, রূহুল-মা'আনী প্রমুখ এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবূল হওয়ার বিষয়টি সাধারণ আল্লাহ্র রীতির আওতায়ই হয়েছে। কুরতুবীর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

وقال ابن جبير غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر فلما صحت توبتهم رفع الله عنهم العذاب – وقال الطبرى خص قوم يونس من بين

سائر الامم بان تيب عليهم بعد معاينة العذاب وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين - وقال الزجاج انهم لم يقع بهم العذاب وانما رأوالعلامة التى تدل على العذاب ولو رأواعين العذاب لما نفعهم ايمانهم - قلت قول الزجاج حسن فان المعاينة التى لا تنفع التوبة معها هى التلبس بالعذاب كقصة فرعون ولهذا جاء بقصة قوم يونس على اثر قصة فرعون' ويعضد هذا قوله عليه السلام ان الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر والغرغرة الحشرجة وذلك هو حال التلبس بالموت وقدروى معنى ماقلناه عن ابن مسعود رضـ(الى) وهذا يدل على ان توبتهم قبل رؤية العذاب (الى) وعلى هذا فلا اشكال ولاتعارض ولا خصوص -

অর্থাৎ ইবনে জুবাইর (র) বলেন যে, আযাব তাদেরকে এমনভাবে আবৃত করে নেয়, যেমন কবরের উপর চাদর। তারপর যেহেতু তাদের তওবা (আযাব আসার পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুন) যথার্থ হয়ে যায়, তাই তাদের আযাব তুলে নেয়া হয়। তাবারী বলেন যে, সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের উপর ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়কে এই বৈশিষ্ট্য দান করা হয় যে, আযাব প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের তওবা কবূল করে নেয়া হয়। যুজাজ বলেন যে, তাদের উপর তখনও আযাব পতিত হয়নি; বরং আযাবের লক্ষণই শুধু দেখতে পেয়েছিল। যদি আযাব পতিত হয়ে যেত, তবে তাদের তওবাও কবূল হতো না। কুরতুবী বলেন যে, যুজাজের মতটি উত্তম ও ভাল। কারণ যে আযাব দর্শনের পর তওবা কবূল হয় না তা হলো সে আযাব যাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমনটি ঘটেছে ফিরাউনের ঘটনায়। আর সে কারণেই এ সূরায় ইউনুসের সম্প্রদায়ের ঘটনাটি ফিরাউনের ঘটনার লাগালাগি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ পার্থক্য নিরূপিত হয়ে যায় যে, ফিরাউনের ঈমান ছিল আযাবে পতিত হবার পর; আর তার বিপরীতে ইউনুস সম্প্রদায়ের ঈমান ছিল আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বে। এই দাবির সমর্থন মহানবী (সা)-এর বাণীতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে, বান্দার তওবা সে সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে থাকেন, যতক্ষণ না সে মৃত্যুর গরগরা বা মুমূর্ষু অবস্থার সম্মুখীন হয়। আর গরগরা বলা হয় মৃত্যুকালীন অচেতন অবস্থাকে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-র রিওয়ায়েতেও এ কথাই বোঝা যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় আযাব পতিত হওয়ার পূর্বাহ্নেই তওবা করে নিয়েছিল। কুরতুবী বলেন যে, এই বক্তব্য ও বিশ্লেষণে না কোন আপত্তি আছে, না আছে স্ববিরোধিতা, আর নাই বা আছে ইউনুস সম্প্রদায়ের কোন নির্দিষ্টতা।

আর তাবারী প্রমুখ তফসীরকারও এ ঘটনাকে হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কেউই একথা বলেন নি যে, এ বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল ইউনুস (আ)-এর ত্রুটিসমূহ। বরং সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তওবা করা ও আল্লাহ্র জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিকেই কারণ বলে লিখেছেন।

সুতরাং যখন একথা জানা গেল যে, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের আযাব রহিত হয়ে যাওয়া সাধারণ আল্লাহ্র রীতির পরিপন্থী নয়, বরং একান্তভাবেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন এ বিতর্কের ভিত্তিই শেষ হয়ে গেছে।

তেমনিভাবে কোরআনের কোন বক্তব্যে এ কথা প্রমাণিত নেই যে, আযাবের দুঃসংবাদ শোনানোর পর ইউনুস (আ) আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়াই তাঁর সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যান। বরং আয়াতের ধারাবাহিকতা ও তফসীর সংক্রান্ত রিওয়ায়েতের দ্বারা এ কথাই বোঝা যায় যে, সমস্ত সাবেক উম্মতের সাথে যে ধরনের আচরণ চলে আসছিল অর্থাৎ তাদের উম্মতের উপর আযাব আসার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের সঙ্গীদেরকে সেখানে থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দিতেন—যেমন হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে কোরআনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে—তেমনিভাবে এখানেও আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ যখন ইউনুস (আ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে পৌঁছে দেয়া হয় যে, তিনদিন পর আযাব আসবে, ইউনুস (আ)-এর সেখানে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা স্পষ্টত একথা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হয়েছে।

অবশ্য পয়গম্বরসুলভ মর্যাদার দিক দিয়ে ইউনুস (আ)-এর দ্বারা একটি পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফ্ফাতের আয়াতসমূহে যে ভর্ৎসনাসূচক শব্দ এসেছে এবং তারই ফলে যে তার মাছের পেটে অবস্থান করার ঘটনা ঘটেছে, তা এজন্য নয় যে, তিনি রিসালাতের দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন, বরং ঘটনাটি তা-ই, যা উপরে প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে লেখা হয়েছে। তা হলো এই যে, হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক তিন দিন পর আযাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং নিজের অবস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান। পরে যখন আযাব আসেনি, তখন ইউনুস (আ)-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি সম্প্রদায়ের নিয়ম মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। তাছাড়া এ সম্প্রদায়ে প্রচলিত রয়েছে যে, কারো মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। কাজেই এ সময় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাওয়ায় প্রাণেরও আশংকা রয়েছে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথই ছিল না। কিন্তু নবী-রাসূলগণের রীতি হলো এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনদিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত তাঁরা হিজরত করেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউনুস (আ)-এর পদস্খলনটি ছিল এই যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরত উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহন করে বসেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ না হলেও নবী-রাসূলগণের রীতির পরিপন্থী ছিল। কোরআনের আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, ইউনুস (আ)-এর পদস্খলন রিসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে ছিল না; বরং তিনি যে সম্প্রদায়ের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য অনুমতি আসার পূর্বেই হিজরত করেছেন, এছাড়া আর কোন কিছুই প্রমাণিত হবে না। সূরা সাফ্ফাতের আয়াতে এ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে প্রায় সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ। এতে

হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করাকে اَبَقَ শব্দ ভর্ৎসনা আকারে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। আর সূরা আম্বিয়ার আয়াতে রয়েছে ঃ

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ –

এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে হিজরত করাকে কঠিন ভর্ৎসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এসবই রিসালতের সমস্ত দায়িত্ব পালনের পর, তখন সংঘটিত হয়েছিল, যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসায় জীবনাশংকা দেখা দেয়। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে এ বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اى غضبان على قومه لشدة شكيتهم وتمادى اصرارهم مع طول دعوته اياهم وكان ذهابه هذا سهم هجرة عنهم لكنه لم يؤمربه –

অর্থাৎ ইউনুস (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরীর উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রিসালতের আহবান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর এ সফর ছিল হিজরত হিসাবেই। অথচ তখনও তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেন নি।

এতে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ রিসালত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। উল্লিখিত সমকালীন তফসীরকারকে কোন কোন ওলামা তাঁর এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা সাফ্ফাতের তফসীরে স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক তফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখের ইসরাঈলী রিওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনটির দ্বারাই তাঁর এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আ)-এর দ্বারা (মা'আযাল্লাহ) রিসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, তফসীরবিদগণ নিজেদের তফসীরে এমন সব ইসরাঈলী রিওয়ায়েতসমূহও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাঁদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রামাণ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের কোন হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রিওয়ায়েত মুসলিম তফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা ইউনুস (আ)-এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আ)-এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তাঁর দ্বারা রিসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোন তফসীরকার এহেন কোন মত গ্রহণও করেন নি।

والله سبحانه وتعالى اعلم وبه استغيث ان يعصمنا من –

হযরত ইউনুস (আ)-এর বিস্তারিত ঘটনা ঃ হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা যার কিছু কোরআনের এবং কিছু হাদীস ও ইতিহাসের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, তা এই যে, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় ইরাকের বিখ্যাত মূছিল এলাকার নেনওয়া নামক জনপদে বসবাস করত। কোরআনে

তাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইউনুস (আ)-কে পাঠান। তারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে। আল্লাহ্ তা'আলা ইউনুস (আ)-কে নির্দেশ দান করেন যেন এদের জানিয়ে দেন যে, তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের উপর আযাব নাযিল হবে। হযরত ইউনুস (আ) সম্প্রদায়ের মাঝে এ ঘোষণা দিয়ে দেন। অতঃপর ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এ বিষয়ে একমত হয় যে, আমরা কখনও ইউনুস (আ)-কে মিথ্যা বলতে শুনিনি। কাজেই তাঁর কথা উপেক্ষা করার মত নয়। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হলো যে, দেখা যাক, ইউনুস (আ) রাতের বেলা আমাদের মাঝে নিজের জায়গায় অবস্থান করেন কি না! যদি তিনি তাই করেন তবে বুঝব, কিছুই হবে না। আর যদি তিনি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যান, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করব যে, ভোরে আমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব নেমে আসবে। হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কথামত রাতের বেলায় সেই বস্তি থেকে বেরিয়ে যান। ভোর হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব এক কালো ধোঁয়া ও মেঘের আকারে তাদের মাথার উপর চক্রাবর্তের মত ঘুরপাক খেতে থাকে এবং আকাশ দিগন্তের নিচে তাদের নিকটবর্তী হয়ে আসতে থাকে। তখন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এবার আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। এ অবস্থা দেখে তারা হযরত ইউনুস (আ)-এর সন্ধান করতে আরম্ভ করে, যাতে তাঁর হাতে ঈমানের দীক্ষা নিতে এবং বিগত অস্বীকৃতির ব্যাপারে তওবা করে নিতে পারে। কিন্তু যখন হযরত ইউনুস (আ)-কে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন নিজেরা নিজেরাই একান্ত নির্মলচিত্তে, বিশুদ্ধ মনে তওবা-ইস্তিগফারের উদ্দেশ্যে জনপদ থেকে এক মাঠে বেরিয়ে গেল। সমস্ত নারী, শিশু এবং জীব-জন্তুকেও সে মাঠে এনে সমবেত করা হলো। চটের কাপড় পরে অতি বিনয়ের সাথে সে মাঠে তওবা-ইস্তিগফার এবং আযাব থেকে অব্যাহতি লাভের প্রার্থনায় এমনভাবে ব্যাপৃত হয়ে যায় যে, গোটা মাঠ আহাযারীতে গুঞ্জরিত হতে থাকে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবূল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দেন—যেমন এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের রিওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ দিনটি ছিল আশুরা তথা ১০ই মহররমের দিন।

এদিকে হযরত ইউনুস (আ) বস্তির বাইরে এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, এখনই এই সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল হবে। তাদের তওবা-ইস্তিগফারের বিষয় তাঁর জানা ছিল না। কাজেই যখন আযাব খণ্ডে গেল, তখন তাঁর মনে চিন্তা হলো যে, আমাকে (নির্ঘাৎ) মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করা হবে। কারণ আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, তিন দিনের মধ্যে আযাব এসে যাবে। এ সম্প্রদায়ে আইন প্রচলিত ছিল যে, যার মিথ্যা সম্পর্কে জানা যায় এবং সে যদি তার দাবির পক্ষে কোন সাফ-প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। অতএব, হযরত ইউনুস (আ)-এর মনে আশংকা দেখা দেয় যে, আমাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে হত্যা করে ফেলা হবে।

নবী-রাসূলগণ যাবতীয় পাপ-তাপ থেকে মা'সুম হয়ে থাকেন সত্য, কিন্তু মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি থেকে মুক্ত বা পৃথক থাকেন না। সুতরাং তখন ইউনুস (আ)-এর মনে স্বভাবতই এই ভাবনা উপস্থিত হয় যে, আমি আল্লাহ্র নির্দেশমতই ঘোষণা করেছিলাম, অথচ এখন আমি সে ঘোষণার কারণে মিথ্যুক প্রতিপন্ন হয়ে যাব! নিজের অবস্থানেই বা কোন্ মুখে ফিরে যাই এবং

সম্প্রদায়ের আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হই। এই দুঃখ-বেদনা ও পেরেশান অবস্থায় এ শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়েন। রোম সাগরের তীরে পৌঁছে সেখানে একটি নৌকা দেখতে পান। তাতে লোক আরোহণ করছিল। ইউনুস (আ)-কে আরোহীরা চিনতে পারল এবং বিনা ভাড়ায় তুলে নিল। নৌকা রওয়ানা হয়ে যখন মধ্য নদীতে গিয়ে পৌঁছল, তখন হঠাৎ তা থেমে গেল; না সামনে যেতে পারছিল, না পিছনের দিকে ফিরে আসতে পারছিল। নৌকার আরোহীরা ঘোষণা করল যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের এই নৌকার এমনই গুণ যে, এতে যখনই কোন জালিম, পাপী কিংবা ফেরারী গোলাম আরোহণ করে, তখন এটি নিজে নিজেই থেমে যায়। কাজেই যে লোক এমন, তাকে তা প্রকাশ করে ফেলাই উচিত, যাতে একজনের জন্য সবার উপর বিপদ না আসে।

হযরত ইউনুস (আ) বলে উঠলেন, "আমি ফেরারী গোলাম, পাপীটি আমিই বটে।" কারণ নিজের শহর থেকে পালিয়ে তাঁর নৌকায় আরোহণ করাটা ছিল একটি স্বভাবজাত ভয়ের দরুন, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে নয়। এই বিনা অনুমতিতে এদিকে চলে আসাকে হযরত ইউনুস (আ)-এর পয়গম্বরসুলভ মর্যাদা একটি পাপ হিসাবেই গণ্য করল। কেননা পয়গম্বরের কোন গতিবিধি আল্লাহ্‌র বিনা অনুমতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্যই বললেন, আমাকে সাগরে ফেলে দিলে তোমরা সবাই এ বিপদ থেকে বেঁচে যাবে; কিন্তু নৌকার লোকেরা তাতে সম্মত হলো না, বরং তারা লটারি করল যে, লটারিতে যার নাম উঠবে, তাকেই সাগরে ফেলে দেয়া হবে। দৈবক্রমে লটারিতেও হযরত ইউনুস (আ)-এর নামই উঠল। সবাই এতে বিস্মিত হলো। তখন কয়েকবার লটারি করা হলো এবং সব কয়বারই আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম অনুয়ায়ী ইউনুস (আ)-এর নাম উঠতে থাকল। কোরআন করীমে এই লটারি এবং তাতে হযরত ইউনুস (আ)-এর নাম ওঠার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে : فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ

ইউনুস (আ)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলার এ আচরণ ছিল তাঁর বিশেষ পয়গম্বরোচিত মর্যাদারই কারণ। যদিও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কোন হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি যাকে পাপ বলে গণ্য করা যায় এবং কোন পয়গম্বরের দ্বারা তার সম্ভাবনাও নেই—কারণ, তারা হলেন মা'সুম তথা নিষ্পাপ, কিন্তু তা পয়গম্বরের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে এমনটি শোভন ছিল না যে, শুধুমাত্র স্বাভাবিক ভয়ের দরুন আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়াই কোথাও স্থানান্তরিত হবেন। এই মর্যাদাবহির্ভূত কাজের জন্য ভর্ৎসনা হিসাবেই এ আচরণ করা হয়েছে।

এদিকে লটারিতে নাম ওঠার ফলে সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল আর অপরদিকে একটি মহাকায় মাছ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে নৌকার কাছে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়েছিল, যাতে তিনি সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে নিজের পেটে ঠাঁই করে দিতে পারে। তাঁকে পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, ইউনুস (আ)-এর দেহ যা তোমার পেটের ভেতরে রাখা হবে, তা কিন্তু তোমার আহার্য নয়; বরং আমি তোমার পেটকে তার আবাস করছি। সুতরাং ইউনুস (আ) সাগরে পৌঁছার সাথে সাথে সে মাছ তাঁকে মুখে নিয়ে নিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত ইউনুস (আ) এ মাছের পেটে

চল্লিশ দিন ছিলেন। সে তাঁকে মাটির তলদেশ পর্যন্ত নিয়ে যেত এবং বহু দূর-দূরান্তে নিয়ে বেড়াত। কোন কোন মনীষী সাত দিন, কেউ কেউ পাঁচ দিন আবার কেউ কেউ এক দিনের কয়েক ঘন্টাকাল মাছের পেটে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।—(মাযহারী)

তবে প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। এ অবস্থায় হযরত ইউনুস (আ) দোয়া করেন ঃ

لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ –

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ইউনুস (আ)-কে সাগর তীরে ফেলে দেন।

মাছের পেটের উষ্ণতার দরুন তাঁর শরীরে কোন লোম ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছাকাছি একটি লাউ গাছ গজিয়ে দেন, যার পাতার ছায়া হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য এক প্রশান্তি হয়ে যায়। আর এক বন্য ছাগলকে আল্লাহ্ ইশারা দিয়ে দেন, সে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে এসে দাঁড়াত, আর তিনি তার দুধ পান করে নিতেন।

এভাবে হযরত ইউনুস (আ)-এর প্রতি তাঁর পদস্খলনের জন্য সতর্কীকরণ হয়ে যায়। আর পরে তাঁর সম্প্রদায়ও বিস্তারিত অবস্থা জানতে পারে।

এ কাহিনীতে যে অংশগুলো কোরআনে উল্লেখ রয়েছে কিংবা প্রামাণ্য হাদীসের রিওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলো তো সন্দেহাতীতভাবে সত্য, কিন্তু বাকি অংশগুলো ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে গৃহীত, যার উপর শরীয়তের কোন মাস'আলার ভিত রাখা যায় না।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۭ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ

حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۹۹﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

---

(৯৯) আর তোমার পরওয়ারদিগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসত সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে ঈমান আনার জন্য ? (১০০) আর কারো ঈমান আনা হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্র হুকুম হয়। পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদের উপর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সেসব জাতি ও জনপদের কি বৈশিষ্ট্য) যদি আপনার পরওয়ারদিগার চাইতেন, তবে সমগ্র বিশ্ববাসী ঈমান নিয়ে আসত। (কিন্তু কোন কোন বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তিনি তা

চাননি। ফলে সবাই ঈমান আনেনি।) সুতরাং (ব্যাপারটি যখন এমন, তখন) আপনি কি লোকদেরকে জবরদস্তি করতে পারেন, যার ফলে তারা ঈমান নিয়ে আসবে? অথচ কারো ঈমান আনা আল্লাহর হুকুম (তথা তাঁর ইচ্ছা) ছাড়া সম্ভব নয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা আরোপ করে দেন।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

(১০১) তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমূহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতি প্রদর্শনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না। (১০২) সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই, যার অপেক্ষা করবে, কিন্তু সেসব দিনের মতই দিন, যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে! আপনি বলুন, এখন পথ দেখ; আমিও তোমাদের সাথে পথ চেয়ে রইলাম। (১০৩) অতঃপর আমি বাঁচিয়ে নেই নিজের রাসূলগণকে এবং তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এমনিভাবে। ঈমানদারদের বাঁচিয়ে নেয়া আমার দায়িত্বও বটে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, তোমরা লক্ষ্য কর (এবং দেখ,) কি কি বস্তু রয়েছে আসমান ও যমীনে। (আকাশের তারকারাজি প্রভৃতি এবং যমীনের অসংখ্য সৃষ্টি দেখ অর্থাৎ তা লক্ষ্য করলে তওহীদ তথা একত্ববাদের যৌক্তিক দলীল পাওয়া যাবে। এই হলো তাদের মুকাল্লাফ হওয়ার বর্ণনা।) আর যারা (ঈর্ষাবশত) ঈমান আনে না, তাদের জন্য যুক্তি-প্রমাণ এবং তাম্বি তাকীদে কোন লাভ হবে না (এই হলো তাদের ঈর্ষার বর্ণনা)। কাজেই (তাদের এই ঈর্ষাপূর্ণ অবস্থায় এমন প্রতীয়মান হয় যে,) তারা (অবস্থানুযায়ী) শুধুমাত্র তাদেরই অনুরূপ ঘটনার অপেক্ষা করছিল যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। (অর্থাৎ দলীল-প্রমাণ ও ভর্ৎসনা সত্ত্বেও যারা ঈমান আনেনি, তাদের অবস্থা সে লোকেরই অনুরূপ, যারা এমন আযাবের অপেক্ষায় থাকে যা বিগত কোন উম্মতের উপর এসে গিয়েছিল। সুতরাং) আপনি বলে দিন, তাহলে তাই হোক, তোমরা (এরই) অপেক্ষা থাক। আমিও তোমাদের সাথে (এর) অপেক্ষায় থাকলাম। (অতীতে যেসব সম্প্রদায়ের উপর আযাব আগমনের কথা উল্লেখ ছিল, তাদের উপর আযাব আরোপ করতামই) ; অতঃপর আমি (এ আযাব হতে) স্বীয় পয়গম্বর এবং ঈমানদারগণকে বাঁচিয়ে রাখতাম। (যেমন করে

নাজাত দিয়েছিলাম সে সমস্ত মু'মিনকে) তেমনি করে আমি সমস্ত মু'মিনকে নাজাত দান করে থাকি। (প্রতিশ্রুতি মুতাবিক) এটি হলো আমার দায়িত্ব। (অতএব, এভাবে যদি এসব কাফিরের উপর কোন বিপদ নাযিল হয়, তাহলে মুসলমানগণ তা থেকে হিফাযতে থাকবে, তা দুনিয়াতেই হোক কিংবা আখিরাতে)।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۖ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِنْ
يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

(১০৪) বলে দাও—হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাক, তবে (জেনো) আমি তাদের ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর আল্লাহ্ ব্যতীত। কিন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি তুলে নেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (১০৫) আর যেন সোজা দীনের প্রতি মুখ করি সরল হয়ে এবং যেন মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হই। (১০৬) আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুত তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (১০৭) আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদের) বলে দিন, হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহ (ও দ্বন্দ্বে) থেকে থাক তবে (আমি তোমাদেরকে এর তাৎপর্য বলে দিচ্ছি—তা হলো এই যে,) আমি

সেসব উপাস্যের ইবাদত করি না আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে, তোমরা যাদের ইবাদত কর। তবে অবশ্য আমি সে উপাস্যের ইবাদত করি যিনি তোমাদের জান কবজ করেন। আর (আল্লাহ্র তরফ থেকে) আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যেন আমি (এমন উপাস্যের উপর) ঈমান গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকি এবং (আমার উপর) এই (নির্দেশ হয়েছে) যেন আমি নিজে দীন (অর্থাৎ উল্লিখিত বিশুদ্ধ তওহীদ)-এর প্রতি এমনভাবে মনোনিবেশ করি যাতে অন্যান্য মতবাদ থেকে আলাদা হয়ে যাই এবং কখনও যেন মুশরিক না হই। আর (এ নির্দেশ হয়েছে যে,) আল্লাহ্ (তা'আলার একত্ববাদ)-কে পরিহার করে এমন বস্তুর ইবাদত করবে না, যা তোমাকে না (ইবাদত করার প্রেক্ষিতে) কোন উপকার করতে পারে আর না (ইবাদত পরিহার করার প্রেক্ষিতে) কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। অতঃপর যদি (ধরে নেওয়া হয়) এমন কর (অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত কর,) তাহলে এমতাবস্থায় (আল্লাহ্ তা'আলার) হক বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং (আমাকে একথা বলা হয়েছে যে,) যদি (তোমার উপর) আল্লাহ্ তা'আলা কোন কষ্ট আরোপ করেন, তবে শুধুমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ তা সরাবার মত নেই। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন সুখ দান করতে চান তবে তাঁর অনুগ্রহকে সরবার মতও কেউ নেই। (বরং) তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি নিজের অনুগ্রহ থেকে যাকে ইচ্ছা দিতে পারেন। তিনি মহান ক্ষমাশীল, করুণাময় (বস্তুত অনুগ্রহের সমস্ত প্রকারই মাগফিরাত ও রহমতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তিনি যেহেতু মাগফিরাত ও রহমতের গুণে গুণান্বিত, কাজেই তিনি অবশ্যম্ভাবীভাবেই অনুগ্রহশীলও বটেন)।

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا
يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾
وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

(১০৮) বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই। (১০৯) আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ্। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (একথাও) বলে দিন যে, হে মানবকুল, তোমাদের নিকট তোমাদের পরওয়াদিগারের পক্ষ থেকে (প্রমাণাদিসহ) সত্য (দীন) এসে পৌঁছে গেছে। অতএব, (এর আগমনের পর) যে

লোক সরল পথে এসে যাবে, সে তার নিজের লাভের জন্যই সরল পথে আসবে, আর যে লোক (এখনও) বিপথে থাকবে, তার (এই) বিপথগামিতা (অর্থাৎ এর অনিষ্টও) তারই উপর পতিত হবে। তাছাড়া আমাকে তোমাদের উপর (দায়ী হিসাবে) চাপিয়ে দেওয়া হয়নি (যে, তোমাদের বিপথগামিতার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং এতে আমার কি ক্ষতি ?) আর আপনি তারই অনুসরণ করতে থাকুন যা কিছু আপনার প্রতি ওহী করা হয়। (এতে অন্যান্য আমলের সাথে সাথে তবলীগের বিষয়টিও এসে গেছে।) আর (তাদের কুফরী ও দুঃখ দানের ব্যাপারে) সবর করুন যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা (সে সবের) মীমাংসা করে দেন। (তা দুনিয়াতে ধ্বংসের সম্মুখীন করেই হোক কিংবা আখিরাতে আযাব দানের মাধ্যমেই হোক। আপনি আপনার ব্যক্তিগত ও পদগত কাজে নিয়োজিত থাকুন; তাদের ব্যাপারে ভাববেন না।) বস্তুত তিনিই হচ্ছেন মীমাংসাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম (মীমাংসাকারী)।

سورة هود

সূরা হুদ

মক্কা অবতীর্ণ, আয়াত ১২৩, রুকূ ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝١ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا

اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۝٢ وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ

يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝٣ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٤ اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ

يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٥

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ, লা-ম, রা; এ এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে! (২) যেন তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তারই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশি করে দেবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। (৪) আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৫) জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহ্‌র নিকট হতে লুকাতে পারে। শুন, তারা তখন কাপড়ে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত

করে, তিনি তখনও জানেন যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যভাবে বলে। নিশ্চয় তিনি জানেন যা কিছু অন্তরসমূহে নিহিত রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ, লা-ম, রা (এর সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা জানেন)। এটি (অর্থাৎ কোরআন পাক) এমন এক বিস্ময়কর কিতাব, যার আয়াতসমূহ (অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে) সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অতঃপর সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনাও করা হয়েছে। এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার (অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'আলার) পক্ষ হতে (এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে)। যার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত-উপাসনা করবে না; (হে রাসূল, আপনি বলুন—নিশ্চয়) আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে (ঈমান না আনার কারণে আযাব সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শনকারী, আর ঈমান আনার জন্য পুরস্কারের সুখবরদাতা। আর (এ গ্রন্থের আরো একটি অন্যতম উদ্দেশ্য) এই যে, তোমরা যেন নিজেদের (শিরক, কুফরী প্রভৃতি) পাপ হতে তোমাদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (অর্থাৎ ঈমান আনয়ন কর এবং) অতঃপর তাঁরই প্রতি (উপাসনার মাধ্যমে) মনোনিবেশ কর। (অর্থাৎ সর্বদা সৎকার্য করতে থাক। তাহলে ঈমান ও সৎকার্যের দৌলতে) তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময়সীমা (অর্থাৎ মৃত্যুকাল) পর্যন্ত (পার্থিব জীবনে) উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন। আর অধিক সৎকর্মশীলকে অধিকতর প্রতিদান দেবেন। (একথাও সুখবর দানকারী হিসাবে বলা হয়েছে।) পক্ষান্তরে তোমরা যদি (ঈমান আনয়ন করা হতে) বিমুখ হয়ে থাক, তাহলে (এমতাবস্থায়) আমি তোমাদের উপর এক মহাদিবসের আযাবের আশঙ্কাবোধ করছি। (এ সংবাদ সতর্ককারী হিসাবে বলা হয়েছে।) আর আল্লাহ্র আযাবকে সুদূর পরাহত মনে করো না। কারণ আল্লাহ্র সান্নিধ্যে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। আর তিনি তো সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। [অতএব, তাঁর আযাবকে দূরে মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই। অবশ্য যদি তাঁর সান্নিধ্যে তোমাদের উপস্থিত হতে না হতো অথবা (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান না হতেন, তাহলে হয়ত আযাব না হতে পারত। কাজেই ঈমান ও একত্ববাদ হতে বিমুখ থাকা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও ইলমই তওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।] জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা নিজেদের বুকে বুক মিলিয়ে নেয়, আর উপরে কাপড় জড়িয়ে নেয়, যেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে নিজেদের মনোভাব ও দুরভিসন্ধি লুকাতে পারে; অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় অতি সংগোপনে, চুপিসারে রেখে-ঢেকে কথা বলে। যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন, এবং যারা আপনার প্রতি যে ওহী হয় তা বিশ্বাস করে, তারা এমনটি করবে না। কারণ এহেন অপকৌশলের আশ্রয় নেয়া বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ হতে গোপন করার অপচেষ্টারই শামিল। জেনে রাখ, তারা যখন বুকে বুক মিলিয়ে নিজেদের কাপড় (নিজেদের উপর

জড়িয়ে নেয়) তখনও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবকিছু জানেন, যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যভাবে বলে। (কেননা) নিশ্চয়ই তিনি জানেন যা কিছু কল্পনা বা মনোভাব মানুষের অন্তরসমূহে নিহিত রয়েছে (সুতরাং মুখে উচ্চারিত কথাবার্তা কেন তাঁর জানা থাকবে না ?)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হূদ ঐসব সূরার অন্যতম, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত আল্লাহ্র গযব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবের এবং পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কারণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একদিন হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর কিছু দাড়ি-মুবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।" তখন রাসূলে পাক (সা) ইরশাদ করেছিলেন, "হ্যাঁ, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" তখন কোন কোন রিওয়ায়েতে সূরা হূদের সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা'আলুন এবং সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। —(আল-হাকেম ও তিরমিযী শরীফ)। উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

অত্র সূরার প্রথম আয়াত 'আলিফ লাম-রা' বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকেই এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি; বরং এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে।

অতঃপর কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। محكم শব্দ احكام হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোন বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন ভুল বা বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই। (তফসীরে কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে مُحْكَمْ শব্দ مَنْسُوْخْ-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে— আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকের আয়াতসমূহকে সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিতরূপে তৈরী করেছেন। তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পবিত্র কোরআন নাযিলের ফলে যেভাবে 'মনসূখ' বা রহিত হয়েছে কোরআন পাক নাযিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না—(কুরতুবী)। তবে কোরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য আয়াতেই ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কুরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। تفصيل শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য

ও ব্যবধান করা। সেজন্যেই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু فصل - فصل শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসাবে অত্র আয়াতের মর্ম হবে, আকায়িদ, ইবাদত, আদান-প্রদান, আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কোরআন মজীদ একসাথে লওহে মাহফুযে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমান্বয়ে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ এসব আয়াত এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ, যাঁর প্রতিটি কার্যে বহু রহস্য ও হিকমত বিদ্যমান—যা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি-নিষেধ নাযিল করেন। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্ধারিত সীমারেখার গণ্ডিতে আবদ্ধ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতেই তাদের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যতকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইলম ও হিকমত কখনো ভুল হবার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ তওহীদের উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না।" আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত-উপাসনা করবে না।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন ঃ اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ "নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।" অত্র আয়াতে বিশ্বনবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি সারা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচরণকারী এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী, তাদেরকে আল্লাহ্র ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরদিকে অনুগত, বাধ্যগত লোকদের দোজাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

نذير শব্দের অর্থ করা হয়, 'ভীতি প্রদর্শনকারী'। কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্র জন্তু বা অন্য কোন অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না। বরং এমন ব্যক্তিকে 'নাযীর' বলা হয় যিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রগণকে সস্নেহে এমন সব বস্তু বা কার্য হতে বিরত রাখেন ও ভয় দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখিরাত অথবা উভয় কালেই ক্ষতিকারক।

তৃতীয় আয়াতে কোরআন হিদায়েতসমূহের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিদায়েত এভাবে দেয়া হয়েছে-- وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ অর্থাৎ মুহ্কাম আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা

স্বীয় বান্দাগণকে এ পথনির্দেশ দিয়েছেন যে, "তারা যেন স্বীয় পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে।" ক্ষমার সম্পর্ক পূর্বকৃত গুনাহ্‌সমূহের সাথে আর তওবার সম্পর্ক ভবিষ্যতে পুনরায় তার কাছেও না যাওয়ার অঙ্গীকারের সাথে। অতএব পূর্বকৃত গোনাহ্‌র জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আগামীতে পুনরায় তা না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাই হলো সত্যিকার তওবা। এজন্যই কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, ভবিষ্যতে গোনাহ্ হতে বিরত থাকার সংকল্প ছাড়া মৌখিক তওবা করা হলো توبة كـذابين (অর্থাৎ) মিথ্যাবাদীদের তওবা। (কুরতুবী)। অনুরূপভাবে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ استغفا رما معصيت راخنده مى أيدزا অর্থাৎ আমাদের তওবা দেখে খোদ গোনাহ্‌রও হাসি পায়। অন্য কথায় এ ধরনের তওবা হতে তওবা করা উচিত।

অতঃপর সত্যিকার তওবাকারীদের জন্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঃ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا الى أَجَلٍ مُّسَمًّى বলে। অর্থাৎ যারা পূর্বকৃত গোনাহ্ হতে সত্যিকারভাবে তওবা করে, ভবিষ্যতে তাতে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ও সতর্কতা অবলম্বন করে, তাদের শুধু ক্ষমাই করা হয় না, বরং তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবন দান করা হবে। পার্থিব নশ্বর জীবন ও আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন উভয়ই অত্র সুসংবাদের আওতাভুক্ত। যেমন অন্য এক আয়াতে এরূপ তওবাকারী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً অর্থাৎ "আমি অবশ্যই তাকে সুখময় জীবন দান করব।" অত্র আয়াত সম্পর্কেও অধিকাংশ তফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, এখানে ইহজীবন ও পরজীবন উভয়ই শামিল রয়েছে। সূরা নূহে তওবাকারীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا অর্থাৎ "যদি তোমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে রহমত বর্ষণ করবেন। ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা তোমাদের মদদ করবেন এবং তোমাদেরকে বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহ দান করবেন। এখানে রহমত বর্ষণ, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা পার্থিব নিয়ামতসমূহ বোঝানো হয়েছে এবং বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহ দ্বারা আখিরাতের নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে مَتَاعًا حَسَنًا শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেন—ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবার ফলশ্রুতিস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রিযিকের সচ্ছলতা ও প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সহজলভ্য করে দেবেন, সর্বপ্রকার আযাব ও অনিষ্ট হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। তবে পার্থিব জীবন যেহেতু একদিন শেষ হয়ে যাবে, কাজেই এর সুখ-শান্তিও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং الى أَجَلٍ مُّسَمًّى বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, ইহজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বজায় থাকবে। অতঃপর মৃত্যু এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। মৃত্যুর পরক্ষণেই আখিরাতের অন্তহীন জীবন শুরু হবে। তওবাকারীদের জন্য সেখানেও অফুরন্ত আরাম-আয়েশের বিপুল আয়োজন করা হয়েছে।

হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, এখানে مَتَاعًا حَسَنًا দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টির দিক থেকে সরে স্রষ্টার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া। কোন কোন বুযুর্গ বলেন متاع حسن অর্থ হচ্ছে, যা

আছে তার উপর তুষ্ট থাকা আর যা খোয়া গেছে তার জন্য বিষণ্ণ না হওয়া। অর্থাৎ বৈষয়িক সামগ্রী বৈধভাবে যতটুকু অর্জিত হয় তাতে সন্তুষ্ট থাকা আর যা অর্জিত নয় সেজন্য পেরেশান না হওয়া।

ইস্তিগফার ও তওবাকারীদের জন্য দ্বিতীয় খোশখবরী শোনানো হয়েছে ঃ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهُ এখানে প্রথম فضل দ্বারা মানুষের নেক আমল এবং দ্বিতীয় ঃ فضل দ্বারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অর্থাৎ বেহেশত বোঝানো হয়েছে। সুতরাং অত্র আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, প্রত্যেক সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে তার সৎকর্ম অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস দান করবেন।

প্রথম বাক্যে পার্থিব ও পারলৌকিক—উভয় জীবনে সুখ-সচ্ছলতার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে আখিরাতের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ অর্থাৎ এতসব নীতিবাক্য ও হিতোপদেশ সত্ত্বেও যদি তোমরা বিমুখ হও, পূর্বকৃত গোনাহ্ হতে ক্ষমা প্রার্থনা না কর এবং ভবিষ্যতে তা হতে বিরত থাকতে বদ্ধপরিকর না হও, তাহলে আমার ভয় হয় যে, এক মহাদিনের আযাব এসে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে মহাদিন বলে কিয়ামতের দিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা ব্যক্তির দিক দিয়ে সে দিনটি হবে হাজার বছরের সমান। আর সঙ্কট ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে তার চেয়ে বড় কোন দিন নেই।

পঞ্চম আয়াতেও পূর্বোক্ত বিষয়বস্তুর উপরই জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবনে তোমরা যা কিছু কর আর যেভাবেই জীবন-যাপন কর না কেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সর্বশক্তিমান, তার জন্য কোন কার্যই দুঃসাধ্য বা দুষ্কর্ম নয়। তোমাদের মৃত্যু এবং মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর তোমাদের সমস্ত অণুকণাসমূহ একত্র করে তিনি তোমাদেরকে পুনরায় মানুষরূপে দাঁড় করাতে সক্ষম।

ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ও বদভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলে পাক (সা)-এর সাথে তাদের বৈরিতা ও বিদ্বেষকে গোপন রাখার ব্যর্থ-প্রয়াসে লিপ্ত। তাদের অন্তরস্থ হিংসা ও কুটিলতার আগুনকে ছাইচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। তাদের ভ্রান্ত ধারণা যে, বুকের উপর চাদর আচ্ছাদিত করে রাখলে এবং চুপে চুপে চক্রান্ত করলে তাদের কুটিল মনোভাব ও দুরভিসন্ধির কথা কেউ জানতে বা আঁচ করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাবস্থায় তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত রয়েছেন। কেননা, اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ। তিনি তো অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহিত গুপ্ত ভেদের কথাও পূর্ণ ওয়াকিফহাল, কোন সন্দেহ নেই।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦ وَهُوَ الَّذِيْ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾ وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ
الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ
مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨﴾

(৬) আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাহিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। (৭) তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে; তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে, তখন কাফিররা অবশ্য বলে, "এটা তো স্পষ্ট যাদু।" (৮) আর যদি আমি এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তাদের আযাব স্থগিত রাখি, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে—কোন জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে ? শুনে রাখ, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়; তারা যে ব্যাপারে উপহাস করত তাই তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর পৃথিবীতে বিচরণশীল (আহার্য-পানীয় ইত্যাদি জীবিকার মুখাপেক্ষী) প্রাণ নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা নেননি। (রিযিক পৌঁছানোর জন্য ইলম থাকা অপরিহার্য। তাই) প্রত্যেকের অধিককাল অবস্থানের জায়গা এবং স্বল্পকাল অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে তিনি অবগত (এবং সবাইকে সেখানেই রিযিক পৌঁছে দেন।) আর যদিও সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌মে রয়েছে, সাথে সাথে এক সুবিন্যস্ত কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহ্‌ফুজে) লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত রয়েছে। (অতঃপর সৃষ্টির রহস্য বলা হচ্ছে, যা দ্বারা কিয়ামতে পুনরায় সৃষ্টি করা সমর্থিত ও প্রমাণিত হয়। কেননা প্রথমবার নজীরবিহীনভাবে তিনি যখন সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তখন দ্বিতীয়বারও অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারবেন।) আর তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) এমন এক মহান সত্তা যিনি মাত্র ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিন পরিমাণ সময়ে আকাশ ও ভূমণ্ডলকে) সৃষ্টি করেছেন। তখন পানির উপর তাঁরই আরশ ছিল। (যেন এ দু'টি পূর্ব থেকেই সৃষ্ট ছিল। আর এই নবসৃষ্টি ছিল এ কারণে) যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের

মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। (অর্থাৎ তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তার মাধ্যমে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রেখেছেন যেন তোমরা তা অবলোকন করে আল্লাহ্র একত্ববাদকে উপলব্ধি করতে পার এবং তাতে তা দ্বারা উপকৃত হয়ে নিয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর) এবং তাঁর আনুগত্য ও খিদমত কর, (অর্থাৎ বেশি বেশি নেক আমল কর।) কিন্তু কেউ সৎকার্য করল, আর কেউ-তা করল না। আর আপনি যদি (লোকদেরকে বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন) পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে, তখন (তাদের মধ্যে) যারা অবিশ্বাসী তারা (কোরআন সম্পর্কে) বলে, 'এটি তো স্পষ্ট যাদু'। [কোরআনকে যাদু বলার কারণ এই যে, যাদু যেমন ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়াশীল, তদ্রূপ কোরআন পাককেও তারা ভিত্তিহীন মনে করত (নাউযুবিল্লাহ্), কিন্তু এর আয়াতসমূহের ক্রিয়াশীলতা তারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিল। তাই উভয় দিক বিবেচনা করে তারা কোরআনকে যাদু বলে অভিহিত করেছে। তাই সামনে তার জবাব দেয়া হচ্ছে—] আর কতিপয় হিকমত ও বিশেষ রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমি এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত (অর্থাৎ পার্থিব জীবনে) সাময়িকভাবে তাদের থেকে প্রতিশ্রুত আযাবকে স্থগিত রাখি, তবে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলতে থাকে যে, আপনার কথা মতে (আমরা যখন শাস্তিযোগ্য অপরাধী তবে) এখন শাস্তি হচ্ছে না কেন ? কোন্ জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে ? (অর্থাৎ সত্যিই যদি আযাব থাকত, তাহলে এতদিনে অবশ্যই আপতিত হতো। তা যখন অদ্যাবধি হচ্ছে না, কাজেই ভবিষ্যতেও হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা জবাব দিচ্ছেন—) শুনে রাখ, যেদিন নির্ধারিত সময়ে তাদের উপর তা (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত আযাব) এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়। (কেউ বাধা দিয়ে তার গতি রোধ করতে পারবে না। বরং) তারা যে আযাব সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, সে আযাবই তাদের ঘেরাও করবে। (অর্থাৎ রহস্যগত কতিপয় বিশেষ কারণে আযাব আসার জন্য সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। অতঃপর যথাসময়ে আযাব যখন আসবে, তখন কেউই রেহাই পাবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার ইলমের ব্যাপকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু এবং মানুষের মনের গোপন কল্পনাও তাঁর অজানা নয়। অতঃপর তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে মানুষের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের আহার্য-পানীয় ইত্যাদি রিযিকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। শুধু মানুষেরই নয়, পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী যেখানেই অবস্থান করুক বা চলে যাক না কেন, সেখানেই তার রিযিক পৌঁছতে থাকবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র নিকট হতে কিছু গোপন করার জন্য কাফিরদের অপকৌশল ও ব্যর্থপ্রয়াস বোকামি এবং মূর্খতা বৈ নয়। এখানে من শব্দ বৃদ্ধি করে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ বলে আয়াতের ব্যাপকতার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে যে, অন্য হিংস্র জন্তু, পক্ষীকুল, গুহাবাসী সরীসৃপ, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, সামুদ্রিক প্রাণী প্রভৃতি সবই অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত। সকলের রিযিকের দায়িত্বই আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

دَابَّةٌ (দাব্বাতুন) এমনসব প্রাণীকে বলে, যা পৃথিবীতে বিচরণ করে। পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্বই তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যার দ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। ইরশাদ করেছেন ঃ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا 'উহাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত।' একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই। বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে এ দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এটা এক পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যা নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থে এখানে على শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—যা ফরয বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহ্‌র উপর কোন কাজ ফরয বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না।

رِزْق রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোন প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যা দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিযিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল জীবজন্তু রিযিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা সেটার মালিক হয় না। কারণ মালিক হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। রিযিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ওলামায়ে কিরাম বলেন, রিযিক হালালও হতে পারে হারামও হতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে, তখন উক্ত বস্তু তার রিযিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কারণে তা তার জন্য হারাম হয়েছে। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত রিযিক বৈধ পন্থায়ই তার নিকট পৌঁছে যেত।

রিযিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা নিজে গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার কথা নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায় অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, অনাহারে ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়। এর রহস্য কি ? ওলামায়ে কিরাম এ প্রশ্নের বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন।

তন্মধ্যে এক জবাব হচ্ছে, এখানে রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কারণেই মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ হওয়া, সলিল সমাধি লাভ করা, আঘাত বা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রিযিক বন্ধ করে দেওয়ার কারণে অনাহারও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি, আসলে তাদের রিযিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অতঃপর রোগ-ব্যাধি

বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিযিক সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহারে ও ক্ষুধা-পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (র) অত্র আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবূ মূসা (রা) ও হযরত আবূ মালেক (রা) প্রমুখ আশ'আরী গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়ামন হতে হিজরত করে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। তাঁদের সাথে পাথেয়স্বরূপ আহার্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তাঁরা নিজের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হযরত (সা)-এর সমীপে প্রেরণ করলেন, যেন রাসূলে করীম (সা) তাদের জন্য কোন আহার্যের সুব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন রাসূলে আকরাম (সা)-এর গৃহদ্বারে হাযির হলেন, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রাসূলে পাক (সা)-এর কোরআন তিলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি ভেসে এল ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্ গ্রহণ করেন নি (উক্ত সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশ'আরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন—"শুভ সংবাদ, তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসছে।" তাঁরা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের দুরবস্থার কথা রাসূলে পাক (সা)-কে অবহিত করার পর তিনি তাঁদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে বসে রইলেন। তাঁরা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত-রুটিপূর্ণ একটি قَصْعَةٌ অর্থাৎ বড় খাঞ্চা বহন করে উপস্থিত হয়ে আশ'আরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশ'আরী গোত্রের লোকদের আহার করার পরও প্রচুর রুটি-গোশত অবশিষ্ট রয়ে গেল। তখন তাঁরা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

তারা খাঞ্চা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন— "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার প্রেরিত রুটি-গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে।" তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমি তো কোন খানা প্রেরণ করিনি।"

তখন তাঁরা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে একথা বলেছিলেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—"আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা তা প্রেরণ করেছেন—যিনি সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।"

কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, হযরত মূসা (আ) আগুনের খোঁজে তূর পাহাড়ে পৌঁছে আগুনের পরিবর্তে যখন সেখানে আল্লাহ্র নূরের তাজাল্লী দেখতে পেলেন, নবুয়ত ও রিসালাত

লাভ করলেন এবং ফিরাউন ও তার কওমকে হিদায়েতের জন্য মিসর গমনের নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, তখন তাঁর মনের কোণে উদয় হলো যে, আমি স্বীয় স্ত্রীকে জনহীন মরুপ্রান্তরে একাকিনী রেখে এসেছি, তার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে ? তখন আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ)-এর সন্দেহ নিরসনের জন্য আদেশ করলেন যে, "তোমার সম্মুখে পতিত প্রস্তরখানির উপর লাঠি দ্বারা আঘাত হান।" তিনি আঘাত করলেন। তখন উক্ত প্রস্তরখানি বিদীর্ণ হয়ে তার মধ্য হতে আরেকখানি পাথর বের হলো। দ্বিতীয় প্রস্তরখানির উপর আঘাত করার জন্য পুনরায় আদেশ হলো। হযরত মূসা (আ) আদেশ পালন করলেন। তখন তা ফেটে গিয়ে আরেকখানি প্রস্তর বের হলো। তৃতীয় পাথরখানির উপর আঘাত হানার জন্য আবার নির্দেশ দেওয়া হলো। তিনি আঘাত করলেন। তা বিদীর্ণ হলো এবং এর অভ্যন্তর হতে একটি জ্যান্ত কীট বেরিয়ে এল, যার মুখে ছিল একটি তরতাজা তৃণখণ্ড (সুবহানাল্লাহ্)। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতের একীন হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বেও ছিল। তবে বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। তাই এ দৃশ্য দেখার পর হযরত মূসা (আ) সরাসরি মিসর পানে রওয়ানা হলেন। সহধর্মিণীকে এটা বলা প্রয়োজন মনে করেন নি যে, মিসর যাওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রিযিক পৌঁছাবার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা ঃ অত্র আয়াতে "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন" বলেই ক্ষান্ত হন নি। বরং মানুষের আরো নিশ্চয়তা দান করার জন্য ইরশাদ করেছেন ঃ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ; আলোচ্য আয়াতে مستقر 'মুস্তাকার' ও مستودع 'মুস্তাওদা' শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন তফসীর বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে তফসীরে কাশশাফের ব্যাখ্যাই অধিক অভিধানসম্মত। তা হচ্ছে, 'মুস্তাকার' স্থায়ী বাসস্থান বা বাসভূমিকে বলে। আর অস্থায়ী ও সাময়িক অবস্থানস্থলকে 'মুস্তাওদা' বলা হয়।

সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মাদারীকে দুনিয়ার কোন ব্যক্তি বা শক্তির দায়িত্বের সাথে তুলনা করা চলে না। কারণ দুনিয়ার কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার যদি আপনার খোরাকীর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলেও কিছুটা পরিশ্রম আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। নির্দিষ্ট অবস্থান হতে আপনি যদি স্থানান্তরিত হতে চান, তবে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে যে, অমুক মাসের অত তারিখ হতে অত তারিখ পর্যন্ত আমি অমুক শহরে বা গ্রামে অবস্থান করব। অতএব, আমার খোরাকী সেখানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা হোক। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যিম্মাদারী গ্রহণ করলে এতটুকু মেহনতও করা লাগে না। কেননা তিনি তো সকল প্রাণীর প্রতিটি নড়াচড়া, উঠা-বসা, চলাফেরা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি যেমন আপনার স্থায়ী নিবাস জানেন, তেমনি সাময়িক আবাসও জ্ঞাত আছেন। কাজেই কোন আবেদন অনুরোধ ছাড়াই আপনার রেশন যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবেই।

আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাত্মক ইলম ও সর্বময় ক্ষমতার ফলে যাবতীয় কাজ সমাধার জন্য তাঁর ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। কোন কিতাব বা রেজিস্টারে লেখালেখির আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুর্বল মানুষ যে ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে রিযিক পৌঁছাতে ভুল-ভ্রান্তি

হওয়ার আশংকা তাদের অন্তরে সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং মনের খটকা দূর করে তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করার জন্য ইরশাদ করেছেন ঃ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ সবকিছুই এক খোলা কিতাবে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'খোলা কিতাব' বলে 'লওহে মাহফুয'কে বোঝানো হয়েছে। যার মধ্যে সমস্ত সৃষ্ট জীবের আয়ু, রুযী ও ভালমন্দ কার্যকলাপ পুংখানুপুংখরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা যথাসময়ে কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ ফরমান—আসমান ও যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের তাকদীর নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। (মুসলিম শরীফ)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একখানি দীর্ঘ হাদীস বয়ান করেন যার সারমর্ম হলো—মানুষ তার জন্মের পূর্বে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আসে। মাতৃগর্ভে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক একজন ফেরেশতা তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম, ভালমন্দ তার যাবতীয় কার্যকলাপ, যা সে জীবনভর করবে। দ্বিতীয়, তার আয়ুষ্কালের বর্ষ, মাস দিন, ঘন্টা, মিনিট ও শ্বাস-প্রশ্বাস। তৃতীয়, কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং কোথায় সমাধিস্থ হবে। চতুর্থ, তার রিযিক কি পরিমাণ হবে এবং কোন্ পথে তার কাছে পৌঁছবে। সুতরাং লওহে মাহফুযে আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ থাকা অত্র রিওয়ায়েতের বিপরীত নয়।

সপ্তম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম ইল্‌ম ও অসীম শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি মাত্র ছয় দিন পরিমাণ সময়ে সমগ্র আসমান ও যমীন সৃজন করেছেন। আর এসব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্‌র আরশ পানির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। এতদ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বেই পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টির ব্যাখ্যায় সূরা হা-মীম-সাজদার দশম ও একাদশ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে, দুই দিনে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছপালা এবং প্রাণীকুলের আহার্য ও জীবন ধারণের উপকরণাদি সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং দুই দিনে সাত আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে আছে যে, এখানে আসমান দ্বারা সমগ্র উর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে এবং যমীন দ্বারা সমস্ত নিম্নজগত বোঝানো হয়েছে। আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে যেহেতু সূর্যও ছিল না, তার উদয়-অস্তও ছিল না, সুতরাং দিনের অস্তিত্বও ছিল না। তবে এখানে 'দিন' বলে আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরবর্তী 'একদিন পরিমাণ' সময়কে বোঝানো হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা এক মুহূর্তে সবকিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা করেন নি। বরং স্বীয় হিকমতের প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে সৃজন করেছেন, যেন তা মানুষের প্রকৃতিসম্মত হয় এবং মানুষও সকল কাজে ধীরতা, স্থিরতা অবলম্বন করে।

আয়াতের শেষভাগে আসমান ও যমীন সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا। সবকিছু সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে— আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা করতে চাই যে, তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল।

এতে বোঝা যায় যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমলকারী মানুষের উপকারার্থে তা সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তারা এর মাধ্যমে নিজেদের জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং এর অপার রহস্য চিন্তা করে নিজেদের প্রকৃত মালিক ও পালনকর্তাকে চিনতে পারে।

সারকথা, আসমান ও যমীন সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে মানুষ। বরং মানুষের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং তাদের মধ্যে আবার যারা অধিক সৎকর্মশীল তাদের খাতিরেই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আমাদের প্রিয় নবী (সা)-ই সর্বাধিক সৎকর্মশীল ব্যক্তি। অতএব, একথা নির্ঘাত সত্য যে, হযরত রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র সত্তাই হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মূল কারণ। (তফসীরে মাযহারী)

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে أَحْسَنُ عَمَلًا-কে সবচেয়ে ভাল কাজ বলা হয়েছে, কিন্তু কে সর্বাধিক কাজ করে বলা হয়নি। অতএব, বোঝা যায় যে, নামায-রোযা, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ইত্যাদি যাবতীয় নেক কাজ সংখ্যায় খুব বেশি করার চেয়ে, সুন্দর ও নিখুঁতভাবে আমল করাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমলের এই সৌন্দর্যকে হাদীস শরীফে ইহ্সান বলা হয়েছে, যার সারকথা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমল করতে হবে। পার্থিব কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য জড়িত করবে না। আল্লাহ্র পছন্দনীয় পদ্ধতিতে আমল করতে হবে, যেভাবে মহানবী (সা) নিজে করে দেখিয়েছেন। আর তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা উম্মতের জন্য জরুরী সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা, সুন্নত তরীকা মুতাবিক ইখলাসের সাথে অল্প আমল করাও ঐ অধিক আমলের চেয়ে উত্তম যার মধ্যে উপরোক্ত গুণ দু'টি নেই অথবা কম আছে।

সপ্তম আয়াতে কিয়ামত ও আখিরাতকে অস্বীকারকারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের যে কথা বোধগম্য না হয় তাকেই তারা 'যাদু' বলে অভিহিত করে এড়িয়ে যেতে চায়।

অষ্টম আয়াতে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে, যারা আযাবের হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও নবীদের সতর্কবাণী গ্রাহ্য করত না; বরং বলত যে, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছেন, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে সে আযাব কেন আপতিত হচ্ছে না?

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ
عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ

إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ
أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ
ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ
فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

(৯) আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই; তাহলে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়। (১০) আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। (১১) তবে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (১২) আর সম্ভবত ঐসব আহ্‌কাম যা ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়, তার কিছু অংশ বর্জন করবে ? এবং এতে মন ছোট করে বসবে ? তাদের এ কথায় যে, তার উপর কোন ধনভাণ্ডার কেন অবতীর্ণ হয়নি ? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন ? তুমি তো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুর দায়িত্বভারই তো আল্লাহ্ নিয়েছেন। (১৩) তারা কি বলে ? কোরআন তুমি তৈরী করেছ ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস ; এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। (১৪) অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পূরণ করতে অপারক হয়; তবে জেনে রাখ এটা আল্লাহ্‌র ইল্‌ম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে; আরো একীন করে নাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। অতএব, এখন কি তোমরা আত্মসমর্পণ করবে ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেই, তাহলে সে হতাশ হয়ে পড়ে ও কৃতঘ্ন হয়। আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পর তাকে সুখ-ভোগ করতে দেই, তবে সে (গর্ব করে) বলতে থাকে যে, আমার সমস্ত অমঙ্গল চিরতরে দূর হয়ে গেছে (আর কোন দুঃখকষ্ট হবে না)। অতঃপর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহংকারে উদ্ধত হয়। কিন্তু যারা ধৈর্যধারণকারী ও সৎকর্মশীল (অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি) তাদের অবস্থা এমন নয়। (বরং তারা বিপদের সময়

ধৈর্যধারণ এবং সুখের সময় শুকরিয়া আদায় করে। অতএব,) তাদের জন্য ব্যাপক ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (সারকথা, ঈমানদার ব্যতীত অধিকাংশ লোকের অবস্থা হলো যে, তারা যেমন অল্পতেই নির্ভীক হয়ে যায়, তেমনি সামান্যতেই হতাশ হয়ে পড়ে। তাই আযাব বিলম্বিত হতে দেখে তারা নির্ভীক ও অমান্যকারী হয়ে পড়ে। আর তাদের অস্বীকার ও বিদ্রূপের কারণে) আপনি কি ঐসব আহ্‌কামের কিছু অংশ (অর্থাৎ তবলীগ করা) ছেড়ে দিতে চান যা ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করা হয়। ইহা সুস্পষ্ট যে, তবলীগের কাজ ছেড়ে দেওয়া আপনার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই তাদের একথায় আপনার মন ছোট করায় লাভ কি? যে, ইনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় না কেন ? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসে না কেন ? (যিনি আমাদের সাথেও কথাবার্তা বলবেন। এ ধরনের কোন প্রকাশ্য মু'জিযা দেখান না কেন ? যা হোক, তাদের এহেন অবাস্তব কথায় আপনি হতোদ্যম হবেন না। কেননা,) আপনি তো (কাফিরদের জন্য) শুধু ভীতি প্রদর্শনকারী (অর্থাৎ পয়গম্বর মাত্র। মু'জিযা দেখানো নবীর কোন জরুরী দায়িত্ব বা কর্তব্য নয়।) আর সবকিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, আপনি নন। কাজেই মু'জিযা প্রদর্শন করা আপনার ইখতিয়ার বহির্ভূত। অতএব, এই ধরনের চিন্তা বা এর ফলে সংকুচিত হওয়ার কোন কারণ নেই। অবশ্য পয়গম্বরগণের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ সাধারণত কোন মু'জিযা থাকা আবশ্যক। আর আপনার প্রধান মু'জিযা 'আল-কোরআন' তাদের সম্মুখে বর্তমান রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কোরআন পাককে অমান্য করার হেতু কি ? কোরআন সম্পর্কে তারা কি বলতে চায় ? তা আপনি নিজের পক্ষ থেকে তৈরী করেছেন ? (نعوذ بالله) তদুত্তরে আপনি বলুন—এ যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস। আর তোমাদের সহযোগিতার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাকে যাকে পার, ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের কথা অর্থাৎ কোরআনের অনুরূপ সূরাসমূহ রচনার দাবি পূরণে অপারক হয়, তখন তোমরা তাদেরকে বল যে, এখন বিশ্বাস কর, এই কিতাব আল্লাহ্‌র ইল্‌ম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কারো ইল্‌ম ও কুদরতের কোন দখল নেই। আর এও একীন করে নাও যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। কেননা মা'বুদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি থাকা অপরিহার্য। অন্য কোন মা'বুদ থাকলে সেও সর্বশক্তিমান হতো। উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তোমাদের সাহায্য করত। ফলে তোমাদের পক্ষে কোরআনের সমতুল্য কোন সূরা রচনা করতে অপারক হওয়া তওহীদ ও রিসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব তওহীদ ও রিসালত প্রমাণিত হওয়ার পর এখনও কি তোমরা মুসলমান হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহ রাসূলে করীম (সা)-এর রিসালতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে চঞ্চল প্রকৃতির ও জলদি-প্রিয়। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হতে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষকে আমার কোন নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাবার পর যদি তা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত-হারা হতাশ ও না-শোকর বনে যায়। আর তার উপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, তাহলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, মানুষ স্বভাবত জলদি-বাজ, বর্তমান অবস্থাকেই তারা সর্বস্ব মনে করে থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত নয়। কাজেই, সুখ-সমৃদ্ধির পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নিয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামি করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ-সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরূপভাবে দুঃখ-দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহঙ্কার করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসব সুখ-সম্পদ আমার যোগ্যতার পুরস্কার এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য। এ কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করে না যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রূপ বর্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে। چناں نماند چنیں نیز هم نخواهد ماند তা যেমন রয়নি এও তেমনি থাকবে না, থাকাটাই বরং অসম্ভব।

অতীত ও ভবিষ্যতকে ভুলে গিয়ে বর্তমান-পূজায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যাধি মানুষের মন-মগজকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, একজন ক্ষমতাসীনের রক্তমাখা মাটির উপর আরেকজন স্বীয় মসনদের ভিত্তি স্থাপন করে এবং কখনো পেছনে ফিরে তাকাবার সুযোগ হয় না যে, তার পূর্বসূরি একজন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিও ছিল, তার পরিণতি কত মর্মান্তিক হয়েছে। বরং ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করার নেশায় বুঁদ হয়ে এর শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে থাকে।

এহেন বর্তমান-পূজার ব্যাধি ও ভোগমত্ততার রোগ হতে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই আসমানি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, নবী-রাসূল (আ)-গণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা অতীত ইতিহাসের শিক্ষামূলক ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যৎ সাফল্যের চিন্তা সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন যে, সৃষ্টিজগতের পরিবর্তনশীল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখ, এক পরাক্রমশালী মহাশক্তি অন্তরাল হতে একে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন। তোমরাও তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চল। হযরত শায়খুল-হিন্দের ভাষায় বলতে হয় ঃ

انقلابات جہاں واعظ رب ہے دیکھو – ہر تغیر سے صدا اتی ہے فافہم فافہم

'জগতের পরিবর্তনসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ হতে উপদেশ দিচ্ছেন, প্রতিটি পট-পরিবর্তন ডাক দিয়ে যায়—উপলব্ধি কর, অনুধাবন কর।' পূর্ণ ঈমানদার তথা সত্যিকার মানুষ ঐসব ব্যক্তি যারা সাময়িক সুখ-দুঃখ ও বস্তুজগতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন না। বরং সকল সুখ-দুঃখ, প্রতিটি

আবর্তন-বিবর্তন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল এক মহাশক্তিকে অনুধাবন করেন। কার্যকারণের পেছনে না ছুটে বরং তার মূল উৎস ও স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

১১নং আয়াতে এমনি ইনসানে-কামিল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য ইরশাদ করেছেন ঃ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ। অর্থাৎ সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে এসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি—সৎকর্মশীলতা।

صبر সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবী ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া, বন্ধন করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যায় কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে 'সবর' বলে। সুতরাং শরীয়তের পরিপন্থী যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। সারকথা, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কিয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের অপছন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তুষ্টিজনক কার্যে মশগুল থাকে, তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্য ধারণকারী, সৎকর্মশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে—"أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ" অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছে যে, তাদের গোনাহ্সমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাদের সৎকার্যসমূহের বিরাট প্রতিদান দেয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ্ তা'আলা أَذَقْنَا। 'স্বাদ আস্বাদন করাই' – বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই। বরং মানুষের পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ সুখ-দুঃখ দেয়া হয়েছে, যেন আখিরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। সুতরাং পার্থিব সুখ-শান্তিতে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন বোকামি, তদ্রূপ পার্থিব দুঃখ-দুর্দশায়ও অত্যধিক বিমর্ষ হওয়া উচিত নয়। বস্তুত দুনিয়াটাকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখিরাতের একটা প্রদর্শনীস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেখানে আখিরাতের সুখ-দুঃখের নমুনা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২নং আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা হচ্ছে মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সা) সমীপে কতিপয় আবদার পেশ করেছিলেন। প্রথমত তারা বলল, 'এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব, আপনি হয়ত অন্য কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করুন।' ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ "আপনি অন্য কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এগুলো পরিবর্তন করুন।" (তফসীরে বগবী ও তফসীরে মাযহারী)

দ্বিতীয়ত তারা আরো বলেছিল যে, "আমরা আপনার নবুয়তের প্রতি ঐ সময় বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্দের মত আপনার আয়ত্তে কোন ধন-ভাণ্ডার

রয়েছে এবং সেখান থেকে আপনি সবাইকে দান করছেন। অথবা আসমান হতে কোন ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবে এবং আপনার কথা সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহ্র রাসূল।"

তাদের এহেন অবাস্তব ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রাসূলে করীম (সা) মনঃক্ষুন্ন হলেন। কারণ তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা যেমন তার ইখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদেরকে কুফরী ও শিরকের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াও অসহনীয় ছিল, তাদের হিদায়েতের চিন্তা-ফিকির অন্তর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা, রাহমাতুল-লিল 'আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ তিনি ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে তাদের আবদার ছিল নিরেট মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতা-প্রসূত। কেননা সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্যকলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়, নবুয়তকে তারা বাদশাহীর উপর কিয়াস করে বসেছিল। আসলে ধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুয়তের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলারও এমন কোন দস্তুর নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। নতুবা নিখিল সৃষ্টিজগৎ তাঁর অপার কুদরতের করায়ত্ত। কার সাধ্য ছিল যে, তাঁর অপছন্দনীয় কোন কাজ করবে বা চিন্তাধারা পোষণ করবে ? কিন্তু তাঁর অফুরন্ত হিকমতের তাগিদে ইহজগতকে পরীক্ষাক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সৎকার্য সম্পাদন অথবা অন্যায়-অসত্য হতে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে মজবুর বা বাধ্য করা হয় না।

তবে যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ ও আসমানী কিতাব নাযিল করে ভাল-মন্দের পার্থক্য এবং তার প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সৎকার্য করা ও অসৎকার্য হতে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোন ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাঁকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হতো। ফলে এ দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পর্যায়ভুক্ত হতো। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান-বিল গায়েব বা গায়েবের প্রতি ঈমান হতো না। অথচ ঈমান বিল্-গায়েবই হচ্ছে ঈমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার ইখতিয়ারও থাকত না। অথচ এই ইখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অতএব, তাদের আবদার ছিল নিরর্থক ও অবাঞ্ছিত। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে তাদের এহেন বেহুদা আবদার প্রমাণ করে তারা নবী ও রাসূলের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও জাহিল ছিল। তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহ্র ন্যায় রাসূলকেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রাসূলের কাছে তারা এমন আবদার করছে—যা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না।

যা হোক, রাসূলে করীম (সা) তাদের এহেন অবান্তর আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান করা ও মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হলো। যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহ্র প্রেরিত কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত প্রচার করা ছেড়ে

দেবেন ? যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে বলে মুশরিকরা ঐসব আয়াত অপছন্দ করছে। এখানে لعلك শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন আয়াত বাদ দেবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল। বরং এখানে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরিকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রাসূলে পাক (সা) কোরআন করীমের কোন আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ তিনি তো আল্লাহ্র পক্ষ হতে نذير ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই নবীর মাধ্যমে মু'জিযা প্রদর্শন করেন। অতএব, তাদের অন্যায় আবদারে আপনার মনঃক্ষুণ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফির ও মুশরিকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে نذير নাযীর বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন نذير (ভীতি প্রদর্শক) ছিলেন, অপরদিকে সৎকর্মশীলদের জন্য তদ্রূপ بشير সু-সংবাদদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু 'নাযীর' এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে 'বশীর'-এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হযরত (সা)-এর মু'জিযা পাক-কোরআন তোমাদের সম্মুখে বর্তমান রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ মু'জিযার দাবি করে থাক, তাহলে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবি পূরণ করা হয়েছে। সুতরাং নতুন কোন মু'জিযা দাবি করার তোমাদের কোন অধিকার নেই। আর যদি ধৃষ্টতার কারণে তোমরা মু'জিযার দাবি করে থাক তাহলে তোমাদের মত হঠকারী লোকেরা মু'জিযা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশা করা যায় না। সারকথা, কোরআন করীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মু'জিযা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাফির ও মুশরিকরা যেসব অমূলক সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কুরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম নয়; বরং হযরত (সা) স্বয়ং তা রচনা করেছেন ! যদি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে উম্মী (সা) নিজে রচনা করেছেন তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তির দশটি সূরা তৈরী করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। বরং সারা দুনিয়ার পণ্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জ্বিন, তথা দেবদেবী সবাই মিলে তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরী করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এই কোরআন যদি কোন মানুষের রচিত কালাম হতো তাহলে অন্য মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হতো। সকলের অপারক হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই কোরআন আল্লাহ্ পাকের ইল্ম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস-বৃদ্ধি করার অবকাশ নেই।

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরী করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারক হলো, তখন তাদের অক্ষমতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কোরআন করীমের সূরা বাকারার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরী করার চ্যালেঞ্জ করা অর্থাৎ তোমরা পবিত্র কোরআনকে যদি মানুষের তৈরী কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশি নয়, অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে আন। কিন্তু তাদের জন্য অতদূর সহজ করে দেয়া সত্ত্বেও কোরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে সক্ষম হলো না। অতএব, কোরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম ও স্থায়ী মু'জিযা হওয়া সন্দেহাতীত প্রমাণিত হলো। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে— فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ এখনও কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়ণ হবে, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾

(১৫) যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। (১৬) এরাই হলো সেসব লোক, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হলো। (১৭) আচ্ছা বলতো—যে ব্যক্তি তার প্রভুর সুস্পষ্ট পথে রয়েছে, আর সাথে সাথে আল্লাহ্র তরফ হতে একটি সাক্ষীও বর্তমান রয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী মূসা (আ)-এর কিতাবও সাক্ষী যা ছিল পথ নির্দেশক ও রহমতস্বরূপ, (তিনি কি অন্যান্যের সমান?) অতএব তারা কোরআনের প্রতি ঈমান আনে। আর ঐসব দলের যে কেউ তা অস্বীকার করে, দোযখই হবে তার ঠিকানা। অতএব, আপনি তাতে কোন সন্দেহে থাকবেন

না। নিঃসন্দেহে এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে ধ্রুব সত্য; তথাপি অনেকেই তা বিশ্বাস করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি (স্বীয় পুণ্যকার্যের বিনিময়ে শুধু সুখ-শান্তিময়) পার্থিব জীবন কামনা করে এবং তার চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, (অর্থাৎ আখিরাতের সওয়াব ও প্রতিদান কামনা করে না; বরং শুধু পার্থিব জীবনে সুনাম ও প্রসিদ্ধি এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি কাম্য হয়,) তাহলে আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের নেক কার্যসমূহের প্রতিফল পুরোপুরি ভোগ করতে সুযোগ দেই এতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। (অর্থাৎ তাদের পাপকার্যের তুলনায় পুণ্যকার্য বেশি হলে তার প্রতিদান স্বরূপ ইহজীবনেই তাদের সু-স্বাস্থ্য, সুখ্যাতি, সম্মান-প্রতিপত্তি, আরাম-আয়েশ, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও অধিক সন্তানসন্ততি দান করা হয়। পক্ষান্তরে পুণ্যের চেয়ে পাপের পরিমাণ বেশি হলে তার কর্মফলও ভিন্নতর হয়ে থাকে। এ হচ্ছে পার্থিব কর্মফল।) কিন্তু তারা এমন লোক যে, আখিরাতে তাদের জন্য দোযখ ছাড়া আর কিছু (প্রতিদান) নেই। আর তারা যা কিছু করেছিল আখিরাতে সবই বরবাদ সাব্যস্ত হবে এবং যা কিছু তারা উপার্জন করছে, (নিয়্যত দুরস্ত না হওয়ার কারণে এখনও তা) সবই নিষ্ফল হচ্ছে। (বর্তমানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে মূল্যবান ও সার্থক মনে করা হলেও পরকালে এ বাহ্যিক সার্থকতাও বিলুপ্ত হবে।) কিন্তু কোরআন অস্বীকারকারী এমন ব্যক্তির সমান (হতে পারে) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত স্পষ্ট দলীলের উপর অবিচল রয়েছে ? আর (তার) একজন সাক্ষী তো তার সাথেই রয়েছে, (অর্থাৎ কোরআন পাকের মু'জিযা হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।) আর এক সাক্ষী তার পূর্ববর্তী হযরত মূসা (আ)-এর কিতাব (অর্থাৎ তওরাতও এর সত্যতার সাক্ষ্যদানের জন্য প্রেরিত হয়েছে) যা ছিল (আহ্কাম শিক্ষাদানের দিক দিয়ে পথনির্দেশক) ইমাম (স্বরূপ) এবং আমলের প্রতিদান ও সওয়াবের দিক দিয়ে) রহমতস্বরূপ; (সারকথা, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।) অতএব, (ইতিপূর্বে যাদেরকে স্পষ্ট দলীলের ধারক বলা হয়েছে) তাঁরা উক্ত কোরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। আর ঐসব (কাফিরদের) দলগুলির যেসব লোক কোরআনকে অস্বীকার ও অমান্য করে, দোযখই হচ্ছে তাদের ওয়াদাস্থল। (এমতাবস্থায় কোরআন অমান্যকারীরা কোরআন বিশ্বাসীদের সমকক্ষ কিরূপে হবে ?) অতএব, (হে শ্রোতা) কোরআনের (সত্যতার) ব্যাপারে কোন সন্দেহে পতিত হইও না। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে (আগত) মহাসত্য গ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু (অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, এত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ সত্ত্বেও) অনেকেই তা বিশ্বাস করে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলাম বিরোধীদের যখন আযাবের ভয় দেখানো হতো, তখন তারা নিজেদের দান খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলীকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, এতসব সৎকার্য করা সত্ত্বেও আমাদের শাস্তি হবে কেন ? আজকাল পাণ্ডিত্যের দাবিদার অনেক অজ্ঞ

মুসলমানকেও এহেন সন্দেহে পতিত দেখা যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোন রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ ইত্যাদি কোন জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এ আয়াতে (১৫ নং) সে মনোভাবেরই জবাব দেয়া হয়েছে।

জবাবের সারকথা এই যে, প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা রাসূলে করীম (সা)-এর তরীকা মুতাবিক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ, গুণ-গরিমা, নীতি-নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও আখিরাতে তার কানাকড়িও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যত তা যেহেতু পুণ্যকার্য ছিল এবং এর দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু এহেন তথাকথিত সৎকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না; বরং এসব লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল—যেমন তার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোক তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি—আল্লাহ্ অ'আলা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে আখিরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের প্রাণহীন সৎকার্য আখিরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নিয়ামতসমূহের মূল্য হওয়ার যোগ্য ছিল না, কাজেই আখিরাতে তার কোন প্রতিদানও লাভ করবে না। বরং নিজেদের কুফরী, শিরকী ও গোনাহ্র কারণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। এটাই ১৫নং আয়াতের সংক্ষিপ্তসার। এবার অত্র আয়াতের শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করুন।

ইরশাদ হয়েছে, যারা শুধু দুনিয়ার যিন্দেগী ও এর চাকচিক্য কামনা করে, তাদের যাবতীয় সৎকার্যের পূর্ণ প্রতিদান আমি এখানেই দান করি, আর এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনরূপ কমতি করা হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য দোযখের আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, অত্র আয়াতে কুরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুসারে مَنْ أَرَادَ সংক্ষিপ্ত শব্দের পরিবর্তে দীর্ঘতর مَنْ كَانَ يُرِيدُ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ বাকরীতিতে চলমান কাল বোঝায় এবং এর অর্থ হচ্ছে—যারা পার্থিব জীবন কামনা করতে থাকে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, অত্র আয়াতে শুধু ঐ সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা নিজেদের সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব ফায়দাই হাসিল করতে চায়। আখিরাতে মুক্তিলাভের কল্পনা তাদের মনের কোণে কখনো উদয় হয় না। পক্ষান্তরে যারা আখিরাতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে এবং সাথে সাথে পার্থিব কিছু লাভের আশাও রাখে, তারা অত্র আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অত্র আয়াত কি কাফিরদের সম্পর্কে, না মুসলমানদের সম্পর্কে অথবা কাফির ও মুসলমান উভয়ের সম্পর্কে, এ ব্যাপারে তফসীরকার ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, 'আখিরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।' এতে করে বোঝা যায় যে, অত্র আয়াত কাফিরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা একজন মুসলমান যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গোনাহ্র শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে

দোযখ হতে মুক্তিলাভ করে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং আরাম–আয়েশ ও নিয়ামত লাভ করবে। এজন্য যাহ্‌হাক প্রমুখ মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াত শুধু কাফিরদের উপর প্রযোজ্য।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে ঐ মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—যারা সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি, যশ-মান, খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোযখের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে।

আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তফসীর হচ্ছে যে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সৎকার্য শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফির হোক অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যত সেদিকে কোন লক্ষ্য রাখে না, বরং পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তফসীরকার ইমামগণের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রা), মায়মুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ (র) অত্র ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন।

রাসূলে করীম (সা)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ দ্বারাও তৃতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটিও তদ্রূপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভ পেতে চায়, সে নগদ লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখিরাতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সে আখিরাতের নিয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ কামনা করে, সে দো-জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করবে। নিয়তের উপর সর্বকাজের ভিত্তি একথা সর্বধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন মূলনীতি।—(তফসীরে কুরতুবী)

হাদীস শরীফে আছে কিয়ামতের দিন ঐসব লোককে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে উপস্থিত করা হবে, যারা লোকসমাজে সুনাম ও প্রশংসা লাভের জন্য লোকদেখানো মনোভাব নিয়ে ইবাদত ও সৎকার্য করেছে। তাদেরকে বলা হবে যে, "তোমরা দুনিয়াতে নামায পড়েছ, দান-খয়রাত করেছ, জিহাদ করেছ, কোরআন তিলাওয়াত করেছ; কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, যেন লোকে তোমাদেরকে মুসল্লী, দাতা, বীর ও কারী সাহেব বলে। তোমাদের যা কাম্য ছিল, তা তোমরা পেয়েছ, দুনিয়াতেই তোমরা এসব বিশেষণে বিভূষিত হয়েছ। অতএব, আজ এখানে তোমাদের কার্যাবলীর কোন প্রতিদান নেই।" অতঃপর তাদেরকেই সর্বপ্রথম দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) অত্র হাদীস বর্ণনা করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, কোরআনের আয়াত مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কারো প্রতি জুলুম করেন না। সৎকর্মশীল মু'মিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিদান আখিরাতে লাভ করবে। আর কাফিররা যেহেতু আখিরাতের কোন ধ্যান-ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা ইহজীবনেই

তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেয়া হয়। তাদের সৎকার্যাবলীর প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখিরাতে উপস্থিত হবে তখন সেখানে পাওয়ার মত তাদের প্রাপ্তব্য কিছুই থাকবে না।

তফসীরে মাযহারীতে আছে যে, মু'মিন ব্যক্তি যদিও পার্থিব সাফল্য ও প্রত্যাশা করে, কিন্তু আখিরাতের আকাঙ্ক্ষাই তার প্রবলতর থাকে। সুতরাং দুনিয়ায় সে প্রয়োজন পরিমাণ পায় এবং আখিরাতে বিপুল প্রতিদান লাভ করে।

হযরত উমর ফারূক (রা) একদা হুযুর (সা)-এর গৃহে হাযির হলেন। সারা ঘরে হাতেগোনা কিছু আসবাবপত্র ছাড়া বেশি কিছু জিনিসপত্র দেখতে পেলেন না। তিনি আরজ করলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আপনার উম্মতকে দুনিয়ায় সচ্ছলতা দান করেন। আমরা পারসিক ও রোমকদেরকে দেখেছি, তারা দুনিয়ায় অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতই করে না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতক্ষণ তাকিয়ার সাথে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন—হে উমর! তুমি এখন পর্যন্ত এহেন চিন্তাধারা পোষণ করছ! এরা তো ঐসব লোক যাদের কাজের প্রতিফল ইহজীবনেই দান করা হয়েছে।

জামে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ ফরমান—যে ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে আখিরাত লাভ করতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত ও বেনিয়াজ করে দেন এবং তার পার্থিব প্রয়োজনসমূহও পূরণ করে দেন, দুনিয়া তার কাছে নত হয়ে ধর্ণা দেয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিল করতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুহতাজ ও পরমুখাপেক্ষী করে দেন। তার অভাব ও দৈন্য কখনো দূর হয় না। কারণ দুনিয়ার মোহ তাকে কখনো নিশ্চিন্ত বসার অবসর দেয় না। একটি প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আগেই আরেকটি প্রয়োজন তার সামনে উপস্থিত হয়। আর অন্তহীন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী তাকে পেয়ে বসে। অথচ শুধু ততটুকুই সে প্রাপ্ত হয়, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, যারা পার্থিব জীবন কামনা করে, তাদেরকে দুনিয়াতেই পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হয়, কোন কমতি করা হয় না। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা শুধুমাত্র পার্থিব সুখ-সম্পদ হাসিল করতে চায় এবং এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা-তদবীরও করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কিছুই পায় না। এর কারণ কি?

জবাব এই যে, কোরআনুল করীমের অত্র আয়াতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর তফসীর সূরা বনি ইসরাঈলের এই আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاۤءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ—

অর্থাৎ যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে—আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান করি,

তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মুতাবিক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আমার হিকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭নং আয়াতে নবী করীম (সা) এবং সত্যিকার মু'মিনদের অবস্থা ঐসব লোকের মুকাবিলায় তুলে ধরা হয়েছে—যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই দু'টি শ্রেণী কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশ্বমানবের জন্য রাসূল হওয়া এবং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সে যত ভাল কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ্ ও জাহান্নামী হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোরআন আমানতকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যিনি কোরআনের ধারক ও বাহক এবং তার উপর স্থির-অবিচল, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সত্যতার একটি প্রমাণ তো এর মধ্যেই মৌজুদ রয়েছে এবং এর পূর্বে মূসা (আ)-এর কিতাবও এর সাক্ষী— যা ছিল মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য এবং রহমতস্বরূপ।

অত্র আয়াতে بَيِّنَةٍ বলে কোরআন পাককে বোঝানো হয়েছে। شَاهِدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বয়ানুল-কোরআনে হযরত থানবী (র) লিখেছেন যে, এখানে 'শাহিদ' অর্থ পবিত্র কোরআনের اعجاز। ইজায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কোরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কোরআনের উপর কায়েম রয়েছে, আর কোরআনের সত্যতার একটি সাক্ষী তো খোদ কোরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে তওরাতরূপে এসেছে, যা হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা কোরআন যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

দ্বিতীয় বাক্যে হুযুর (সা) ও কোরআনের প্রতি ঈমান ও একীনকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব-মানবের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যে কোন ব্যক্তি আপনাকে অমান্য বা অস্বীকার করবে জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন— আমার প্রাণ যার কুদরতের করায়ত্ত, সেই মহান সত্তার কসম; যেকোন ইহুদী বা খৃষ্টান আমার দাওয়াত শোনা সত্ত্বেও আমার আনীত শিক্ষার উপর ঈমান আনবে না, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ঐসব লোকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হওয়া উচিত, যারা ইহুদী, খৃষ্টান বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের প্রশংসনীয় কার্যাবলী দেখে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের উপর কায়েম বলে সাফাই পেশ করে, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় এবং কোরআন পাক ও রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা ব্যতিরেকে শুধু বাহ্যিক সৎকার্যাবলীকেই পরকালীন মুক্তির

জন্য যথেষ্ট মনে করে। এহেন ধ্যান-ধারণা পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত আয়াতে করীমা ও সহীহ্ হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا
عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ
لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾
لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

(১৮) আর তাদের চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎ সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষিগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐ সব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল; শুনে রাখ, জালিমদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত রয়েছে। (১৯) যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়, এরাই আখিরাতকে অস্বীকার করে। (২০) তারা পৃথিবীতেও আল্লাহ্‌কে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই; তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে। তারা শুনতে পারত না এবং দেখতেও পেত না। (২১) এরা সেই লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর তারা যা কিছু মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। (২২)

আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, কোন সন্দেহ নেই। (২৩) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনয় প্রকাশ করেছে, তারাই বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) উভয় পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি এক সমান ? তবুও তোমরা কি ভেবে দেখ না ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদের চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে (অর্থাৎ তাঁর একত্ববাদ, তদীয় রাসূলের রিসালত ও তাঁর কালামকে অস্বীকার করে। কিয়ামতের দিন) এসব লোককে (মিথ্যাবাদী, অপরাধীরূপে) তাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎ সম্মুখীন করা হবে। আর (তাদের কার্যকলাপের) সাক্ষী (ফেরেশতাগণ প্রকাশ্যভাবে সামনা-সামনি) বলতে থাকবে (যে,) এরাই ঐসব লোক যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (সবাই) শুনে রাখ, (ঐসব) জালিমদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত রয়েছে, যারা (নিজেদের কুফরী ও জুলুমের সাথে সাথে অন্যদেরকেও) আল্লাহ্‌র পথে (দীন-ইসলাম হতে) বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়। (দীনের পথে সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায়, যেমন অন্য লোকদের পথভ্রষ্ট করতে পারে) এরাই আখিরাতকে অস্বীকার করে। (এ পর্যন্ত সাক্ষী ফেরেশতাগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, সামনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন) তারা (পার্থিব জীবনে সমগ্র) পৃথিবীতে (কোথাও আত্মগোপন করে) আল্লাহ্‌কে অপারক করতে (অর্থাৎ তাঁর নাগালের বাইরে চলে যেতে) পারবে না এবং (আজকে একমাত্র) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের আর কোন সাহায্যকারীও নেই (যে আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে তাদের উদ্ধার করবে। এখন অন্যদের তুলনায়) তাদের দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে; (এক—তাদের কাফির থাকার অপরাধে, দ্বিতীয়—অন্যদেরকে ঈমান আনয়নে বাধাদানের অপরাধে।) তারা (চরম বিদ্বেষের কারণে আল্লাহ্ ও রাসূলের অমূল্য বাণী) শুনতে পারত না এবং (ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে সত্য-সঠিক, সরল পথ) দেখতে পেত না। এরা সেই লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর তারা যা কিছু মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল তা সবই (আজ) তাদের থেকে গায়েব (এবং নিরুদ্দেশ) হয়ে গেছে। (কেউই তো কোন কাজে লাগেনি, অতএব) এটা অনিবার্য যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (এতক্ষণ কাফিরদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে, সামনে ঈমানদারদের পরিণাম বর্ণিত হচ্ছে) —নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে আর ভাল ভাল কাজ করেছে এবং একাগ্রচিত্তে স্বীয় পালনকর্তার দিকে ঝুঁকেছে (অর্থাৎ অন্তরে আনুগত্য ও বিনয়ভাব সৃষ্টি করেছে) তারাই বেহেশতবাসী (হবে) এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (এতদ্বারা মু'মিন ও কাফির উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান সূচিত হলো। সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে উভয়ের অবস্থার পার্থক্য তুলে ধরা হচ্ছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরিণতিও ভিন্নতর হবে। ইরশাদ হচ্ছে, উভয় পক্ষের অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত (মু'মিন ও কাফিরদের) দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন (এক ব্যক্তি) অন্ধ ও বধির (ফলে কথা বলেও তাকে বোঝানো যায় না এবং ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারাও কিছু বোঝানো সম্ভব হয় না।) আর

(অপর এক ব্যক্তি) যে দেখতেও পায়, শুনতেও পায় (তাই অনায়াসে তাকে বোঝানো সম্ভবপর। অবস্থার দিক দিয়ে) তারা উভয়ে কি এক সমান ? (নিশ্চয়ই নয়। কাফির ও মু'মিনের অবস্থাও অনুরূপ। একজনের হিদায়েত সুদূর পরাহত, অন্যজন হিদায়েতপ্রাপ্ত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।) তোমরা কি বুঝতে পারছ না ?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (২৫) أَنْ لَا تَعْبُدُوا
إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (২৬) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا
الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (২৭) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي
وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ
لَهَا كَارِهُونَ (২৮) وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُونَ (২৯) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (৩০)
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي
مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (৩১) قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ
جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (৩২)
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (৩৩) وَلَا يَنْفَعُكُمْ

نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ؕ ﴿٣٤﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾

(২৫) আর অবশ্যই আমি নূহ (আ)-কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, (তিনি বললেন—) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৬) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। (২৭) তখন তাঁর কওমের কাফির প্রধানরা বলল—আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না; এবং আমাদের উপর আপনাদের কোন প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি। (২৮) নূহ (আ) বললেন—হে আমার জাতি! দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি তা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি ? (২৯) আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্র যিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎ লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। (৩০) আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদেরে তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ্ হতে রেহাই দেবে কে ? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না ? (৩১) আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ভাণ্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়েবী খবরও জানি; একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ্ তাদেরে কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হবো। (৩২) তারা বলল—হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন। (৩৩) তিনি বলেন, তা তোমাদের কাছে আল্লাহ্ই আনবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। তখন তোমরা পালিয়ে তাঁকে অপারক করতে পারবে না। (৩৪) আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের

জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে গোমরাহ্ করতে চান; তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (৩৫) তারা কি বলে ? আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন ? আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি নূহ্ (আ)-কে অবশ্যই তাঁর কওমের প্রতি (রাসূলরূপে এ পয়গাম দিয়ে) প্রেরণ করেছি যে, "তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, [এবং 'ওয়াদ্দ' 'সূয়া' 'ইয়াগুছ' 'ইয়াউক' 'নসর' প্রভৃতি হাতেগড়া যেসব মূর্তিকে মনগড়া উপাস্য সাব্যস্ত করেছ, এগুলোকে বর্জন কর।" অতঃপর হযরত নূহ (আ) তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা করার কারণে] নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সাফ সাফ ভীতি প্রদর্শন করছি। (আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে,) নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। (তদুত্তরে) তাঁর কওমের কাফির-প্রধানরা বলতে লাগল—(আপনি যে নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন, আমাদের অন্তর তাতে সায় দিচ্ছে না। কারণ) আমরা তো আপনাকে আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু মনে করি না। (মানুষ কি করে আল্লাহ্র নবী হতে পারে, তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।) আর (কতিপয় লোকের স্বীকৃতি ও আনুগত্যকে যদি নবুয়তের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়, তবে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ) আমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, ইতর ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না, (তদুপরি) তারাও শুধু ভাসাভাসাভাবে (আনুগত্য করে থাকে। কেননা সুষ্ঠু বিচার বুদ্ধি না থাকার ফলে চিন্তা-বিবেচনা করেও তারা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অধিকন্তু তারা চিন্তা-ভাবনা করেও কাজ করেনি। কাজেই এহেন লোকদের স্বীকৃতি ও আনুগত্য আপনার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ হতে পারে না। বরং তা আমাদের ঈমান আনার পথে অন্তরায়স্বরূপ। কারণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নীচাশয়দের সাথে সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে অপমান বোধ করে থাকেন। পক্ষান্তরে নীচাশয় ব্যক্তিরা শুধুমাত্র সম্পদ ও সম্মান হাসিলের জন্য যেকোন কাজ করতে পারে। সুতরাং তারাও আন্তরিকতার সাথে ঈমান আনেনি)। আর (যদি বলেন যে, বিশেষ কোন গুণের কারণে আমাদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তাই তারা আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তাহলে বলব যে,) আমরা নিজেদের উপর আপনাদের (অর্থাৎ নবী ও তাঁর অনুসারীদের) কোন (শ্রেষ্ঠত্ব বা) প্রাধান্য দেখি না। (কাজেই আপনার বক্তব্য সত্য নয়। বরং আমরা আপনাদের সবাইকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি। (তখন) নূহ (আ) বললেন—হে আমার জাতি! (আমার নবুয়ত তোমাদের বোধগম্য ও মনঃপূত নয় বলে দাবি করছ।) আচ্ছা বল তো, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর (কায়েম) থাকি (যা দ্বারা আমার নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে)। আর তিনি যদি আমাকে নিজের পক্ষ হতে (মেহেরবানী করে) রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) দান করে থাকেন, তারপরেও তা (অর্থাৎ নবুয়ত অথবা তার প্রমাণাদি) যদি তোমাদের বুঝে না আসে তাহলে (আমার কি দোষ?) আমি

কি তা (অর্থাৎ উক্ত দাবি অথবা তার দলীল) তোমাদের উপর (জোর করে) চাপিয়ে দেব ? আর তোমরা তা ঘৃণা করতে থাকবে ? (অর্থাৎ আমার নবুয়ত তোমাদের বোধগম্য ও মনঃপূত না হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে—তোমরা মনে কর যে, মানুষ কখনো আল্লাহ্‌র পয়গাম্বর বা বার্তাবহ হতে পারে না। এটা তোমাদের একটি ভ্রান্ত ও অমূলক ধারণা মাত্র, যার সপক্ষে তোমাদের নিকট কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে এটা সম্ভব ও বাস্তব হওয়ার অকাট্য প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা আমার কাছে বর্তমান রয়েছে ; উপরন্তু কারো খেয়াল-খুশির অনুসরণেই কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত বা বাতিল হয়ে যায় না। তাই নবুয়তের সপক্ষে যেসব দলীল-প্রমাণ রয়েছে, তা অনুসরণ করার জন্য নিরপেক্ষ চিন্তা-বিবেচনা অপরিহার্য। কিন্তু তোমরা সেরূপ চিন্তা-বিবেচনা কর না; আর জোর করে তোমাদের দ্বারা চিন্তা করানো আমার সাধ্যাতীত।) আর [নূহ্ (আ) আরও বললেন—] হে আমার জাতি! (চিন্তা করে দেখ তো, নবুয়তের মিথ্যা দাবি করলে তাতে আমার কোন স্বার্থ অবশ্য থাকত, আমি হয়ত তোমাদের অর্থ-সম্পদে ভাগ বসাতাম। কিন্তু তোমরা তো খুব ভাল করেই জান যে,) আমি এর (তবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে (ধন-সম্পদ ইত্যাদি) কোন বস্তু চাই না; আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে। (তিনি পরকালে তা দান করবেন, আশা রাখি। অনুরূপভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে যে, আমার অন্য কোন স্বার্থও নেই। এতদসত্ত্বেও আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর কেন ? আমার দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মত কোন যুক্তিপ্রমাণ নেই। বরং দাবির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ বর্তমান রয়েছে। অতএব, আমার নবুয়তে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।) আর (তোমরা দরিদ্র-দুর্বল লোকদের আনুগত্যকে নিজেদের ঈমান আনার পথে অন্তরায় মনে করছ এবং স্পষ্টত অথবা ইঙ্গিতে চাইছ যেন আমি তাদেরকে নিজের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেই। তাই জেনে রাখ,) আমি তো ঈমানদারগণকে (নিজের কাছ থেকে) দূরে তাড়িয়ে দিতে পারি না। (কারণ) তারা অবশ্যই (সাদরে-সসম্মানে) তাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎ লাভ করবে। (শাহী দরবারের প্রিয়পাত্রকে কেউ তাড়িয়ে দেয় কি ? এতদ্বারা বোঝা গেল যে, "দরিদ্র-দুর্বল ব্যক্তিরা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি"—বলে কওমের লোকেরা যে উক্তি করেছিল, তা মিথ্যা।) বরঞ্চ (অবাঞ্ছিত আচরণ ও অসংলগ্ন কথাবার্তার কারণে) তোমাদেরকে আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। আর হে আমার জাতি ! (ধর, তোমাদের কথা অনুসারে) আমি যদি তাদেরে তাড়িয়ে দেই, তাহলে (বল তো, তোমাদের মধ্যে) কে আমাকে আল্লাহ্‌র (পাকড়াও) হতে (রক্ষা করবে,) রেহাই দেবে ? (তোমরা যারা এহেন বেহুদা পরামর্শ দিচ্ছ তোমাদের কারো সে ক্ষমতা নেই।) তোমরা কি তা চিন্তা করে দেখ না ? আর (উপরোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে তাদের উত্থাপিত সব প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে। পরিশেষে জবাবের উপসংহার টানা হচ্ছে যে, আমার নবুয়ত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরেও তা অস্বীকার করা মারাত্মক অপরাধ। বাস্তবিকপক্ষে এটা কোন অভিনব বা অসম্ভব দাবি ছিল না। যদি কোন অসম্ভব বা অলীক দাবি করা হতো, তাহলে তা অমান্য করা এত দূষণীয় ছিল না। কিন্তু দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার পর তাকে অবিশ্বাস করা চলে না। তবে দলীল-প্রমাণ

দ্বারাও যদি কোন জিনিস অসম্ভব সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে অসম্ভবই বলতে হবে। কিন্তু আমি তো কোন মিথ্যা বা অবাস্তব দাবি করছি না। অতএব,) আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ধনভাণ্ডার রয়েছে; এবং আমি গায়েবের সব খবরও জানি (এমন দাবিও করি না,) আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। (এতক্ষণ নিজের সম্পর্কে বলেছেন, অতঃপর নিজ অনুসারীদের সম্পর্কে বলছেন—) আর যারা তোমাদের দৃষ্টিতে হীন (লাঞ্ছিত তাদের সম্পর্কে) আমি (তোমাদের মত) একথা বলতে পারি না যে, (তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। সুতরাং) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কোন সওয়াব দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করেই অবগত রয়েছেন। (হয়ত তাদের অন্তরে পূর্ণ ইখলাস রয়েছে। কাজেই আমি তাদের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা কেন করব?) এরূপ কথা বললে (তো) আমি অন্যায়কারীদের মধ্যে পরিগণিত হব। [কেননা, প্রমাণ ছাড়া এরূপ মন্তব্য করা নাজায়েয ও গোনাহ্। হযরত নূহ (আ) যখন তাদের সকল প্রশ্নের সুষ্ঠু জবাব দান করলেন এবং তারা কোন প্রত্যুত্তর দিতে অপারক হলো, তখন জনন্যোপায় হয়ে] তারা বলতে লাগল—হে নূহ (আ)! আপনি আমাদের সাথে তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন, যা হোক (তর্ক ক্ষান্ত করুন এবং) আপনি আমাদেরকে যে (আযাবের) ধমক দিচ্ছেন, তা (আমাদের উপর) নিয়ে আসুন, যদি আপনি একজন সত্যবাদী ব্যক্তি হয়ে থাকেন। তিনি [হযরত নূহ (আ)] বললেন—(তা নিয়ে আসার আমার কোন ক্ষমতা বা অধিকার নেই। বরং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া, শুনিয়ে দেওয়া ও সতর্ক করা আমার কর্তব্য ছিল, আমি তা যথাসাধ্য পালন করেছি। কিন্তু তোমরা আমার কথা অগ্রাহ্য-অমান্য করে চলছ। অতএব) এটা (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত আযাব) তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলাই আনয়ন করবেন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন; আর তখন তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না (যে, আল্লাহ্ আযাব দিতে চাইবেন আর তোমরা তা ঠেকিয়ে রাখবে)। আর আমি তোমাদের অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে মমতা ও দরদের সাথে (তোমাদেরকে সুপথে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি) তোমাদের (যত বড় হিতাকাঙ্ক্ষীই হই না কেন এবং) যতই নসীহত করি না কেন, তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পথহারা করতে চান। (যার মূল কারণ হচ্ছে, তোমাদের ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও অহংকার। অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই যখন নিজেদের কল্যাণ সাধন করতে এবং অনিষ্ট হতে রক্ষা পেতে সচেষ্ট না হবে, তখন আমার একতরফা চেষ্টা ও আগ্রহে কি ফায়দা হবে?) (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই) তোমাদের মালিক (আর তোমরা তাঁর গোলাম। অতএব, তাঁর প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ হুবহু পালন করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। অথচ, তোমরা ধৃষ্টতা, হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তাঁর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে চরম অপরাধী সাব্যস্ত হচ্ছ।) আর তাঁর সান্নিধ্যেই তোমাদের (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের ধৃষ্টতা, হঠকারিতা ও অহংকারের প্রতিবিধান করবেন। কি তারা বলে? এই কোরআন আপনি রচনা করে এনেছেন? তদুত্তরে আপনি (হে মুহাম্মদ!) বলে দিন (যে,) আমি যদি এটা রচনা করে থাকি, তবে তা আমার অপরাধ (এবং তার দায়িত্বও) আমার উপর (তোমরা তার দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত)। আর (তোমরা যদি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাক,

তবে) তোমাদের অপরাধের (পরিণাম ভোগ তোমরা করবে, তার) সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই (আমি তজ্জন্য দায়ী নই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত নূহ (আ) যখন তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। হযরত নূহ (আ) আল্লাহর হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের বহু মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেওয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরিকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা-সাপেক্ষে কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَـلَاءُ 'মালাউ' শব্দের সাধারণ অর্থ জামাত বা দল। কোন কোন ভাষাবিদ ইমামের মতে, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জামাতকে مَلَاءُ বলে।

بَشَرٌ 'বাশার' অর্থ ইনসান বা মানুষ।

اَرَاذِلُ বহুবচন, তার এক একবচন, اَرْذَلُ অর্থ নীচাশয়, ইতর লোক, কওমের মধ্যে যাদের কোন মান-মর্যাদা নেই।

بَادِىَ الرَّاْىِ 'বাদিয়ার রায়' অর্থ স্থূলবুদ্ধি, স্বল্পবুদ্ধি, ভাসাভাসা মতামত।

হযরত নূহ (আ)-এর নবুয়ত ও রিসালতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল مَـا نَرَاكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا আমরা তো দেখি যে, আপনিও আমাদের মতই মানুষ মাত্র। আমাদের মত পানাহার করেন, হাটবাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান, জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও বার্তাবাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবি তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি ? তারা মনে করত যে, আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলরূপে কোন মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়, বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তাঁর বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জানতে বাধ্য হয়।

২৮ নং আয়াতে এর জবাবে ইরশাদ হয়েছে : يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ – এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী নয়। বরং চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তাঁর কাছে দীন শিক্ষা করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী করে পাঠানো হতো, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হতো। কেননা ফেরেশতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সম্মুখীন হন না। অতএব, তাঁরা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তা'লীম দিতে পারতেন না

এবং তাদের পূর্ণ তাঁবেদারি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে যা ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহ্র নবী হতে পারবে না—এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর কাছে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে—যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত পয়গম্বর বা বার্তাবহ। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মু'জিযাই তাঁর নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ্ (আ) বলেছেন যে, আমি আল্লাহ্র তরফ হতে স্পষ্ট দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করতে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর অটল রয়েছ।

কিন্তু পয়গম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহ্র রহমত জোরজবরদস্তি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকত তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম। কিন্তু এটা আল্লাহ্র চিরন্তন বিধানের পরিপন্থী। এ মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেওয়া যায় না। এতদ্বারা আরো সাব্যস্ত হচ্ছে যে, জোর-জবরদস্তি কাউকে মু'মিন বা মুসলমান বানানো কোন নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রটনা করে তাদেরও একথা অজানা নয়। তথাপি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অন্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টত বোঝা গেল যে, কোন ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন ? কারণ ফেরেশতারা অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সবদিক থেকেই তাঁদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুতরাং তাঁদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হতো। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল ? আর কোন পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং 'ঈমান বিল-গায়েব' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ না করেই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল : وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ অর্থাৎ আমরা দেখছি যে, আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার আনুগত্য ও অনুসরণকারী সবাই আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর, ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না। এই উক্তির মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। এক, আপনার দাবি যদি সত্য ও সঠিক হতো, তাহলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তা সর্বাগ্রে গ্রহণ করত। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে; আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা মেনে

নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনলে আমরাও আহম্মকরূপে পরিচিত ও ধিকৃত হবো। দুই. সমাজের নিকৃষ্ট, ইতর ও ছোট লোকগুলি আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এক্ষণে আমরাও যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান ভাই হিসাবে তাদের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হবো, নামাযের কাতারে ও অন্যান্য মজলিসে তাদের সাথে এক বরাবর উঠবসা করতে হবে। ফলে আমাদের আভিজাত্য ও কুলীনতার হানি হবে। অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং তাদের ঈমান কবূল করাটা আমাদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আপনি যদি তাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বিবেচনা করতে পারি।

• বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহিল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল—যাদের কাছে পার্থিব ধনসম্পদ ও বিষয়-বৈভব ছিল না। মূলত তা ছিল তাদের জাহিলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুতপক্ষে ইজ্জত ও জিল্লতি ধন-দৌলত বা বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মতো, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না, কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য-ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে এর স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহবান সম্বলিত রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই এর তদন্ত-তাহকীক করতে মনস্থ করল। কেননা সে তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব পাঠ করে করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্র করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তাঁর অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী ঈমান আনয়ন করছে, না বিত্তশালী বড়-লোকেরা ? তারা জবাব দিল, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, এ তো সত্য রাসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, যুগে যুগে দরিদ্র দুর্বল শ্রেণীই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোদ্দাকথা, দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই—যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তাঁর নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান সওরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে ? তিনি উত্তর দিলেন—যারা বাদশাহ্ ও রাজকর্মচারীদের খোশামোদ-তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবী (র) বলেন, যারা দীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমীনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো—সবচেয়ে কমীনা কে ? তিনি জবাব দিলেন—যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালিক (র) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে-কিরাম (রা)-গণের নিন্দা-সমালোচনা

করে, সে-ই ইতর ও অর্বাচীন। কারণ তাঁরাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরীয়তের আহকাম সকলের কাছে পৌঁছেছে।

যা হোক, ৩৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমত বলা হয়েছে যে, কারো ধনসম্পদের প্রতি নবী-রাসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁরা নিজেদের খিদমত ও তা'লীম-তবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাঁদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই দায়িত্বে। কাজেই তাঁদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশংকা পোষণ করো না যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়ত আমাদের বিত্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়ত তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের প্রবেশাধিকার ও উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া অন্যায়-অসঙ্গত।

مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ-এর আরেক অর্থও হতে পারে যে, ধরে নেওয়া যাক, আমি যদি তাদেরে তাড়িয়ে দেই তাহলে কিয়ামতের দিন তারা যখন আল্লাহ্ পাক পরোয়ারদিগারের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ জানাবে, তখন আমি কি জবাব দেব?

৩০ নং আয়াতে একই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি তাদেরে তাড়িয়ে দেই, তাহলে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা পাকড়াও করবেন, তখন আমাকে আল্লাহ্র আযাব হতে কে রক্ষা করবে? পরিশেষে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, মানুষের জন্য নবুয়ত প্রাপ্তিকে অসম্ভব মনে করা, দরিদ্রদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার আবদার করা ইত্যাদি সবই তাদের জাহিলিয়াত ও মূর্খতার লক্ষণ।

৩১ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা তিনি তাঁর কওমের প্রশ্ন ও আপত্তি শ্রবণ করার পর তাদের মৌলিক হিদায়েত দানের জন্য ব্যক্ত করেছেন। যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ধন-ভাণ্ডার থাকা, গায়েবের খবর জানা, ফেরেশতা হওয়া প্রভৃতি যা কিছু তোমরা নবী-রাসূলগণের জন্য আবশ্যক মনে করছ, আসলে তার একটিও নবুয়ত বা রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

তিনি প্রথমেই বলেছেন : وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে। এখানে তাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে। তারা বলত যে, তিনি যদি আল্লাহ্র নবীরূপে আগমন করে থাকেন, তবে তাঁর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে ধন-ভাণ্ডার থাকা উচিত ছিল, যা থেকে তিনি লোকদেরকে সাহায্য দান করবেন। হযরত নূহ (আ) জানিয়ে দিলেন যে, পার্থিব ধনসম্পদে মানুষকে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হননি। বরং ধনসম্পদের মোহমুক্ত করে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার জন্যই তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন। অতএব, ধন-ভাণ্ডারের সাথে তাঁদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

সম্ভবত এখানে আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, নবী-রাসূল এমনকি আল্লাহ্র ওলীগণকে পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদত্ত রয়েছে, তাদের হাতে আল্লাহ্র কুদরতের

ভাণ্ডার তুলে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে যাকে খুশী তাঁরা দিতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখতে পারেন।—এহেন ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে হযরত নূহ (আ) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের ভাণ্ডার কোন নবী-রাসূলের হাতে তুলে দেননি। ওলী-আবদাল তো দূরের কথা। তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য নিজ অনুগ্রহে তাঁদের দোয়া ও চাহিদা স্বীয় মর্জি মুতাবিক পূরণ করে থাকেন।

হযরত নূহ (আ)-এর দ্বিতীয় উক্তি ছিল ঃ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ "আর আমি গায়েবও জানি না।" কেননা, উক্ত জাহিলদের আরো বিশ্বাস ছিল, যারা সত্যিকার পয়গম্বর, তাঁরা নিশ্চয়ই গায়েবের খবর জানবেন। নূহ (আ)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুয়ত ও রিসালতের জন্য গায়েবের ইলম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়েবের ইলম তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সিফত বা বৈশিষ্ট্য। কোন নবী, ওলী বা ফেরেশতা তার অংশীদার হতে পারে না। তাঁদের অত্র গুণে গুণান্বিত মনে করা স্পষ্ট শিরকী। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তদীয় পয়গম্বরগণের মধ্যে যাঁকে যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্য জগতের ইলম দান করেন। তা নবী-ওলীগণের ইখতিয়ারভুক্ত নয় যে, তাঁরা যখন-তখন যেকোন বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন অবহিত করেন, তখন তাঁদের জন্য তা আর গায়েব থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে আলিমুল-গায়েব বলা হারাম ও শিরকী।

তাঁর তৃতীয় উক্তি হয়েছে ঃ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ "আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা।" এখানে তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী-রাসূলরূপে উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

তাঁর চতুর্থ কথা হচ্ছে—তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা দরিদ্র ঈমানদারগণকে যেরূপ লাঞ্ছিত, অপাংক্তেয় ক্ষুদ্র দেখছ, আমি কিন্তু তোমাদের মত এ কথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ ও কামিয়াবী দান করবেন না। কারণ প্রকৃত কল্যাণ ও কামিয়াবী ধনসম্পদ এবং ক্ষমতার জোরে হাসিল করা যায় না। বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তা দান করা হয়। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক অবহিত আছেন যে, কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য, আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব, তিনিই তার ফয়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ) বলেন, তোমাদের মত আমিও যদি দরিদ্র ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত মনে করি, তাহলে আমিও জালিমরূপে পরিগণিত হবো।

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا
تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ

الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا
فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿৩৮﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿৩৯﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ
الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿৪০﴾

(৩৬) আর নূহ (আ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো যে, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবে না। অতএব, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। (৩৭) আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মুতাবিক একটি নৌকা তৈরি করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে। (৩৮) তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাকে বিদ্রূপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদেরে উপহাস করছি। (৩৯) অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে— লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে। (৪০) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, আমি বললাম ঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদেরে বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল।

তফসীরেরর সার-সংক্ষেপ

আর (সুদীর্ঘকালব্যাপী উপদেশ দান করা সত্ত্বেও যখন দেখা গেল যে, কোন ফল হচ্ছে না, তখন) নূহ (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করা হলো যে, (আপনার কওমের) যারা ঈমান আনার (যোগ্য ছিল তারা ইতিমধ্যেই) ঈমান এনেছে, (ভবিষ্যতে) আপনার কওম হতে অন্য কেউ (আর) ঈমান আনবে না। (অতএব) তারা (কুফরী-শিরকী, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, নিপীড়ন-নির্যাতন ইত্যাদি) যা কিছু করছে আপনি (তাদের কার্যকলাপে) বিমর্ষ হবেন না। (কেননা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারেই মানুষ বিমর্ষ হয়ে থাকে। তাদের থেকে যেহেতু অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করা যায় না, সুতরাং তাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে আপনি বিমর্ষ হবেন কেন?) আর (তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি অচিরেই তাদেরে ডুবিয়ে মারার ফয়সালা করেছি, আর

এতদুদ্দেশ্যে এক মহাপ্লাবন সমাগত প্রায়। অতএব, আপনি উক্ত প্লাবন হতে আত্মরক্ষার্থে) আমার তত্ত্বাবধানে আমারই নির্দেশ অনুসারে একখানি নৌকা তৈরি করুন (যাতে আরোহণ করে আপনি স্বীয় পরিজনবর্গ ও ঈমানদারগণসহ নিরাপদে থাকেন)। আর (মনে রাখবেন,) কাফিরদের রক্ষার ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। (কেননা, তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয়ে গেছে যে,) তারা সবাই নিমজ্জিত হবে। (কাজেই তাদের জন্য সুপারিশ করা নিরর্থক।) অতঃপর [নূহ (আ) নৌকা তৈরির উপকরণাদি সংগ্রহ করলেন এবং] তিনি (নিজে অথবা কারিগরের সাহায্যে) নৌকা তৈরি করতে লাগলেন। আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয়রা যখন সেটার পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন (ডাঙ্গায় নৌকা তৈরি করতে দেখে এবং মহা-প্লাবনের কথা শুনে) তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত যে, চেয়ে দেখ, ধারে-কাছে কোথাও পানির নাম-গন্ধ নেই, অথচ ইনি এ অর্থহীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন তখন) তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক; তবে তোমরা যেমন আমাদের উপহাস করছ, আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপহাস করছি। (অর্থাৎ আযাব তোমাদের এত নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাকে উপহাস করছ। তোমাদের অবস্থা দেখে বরং আমারই হাসি পায়। যা হোক,) অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, (দুনিয়াতেই) লাঞ্ছনাজনক শাস্তি কার উপর আপতিত হয় এবং (মৃত্যুর পরে) চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে! (সারকথা, প্রায় প্রতিদিনই এভাবে তর্ক-বিতর্ক, বাক-বিতণ্ডা অব্যাহত ছিল।) অবশেষে যখন আমার (আযাবের) হুকুম এসে পৌঁছল এবং (প্লাবনের পূর্বনির্ধারিত সংকেতস্বরূপ) ভূপৃষ্ঠ (হতে পানি) উথলিয়ে উঠতে লাগল (এবং আকাশ হতে বর্ষণ আরম্ভ হলো, তখন) আমি [নূহ (আ)-কে] বললাম, (মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এবং পানির মধ্যে জীবিত থাকতে অক্ষম) সর্বপ্রকার জীব থেকে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী মোট দু'টি করে (নৌকায় তুলে নিন ;) এবং যাদের সম্পর্কে ইতিমধ্যেই (ডুবে মরার চূড়ান্ত) ফয়সালা হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারকে নৌকায় তুলুন। (অর্থাৎ যেসব কাফির ও মুশরিকদের সম্পর্কে إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ। "নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে" বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের নৌকায় আরোহন করাবেন না।) বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল (অতএব, শুধু এরাই নৌকায় আরোহণের সুযোগ পেয়েছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গম্বরসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। কওমের পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয় ; এমনকি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুশ হলে পরে দোয়া করতেন—আয় আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, তারা জানে না, বুঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে,

হয়ত তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন ঃ

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلاَّ فِرَارًا

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্য পথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। (সূরা নূহ)

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করলেন ঃ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ হে আল্লাহ্ ! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।—(১৮ পারা, আয়াত ৩৯, সূরা আল-মু'মিনুন।)

দেশবাসীর জুলুম-নির্যাতন,অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম করার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সম্বোধন করেন।—(বগভী ও মাযহারী)

৩৬ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ)-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার কওমের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না।

৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর মহাপ্লাবন আকারে আযাব অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা তৈরি করুন যার মধ্যে আপনার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন তাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলি নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ (আ) নৌকা তৈরি করলেন। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসাবে ভূমি হতে পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। নূহ (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো সকল ঈমানদারকে নৌকায় আরোহণ করাবার জন্য। আর মানুষের প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেয়ার আদেশ দেয়া হলো। তিনি আদেশ পালন করলেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতক্ষণ বলা হলো, এবার প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন—হযরত নূহ (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছিল যে, তাঁর জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

৩৭ নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায়ই হযরত নূহ (আ)-এর মুখে তাঁর কওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিল ঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا - اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا -

অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার! এখন কাফিরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফির হবে।—(পারা ২৯, সূরা নূহ, আয়াত ২৬)

এই বদদোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হলো, যার ফলে সমস্ত কওমে নূহ (আ) ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আ)-কে নৌকা তৈরি শিক্ষা দান ঃ হযরত নূহ (আ)-কে যখন নৌকা তৈরির নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরি করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا "আর আপনি নৌকা তৈরি করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে"। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত নূহ (আ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরি করেছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকসূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকাখানি ৩০০ গজ দীর্ঘ, ৫০ গজ প্রস্থ, ৩০ গজ উঁচু ও ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল। এর দুই পার্শ্বে অনেকগুলি জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ (আ)-এর হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে ঃ হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত 'আত-তিব্বুন-নববী' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোন নবীর পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি-অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ)-এর প্রতি যেসব ওহী নাযিল করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত। পরিবহনের জন্য চাকা, চলতি গাড়ি হযরত আদম (আ)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

আলীগড়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ির ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি হতে শুরু করে মোটর ও রেলগাড়ি সর্বত্র চাকার কারবার। কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক। আর এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত আদম (আ) ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন।

এ দ্বারা আরো বোঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলগণকে ওহীর সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে নৌকা নির্মাণ পদ্ধতি ও কলাকৌশল শিক্ষা দানের সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কওমের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোন সুপারিশ যেন না করেন।

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরিকালীন সময়ে নূহ (আ)-এর কওমের উদাসীনতা, গাফলতি, অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র আদেশক্রমে হযরত নূহ (আ) যখন নৌকা নির্মাণ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত—আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন যে, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লবন হবে, তাই নৌকা তৈরি করছি। তখন তারা বলত—"এখানে তো পান করার মত পানিও দুর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।" তদুত্তরে হযরত নূহ (আ) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখ সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতপক্ষে নবীগণ কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাঁদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী বরং হারাম। কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ ـ

অর্থাৎ "এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহ্র কাছে) তারাই শ্রেষ্ঠতর।" (পারা ২৬, সূরা হুজুরাত, ১১ আয়াত) সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেয়া। সেমতে "আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব" বাক্যের অর্থ হচ্ছে—তোমরা যখন আযাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, "এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি!" যেমন ৩৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর লাঞ্ছনাকর আযাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আযাব কাদের উপর হয়। প্রথম عـذاب শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আযাব এবং عذاب مقيم দ্বারা আখিরাতের চিরস্থায়ী আযাব উদ্দেশ্য।

৪০ নং আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاۤءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ـ

অর্থাৎ "অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হলো এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।"

اَلتَّنُّوْرُ তান্নুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তান্নুর বলা হয়, রুটি পাকানোর তন্দুরকেও তান্নুর বলে, যমীনের উঁচু অংশকেও তান্নুর বলে। তাই তফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে তান্নুর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি

উত্থলে উঠছিল। কেউ কেউ বলেন—এখানে তান্নুর বলে হযরত আদম (আ)-এর রুটি পাকানো তন্দুরকে বোঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার عين وردة 'আইনে আরদাহ' নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুর অভ্যন্তর হতেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন—এখানে হযরত নূহ (আ)-এর তন্দুরকে বোঝানো হয়েছে,—যা কূফা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী (র), মুজাহিদ (র), শা'বী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসির এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'বী (র) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কূফা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। কূফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত নূহ (আ) তাঁর নৌকা তৈরী করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ মসজিদের প্রবেশদ্বার।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে মহাপ্লাবনের পূর্বাভাসস্বরূপ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন বুঝবেন যে মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে। —(তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা প্লাবন যখন শুরু হয়েছে তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি হতেও উঠেছে আর উঁচু যমীন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল আরদার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কূফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প সময়েই সব একাকার হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের আয়াতে স্পষ্ট ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ٥

অর্থাৎ "অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম এবং যমীনে প্রস্রবণরূপে প্রবহমান করলাম।—(২৭ পারা, সূরা আল কামার, আয়াত ১১)

ইমাম শা'বী (র) আরো বলেছেন যে, কূফার এই জামে' মসজিদটি মসজিদে হারাম, মসজিদে-নববী ও মসজিদে আকসার পর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশ্বের চতুর্থ মসজিদ।

তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ্ (আ)-কে হুকুম দেয়া হলো ঃ

احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ـ

অর্থাৎ "জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।" এতদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ)-এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখি উঠানো হয়েছিল। জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ডাঙ্গায় প্রাণীকুলের মধ্যে যেসব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখি কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা ঐ সন্দেহ দূরীভূত হলো যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকুলের স্থান সংকুলান এতটুকু কিশতিতে কিভাবে হলো ?

অতঃপর হযরত নূহ (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফিরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ্ (আ)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস ও তাদের ৩ জন স্ত্রীও ছিল। নূহ্ (আ)-এর চতুর্থ পুত্র কেন্'আন কাফিরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছে।

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرٰىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاٰوِيْ إِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يٰۤأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيٰسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾

(৪১) আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান। (৪২) আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নূহ (আ) তার পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সাথে থেকো না। (৪৩) সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ (আ) বললেন, আজিকার দিনে আল্লাহ্র হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হলো। (৪৪) আর নির্দেশ দেয়া হলো—হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হলো এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হলো 'দুরাত্মা কাফিররা নিপাত যাক।'

তফসীরেরর সার-সংক্ষেপ

আর নূহ (আ) (নৌকায় আরোহণ করিয়ে স্বীয় অনুগামীদেরকে) বললেন, (এস,) তোমরা (সবাই) এতে (এই কিশতিতে) আরোহণ কর, (ডুবে যাওয়ার কোন আশংকা করো না। কেননা) এর গতি ও এর স্থিতি (সবই একমাত্র) আল্লাহ্র নামে। (তিনিই এর হিফাযতকারী, অতএব আশংকার কোন কারণ নেই। বান্দাদের পাপতাপ তাদেরে ডুবাতে চাইলেও) আমার পালনকর্তা বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়, কোন সন্দেহ নেই। (তিনি নিজ রহমতে অপরাধ মার্জনা করেন, অধিকন্তু হিফাযত করেন। সারকথা, সবাই নিশ্চিন্তে নৌকায় আরোহণ করল। ইতিমধ্যে পানি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল) আর (উক্ত) কিশতিখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে; আর নূহ (আ) তাঁর (এক) পুত্রকে (যার নাম ছিল কেনআন; যাকে অনেক বোঝানো সত্ত্বেও ঈমান আনেনি, তাকে কিশতিতে আরোহণ করতে দেয়া হয়নি। তখন পর্যন্ত কিশতি কূলেই ছিল।) আর সে (কিশতি হতে আলাদা স্থানে অর্থাৎ কিনারায়) সরে (দাঁড়িয়ে) ছিল, (শেষবারের মত) ডেকে বললেন—প্রিয় বৎস! (কিশতিতে আরোহণ করার পূর্বশর্ত পূরণ করত অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করে সত্বর) আমাদের সাথে (কিশতিতে) আরোহণ কর, আর (আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে) কাফিরদের সাথে থেকো না। (অর্থাৎ কুফরী ও শিরকী আকীদা পরিত্যাগ কর নতুবা সলিল সমাধি লাভ করবে।) সে (তৎক্ষণাৎ) বলল, আমি (এক্ষুণি) কোন (উঁচু) পাহাড়ের (শীর্ষে) আশ্রয় গ্রহণ করব, যা আমাকে পানি হতে (নিরাপদে) রক্ষা করবে। (বস্তুত তখন প্লাবনের প্রাথমিক অবস্থা ছিল এবং পর্বতশীর্ষে তখন পর্যন্ত পানি পৌঁছেনি।) নূহ্ (আ) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার (আযাবের) হুকুম হতে কোন রক্ষাকারী নেই। (পাহাড় পর্বত বা অন্য কোন শক্তির দ্বারা কাজ হবে না।) তবে আল্লাহ্ পাক (স্বয়ং) যাকে অনুগ্রহ করবেন, (তাকে তিনিই রক্ষা করবেন। যা হোক, হতভাগা কেন্'আন তখনও ঈমান আনল না, প্রবল বেগে পানি বাড়ছিল)। আর এমন সময় তাদের (পিতা-পুত্র) উভয়ের মাঝে (এক বিশাল) তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, এতে সে (কেন'আনও অন্যান্য) কাফিরদের মত নিমজ্জিত হলো। আর (সমস্ত কাফির নিমজ্জিত হওয়ার পর) নির্দেশ দেয়া হলো, হে পৃথিবী, তোমার (উপরিস্থিত সব) পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, (বর্ষণ হতে) ক্ষান্ত হও। (উভয় নির্দেশ তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হলো,) আর পানি হ্রাস করা হলো এবং কাজ যা হওয়ার ছিল হয়ে গেল। আর কিশতি এসে জুদী পাহাড়ে ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হলো— কাফিররা রহমত হতে দূরীভূত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যানবাহনে আরোহণের আদব ঃ ৪১ নং আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি জলযানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে আরোহণ করবে।

مَجْرِى 'মাজরে' অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

مُرْسٰى 'মুরসা' অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আল্লাহ্র নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি ও কুদরতের অধীন!

প্রতিটি যানবাহনের গতি স্থিতি আল্লাহ্র কুদরতের অধীন ঃ সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান ও শূন্যযান অথবা কোন জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা তৈরী করা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূল দৃষ্টিতে মানুষ হয়ত এই বলে আস্ফালন করতে পারে যে, আমরা এটা তৈরি করেছি, আমরা এটা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটার লোহা-লক্কড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লৌহ বা এক ইঞ্চি কাঠও তৈরী করার ক্ষমতা তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারি যন্ত্রাংশ তৈরী করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছেন ? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত তাহলে দুনিয়ায় কোন নির্বোধ লোক থাকত না। সবাই এরিস্টটল, প্লেটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরি হয়। অতঃপর শত শত টন, হাজার হাজার মণ মালামাল বহন করে যমীনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য, তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে বিদ্যুৎরূপে হোক বা জ্বালানি তেল ইত্যাদি হোক সর্বাবস্থায় চিন্তা করে দেখুন তন্মধ্যে কোন্‌টি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ? বায়ু বা পানি কি সে সৃষ্টি করেছে ? তেল বা পেট্রোল কি সে সৃষ্টি করেছে ? এর অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে ?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায় তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হিফাযত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়াতালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا—একমাত্র আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মাত্র দুই শব্দ বিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুত এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যদ্দারা মানুষ বস্তু জগতে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মু'মিনের দুনিয়াদারী ও কাফিরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু ম'মিন যখন কোন যানবাহনে আরোহণ করে তখন সে শুধু যমীনের দূরত্বই অতিক্রম করে না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ্ (আ)-এর সকল পরিজনবর্গ কিশতিতে আরোহণ করল, কিন্তু 'কেনআন' নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশত হযরত নূহ্ (আ) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর, কাফিরদের সাথে থেকো না, পানিতে ডুবে মরবে। কাফির ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগসাজশ ছিল এবং সে নিজেও কাফির ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ) তার কাফির হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর আহবানের মর্ম হবে—নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরী হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফিরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা 'কেনআন' তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল—আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ (আ) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে—আজকে কোন উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র খাস রহমত ছাড়া আজ বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই। দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং কেনআনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ (আ)-এর তুফানের সময় এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫ গজ এবং কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল।

৪৪ নং আয়াতে প্লাবন সমাপ্তি ও পরিবেশ শান্ত হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিলেন ঃ يَا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ

অর্থাৎ "হে যমীন, তোমার সব পানি গিলে ফেল।" অর্থাৎ যে পরিমাণ পানি যমীন উদগীরণ করেছিল, সে সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হলো যেন যমীন তা শুষে নেয়। আকাশকে অর্থাৎ মেঘমালাকে নির্দেশ দিলেন—"ক্ষান্ত হও, বারি বর্ষণ বন্ধ কর।" ফলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হলো, যমীনের পানি ভূ-অভ্যন্তরে চলে গেল। আর আসমান হতে ইতিপূর্বে বর্ষিত পানি নদ-নদীর আকার ধারণ করল—যা দ্বারা পরবর্তীকালে মানব সমাজ উপকৃত হতে পারে।—(তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যমীন ও আসমানকে সম্বোধন করে নির্দেশ দান করেছেন। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন অনুভূতিসম্পন্ন বস্তু নয়। তাই কেউ কেউ এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমাদের দৃষ্টিতে বিশ্বের যেসব বস্তু অনুভূতিহীন নির্জীব জড় পদার্থ মাত্র, আসলে তা সবই অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রাণবিশিষ্ট। অবশ্য তাদের আত্মা ও অনুভূতি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পর্যায়ের নয়। তাই তাদের প্রাণহীন ও অনুভূতিহীন সাব্যস্ত করে শরীয়তের বিধিনিষেধ হতে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে ঃ যেমন— وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ "এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্‌র হাম্‌দ্ ও তসবীহ পাঠ করছে না।" আর একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র মারিফত ও পরিচয় ছাড়া হাম্‌দ্ ও তসবীহ পাঠে সক্ষম হওয়া সম্ভব নয় আর পরিচয় লাভের জন্য জ্ঞান

ও অনুভূতি থাকা অপরিহার্য। অতএব উপরোক্ত আয়াতে করীমা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যথাযোগ্য অনুভূতি রয়েছে, যা দ্বারা সে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে ও জানতে পারে; স্রষ্টা তাকে কি জন্য সৃষ্টি করেছেন, কোন্ কাজে নিয়োজিত করেছেন, তাও উত্তমরূপে জানে এবং তা পূরণ করার জন্য আত্মনিয়োজিত থাকে। কোরআন পাকের আয়াতে أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى-এর মধ্যে এ কথাই বলা হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে আসমান ও যমীনকে সরাসরি সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বললে কোন অসুবিধা নেই। মাওলানা রূমী (র) বলেন ঃ

خاك وباد وآب وآتش زنده اند - بامن وتو مرده باحق زنده اند

"মাটি, বায়ু, আগুন ও পানিরও প্রাণ আছে। আমার ও তোমার কাছে তা প্রাণহীন, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে জীবন্ত।"

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, যমীন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হলো, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেওয়া হলো যে, দুরাত্মা কাফিররা চিরকালের জন্য আল্লাহ্র রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে।

জুদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। এটা হযরত নূহ (আ)-এর মূল আবাসভূমি ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে উমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুত এটি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ (আ)-এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্ন স্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ (আ) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শ্বে পৌঁছল, তখন সাতবার কা'বা শরীফের তাওয়াফ করল। আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ (আ) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোযা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোযা পালন করেছিল।—(তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

পূর্ববর্তী নবীগণের সব শরীয়তেই মুহাররম মাসের দশম তারিখে অর্থাৎ আশুরার দিনটিকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের প্রাথমিক যুগেও আশুরার রোযা ফরয ছিল। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরার রোযা ফরয থাকেনি, তবে তা সুন্নত ও বিশেষ সওয়াবের কাজ হিসাবে সর্বদা পরিগণিত।

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۫ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ
اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا
لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾
قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ
مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ مِنْ
اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ
قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ۛؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾ ع

(৪৫) আর নূহ (আ) তার পালনকর্তাকে বললেন—হে পরওয়ারদিগার! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। (৪৬) আল্লাহ্ বলেন—হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। (৪৭) নূহ্ (আ) বলেন—হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় চাইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো। (৪৮) হুকুম হলো—হে নূহ্ (আ)! আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুন। আর অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দিব। অতঃপর তাদের উপর আমার দারুণ আযাব আপতিত হবে। (৪৯) এটা গায়েবের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে; তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[নূহ (আ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান আনয়ন করতে কিনআন যখন অস্বীকার করল, তখন সে নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত তার অন্তরে ঈমান ঢেলে দিবেন এবং সে ঈমান আনয়ন করবে এ আশায়] হযরত নূহ্ (আ) স্বীয় পরওয়ারদিগারকে বললেন—হে পরওয়ারদিগার। আমার পুত্র তো আমার পরিজনভুক্ত আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য (যে, পরিজনবর্গের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদেরে আপনি রক্ষা করবেন)। আর (যদিও সে বর্তমান ঈমানদার না হওয়ার কারণে পরিত্রাণ লাভের অযোগ্য, কিন্তু) আপনি তো আহকামুল হাকিমীন (সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সর্বশক্তিমান। আপনার অসাধ্য কিছুই নেই। আপনি ইচ্ছা করলে তাকে ঈমান দান করে কিশতিতে আরোহণের যোগ্য করতে পারেন। বস্তুত এটা ছিল কিনআনের ঈমানদার হওয়ার জন্য দোয়া স্বরূপ)। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন—হে নূহ (আ), (আমার অনাদি ইলম অনুসারে) সে (কিনআন) আপনার পরিজনভুক্ত নয়, (অর্থাৎ যারা ঈমানের বদৌলতে নাজাত হাসিল করবে; তাদের মধ্যে নয়—ঈমান আনার সৌভাগ্য তার হবে না। বরং) সে (অন্তিমকাল পর্যন্ত) অবশ্যই দুরাচার (কাফির থাকবে। সুতরাং আমার কাছে এমন কোন দোয়া বা) দরখাস্ত করবেন না যার (আসল) খবর আপনার জানা নাই। আমি আপনাকে নসীহত করছি যে, আপনি (অজ্ঞদের) দলভুক্ত হবেন না। নূহ (আ) বললেন—হে আমার প্রভু। আমার যা জানা নেই (ভবিষ্যতে)এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইতেছি; (এবং পূর্বকৃত ত্রুটি মার্জনার প্রার্থনা করছি। কেননা) আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো, [ধ্বংস হয়ে যাব। জুদী পাহাড়ে কিশতি নোঙ্গর করার কয়েক দিন পরে যখন পানি হ্রাস পেল, তখন হযরত নূহ (আ)-কে] বলা হলো (অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সরাসরি অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে বললেন—) হে নূহ (আ), (এখন জুদী পাহাড় হতে সমতল ভূমিতে) অবতরণ করুন, আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা ও বরকত সহকারে যা নাযিল হবে আপনার নিজের উপর ও আপনার সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর। (কারণ তাঁরা সবাই ঈমানদার ছিলেন। একই কারণে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মু'মিন-মুসলমানদের উপর আল্লাহ্র তরফ হতে সালামতি ও বরকত নাযিল হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে।) আর (পরবর্তী যুগে এদের বংশধরদের মধ্য হতে অনেক লোক কাফিরও হবে, তাই তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে) এমন অনেক সম্প্রদায় হবে, যাদের আমি (পার্থিব জীবনে সাময়িকভাবে) উপকৃত হতে দেব। অতঃপর (কুফরী ও শিরকীর কারণে পরকালে) তাদের উপর আমার দারুণ আযাব আপতিত হবে। এই কাহিনী [হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনার জন্য ও আপনার জাতির জন্য] গায়েবের খবরসমূহের মধ্যে একটি (খবর), যা ওহীর মাধ্যমে আমি আপনাকে পৌঁছাচ্ছি! (ওহীর) পূর্বে এ আপনিও জানতেন না এবং আপনার জাতিও জানত না। (সে হিসাবে) এটা ছিল গায়েবের খবর। (আর একমাত্র ওহী ছাড়া এটা জানার অন্য কোন উপায় ছিল না। অতএব, প্রমাণিত হচ্ছে যে,) আপনি ওহীর মাধ্যমে অত্র কাহিনী অবহিত হয়েছেন। এতদ্বারা আপনার নবুয়ত ও রিসালত অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। এতদসত্ত্বেও মক্কার কাফিররা আপনার বিরোধিতা করছে। যা হোক, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন।

[যেমন ইতিপূর্বে হযরত নূহ (আ)-এর চরম ধৈর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা,] যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য কল্যাণকর পরিণাম (রয়েছে,) কোন সন্দেহ নেই। [যেমন হযরত নূহ (আ) ও তাঁর কওমের ঘটনায় দেখা গেছে যে, কাফিরদের পরিণতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে আর ঈমানদারগণের পরিণাম কল্যাণপ্রসূ হয়েছে। অনুরূপভাবে বর্তমান যুগের কাফির বেঈমানদের দাপট সাময়িক ব্যাপার, পরিশেষে সত্য ও ন্যায়ের বিজয় অবধারিত।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য ৫টি আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর তুফান সংক্রান্ত অবশিষ্ট কাহিনী ও সংশ্লিষ্ট হিদায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র কিনআন যখন মহান পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য ও আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করল তখন তার ধ্বংস অনিবার্য দেখে হযরত নূহ (আ)-এর পিতৃস্নেহ ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল-ইজ্জতের মহান দরবারে আরয করলেন, হে প্রভু ! আপনি আমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আপনার ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক। কিন্তু অবস্থা দেখছি যে, আমার পুত্র কিনআন তুফানে মারা পড়বে। এখনও তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনি তো আহকামুল হাকিমীন, আপনি সর্বশক্তিমান। অতএব, আপনি নিজ ক্ষমতাবলে তাকে রক্ষা করবেন বলে আশা রাখি।

৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ হতে হযরত নূহ্ (আ)-এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ ছেলেটি আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা কাফির। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোন আবেদন করা আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞসুলভ কাজ না করার জন্য আমি আপনাকে নসীহত করছি।

আল্লাহ্ তা'আলার অত্র ফরমানের মধ্যে দুটি বিষয়ই জানা গেল। প্রথম এই যে, হযরত নূহ্ (আ) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফির হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। বরং তার মুনাফিকীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ "অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন কোন অবাধ্য কাফিরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।"—এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দুঃসাহস করা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে এটা কুফরী অবস্থায় কিনআনকে রক্ষা করার আবদার ছিল না। বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য আল্লাহ্র দরবারে আকুল আবেদন ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ)-এর মত একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালমত না জেনেশুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন নি। বরং এরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। পয়গম্বরের উচ্চ মর্যাদার জন্য এটা এমন একটা ত্রুটি যা পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি

যখন তাঁর কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনও তিনি উক্ত ত্রুটিকে ওজর হিসাবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

কাফির ও জালিমের জন্য দোয়া করা জায়েয নয় ঃ উপরোক্ত বয়ান দ্বারা একটি মাস'আলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে–তা জায়েয, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেওয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তফসীরে বয়জাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনেশুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে দোয়া করা অধিকতর হারাম হবে।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর-বুযর্গানের নীতি হচ্ছে, যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন দোয়ার জন্য তাঁদের কাছে আসে, পীর-বুযর্গান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জানা থাকে যে, এ ব্যক্তি জালিম ও অন্যায়কারী অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য হালাল নয়। এমন কোন চাকরি বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। জেনেশুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দোয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না ঃ এখানে আরো জানা গেল যে, মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বুযর্গের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন, কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোন মূল্য নেই। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

هزار خویش که بیگانه ازخدا باشد
فدائے یک تن بیگانه کاشنا باشد

অর্থাৎ হাজারো আপন লোক আল্লাহ্‌র খাতিরে পর হয়েছে। আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গিত পরও আপন হয়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। বরং ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তারা যে-কোন বংশের, যে-কোন গোত্রের, যে-কোন দেশের, যে-কোন ভাষাভাষী হোক না কেন, সবাই মিলে এক জাতি একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। إِنَّمَا الْمُسْلِمُوْنَ إِخْوَةٌ। 'সকল মুসলমান ভাই ভাই' আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও

সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়। এ তত্ত্বটি কোরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জবানীতে অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

اِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ •

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যেসব বাতিল মা'বুদের উপাসনা করছ সেসব উপাস্যের প্রতিও বিরক্ত।

(২৮ পারা, সূরা মুমতাহানাহ্, আয়াত ৪)

আলোচ্য আয়াতে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি دینی معاملات 'ধর্মীয় ব্যাপারের শর্ত' অতিরিক্ত আরোপ করেছি। কেননা দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে সুষ্ঠু লেনদেন, ভাল আচার-ব্যবহার, পরোপকার, দয়াশীলতা, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র ব্যাপার। যে কোন ব্যক্তির সাথে তা করা জায়েয, উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হযরত রাসূলে করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সদ্ব্যবহার, কাফির ও অমুসলিমদের প্রতি তাদের উদারতা ও সদয় ব্যবহারের অসংখ্য ঘটনা এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।

বর্তমান যুগে বিশ্বজুড়ে আঞ্চলিক, ভৌগোলিক, বর্ণগত ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী, আরবী, হিন্দী, সিন্ধীরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তারূপে পরিগণিত হচ্ছে। এহেন জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা কোরআন ও সুন্নাহের আদর্শের পরিপন্থী তথা রাসূলে করীম (সা)-এর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহের শামিল।

৪৭ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ) কর্তৃক পেশকৃত ওজরখাহীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে—সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ামাত্র আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ, তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ, অন্যায় হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য কামনা, অতীত দোষত্রুটি মার্জনার জন্য আল্লাহ্র কাছে মার্জনা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে তাঁর অনুগ্রহের জন্য আবেদন।

এতদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষের কোন ভুলত্রুটি হওয়ার পর ভবিষ্যতে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শুধু নিজের সংকল্প ও দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে কাজ হবে না। বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করবে এবং দোয়া করবে যে, আয় পরওয়ারদিগার ! আপনি আমাকে নিজ কুদরত ও রহমতে ত্রুটি-বিচ্যুতি, পাপ-তাপ হতে রক্ষা করুন !

৪৮ নং আয়াতে তুফানের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্লাবনের উদ্দেশ্য যখন সাধিত হলো, তখন আল্লাহ্র হুকুমে বৃষ্টিপাত বন্ধ হলো, যমীনের পানি যমীন গ্রাস করল, প্লাবন সমাপ্ত হলো, হযরত নূহ (আ)-এর কিশতি জুদী পাহাড়ে ভিড়ল, অবশিষ্ট বৃষ্টির পানি নদনদীরূপে সংরক্ষিত হলো। ফলে যমীন মানুষের বসবাসের যোগ্য হলো। হযরত নূহ্ (আ)-কে পাহাড় হতে সদলবলে সমতল ভূমিতে অবতরণের হুকুম দিয়ে বলা হলো, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। কেননা আপনার প্রতি আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা থাকবে, অথবা সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে নিরাপত্তা দেয়া হলো এবং আপনার ধন-সম্পদ ও আওলাদ-ফরজন্দের মধ্যে বরকত ও প্রাচুর্যের নিশ্চয়তা দেয়া হলো।

কোরআন করীমের এই ইরশাদ অনুযায়ী প্লাবন-পরবর্তীকালের সমস্ত মানবমণ্ডলী হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ। "আর শুধু তাঁর বংশধরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছি।" এ জন্যই ইতিহাসবেত্তাগণ হযরত নূহ (আ)-কে দ্বিতীয় আদম উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

নিরাপত্তা ও বরকতের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা শুধু হযরত নূহ (আ)-এর সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইরশাদ হয়েছে ঃ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ "আর আপনার সঙ্গীদের সম্প্রদায়গুলির উপরও সালামতি ও বরকত রয়েছে।" এখানে হযরত নূহ (আ)-এর সহযোগী ঈমানদারগণকে أُمَمٌ বলা হয়েছে, যা أُمَّةٌ উম্মত-এর বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, কিশতিতে আরোহণকারীরা বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক ছিল। অথচ ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, কিশতির আরোহিগণ অধিকাংশ হযরত নূহ (আ)-এর খান্দানের লোক ছিল। আঙ্গুলে গোনা কয়েকজন মাত্র অন্য বংশের ছিল। এতদসঙ্গেও তাদের প্রতি أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ বাক্য প্রয়োগ করে বোঝানো হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাদের বংশধরদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হবে। কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যত বংশধরগণকে সালামতি ও বরকতের শামিল করা হয়েছে।

অতএব, এখানে সালামতি ও বরকতের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যেমন মু'মিনও থাকবে, তদ্রূপ বহু জাতি কাফির, মুশরিক ও নাস্তিকও হয়ে যাবে। মু'মিনদের জন্য তো দুনিয়া ও আখিরাতে সালামতি ও বরকত রয়েছে। কিন্তু তাদের বংশধরদের মধ্যে যারা কাফির, মুশরিক, নাস্তিক তারা তো জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের জন্য নিরাপত্তা ও বরকত কিভাবে হতে পারে? আয়াতের শেষ বাক্যে তার জবাব দেয়া হয়েছে যে ঃ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ অন্যান্য সম্প্রদায়কেও আমি পার্থিব জীবনের নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য দান করব, সর্বপ্রকার ভোগবিলাসের সামগ্রী দ্বারা সাময়িকভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেব। কেননা পার্থিব নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য সাধারণ দস্তারখানস্বরূপ; শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই তা উপভোগ করতে পারে। অতএব, কিশতি আরোহিগণের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যারা কাফির হবে তারাও এর অংশীদার হবে। কিন্তু আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবী শুধু ঈমানদারদের জন্য সংরক্ষিত। কাফিরদের সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান ইহজীবনেই বুঝিয়ে দেয়া হবে। অতএব, আখিরাতে তাদের উপর শুধু আমার আযাবই নির্ধারিত রয়েছে।

হযরত নূহ (আ)-এর যমানায় সংঘটিত মহাপ্লাবনের বিস্তারিত বিবরণ হুযুর (সা) ওহীর মাধ্যমে অবহিত হয়ে স্বীয় দেশবাসীকে শুনালেন, ওহীর পূর্ব পর্যন্ত এসব ঘটনা তিনিও জানতেন না, তাঁর দেশবাসীও জানত না। একমাত্র ওহী ছাড়া তা জানার কোন উপায়-উপকরণও তাদের কাছে ছিল না। সমগ্র জাতি যে ঘটনা সম্পর্কে বেখবর এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-ও যেহেতু বিদ্যা-শিক্ষার জন্য কখনো বিদেশে যান নি, সুতরাং এটা জানার একমাত্র পন্থা ওহী সাব্যস্ত হলো। আর ওহীপ্রাপ্ত হওয়াই নবুয়ত ও রিসালতের অকাট্য প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যে রাসূলে আকরাম (সা)-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, আপনার নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতার পক্ষে সূর্যের চেয়ে ভাস্বর অনস্বীকার্য যুক্তি-প্রমাণ

বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কতিপয় বদবখত যদি আপনাকে অমান্য করে, আপনার সাথে কলহ করে, আপনাকে কষ্ট-ক্লেশ দেয়, তাহলে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বর হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনাবলী চিন্তা করুন। তিনি প্রায় এক হাজার বছর যাবত অপরিসীম কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছেন, আপনি তাঁর মত ধৈর্য অবলম্বন করুন। কারণ পরিশেষে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিগণই কল্যাণ ও কামিয়াবী লাভ করবেন।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ
إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَٰقَوْمِ لَا أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ
قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا
نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن
نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي
بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي
تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ
رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
وَنَجَّيْنَٰهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا
رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿٦٠﴾ ع

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ

اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَاۤ

اَتَنْهٰىنَاۤ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً

فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۫ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾ وَيٰقَوْمِ

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا

بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ

اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾ كَاَنْ لَّمْ

يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَا۟ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾ ع

(৫০) আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন—হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (৫১) হে আমার জাতি ! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরি চাই না; আমার মজুরি তাঁরই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তবু তোমরা কেন বুঝ না ? (৫২) আর হে আমার কওম ! তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের

মত বিমুখ হয়ো না। (৫৩) তারা বলল—হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নি, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেবদেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। (৫৪) বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হূদ বললেন—আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সাথে, যাদেরকে তোমরা শরীক করছ; (৫৫) তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। (৫৬) আমি আল্লাহ্‌র উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদিগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তা সরল পথে, সন্দেহ নেই। (৫৭) তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌঁছিয়েছি, যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে; আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তার কিছুই বিগড়াতে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদিগারই প্রতিটি বস্তুর হিফাযতকারী। (৫৮) আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হলো, তখন আমি নিজ রহমতে হূদ এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে পরিত্রাণ করি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করি। (৫৯) এ ছিল 'আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। (৬০) এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, 'আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হূদের জাতি 'আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ। (৬১) আর সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; তিনি বললেন—হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই, তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তারই দিকে ফিরে চল; আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। (৬২) তারা বলল,—হে সালিহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যার পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না। (৬৩) সালেহ বললেন—হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করে থাকি আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তাঁর থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না। (৬৪) আর হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহ্‌র যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। (৬৫) তবু তারা এটার পা কেটে দিল। তখন

সালিহ বললেন—তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। এটা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (৬৬) অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হলো, তখন আমি সালিহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। (৬৭) আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) যেন তারা কোনদিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল! আরো শুনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি 'আদ জাতির প্রতি তাদের (গোত্রীয় বা দেশীয়) ভাই হযরত হূদ (আ)-কে (পয়গম্বররূপে) প্রেরণ করেছি। তিনি স্বীয় (জাতিকে) বললেন—হে আমার জাতি, (তোমরা একমাত্র) আল্লাহ্র (ইবাদত) বন্দেগী কর। তিনি ছাড়া আর কেউ তোমার মাবূদ হওয়ার যোগ্য নেই। তোমরা (এই প্রতিমা পূজার বিশ্বাসের নিরেট) মিথ্যাবাদী। (কেননা, যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এর অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।) হে আমার জাতি (আমার নবুয়তের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ এই যে,) আমি (আল্লাহ্র দীন প্রচারের সুবাদে) তোমাদের কাছে কোন মজুরি চাই না। আমার পারিশ্রমিক ঐ আল্লাহ্র কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তথাপি তোমরা কেন বুঝ না? (নবুয়তের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও সন্দেহ পোষণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।) আর হে আমার দেশবাসী, তোমরা নিজেদের (শিরকী, কুফরী ইত্যাদি গোনাহ্ হতে) পরওয়ারদিগারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর (অর্থাৎ ঈমান আনয়ন কর)। অতঃপর (ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে) তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। (অর্থাৎ নেক আমল কর, তাহলে ঈমান ও ইবাদতের বদৌলতে) তিনি তোমাদের উপর (প্রচুর পরিমাণে) বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন। (দুররে-মনসূর কিতাবে বর্ণিত আছে যে, 'আদ জাতির উপর একাদিক্রমে তিন বছর যাবত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ চলেছিল। তাই তারা বৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।) আর (ঈমান ও আমলের বরকতে) শক্তিদান করে আমাদের (বর্তমান) শক্তিকে (আরো) বৃদ্ধি করবেন। (অতএব, সত্বর ঈমান আনয়ন কর) এবং অপরাধীরূপে (ঈমান হতে) বিমুখ হয়ো না। (তদুত্তরে তারা বলল)—হে হূদ (আ)! তুমি (আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার সপক্ষে) আমাদের কাছে কোন দলীল (প্রমাণ) নিয়ে আসনি। (তাদের এই উক্তি ছিল বিদ্বেষমূলক) আর আমরা (বিনা দলীলে শুধু) তোমার কথায় নিজেদের (পূর্বতন) উপাস্য দেব-দেবীদের (উপাসনা) পরিত্যাগ করতে পারি না, আমরা (কখনো) তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন (উপাস্য) দেবতা তোমাকে কোন অনিষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। (যেহেতু তুমি এদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছ, তাই তারা ক্রোধান্বিত হয়ে তোমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে; এ জন্যই তুমি আজেবাজে কথা বলছ যে, আল্লাহ্ এক এবং আমি তার নবী।) হযরত হূদ (আ) বললেন, (দেবতারা আমাকে উন্মাদ করেছে বলে (তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, তজ্জন্য (আমি প্রকাশ্যভাবে)

আল্লাহ্কে সাক্ষী করছি, আর তোমরাও (শুনে রাখ এবং) সাক্ষী থাক যে, তোমরা (আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের মধ্যে) যা কিছুকে শরীক (সাব্যস্ত) করছ (তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই), আমি তা থেকে (সম্পূর্ণ) বিমুখ। (মূর্তির সাথে আমার দুশমনি আগেও অজানা ছিল না, এবারের ঘোষণার ফলে তা আরো সুস্পষ্ট হলো। অতএব, যদি এসব দেব-দেবীর কোন ক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকে, তবে) আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা (ও দেবতারা) সবাই মিলে আমার (বিন্দুমাত্র) অনিষ্ট (সাধন) করার (জন্য সর্বাত্মক) প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশও দিও না, (এবং কোন ত্রুটিও করো না, দেখি তোমরা কি করতে পার; আর তোমরা ও তারা সবাই মিলেও যখন কিছু করতে পারবে না, তাহলে তারা একাকী কি করতে পারে? আমি মুক্তকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করছি; কেননা, মূর্তিগুলো তো সম্পূর্ণ অক্ষম, জড় পদার্থ, আমি তাদের মোটেই ভয় পাই না আর তোমাদের সামান্য ক্ষমতা থাকলেও তা আমি পরোয়া করি না। কারণ) আমি আল্লাহ্ তা'আলার উপর নিশ্চিত ভরসা করছি, যিনি আমার ও তোমাদের (মালিক) পরওয়ারদিগার। ধরাপৃষ্ঠে বিচরণশীল যত প্রাণী রয়েছে সবাই তাঁর কব্জার মধ্যে রয়েছে। (সবাই তাঁর অসীম কুদরতের করায়ত্ত, তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ নড়াচড়া করতে পারে না। তাই আমি তোমাদের পরোয়া করি না। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে একটি নতুন মু'জিযা প্রকাশ পেল যে, এক ব্যক্তি একাকী দাঁড়িয়ে সমগ্র জাতির সম্মিলিত জনশক্তির মুকাবিলা করেছেন, কিন্তু সবাই মিলে তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারছে না। এটা তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "তুমি আমাদের সম্মুখে কোন প্রমাণ পেশ করনি, আমাদের দেব-দেবীরা তোমার উপর ভূত চাপিয়ে দিয়েছে"—ইত্যাকার উক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাবও হয়ে গেছে, নবুয়ত ও তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে।—"তোমার কথায় আমাদের দেবতাদেরকে পরিত্যাগ করতে পারি না"—বাক্যটি বাতিল হয়ে গেছে; আর এটাই হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল পথ।) সরল পথে (চলার মাধ্যমেই) আমার পরওয়ারদিগারকে (পাওয়া যায়) সন্দেহ নেই। (অতএব, তোমরাও সরল পথ অবলম্বন কর। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করে ধন্য হবে। এত জোরালো বক্তব্যের পরেও) যদি তোমরা (সত্য পথ হতে অন্য দিকে) মুখ ফিরাও তবে (সেজন্য আমি দায়ী নই। কেননা) আমার কাছে তোমাদের প্রতি (পৌঁছাবার জন্য) যে পয়গাম প্রেরিত হয়েছিল আমি তা (যথাযথভাবে) পৌঁছে দিয়েছি। (অতএব, আমি দায়মুক্ত। কিন্তু তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন) এবং আমার পালনকর্তা অন্য লোকদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। (অস্বীকার ও অমান্য করে তোমরা নিজেদেরই সর্বনাশ করছ) এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। (ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে যদি কারো সন্দেহ হয় যে, কে কি করছে, আল্লাহ্ তা কি জানেন? তাহলে জেনে রাখ) নিশ্চয় আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই প্রতিটি বস্তুর হিফাযতকারী, (তিনি সব খবর রাখেন। এতদসত্ত্বেও তারা ঈমানের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল) এবং (আযাবের ফয়সালা ও প্রস্তুতি শুরু হলো।) যখন (আযাবের জন্য) আমার নির্দেশ নেমে এল (এবং প্রচণ্ড ঝড়-তুফানরূপে আযাব নাযিল হলো, তখন) আমি নিজ রহমতে (হযরত) হূদ (আ)-কে ও তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে (উক্ত আযাব হতে) রক্ষা করেছি। আর (আমি) তাদেরকে (এক) কঠিন আযাব

হতে রক্ষা করেছি (সামনে অন্যদের শিক্ষার জন্য বলা হচ্ছে)—এ ছিল আদ জাতির (কাহিনী), যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে (অর্থাৎ দলীল-প্রমাণ ও হুকুম-আহকামকে) অস্বীকার করেছে এবং তদীয় রাসূল (আ)-গণের অমান্য করেছে। আর এমন লোকের কথামত কাজ করেছে, যারা ছিল অহংকারী, হঠকারী। (যার ফলে) এ দুনিয়াতে (আল্লাহ্‌র) অভিসম্পাত তাদের পিছনে পিছনে রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও (তাদের সাথে সাথে অভিশাপ থাকবে। যার ফলে ঝড়-তুফানের কবলে পড়ে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী কঠিন আযাব ভোগ করবে)। মনে রেখ, 'আদ জাতি স্বীয় পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, আরো জেনে রাখ, (কুফরীর পরিণতিতে দুনিয়া ও আখিরাতে) হযরত হুদ (আ)-এর জাতি 'আদ জাতি (আল্লাহ্‌র) রহমত হতে দূরীভূত ও অভিশপ্ত হয়েছে।

আর আমি সামুদ জাতির প্রতি তাদের (গোত্রীয় বা দেশীয়) ভাই (হযরত) সালিহ (আ)-কে (পয়গম্বররূপে) প্রেরণ করি। (তিনি (স্বীয় জাতিকে আহবান করে) বললেন—হে আমার কওম, (তোমরা একমাত্র) আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন (অন্য) কেউ তোমাদের মাবুদ (হওয়ার যোগ্য) নেই। (তোমাদের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবদান এই যে,) তিনিই তোমাদেরকে যমীনের (সারাংশ হতে) সৃজন করেছেন, (এবং তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনি যেহেতু পরম দয়ালু ও করুণাময়) অতএব, (নিজেদের কুফরী শিরকী ইত্যাদি গোনাহ হতে) তাঁর কাছে মার্জনা চাও, (ঈমান আনয়ন কর) অতঃপর (ইবাদত ও সৎ কার্যের মাধ্যমে) তাঁরই দিকে ফিরে চল। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদিগার (ঐ ব্যক্তির) নিকটেই রয়েছেন (যে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে, আর কেউ তাঁর কাছে পাপ ক্ষমা করার আবেদন জানালে তিনি তা) কবুল করে থাকেন। (তদুত্তরে) তারা বলতে লাগল, হে সালিহ (আ)! এতদিন (যাবত) তুমি আমাদের আশাস্থল ছিলে, (তোমার যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব আমাদের জাতির জন্য গৌরবজনক ছিল, তোমরা নেতৃত্বের প্রতি আমরা আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু তোমার কথাবার্তায় দেখছি আমাদের আশা বিলীন হতে যাচ্ছে।) আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা (আরাধনা) করতো, তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা-অর্চনা করতে নিষেধ কর? আর যার (তওহীদের) প্রতি তুমি আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছ, আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না (একত্ববাদের চিন্তাধারা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না)।

[তখন হযরত সালিহ (আ)] বললেন—হে আমার দেশবাসী, (তোমরা আমাকে মূর্তি পূজার বিরোধিতা করতে ও একত্ববাদের দাওয়াত দিতে নিষেধ করছ) আচ্ছা বল তো; আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে জ্ঞান (গরিমা) লাভ করে থাকি, এবং তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) দান করেন, (যার ফলে তওহীদের প্রচার ও প্রসারের জন্য আমি আদিষ্ট হই;) অতঃপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই (অর্থাৎ তোমাদের কথামত তওহীদের দাওয়াত পরিত্যাগ করি), তাহলে (বল তো,) তাঁর (আযাব) হতে আমাকে কে রক্ষা করবে? তোমরা তো (কুমন্ত্রণা দিয়ে) আমার (শুধু) ক্ষতিই করতে চাও। (নবুয়তের সত্যতার

প্রমাণ হিসাবে তারা যেহেতু মু'জিযা দেখতে চেয়েছিল, তাই তিনি বললেন) আর হে আমার কওম, (তোমরা মু'জিযা দেখতে চাও, তাহলে) আল্লাহ্র এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন (স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন হওয়ার কারণে একে আল্লাহ্র উষ্ট্রী বলা হয়েছে। মু'জিযা হিসাবে এটা আমার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ। অতএব, এর নিজস্ব কতিপয় অধিকার রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যে,) তাকে আল্লাহ্র যমীনে বিচরণ করে (ইচ্ছামত ঘাস) খেতে (সুযোগ) দাও। (অনুরূপভাবে তার পালার দিন পানি পান করার কথা অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।) আর (অনিষ্ট করা বা কষ্ট দেওয়ার জন্য) মন্দভাবে এটাকে (কখনো) স্পর্শও করবে না। নতুবা (অতি) সত্বর তোমাদেরকে আযাব এসে পাকড়াও করবে।

(তাদের এত করে বোঝানো হলো,) তবুও তারা একে (পা কেটে) হত্যা করল, তখন (হযরত) সালিহ্ [(আ) তাদের লক্ষ্য করে] বললেন—(আচ্ছা,) তোমরা নিজেদের গৃহে (মাত্র) তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। (তিনদিন পরেই আযাব আপতিত হবে। আর) এটা (আল্লাহ্র পক্ষ হতে) এমন (নিশ্চিত) ওয়াদা যা (চুল পরিমাণ) মিথ্যা (প্রতিপন্ন) হতে পারে না।

অতঃপর (তিন দিবস অতীত হওয়ার পরে) যখন (আযাবের জন্য) আমার হুকুম (এসে) পৌছল, (তখন) আমি (হযরত) সালিহ্ (আ)-কে ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে (নিরাপদে) উদ্ধার করি এবং সেদিনকার লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করি। (কেননা আল্লাহ্র গযবে পতিত হওয়ার চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর কিছু নেই।) নিশ্চয় তোমার প্রভু, তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশীল (যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দান করেন, যাকে খুশি রক্ষা করেন।)

আর ভয়ঙ্কর (এক) গর্জন [অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর হাঁক] পাপিষ্ঠদেরকে পাকড়াও করল! (যার) ফলে তারা (অতি) প্রত্যুষে নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (তারা চিরতরে এমন নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল,) যেন তারা কোনদিনই তথায় ছিল না। জেনে রাখ, সামুদ জাতি তাদের পরওয়ারদিগারকে অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, (পরিণামে) তারা (আল্লাহ্র) রহমত হতে দূরীভূত (ও গযবে নিপতিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হূদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত হূদ (আ)-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র সূরার নামকরণ হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আ) হতে হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত সাতজন আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কোরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, যা যেকোন অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাতজন পয়গম্বররের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হূদ (আ)-এর নামে। এতে বোঝা যায় যে, এখানে হযরত হূদ (আ)-এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক হযরত হুদ (আ)-কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হুদ (আ)-ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন ঃ أَخَاهُمْ هُوْدًا 'তাদের ভাই হুদ'—শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরি প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাঁদের মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হুদ (আ) তাঁর কওমের নিকট যে দীনী দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা প্রথম তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত—তওহীদ বা একত্ববাদের আহবান এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে তওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এজন্য জীবন উৎসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন্ স্বার্থে অবলম্বন করেছি ? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোন ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহ্র নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল ?

ওয়াজ-নসিহত ও দীনী দাওয়াতের পারিশ্রমিক ঃ কোরআন করীমে প্রায় সব নবী (আ)-এর যবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহ্র দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।" এতে বোঝা যায় যে, দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসূ হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথা শ্রোতাদের অন্তরে কোন তাসির করতে পারে না।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শিরকী ইত্যাদি যত গোনাহ্ করেছে, সেসব থেকে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গোনাহ্ হতে তওবা কর। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে, আগামীতে আর কখনো এসবের ধারেকাছেও যাবে না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও ইস্তেগফার করতে পার, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই,) অধিকন্তু দুনিয়াতেও এর বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত হবে।

এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধনবল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্বারা জানা গেল যে, তওবা ও ইস্তিগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধনসম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

হযরত হুদ (আ)-এর আহবানের জবাবে তাঁর দেশবাসী মূর্খতাসুলভ উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোন মু'জিযা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপদাদার আমলের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করব না। এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না।

বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলছেন।

তদুত্তরে হযরত হূদ (আ) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না।

এত বড় কথা আমি এ জন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি, যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে বিচরণশীল সকল প্রাণীই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদিগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহ্কে পাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘদিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুত এও হযরত হূদ (আ)-এর একটি মু'জিযা। এর দ্বারা একে-তো তাদের এ কথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কোন মু'জিযা প্রদর্শন করেন নি। দ্বিতীয়ত, তারা যে বলত, "আমাদের কোন কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে" তাও বাতিল করা হলো। কারণ দেবদেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাঁকে জীবিত রাখত না।

অতঃপর তিনি বলেন—তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌঁছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব ও গযব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদিগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের তিনি খবর রাখেন।

কিন্তু হতভাগার দল হূদ (আ)-এর কোন কথায় কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহ্র আযাব নেমে এল। সাতদিন আটরাত যাবত অনবরত ঝড়-তুফান বইতে লাগল। বাড়ি-ঘর ধসে গেল, গাছপালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হলো, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হুদ (আ) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করেন।

'আদ জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য ইরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ আল্লাহ্র আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্র রাসূলগণকে অমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্ঠদের কথামত কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং আখিরাতেও অভিশপ্ত আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে বোঝা যায় যে, 'আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'সূরা মুমিনুন'-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়ত উভয় প্রকার আযাবই নাযিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড়-তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৬১ হতে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালিহ্ (আ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যিনি 'আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা 'কওমে সামুদ'-এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর কওমকে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে বলল—"এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড হতে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাযী আছি।"

হযরত সালিহ্ (আ) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মুতাবিক মু'জিযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা হতে বিরত হলো না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মুতাবিক মু'জিযা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলী সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্মপ্রকাশ করল। আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয়, তবে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালিহ্ (আ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হলো। অত্র ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালিহ্ (আ)-এর জাতি তাঁকে বলল : قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا অর্থাৎ তওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পূজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো, যেমন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নবুওয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত, এবং 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু

নবুওয়তের দাবি ও মূর্তিপূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব লোক তার বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, মাত্র তিনদিন তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো, এ তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিনদিন ছিল বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রোববার প্রত্যুষে তাদের উপর আযাব নাযিল হলো।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ অর্থাৎ ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আ)-এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর হতে পারে না। এরূপ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

অত্র আয়াতের মর্মার্থ থেকে বোঝা যায় যে, 'কওমে-সামুদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপরদিকে সূরা 'আ'রাফ-এর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 'অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।' এতে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল।

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ
اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ
وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَاَتُهٗ
قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾
قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ
عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ
الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾

(৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল, তারা বলল—সালাম, তিনিও বললেন—সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই

তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন! (৭০) কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্দিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। তারা বলল—ভয় পাবেন না। আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি (৭১) তার স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবেরও। (৭২) সে বলল—কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এ তো ভারী আশ্চর্য কথা! (৭৩) তারা বলল—তুমি আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছ? হে গৃহবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহ্র রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রশংসিত, মহিমময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা (মানবাকৃতি ধারণ করে) ইবরাহীম (আ)-এর কাছে [তদীয় পুত্র হযরত ইসহাক (আ) সম্পর্কে] সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। (যদিও তাঁদের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করা), তাঁরা [উপস্থিত হওয়ামাত্র হযরত ইবরাহীম (আ)-কে] বলল—সালাম (অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। তদুত্তরে হযরত) ইবরাহীম (আ)-ও তাদেরকে সালাম বললেন, (অর্থাৎ সালামের যথারীতি জবাব দিলেন, কিন্তু তিনি তাদের চিনতে পারলেন না; তাই সাধারণ আগন্তুক মানুষ মনে করলেন। অতঃপর) তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি (হৃষ্টপুষ্ট) বাছুর ভুনা করে (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে এলেন, (এবং তাদের সম্মুখে রাখলেন।) কিন্তু তাঁরা যেহেতু ফেরেশতা ছিলেন, তাই আহার্য গ্রহণ করলেন না। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন দেখলেন যে, সেই খাবারের দিকে তাঁদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্দিগ্ধ হলেন এবং মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। (যে, এরা কারা ? আহার্য গ্রহণ করছে না কেন ? তবে কি এদের কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে ? অথচ বাড়িতে আমিই একমাত্র পুরুষ, ধারেকাছে কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই। এমনকি তিনি মনের খটকা প্রকাশ করে বললেন إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ 'আমরা তোমাদেরকে ভয় করছি।') ফেরেশতাগণ বললেন, ভয় পাবেন না। [আমরা মানুষ নই, বরং ফেরেশতা। আপনার জন্য সুসংবাদ বহন করে এনেছি যে, আপনার ঔরসে বিবি সারার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যার নাম হবে ইসহাক (আ) এবং তাঁর পুত্র হবে ইয়াকুব (আ)। অত্র ভবিষ্যদ্বাণীকে সুখবর বলার কারণ, প্রথমত সন্তান লাভ করা খুশির বিষয়। দ্বিতীয়ত তখন হযরত ইবরাহীম (আ) ও বিবি সারা বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলেন, সে বয়সে সন্তান লাভের কোন আশা ছিল না। কাজেই, এর চেয়ে বড় সুসংবাদ আর কি হবে ? যাহোক, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর নবীসুলভ জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করলেন যে, তাঁরা ফেরেশতা; নবীসুলভ জ্ঞান দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে গেলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এ ব্যতীত আরো গুরুত্বপূর্ণ কোন কার্য সম্পাদনের জন্যই অবতরণ করেছেন। তাই তিনি জানতে চাইলেন فَمَا

خَطْبُكُمْ 'আপনাদের প্রধান লক্ষ্য কি ?'তদুত্তরে তারা বলল,। আমরা হযরত লূত (আ)-এর কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (কুফরী করার শাস্তিস্বরূপ) তাদের নির্মূল করে দিতে। হযরত ইবরাহীম (আ) ও ফেরেশতাগণের মধ্যে এই কথোপকথন চলছিল। আর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী (বিবি সারা) নিকটেই কোথাও দণ্ডায়মান ছিলেন এবং শুনছিলেন। অতঃপর সন্তান লাভের সংবাদ শুনে আনন্দাতিশয্যে হেসে ফেললেন। কারণ হযরত হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের পরে তাঁর মধ্যে সন্তান কামনা জাগ্রত হয়েছিল। তাজ্জব হয়ে কপালে হাত ঠেকালেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ فَاَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا অতঃপর আমি (ফেরশতাদের মাধ্যমে পুনরায়) তাকে সুখবর দিলাম (হযরত) ইসহাক (আ)-এর জন্মগ্রহণের এবং ইসহাক (আ)-এর পরে তৎপুত্র হযরত ইয়াকুব (আ)-এর (জন্ম গ্রহণের, তখন) সে বলতে লাগল ঃ মরণ আর কি! আমি সন্তান প্রসব করব ? অথচ আমি বৃদ্ধা আর আমার স্বামীও (উপবিষ্ট) রয়েছেন, একেবারে বৃদ্ধ। এ তো বড়ই আজব কথা। ফেরেশতাগণ বললেন, (নবীর পরিবারভুক্ত হওয়া এবং মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী বারবার দেখা সত্ত্বেও) তুমি কি আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করছ ? হে গৃহবাসীরা, (বিশেষ করে) তোমাদের (এ গৃহের লোকদের) উপর তো আল্লাহ্ তা'আলার খাস রহমত এবং (বিভিন্ন প্রকার) বরকত নাযিল হয়ে আসছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসিত (এবং) মহিমময়। (অতএব বিস্মিত না হয়ে বরং আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও শোকর আদায় কর।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য পাঁচটি আয়াতে হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ্ (আ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন; কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যত সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। তাঁর নামকরণ করা হলো ইসহাক। আরো অবহিত করা হলো যে, হযরত ইসহাক (আ) দীর্ঘজীবী হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তাঁর সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকুব' (আ)। উভয়ে নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভুনা গোশত সামনে রাখলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের ঊর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তাঁরা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহীম (আ) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়তো এদের মনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে তা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে, "আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহ্র ফেরেশতা, আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আ)-এর কওমের উপর আযাব নাযিল করা।" হযরত

ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনেছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন, ফেরেশতা, তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সুখবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে! আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? যাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য-কারণের ঊর্ধ্বে বহু অলৌকিক ঘটনা তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্তসার। এবার আয়াত সমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনে তৃতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন—ফেরেশতার দলে হযরত জিবরাঈল (আ), হযরত মীকাইল (আ) ও ইস্রাফীল (আ)—এ তিনজন ফেরেশতা ছিলেন। —(কুরতুবী) তাঁরা মানবাকৃতিতে আগমন করে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সালাম করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাঁদেরকে মানুষ মনে করে আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন। —(কুরতুবী) তাঁর নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন।

তফসীরে কুরতুবীতে ইসরাঈলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) একদিন তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন— 'বিসমিল্লাহ্, আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি বল'। সে বলল—'আল্লাহ্ কাকে বলে আমি জানি না।' হযরত ইবরাহীম (আ) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান হতে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাইল (আ) উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—আমি তার কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারাজীবন তাকে আহার্য-পানীয় দিয়ে আসছি; আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। এ কথা শোনামাত্র হযরত ইবরাহীম (আ) ঐ লোকটির তালাশে ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, "আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।"

হযরত ইবরাহীম (আ) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাফির লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। সে বলল—যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে এ কথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যিই পরম দয়ালু। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ্ বলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু যবেহ্ করলেন এবং তা ভুনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহারের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল, কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই হিকমত নিহিত ছিল, যেন তাঁদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাঁদের পানাহার না করায় 'ফেরেশতা স্বভাব' বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তাঁরা আহার্যের দিকে হাত বাড়ান নাই।

কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর ছিল। তাঁরা এর ফলক দ্বারা ভুনা গোশত স্পর্শ করছিলেন। তাঁদের এহেন আচরণে হযরত ইবরাহীম (আ) সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশ্যে কেউ কারো বাড়িতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না। —(তফসীরে কুরতুবী) অবশেষে ফেরেশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহ্র ফেরেশতা।

আহ্কাম ও মাসায়েল

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হিদায়েত দেওয়া হয়েছে, ইমাম কুরতুবী (র) তদীয় তফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সুন্নত ঃ قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ 'তাঁরা সালাম বললেন, তিনিও বললেন, সালাম।' এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ-মুলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার জবাব দেবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎকালে বিশেষ কোন বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সুন্নত সম্মত বাক্য السلام عليكم -এর মধ্যে সর্বপ্রথম 'আস-সালামু' আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহ্র জিকির করা হলো, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হলো, নিজের পক্ষ হতে তার জানমাল ইজ্জতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো।

এখানে কোরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে سلاما 'সালমান' এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তরফ হতে শুধু سلام 'সালামুন' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যত অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মুতাবিক সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্যই বোঝানো হয়েছে। হযরত রাসূলে করীম (সা)-ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষাদান করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ আসসালামু আলাইকুম বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ্' বলবে।

মেহমানদারীর কতিপয় মূলনীতি ঃ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاۤءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ একটি ভুনা বাছুর উপস্থাপন করতে যতটুকু সময় একান্ত অপরিহার্য, তিনি তার চেয়ে বেশি বিলম্ব করলেন না।

এতদ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা গেল। প্রথমত, মেহমান হাজির হওয়ার পর আহার্য-পানীয় যা কিছু তাৎক্ষণিকভাবে গৃহে মওজুদ থাকে তা মেহমানের সামনে পেশ করা এবং সামর্থ্যবান হলে উপাদেয় আহার্যের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয়ত, মেহমান আপ্যায়নের জন্য বাড়াবাড়ি বা সাধ্যাতিরিক্ত আয়োজন করা সমীচীন নয়। সহজে যতটুকু ভাল খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা যায়, তাই মেহমানের সামনে নিঃসঙ্কোচে পেশ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনেকগুলি গরু ছিল তাই তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বাছুর যবেহ করে ভুনে মেহমানগণের সামনে পেশ করেছিলেন।—(কুরতুবী)

তৃতীয়ত, বহিরাগত আগন্তুকদের আতিথেয়তা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নৈতিক ও মহৎ কার্য। এটা আম্বিয়ায়ে কিরাম ও মহান বুযুর্গগণের একটি ঐতিহ্যও বটে। আতিথেয়তা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ উলাময়ে কিরামের মতে ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত। কোন কোন আলিমের মতে বহিরাগত আগন্তুকদের মেহমানদারী করা গ্রামবাসীদের জন্য ওয়াজিব। কেননা গ্রামে তাদের জন্য সাধারণত কোন হোটেলের ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে শহরে হোটেল-রেস্টুরেন্টের সুব্যবস্থা থাকায় বিদেশী লোকদের মেহমানদারী করা শহরবাসীদের জন্য ওয়াজিব নয়।—(তফসীরে কুরতুবী)

فَلَمَّا رَاٰۤى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) যখন দেখলেন যে, উক্ত আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্ত্রস্ত হলেন।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মেহমানের সম্মুখে মেজবান কর্তৃক যা কিছু পেশ করা হয়, তা সাদরে গ্রহণ করা মেহমানের কর্তব্য। তা তার কাছে অরুচিকর হলেও গৃহকর্তার সন্তুষ্টির জন্য যৎসামান্য স্বাদ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এখানে আরো জানা গেল যে, অতিথির সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী রেখে দূরে সরে যাওয়া রীতি নয়, বরং মেহমান আহার করেন কি না তা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদের হাত গুটিয়ে রাখা লক্ষ্য করেছিলেন। তবে মেহমানের আহারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকাও রীতিবিরুদ্ধ, বরং ভাষা-ভাসাভাবে লক্ষ্য করবে। কেননা লোকমার দিকে তাকিয়ে থাকা ভদ্রতার পরিপন্থী এবং মেহমানের জন্য বিব্রতকর। একদা খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের খানার মজলিসে জনৈক বেদুঈনও শরীক ছিল। তার লোকমার মধ্যে একটা পশম লক্ষ্য করে খলীফা সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু তাতে বেদুঈন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল,—আমরা এমন লোকের সাথে খানা খেতে পছন্দ করি না, যারা আমাদের লোকমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এখানে ইমাম তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতাগণ প্রথমে আহার্য গ্রহণ করার অজুহাত হিসাবে বলেছিলেন যে, আমরা মুফ্ত (বিনামূল্যে) খানা খাই না। আপনি মূল্য ধার্য করুন, তাহলে খেতে পারি। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন—"ঠিক আছে, খানার মূল্য ধার্য করছি যে, শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলবেন এবং শেষে 'আলহামদুল্লিাহ' বলবেন। এ কথা শুনে হযরত জিবরাইল (আ) তদীয় সঙ্গী ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন—'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বীয়

খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি সত্যিই এর যোগ্য। এর দ্বারা জানা গেল যে, খানার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্ ও সমাপ্তিতে আল-হামদুলিল্লাহ বলা সুন্নত।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ
لُوْطٍ ﴿٧٤﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾ يٰاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ
اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾ وَلَمَّا
جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ
عَصِيْبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا
تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ
مَا لَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ اَنَّ
لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ
رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا
يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ
مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا
جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ
مَّنْضُوْدٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٣﴾ ع

(৭৪) অতঃপর যখন ইবরাহীম (আ)-এর আতঙ্ক দূর হলো এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি আমার সাথে তর্ক শুরু করলেন কওমে লূত সম্পর্কে। (৭৫) ইবরাহীম

(আ) বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয়, আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। (৭৬) ইবরাহীম, এহেন ধারণা পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয়। (৭৭) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আ)-এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন তাদের আগমনে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, এবং তিনি বলতে লাগলেন—আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (৭৮) আর তার কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কুকর্মে তৎপর ছিল। লূত (আ) বললেন—'হে আমার কওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই? (৭৯) তারা বলল—তুমি তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান (৮০) লূত (আ) বললেন—হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (৮১) মেহমান ফেরেশতাগণ বলল—হে লূত (আ), আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছতে পারবে না। ব্যস, তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও! আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী, নিশ্চয় তার উপরও ওটা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব কাছে নয়? (৮২) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদের উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাকর পাথর বর্ষণ করলাম। (৮৩) যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর তা পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন (ফেরেশতাগণ নিজেদের আত্মপরিচয় দান করে অভয়বাণী শুনালেন এবং হযরত) ইবরাহীম (আ)-এর আতঙ্ক দূরীভূত হলো এবং তিনি (সন্তান লাভের) সুখবর প্রাপ্ত হলেন, তখন (নিশ্চিত মনে হযরত) লূত (আ)-এর কওমের ধ্বংস সম্পর্কে বাক্যালিপি শুরু করলেন। বস্তুত তিনি সুপারিশ করতে চেয়েছিলেন যে, সেখানে তো স্বয়ং হযরত লূত (আ)-ও বর্তমান রয়েছেন। কাজেই সেখানে যেন আযাব নাযিল না হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) হয়ত পোষণ করতেন যে, লূত (আ)-এর দেশবাসী ভবিষ্যতে ঈমান আনয়ন করবে। তাই হযরত লূত (আ)-এর দোহাই দিয়ে তাঁর কওমকে আযাব হতে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। নিশ্চয় হযরত ইবরাহীম (আ) অতিশয় সহনশীল, কোমল-প্রাণ, (এবং সর্বাবস্থায়) আল্লাহমুখী (ছিলেন, অতএব মাত্রাতিরিক্ত সুপারিশ করছিলেন। তাই ইরশাদ হলো)—হে ইবরাহীম [আ! যদিও আপনি লূত (আ)-এর দোহাই দিচ্ছেন কিন্তু আপনার আসল উদ্দেশ্য তাঁর কওমের জন্য

সুপারিশ করা। যা হোক, সত্বর তুমি] এহেন (ধ্যান) ধারণা পরিহার কর। (কারণ তারা কস্মিনকালেও ঈমান আনবে না। অতএব, তাদের সম্পর্কে) তোমার পালনকর্তার (চূড়ান্ত ফয়সালা ও) নির্দেশ এসে গেছে, এবং (যার ফলে) তাদের উপর এমন (অপ্রতিরোধ্য) আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কিছুতেই প্রতিহত হবার নয়। [সুতরাং এ ব্যাপারে কোন কথা বলা নিরর্থক। তবে লূত (আ)-এর সেখানে অবস্থানের জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা তাঁদের এবং অপরাপর ঈমানদারকে প্রথমে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তারপরে আযাব নাযিল করা হবে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বাদানুবাদের এখানেই পরিসমাপ্তি হলো] এবং [হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা (হযরত) লূত (আ) সমীপে উপস্থিত হলো (তখন) তিনি তাদের (আগমনের) কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, [কারণ তাঁরা অতি আকর্ষণীয় চেহারার সুদর্শন তরুণ বেশে আগমন করেছিলেন। হযরত লূত (আ) তাদেরকে সত্যিকার মানুষ মনে করেছিলেন এবং তাঁর কওমের বিকৃত যৌন লিপ্সার বিভীষিকা তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল]। আর (এ জন্যই) তাঁর মন ছোট হয়ে গেল এবং (চরম অস্বস্তিবোধ করে) বলতে লাগলেন—আজকের দিনটি অত্যন্ত কঠিন দিন। (কারণ একদিকে আগন্তুকদের কমনীয়-মোহনীয় চেহারা, অপরদিকে গোত্রের লোকদের চরম বিকৃতি। উপরন্তু তিনি ছিলেন আত্মীয়-স্বজনহীন নিঃসঙ্গ একাকী।) আর তাঁর কওমের লোকেরা (যখন এহেন মেহমান আগমনের খবর জানতে পারল, তখন উন্মাদনায় আত্মহারা হয়ে) স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর [অর্থাৎ হযরত লূত (আ)-এর] গৃহপানে ধাবিত হলো। আর আগে থেকেই তারা কুকর্মে তৎপর ছিল। (এবারও তারা একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ছুটে এসেছিল। হযরত) লূত (আ) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন এবং (অনুনয়-বিনয় করে) বললেন—হে আমার কওম! (তোমাদের ঘরে) আমার এসব কন্যারা (বধূরা) রয়েছে, এরা তোমাদের (যৌন ক্রিয়ার) জন্য সমধিক (যোগ্য ও) পবিত্রতমা। অতএব, (নওজোয়ান ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত ও হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে তোমরা) আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এবং অতিথিগণের মাঝে আমাকে লজ্জিত করো না। (মেহমানদের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা আমাকে লজ্জিত ও বেইজ্জত করার নামান্তর। আগন্তুক মেহমানের প্রতি তোমাদের যদি কোন সহানুভূতি না থাকে, তবে অন্তত আমার খাতিরে তোমরা সংযম অবলম্বন কর। কারণ আমি তোমাদের সমাজে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি, সর্বদা তোমাদের কল্যাণের চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছি। কিন্তু তাঁর সকল কাকুতি-মিনতি ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখে তিনি বললেন—আফসোস ও আশ্চর্যের বিষয়) তোমাদের মাঝে কি একজনও বিবেকবান ভাল মানুষ নেই! (যে আমার কথাটি নিজে বুঝবে এবং অন্যদের বোঝাবে।) তারা বলল—আপনি তো জানেনই (যে) আপনার ঐসব (বধূ ও) কল্যাণের মধ্যে আমাদের কোন গরজ নেই। (কেননা, নারীদের প্রতি আমার আসক্তি হয় না) আর (এখানে) আমরা কি জিনিস (পেতে) চাই, তাও আপনি নিশ্চয় জানেন। (একান্ত নিরুপায় অসহায় অবস্থায় হযরত) লূত (আ) বলতে লাগলেন—হায়, (কত ভাল হতো) যদি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে তোমাদেরকে শায়েস্তা করার মত আমার শক্তি (সামর্থ্য) থাকত, অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (অর্থাৎ আমার জাতি আপনজনেরা যদি

কাছে থাকত, তাহলে তোমরা এহেন আচরণ করতে পারতে না।) হযরত লূত (আ)-এর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য ফেরেশতাগণ (আত্মপরিচয় দান করে) বললেন—হে লূত (আ), (আমরা মানুষ নই, বরং) আমরা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত। (ফেরেশতা, অতএব, তারা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমাদের তো দূরের কথা,) এরা আপনার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (অধিকন্তু আমরা তাদের উপর আযাব নাযিল করার জন্যই আগমন করেছি।) অতএব, আপনি রাতের কোন অংশে আপন লোকজন নিয়ে (এখান থেকে) বাইরে (অন্যত্র কোথাও) চলে যান। আর আপনাদের (সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিবেন, যাওয়ার পথে) কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, (বরং দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়।) কিন্তু আপনার স্ত্রী (ঈমানদার না হওয়ার কারণে বিরত থাকবে) তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। (আর কিছুটা রাত থাকতে আপনাকে সরে যেতে বলছি। কারণ) তাদের (উপর আযাবের) জন্য প্রতিশ্রুত সময় ভোর বেলা নির্ধারিত হয়েছে। হযরত লূত (আ) তদীয় কওমের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হয়েছিলেন। তাই বললেন—যা হওয়ার এখনি হয়ে যাক (দূররে মনসুর)। ফেরেশতাগণ বললেন—ভোর কি খুবই কাছে নয়? [যা হোক হযরত লূত (আ) রাত থাকতেই আপন লোকজন নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। রাত ভোর হলো, আযাবের ঘনঘটা শুরু হলো। অবশেষে যখন আযাবের জন্য] আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি (ফেরেশতার মাধ্যমে) উক্ত বসতিকে (উলটিয়ে তার) উপরকে নিচে (ও নিচকে উপরে) করে দিলাম এবং তার উপর অবিশ্রান্ত পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রতিটি (পাথর) তোমার পালনকর্তার নিকট (অর্থাৎ আলমে গায়েবে) চিহ্নিত ছিল। (যার ফলে উক্ত পাথরগুলি অন্য সব পাথর হতে ভিন্ন ধরনের ছিল।) আর (মক্কাবাসীদের অত্র কাহিনী হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেননা) তা (অর্থাৎ কওমে লূতের বসতি) এ পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়। (বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়ায় যাতায়াত পথে ওদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ তারা দেখতে পাচ্ছে। অতএব, আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ হতে তাদের ভয় করা উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হূদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও তাঁদের উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানি আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আ) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আ)-এর কওম একে তো কাফির ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় নি, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও এটা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপরে এমন কঠিন আযাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয় নি।

হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ)-সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল

করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তাঁরা ফিলিস্তিনে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমীপে উপস্থিত হন।

আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আযাবই নাযিল করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আ)-ও তাঁদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কুস্বভাব তাঁর অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন—'আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।'

আল্লাহ জাল্লা শানুহু এ দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন, যার মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভুরি ভুরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আযরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ)-কে পয়দা করেছেন। হযরত লূত (আ)-এর মত একজন বিশিষ্ট পয়গাম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফিরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আ)-এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

হযরত লূত (আ)-এর আশংকা যথার্থ প্রমাণিত হলো। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ "আর তাঁর কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তাঁর গৃহপানে ছুটে এল। আর আগে থেকেই তারা কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল।" এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কুকর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আ)-এর মত একজন সম্মানিত পয়গাম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আ) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর, তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফির পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ বন্ধন বৈধ ছিল। হযুরে আকরাম (সা)-এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হযরত (সা) স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উতবা ইবনে আবূ লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবী'র কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরী হালতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফিরের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষিত হয়। —(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরকারের মতে এখানে হযরত লূত (আ) নিজের কন্যা দ্বারা সমগ্র জাতির বধূ-কন্যাদের বুঝিয়েছেন। কেননা প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তাঁর রূহানী সন্তান স্বরূপ। যেমন কোরআনের ২১ পারা সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াত ঃ اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ-এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কিরাতে وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ বাক্যেও বর্ণিত আছে, যার মধ্যে হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে সমগ্র 'উম্মতের পিতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্র তফসীর অনুসারে হযরত লূত

(আ)-এর কথার অর্থ হলো, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর।

অতঃপর হযরত লূত (আ) তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন : فَاتَّقُوا اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় কর' এবং কাকুতি-মিনতি করে বললেন وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ "আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।" তিনি আরো বললেন, اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ "তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল মানুষ নেই?" আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে।

কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষ্যত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল, "আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধূ-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, তাও আপনি অবশ্যই জানেন।"

লূত (আ) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন—হায়, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন যদি এখানে থাকত, যারা এই জালিমদের হাত হতে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে কত ভালো হতো।

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ)-এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন—আপনি নিশ্চিত থাকুন. আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই বরং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না, বরং আযাব নাযিল করে দুরাত্মা-দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর উপর রহম করুন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।" তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আ)-এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।—(কুরতুবী)। স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশ-কাফিরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্মমতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করত। এ জন্যই সম্পূর্ণ বনী হাশিম গোত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে শামিল ছিল, যখন কুরাইশ কাফিররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা যখন হযরত লূত (আ)-এর গৃহদ্বারে সমবেত হলো, তখন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে দুষ্টদের কথাবার্তা চলছিল। তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙ্গতে উদ্যোগী হলো। এমন সঙ্গিন মুহূর্তে হযরত লূত (আ) পূর্বোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে অভয় দান করলেন এবং গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগল।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত লূত (আ)-কে বললেন ঃ আপনি কিছুটা রাত্র থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, তাকেও সে আযাব ভোগ করতে হবে।

এর এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। (দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না।—অনুবাদক) আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুঁশিয়ারি মেনে চলবে না।

কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অক্কা পেল।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

ফেরেশতারা আরো জানিয়ে দিলেন যে, إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ। প্রত্যুষকালেই তাদের উপর আযাব আপতিত হবে। হযরত লূত (আ) বললেন—"আমি চাই, আরো জলদি আযাব আসুক।" ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন ঃ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ "প্রত্যূষকাল দূরে নয়, বরং সমাগত প্রায়।"

অতঃপর উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে কোরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে—যখন আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হলো, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নিচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কোরআন পাকের অন্য আয়াতে مُؤْتَفِكَاتْ 'মুতাফিকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের যমীনের তলদেশে প্রবিষ্ট করত এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল। এমন কি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। ঐ সব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উলটিয়ে নিক্ষেপ করা হলো। তারা আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উলটিয়েছিল, তাই এই ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত লূত (আ)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ প্রস্তর বর্ষণের আযাব বর্তমানকালের জালিমদের থেকেও দূরে নয়। বরং কুরাইশ কাফিরদের জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠও যেন নিজেদেরকে এহেন আযাব হতে দূরে মনে না করে। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "আমার উম্মতের কিছু লোক কওমে লূতের অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর।'

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿৮৪﴾ وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ
وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿৮৫﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم
بِحَفِيظٍ ﴿৮৬﴾ قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ
أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿৮৭﴾
قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا
حَسَنًا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ
إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿৮৮﴾ وَيَٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم
مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَٰلِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ
مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿৮৯﴾ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ
وَدُودٌ ﴿৯০﴾ قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا
ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَٰكَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿৯১﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ
أَرَهْطِىٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ

رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿৯২﴾ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ط

سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لا مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ط

وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿৯৩﴾ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا

فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿৯৪﴾ لا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ط اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ

كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿৯৫﴾ ع

(৮৪) আর মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইব (আ)-কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন—হে আমার কওম! আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নেই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না, আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি। কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী। (৮৫) আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। (৮৬) আল্লাহ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই। (৮৭) তারা বলল—হে শুয়াইব আপনার নামায কি আপনাকে এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐ উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব ? আপনি তো একজন খাসা মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক। (৮৮) শুয়াইব (আ) বললেন—হে দেশবাসী, তোমরা কি মনে কর! আমি যদি আমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি ?) আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহার মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই। (৮৯) আর হে আমার জাতি! আমার সাথে জিদ করে তোমরা নূহ বা হূদ অথবা সালিহ (আ)-এর কওমের মত নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। আর লূতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (৯০) আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মার্জনা চাও এবং তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদিগার খুবই মেহেরবান অতি স্নেহময়। (৯১)

তারা বলল, হে শুয়াইব, আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নি, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন। (৯২) শুয়াইব (আ) বললেন—হে আমার জাতি, আমার ভাই-বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে প্রভাবশালী ? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে। (৯৩) আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি, অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী! আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। (৯৪) আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শুয়াইব (আ) ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি, আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯৫) যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নি। জেনে রাখ, সামুদের প্রতি অভিসম্পাতের মত মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (আমি) মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই (হযরত) শুয়াইব (আ)-কে (পয়গম্বররূপে) প্রেরণ করলাম। তিনি (মাদইয়ানবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে) বললেন—হে আমার কওম, (তোমরা একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত (বন্দেগী) কর, তিনি ছাড়া (আর) কেউ তোমাদের মাবুদ (হওয়ার যোগ্য নেই। এ ছিল ধর্মীয় আকীদা সম্পর্কে তাদের উপযোগী হুকুম। অতঃপর লেনদেন সম্পর্কে তাদের উপযোগী দ্বিতীয় নির্দেশ দিলেন) আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না, (কেননা বর্তমানে) আমি তোমাদেরকে ভাল (ও সচ্ছল) অবস্থায় দেখছি, (সুতরাং মাপে কম দিয়ে লোক ঠকাবার প্রয়োজন নেই। বস্তুত মাপে কম দেওয়া কারো জন্যই বাঞ্ছনীয় নয়) কিন্তু (তবু যদি তোমরা মাপে কম দিতে থাক, তবে তা একদিকে আল্লাহ্র নিয়ামতের না-শোকরী করা হবে এবং এর প্রতিফলও তোমাদের ভোগ করতে হবে। তাই) আমি তোমাদের উপর একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যে দিনটি (বিভিন্ন প্রকার আযাবকে) পরিবেষ্টনকারী হবে।

(মাপে কম দিতে নিষেধ করার প্রকারান্তরে ঠিকমত ওজন করার আদেশও রয়েছে, তবু তাকিদের জন্য পরে এটাকে আরো স্পষ্টভাবে বললেন।) আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না। (যেমন পূর্ব হতে তোমাদের বদভ্যাস রয়েছে।) আর (শিরকী ও কুফরী এবং ওজনে হেরফের করে) পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে (তওহিদ ও ইনসাফের) সীমালংঘন করো না। (বরং মানুষের ন্যায্য পাওনা দিয়ে দেওয়ার পর) আল্লাহ প্রদত্ত (বৈধভাবে লব্ধ) উদ্বৃত্ত মাল তোমাদের জন্য (হারাম উপার্জনের তুলনায়) অধিকতর উত্তম। (কেননা অবৈধ সম্পদ পরিমাণে অধিক হলেও তার মধ্যে বরকত নেই এবং তার পরিণতি জাহান্নাম। অপরদিকে বৈধ সম্পদ

পরিমাণে কম হলেও তাতে বরকত হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ হয়।) যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক, (তবে আমার কথা মান্য কর) অন্যথায় (তোমরাই দায়ী হবে) আমি তো তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নই যে, (বল প্রয়োগ করে তোমাদেরকে তা করাব অথবা ছাড়াব। বরং তোমরা যেমন কর্ম করবে তেমন ফল ভোগ করবে। এতসব আদেশ-উপদেশ শ্রবণ করার পর) তারা বলতে লাগল, হে শুয়াইব, আপনার (মনগড়া) নামায (ও নৈতিকতা) কি আপনাকে এসব (কথা) শিক্ষা দেয় (যা আপনি আমাদেরকে বলছেন? যে) আমরা আমাদের ঐসব উপাস্য দেব-দেবীর (পূজা) উপাসনা পরিত্যাগ করি, আমাদের বাপ-দাদারা যার উপাসনা করে আসছে। অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করার অধিকার রয়েছে তা ছেড়ে দেই। আপনি তো একজন (বেশ) বুদ্ধিমান ধর্মপরায়ণ (গজিয়েছেন)। এ উক্তিটি তারা (ব্যঙ্গ) বিদ্রূপ করে বলেছিল। (যেমন বর্তমানকালে ধর্মদ্রোহীরা দীনদার লোকদের সাথে বলে থাকে। তাদের মূল বক্তব্য ছিল যে আপনার নীতি-নৈতিকতার আমরা ধার ধারি না। আমরা যা করছি তা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। মূর্তিপূজার প্রমাণ হচ্ছে যে, আমাদের বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষরা আদিকাল হতে তা করে আসছেন। ধন-সম্পদের ব্যাপারে যুক্তি হচ্ছে যে, তা আমাদের মালিকানা স্বত্ব। সুতরাং এর মধ্যে ইচ্ছামত যা কিছু হস্তক্ষেপ করার অধিকার ও ইখতিয়ার আমাদের রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের যুক্তি-প্রমাণ সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল ছিল।) হযরত শুয়াইব বললেন—হে আমার জাতি, (তওহীদ ও ন্যায়নীতির কথা বলতে তোমরা যে আমাকে বারণ করছ, কিন্তু) তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে (সুস্পষ্ট) দলীলের উপর (কায়েম) থাকি, (যার মধ্যে একত্ববাদ ও ন্যায়নীতির শিক্ষা রয়েছে,) আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে (একটি) উত্তম সম্পদ (অর্থাৎ নবূয়ত) দান করে থাকেন যার ফলে তওহীদ ও ইনসাফের প্রচার করা আমার একান্ত দায়িত্ব। আমি তোমাদের যেসব কথা বলছি নিজেও তা নিষ্ঠার সাথে পালন করছি। আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা নিষেধ করি, পরে তোমাদের বরখেলাপ নিজেই তা করব। (তোমাদেরকে এক রাস্তা বাতলে দিয়ে নিজে অন্য পথে চলি বরং নিজের জন্য যে রাস্তা পছন্দ করি, নিজে যে পথে চলি, তোমাদেরকেও সে পথে চালাতে চেষ্টা করি। অকৃত্রিম দরদী ও নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে) আমি তো (তোমাদেরকে) যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই। (আমল ও ইসলাহ করার যতটুকু তওফীক হয় তা একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলার মদদেই হয়ে থাকে । আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং (সর্বকার্যে সর্বাবস্থায়) তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তন করি। (এতক্ষণ তাদের বক্তব্যের জবাব দেওয়া হলো। অতঃপর ভীতি ও আশার বাণী শোনানো হচ্ছে।) আর হে আমার কওম ! আমার সাথে জিদ (ও বিদ্বেষ) করে তোমরা নিজেদের উপর হযরত নূহ, হুদ, (অথবা) সালিহ্ (আ)-এর কওমের মত আযাব ডেকে এনো না। আর (তাদের কাহিনী পুরাতন বা তোমাদের সময় থেকে বহু আগের বলে তোমাদের অন্তরে যদি এগুলো কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে, তবে) কওমে লূতের ঘটনা (কাল) তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (বরং অন্যান্য ঘটনার তুলনায় নিকটবর্তী। অতএব, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হও। এতক্ষণ ভীতি প্রদর্শন করা হলো, এবার আশার বাণী শোনানো হচ্ছে।) আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তার কাছে (শিরক, জুলুম

ইত্যাদি যাবতীয় গুনাহের) মার্জনা চাও। (অর্থাৎ ঈমান আনয়ন কর এবং মানুষের পাওনা পরিশোধ কর।) অতঃপর (ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে) তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিঃসন্দেহে আমার পরওয়ারদিগার খুবই মেহেরবান। (অতি স্নেহময়, তিনি গোনাহ্ মার্জনা করেন এবং বন্দেগীর যথাযথ মূল্য দেন।) লোকেরা (তাঁর কথায় লা-জওয়াব হয়ে) বলল—হে শুয়াইব (আ), আপনি (এতক্ষণ যাবত) যা কিছু বলেছেন (বুঝিয়েছেন) তার অনেক কথাই আমাদের বোধগম্য হয়নি। এ কথার এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আপনার কথায় আমরা কর্ণপাত করিনি। অন্য উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আপনার বক্তব্যকে আমরা শ্রবণযোগ্য মনে করি না। (নাউযুবিল্লাহ্ মিন জালিক।) চরম অবজ্ঞার সাথে তারা আরো বলল—আমরা তো আপনাকে আমাদের (সমাজের) মধ্যে (সবচেয়ে হীন ও) দুর্বলতম (ব্যক্তি) মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা (যারা ধর্মীয় মতাদর্শে আমাদের সমমনা তাদের খাতিরে লেহায) না থাকলে আমরা (অনেক আগেই) আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন। (কিন্তু আপনার ভাই-বন্ধুদের খাতিরে আপনাকে এতদিন কিছুই বলিনি। ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদেরকে কোনরূপ আদেশ-উপদেশ দিতে চেষ্টা করবেন না। অন্যথায় আপনার বিপদ হবে। সারকথা, তারা প্রথমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তবলীগ করতে বাধা দেয় এবং পরিশেষে হুমকি দিয়ে সত্য ন্যায়ের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করে। তদুত্তরে) হযরত শুয়াইব বললেন—হে আমার কওম, আমার আত্মীয়-স্বজনরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র চেয়েও প্রভাবশালী (নাউযুবিল্লাহ মিন জালিক)। অত্যন্ত আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয় যে, সর্বশক্তিমান (আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক এবং আমি আল্লাহ্র নবী হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে তোমরা ভ্রূক্ষেপ করনি, অথচ আত্মীয়-স্বজনের খাতিরে আমার উপর হস্তক্ষেপ করতে সাহস কর নাই)। আর তোমরা (আমার আত্মীয়-স্বজনের দিকটি বিবেচনা করেছ কিন্তু) তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে) গিয়ে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছ। (অতএব অচিরেই এর প্রতিফল ভোগ করবে। কেননা) তোমাদের (যাবতীয়) কার্যকলাপ আমার প্রভুর আয়ত্তে রয়েছে। আর হে আমার জাতি, (আযাবের সতর্কবাণী যদি তোমরা অবাস্তব মনে কর তবে ঠিক আছে) তোমরা নিজ নিজ স্থানে (ও অবস্থায়) কাজ চালিয়ে যাও, আমিও (নিজের) কাজে রত আছি। অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে এবং মিথ্যাবাদী কে? (অর্থাৎ তোমরা আমার নবুয়তের দাবিকে মিথ্যা এবং আমাকে লাঞ্ছিত মনে কর। কিন্তু অবিলম্বে টের পাবে যে, মিথ্যুক ও লাঞ্ছিত কে? আমি না তোমরা।) আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত রইলাম। (দেখা যাক, আযাব অবতীর্ণ হয় কিনা এবং আমার সতর্কবাণী সত্য হয়, না তোমাদের আযাব না আসার ধারণা সঠিক হয়। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে আযাবের আয়োজন শুরু হলো), আর আমার (আযাবের) হুকুম যখন এল (তখন) আমি (হযরত) শুয়াইবকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজের (খাস) রহমতে ও কুদরতে উক্ত আযাব হতে নিরাপদে রক্ষা করি। আর (উক্ত) পাপিষ্ঠদের (এক ভীষণ) গর্জন এসে পাকড়াও করল। [বস্তুত তা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর একটি হাঁক ছিল]। ফলে ভোর বেলা তারা নিজ (নিজ) গৃহে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইল। (সারাদেশ ছিল নীরব নিস্তব্ধ যেন সেখানে তারা বা অন্য কোন

ব্যক্তি কখনো বসবাসই করত না।) জেনে রাখ, মাদইয়ানবাসীরা আল্লাহ্র রহমত হতে দূরীভূত (হলো) যেমন দূরীভূত হয়েছে সামুদ জাতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শুয়াইব (আ) ও তাঁর কওমের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরী ও শির্কী ছাড়া ওজনে-পরিমাপেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শুয়াইব (আ) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কমবেশী করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ্র আযাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও নাফরমানীর উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আযাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল। وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا 'আর আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইব (আ)-কে প্রেরণ করছি।' 'মাদইয়ান' আসলে একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইব্নে ইবরাহীম-এর পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান معان 'মোয়ান' নামক স্থানে তা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু 'মাদইয়ান' বলা হতো। আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত শুয়াইব (আ) উক্ত মাদইয়ান কওমের লোক ছিলেন তাই তাঁকে 'তাদের ভাই' বলা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তাঁর হিদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ "তিনি বললেন—হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।" এখানে হযরত শুয়াইব (আ) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহবান জানালেন। কেননা তারা ছিল মুশরিক, গাছপালার পূজা করত। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে 'আসহাবুল-আইকা' বা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধি দেওয়া হয়েছে। এহেন কুফরী ও শির্কীর সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়কালে ওজনে-পরিমাপে হেরফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শুয়াইব (আ) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরী ও শির্কীই সকল পাপের মূল। যে জাতি এতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমই তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরীর ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোন দখল থাকে না। কোরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এর প্রমাণ। তবে শুধু দুইটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরীর সাথে সাথে তাদের বদআমলেরও দখল ছিল। এক, হযরত লূত (আ)-এর জাতি, যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরী ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়, হযরত শুয়াইব (আ)-এর কওম। যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফরী ও মাপে কম দেওয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বোঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ এটা এমন দুই কাজ যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ওজন-পরিমাপে হেরফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শুয়াইব (আ) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন ঃ اِنِّىْ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ "বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভাল ও সচ্ছল দেখছি। তঞ্চকতার আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ্ তা'আলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ্র আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখিরাতের আযাব বোঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আযাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আযাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আযাব হচ্ছে, তোমাদের সচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন "যখন কোন জাতি মাপে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি জনিত শাস্তিতে পতিত করেন।

ওজন-পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যেই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শুয়াইব (আ) উদাত্ত আহ্বান জানালেন ঃ يٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ "হে আমার জাতি! ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কম দিও না, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন ঃ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ মানুষের পাওনা ঠিকমত ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেওয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম। পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখো—তোমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।

হযরত শুয়াইব (আ) সম্বন্ধে রাসূলে করীম (সা) মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন 'খতীবুল-আম্বিয়া বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মিতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বোঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তাঁর কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল। তারা নবীর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্র নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলল ঃ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَاۤ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰۤؤُا اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার পূজা করে আসছে। আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল, কোনটা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শুয়াইব (আ) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামায ও নফল ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তাঁর মূল্যবান নীতিবাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো—আপনার নামায কি আপনাকে এসব আবোল-তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে ? (নাউযুবিল্লাহ্ মিন জালিক)

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোন দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশি ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোন কোন অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জবাবে কওমের লোকেরা কতবড় রূঢ় মন্তব্য করল! কিন্তু হযরত শুয়াইব (আ)-এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা। তাই উপহাস-পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্বোধন করে বোঝাতে লাগলেন ঃ يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا হে আমার জাতি ! তোমরা বল তো, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিযিকও দান করেছেন। অধিকন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা তথা নবুয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মত অন্যায় ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের বাণী তোমাদেরকে পৌঁছাব না ?

অতঃপর তিনি আরো বললেন ঃ مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ

তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাই না। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল।

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াজ নসীহত ও তবলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় তাঁর কথায় শ্রোতাদের কোন ফায়দা হয় না।

অতঃপর বলেন ঃ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

"আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বারবার বোঝানোর একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা-সাধনাও নিজ বাহু বলে নয় বরং ঃ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

"আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহ্র মদদেই করছি। অন্যথায় আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তাঁরই প্রতি রুজু হই।"

নসীহত ও উপদেশ দানের পরে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব হতে সতর্ক করে বললেন ঃ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ

হে আমার কওম, সাবধান! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কওমে নূহ অথবা কওমে হুদ কিংবা সালিহ্ (আ)-এর কওমের মত বিপদ ডেকে আনবে না। আর লূত (আ)-এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিণতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। অর্থাৎ কওমে লূতের উল্টিয়ে দেয়া জনপদগুলি মাদইয়ান শহরের অদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোন ব্যাপার নয়। অতএব, তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল—"আপনার গোষ্ঠী-জ্ঞাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তরাঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।"

এরপর হযরত শুয়াইব (আ) তাদেরকে নসীহত করে বললেন—"তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভয় কর, সম্মান কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর না।"

শেষ পর্যন্ত কওমের লোকেরা যখন হযরত শুয়াইব (আ)-এর কোন কথা মানল না, তখন তিনি বললেন—'ঠিক আছে, তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষা করতে থাক।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শুয়াইব (আ)-কে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ)-এর এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হলো।

আহ্কাম ও মাসায়েল

মাপে কম দেওয়া ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসীদের ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেওয়াকে, আরবীতে যাকে "তাতফীফ" বলা হয়। কোরআন করীমের— ويل للمطففين আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উলামায়ে উম্মতের 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালিক (র) তদীয় 'মুয়াত্তা' কিতাবে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজনে-পরিমাপে কম দেওয়ার কথা বলে আসলে বোঝান হয়েছে—কারো কোন ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেওয়া ; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোন বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোন শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোন নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের সুন্নতগুলি পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতফীফের অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে। (নাউযুবিল্লাহি মিনহু)

মাসআলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদইয়ানবাসীর আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পার্শ্ব হতে স্বর্ণ-রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শুয়াইব (আ) তাদেরকে এ কাজ হতেও নিষেধ করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলে করীম (সা) মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভগ্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কোরআন পাকের ১৯ পারা, সূরা নমল, ৪৮ নং আয়াত ঃ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মুফাস্সিরীন হযরত জায়েদ

ইবনে আসলাম বলেন— মাদইয়ানবাসী দিনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আত্মসাৎ করতো, যাকে কোরআন করীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফতকালে এক ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলীফা তাকে দোররা মারা ও মস্তক মুণ্ডন করে শহর প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ দিলেন। —(তফসীরে কুরতুবী)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾
وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾
ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾

(৯৬) আর আমি মূসা (আ)-কে প্রেরণ করি আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ;
(৯৭) ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে; তবুও তারা ফিরাউনের হুকুমে চলতে থাকে, অথচ ফিরাউনের কোন কথা ন্যায়সঙ্গত ছিল না। (৯৮) কিয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌছে দেবে, আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট স্থান, যেখানে তারা পৌঁছেছে। (৯৯) আর এ জগতেও তাদের পিছনে লানত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও; অত্যন্ত জঘন্য প্রতিফল, যা তারা পেয়েছে। (১০০) এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কোন কোনটি এখনও বর্তমান আছে আর কোন কোনটির শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে। (১০১) আমি কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করিনি বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। ফলে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদকে ডাকতো আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়ল, তখন কেউ কোন কাজে আসল না। তারা শুধু বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি (হযরত) মূসা (আ)-কে প্রেরণ করেছি আমার (অলৌকিক) নিদর্শনাদি (অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ) ও সুস্পষ্ট সনদসহ; (মিসর সম্রাট) ফিরাউন ও তদীয় পারিষদবর্গের কাছে; (কিন্তু) তবুও (ফিরাউন মানেনি এবং তার পারিষদবর্গও মানল না, বরং ফিরাউন আল্লাহ্দ্রোহিতার উপর স্থির রইল, আর) তারা (অর্থাৎ পারিষদবর্গও) ফিরাউনের কথামত কাজ করতে থাকে অথচ ফিরাউনের কোন কাজ ন্যায়সঙ্গত ছিল না। কিয়ামতের দিন সে (ফিরাউন) তার জাতির (সকল) লোকের আগে আগে থাকবে এবং তাদের (সবাইকে) নিয়ে জাহান্নামের (আগুনে) পৌঁছে দেবে আর তা (অর্থাৎ দোযখ) অতি নিকৃষ্ট অবতরণস্থল, যেখানে তাদেরকে পৌঁছানো হবে; আর ইহজগতেও তাদের পেছনে (পেছনে) লানত (রয়েছে) এবং কিয়ামতের দিনেও (তাদের সাথে সাথে লানত থাকবে। অতএব, দুনিয়াতে গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে আর আখিরাতে জাহান্নামের আযাবে নিপতিত হবে।) অত্যন্ত জঘন্য প্রতিফল যা তাদের দেওয়া হয়েছে। (এতক্ষণ যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে) তা (ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতিসমূহের মধ্যে) কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। তন্মধ্যে কোন কোন জনপদ তো এখনও বর্তমান রয়েছে (যেমন, মিসর। ফিরাউনের বংশ ধ্বংস হওয়ার পরও সেখানে জনবসতি রয়েছে)। আর কোন কোনটি সমূলে নিপাত করা হয়েছে। (যেমন—কওমে আদ, কওমে লূত প্রভৃতি। যা হোক,) আমি কিন্তু তাদের উপর জুলুম করিনি (অর্থাৎ বিনা অপরাধে শাস্তি দান করিনি, বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও মালিকানা সত্ত্বেও বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দান করেন না।) বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করেছে। (কারণ, শাস্তিযোগ্য, অপরাধমূলক কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে করে করে তারা নিজেদের উপর আযাব ও গযব ডেকে এনেছে।) ফলে আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তারা (নিজেদের মনগড়া) যেসব বাতিল উপাস্যকে ডাকতো, যখন আমরা প্রভুর (আযাবের) হুকুম এসে পড়ল, তখন কেউ তাদের (উপর আপতিত সে আযাব প্রতিহত অথবা অন্য) কোন (রূপ) সাহায্য করতে পারল না ; (সাহায্য তো দূরের কথা) বরং ক্ষতিগ্রস্ত করল (কেননা তাদের পূজা-উপাসনা করার অপরাধেই তারা বিপর্যস্ত ও ধ্বংস হয়েছে।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ۭ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ
شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۭ ذٰلِكَ
يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا
لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ
وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ

وَّشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ

رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٠٧﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً

غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا

كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ

مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١١﴾

(১০২) আর তোমার পরওয়ারদিগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর (১০৩) নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য, যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে। তা এমন একদিন, যে দিন সব মানুষই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন। (১০৪) আর আমি যে তা বিলম্বিত করি, তা শুধু একটি ওয়াদার কারণে যা নির্ধারিত রয়েছে। (১০৫) যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারিবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক সৌভাগ্যবান। (১০৬) অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। (১০৭) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদিগার যা ইচ্ছা করতে পারেন। (১০৮) আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। (১০৯) অতএব, তারা যেসবের উপাসনা করে তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ ধোঁকায় পড়বে না। তাদের পূর্ববর্তী বাপদাদারা যেমন পূজা-উপাসনা করত, এরাও তেমন করছে। আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছুমাত্র কম না করেই পুরোপুরি দান

করবো। (১১০) আর আমি মূসা (আ)-কে অবশ্যই কিতাব দিয়েছিলাম অতঃপর তাতে বিরোধ সৃষ্টি হলো; বলা বাহুল্য তোমার পালনকর্তার পক্ষে হতে, একটি কথা যদি আগেই বলা না হতো, তাহলে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। তারা এ ব্যাপারে এমনই সন্দেহপ্রবণ যে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। (১১১) আর যত লোকই হোক না কেন, যখন সময় হবে, তোমার প্রভু তাদের সকলেরই আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনার পরওয়ারদিগারের পাকড়াও এমনই (কঠিন) হয়ে থাকে, যখন তিনি কোন জনপদ (বাসী)-কে পাকড়াও করেন, এমতাবস্থায় যে তারা জুলুম ও কুফরীতে) লিপ্ত। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই নির্মম এবং বড়ই কঠিন (এবং কেউ তা এড়িয়ে যেতে পারে না।) নিশ্চিয় এসব ঘটনার মধ্যে (শিক্ষাপ্রদ) নিদর্শন রয়েছে (এমন) প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে (কেননা ইহজগত কর্মফল ভোগের স্থান না হওয়া সত্ত্বেও যখন তাদের নির্মম শাস্তি হয়েছে, তাহলে কর্মফল ভোগের স্থান অর্থাৎ পরকালে তাদের শাস্তি কত মর্মান্তিক হবে)। তা (অর্থাৎ কিয়ামত দিবস) এমন এক দিন, যেদিন সব মানুষকে একত্র করা হবে, সেদিনটি যে সকলের উপস্থিতির দিন। (সেদিনটি যদিও অদ্যাবধি আসেনি কিন্তু অচিরেই আসবে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আমি এটাকে (শুধু কিছুকালের জন্য) বিলম্বিত করছি, (যাতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। অতঃপর) যেদিন তা আসবে, সেদিন (সবাই এতদূর ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে যে,) আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। (তবে পরে যখন জবাবদিহির জন্য তলব করা হবে এবং তাদের কার্যকলাপের কৈফিয়ত চাওয়া হবে, তখন অবশ্যই কথা বলতে পারবে; চাই তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য হোক অথবা না হোক এ পর্যন্ত সকলের এক অবস্থা হবে।) অতঃপর (তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হবে) কিছু লোক (অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকরা) হবে হতভাগ্য আর কিছু লোক (অর্থাৎ মু'মিন মুসলমানগণ) হবে সৌভাগ্যবান। অতএব, হতভাগ্যরা জাহান্নামে যাবে, তারা সেখানে আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকে। (এখানে আসমান-যমীন দ্বারা বর্তমান আসমান-যমীন বোঝানো হয় নি বরং আখিরাতের আসমান ও যমীন, যা চিরকাল থাকবে তা-ই বোঝান হয়েছে, অথবা কথ্য বাচন ভঙ্গি অনুসারে এ কথার অর্থই হচ্ছে, তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় থাকবে না।) তবে তোমার পালনকর্তা (কাউকে বের করতে) চাইলে ভিন্ন কথা। (কেননা) তোমার প্রভু যা কিছু ইচ্ছা করেন, তা-ই (বাস্তবায়িত) করতে পারেন। (কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও এটা সুনিশ্চিত যে, তিনি কখনো তাদেরকে দোযখ হতে পরিত্রাণ দিতে চাইবেন না। অতএব, তারা মুক্তি লাভ করতে পারবে না।) আর

যারা সৌভাগ্যবান, তারা বেহেশতের মাঝে অবস্থান করবে। তারা (তথায় প্রবেশ করার পর) সেখানেই চিরকাল থাকবে—যতদিন আসমান ও যমীন (বর্তমান) থাকবে, (যদিও বেহেশতে প্রবেশ করার পূর্বে তারা কিছু শাস্তি ভোগ করেও থাকে।) তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। অতএব, হে শ্রোতা (কুফরীর পরিণতি জানার পর) তারা যেসবের পূজা-উপাসনা করে, তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে পতিত হয়ো না (বরং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, বাতিল উপাস্যদের পূজা-উপাসনা করার কারণে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধী। তাদের উপাস্য বাতিল হওয়ার প্রমাণ এই যে, কোনরূপ যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া বরং যুক্তি প্রমাণের পরিপন্থী) তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা যেমন (গায়রুল্লাহ্র অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের) পূজা-উপাসনা করত এরাও (তাদের দেখাদেখি তেমনি পূজা উপাসনা) করছে। (এবং দলীল প্রমাণের পরিপন্থী যেকোন কার্য বাতিল ও দণ্ডযোগ্য অপরাধ। আর অবশ্যই আমি (কিয়ামতের দিন) তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছুমাত্র হ্রাস না করেই পুরোপুরি দান করব। আর আমি (হযরত) মূসা (আ)-কে অবশ্যই (তওরাত) কিতাব দিয়েছিলাম। অতঃপর তাতেও কোরআন পাকের ন্যায় মতবিরোধ সৃষ্টি হলো, (কেউ তা মানল আর কেউ মানল না। এটা কোন নতুন ঘটনা নয়, অতএব, আপনি চিন্তিত হবেন না। বলা বাহুল্য, এরা এমন শাস্তিযোগ্য অপরাধী যে,) তোমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে (তাদেরকে পূর্ণ শাস্তি আখিরাতে দেওয়া হবে বলে) একটি কথা যদি আগেই বলা না থাকত, তাহলে (যে ব্যাপারে) তাদের মধ্যে (মতানৈক্য রয়েছে তার) চূড়ান্ত ফয়সালা (দুনিয়াতেই) হয়ে যেত। (অর্থাৎ নির্ধারিত আযাব তাদের উপর আপতিত হতো। আর অকাট্য দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) তারা (এখানো পর্যন্ত) এ (ফয়সালা ও আযাব) সম্পর্কে এমনই সন্দেহপ্রবণ যে, (তারা) কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাসই হচ্ছে না।) আর (কারো অস্বীকার বা সন্দেহের কারণে আযাব ফিরে যাবে না, বরং) যথাসময়ে আপনার পরওয়ারদিগার তাদের সবাইকে তাদের কার্যকলাপের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের (প্রতিটি) কার্যকলাপের (পূর্ণ) খবর রাখেন। (তাদের শাস্তির সাথে যেহেতু আপনার কোন সম্পর্ক নেই, সুতরাং আপনার ও মুসলমানদের নিজেদের কাজ চালিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই কাজ হলো পরবর্তী আয়াতে যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।)

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن
دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

(১১২) অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও—যেমন তোমায় হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং সীমা লংঘন করবে না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতএব, আপনাকে যেরূপ হুকুম দেওয়া হয়েছে (তেমনিভাবে দীনের পথে) সোজা চলতে থাকুন আর যারা কুফরী (ও শিরকী) থেকে তওবা করেছে (এবং) আপনার সাথে রয়েছে তারাও (সবাই সোজা পথে চলতে থাকুক) এবং (ধর্মীয় বিধি-নিষেধের) সীমা (রেখা চুল পরিমাণও) অতিক্রম করবে না। (কেননা) তোমরা যা (কিছু) করছ, নিশ্চয় তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা) তার প্রতি খুব দৃষ্টি রাখেন। আর (হে মুসলমানগণ,) তোমরা (কখনো ঐসব) পাপিষ্ঠদের প্রতি (অথবা তাদের সমতুল্য লোকদের প্রতি) আকৃষ্ট হয়ো না (অর্থাৎ তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা, সৌহার্দ্য বা আচার-আচরণের বা কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে তাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখবে না।) নতুবা (তাদের সাথে সাথে) তোমাদেরকেও (জাহান্নামের) আগুন পাকড়াও করবে। আর (তখন একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই, অতএব, কোথাও (কোন) সাহায্য পাবে না। (কেননা সাহায্য করার চেয়ে বন্ধুত্ব করা সহজতর। বন্ধুত্বই যখন থাকবে না, তখন সাহায্যকারী কোথায় পাবে?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদে হযরত নূহ (আ) হতে হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের এক বিশেষ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হিকমত, আহকাম ও হিদায়েতও বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলী হতে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রাসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করে সমগ্র উম্মতে-মুহাম্মদীকে আহবান জানান হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ۝

অর্থাৎ এটা পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহ্র আযাব আপতিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোন কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। আর কোন কোন জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোন চিহ্ন থাকে না।

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের উপর কোন জুলুম করিনি, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া হাতে তৈরি মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বুদ সাব্যস্ত করেছে, যার ফলে আল্লাহ্র আযাব যখন নেমে এল, তখন ঐসব কাল্পনিক মা'বুদেরা তাদের কোন সাহায্য করতে

পারল না। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জনপদবাসীকে আযাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকড়াও করেন; তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোন গত্যন্তর থাকে না।

অতঃপর সবাইকে আখিরাতের চিন্তায় মশগুল করার জন্য ইরশাদ করেন যে, এসব ঘটনার মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র মানব জাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবে না।

অতঃপর রাসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করে পুনরায় ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ আপনি দীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরী হতে তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন।

ইস্তিকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল ঃ ইস্তিকামতের আসল অর্থ হচ্ছে, কোন দিকে একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুত এটা কোন সহজ কাজ নয়। কোন লৌহদণ্ড বা পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়ত এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোন প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুষ্কর তা কোন সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হযরত রাসূলে করীম (সা) ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তিকামত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ইস্তিকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে—আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে কোন কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানেবামে ঝুঁকে পড়া ইস্তিকামতের পরিপন্থী।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তিকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকাইদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তিকামত না থাকলে, মানুষ বিদ'আত হতে শুরু করে কুফরী ও শিরকী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে হযরত রাসূলে করীম (সা) যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রাসূল (আ)-গণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা। তেমনি কোন

রাসূলকে আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেওয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদী ও খৃস্টানেরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার জন্য কোরআনে আযীম ও রাসূলে করীম (সা) যে পথনির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তিকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে এর মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোন বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। সে কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করছি। অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হযরত রাসূলে আকরাম (সা) স্বীয় উম্মতকে বিদ'আত ও নিত্য-নতুন সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালভাবে নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কার্য সে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কিনা? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান-প্রদান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে কোরআনে করীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলোকে রাসূলে করীম (সা) বাস্তবে রূপায়িত করে একটি সুষ্ঠু-সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, ধৈর্য, মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, বৈরাগী সাধনা, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা সম্ভাব্য চেষ্টা-তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। এটা হতে বিচ্যুতি হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তিকামতের তফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাকাফী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন, যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি বললেন ঃ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন, অতঃপর ইস্তিকামত অবলম্বন কর। —(মুসলিম শরীফ ও তফসীরে কুরতুবী)

উসমান ইবনে হাযের আযদী বলেন—একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, "আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে বললেন ঃ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْاِسْتِقَامَةِ اتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ অর্থাৎ তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি ও ইস্তিকামত অবলম্বন কর, যার পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপারে শরীয়তের অনুশাসন হুবহু মেনে চল, নিজের পক্ষ হতে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেয়ো না। —(দারেমী ও কুরতুবী)

এ দুনিয়ায় ইস্তিকামতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এজন্যই বুযুর্গানে দীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তিকামতের মর্যাদা ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তিকামত অবলম্বন করে রয়েছে,

যদি জীবনভর তাঁর দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "পূর্ণ কোরআন পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়েও কষ্টকর কোন হুকুম রাসূলে আকরাম (সা)-এর উপর নাযিল হয়নি।" তিনি আরো বলেন—একবার সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাড়ি মোবারকের কয়েক গাছি পাক ধরেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন—"সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" সূরা হুদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আযাবের ঘটনাবলীও এর কারণ হতে পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন—'ইস্তিকামতের নির্দেশই ছিল বার্ধক্যের কারণ।'

তফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবূ আলী সিরী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রাসূলে করীম (সা)-এর যিয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আপনি কি একথা বলেছেন যে, "সূরা হুদ বৃদ্ধ করেছে?" তিনি বলেন 'হ্যাঁ'। পুনরায় প্রশ্ন করলেন—" উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আ)-গণের কাহিনী ও তাঁদের কওমসমূহের উপর আযাবের ঘটনাবলী কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন—'না'। বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ "ইস্তিকামত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে" এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, রাসূলে করীম (সা) পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব নমুনারূপে এ জগতে শুভাগমন করেছিলেন। ইস্তিকামতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব, তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুভার মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শুধু সোজা পথে থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং كَمَا أُمِرْتَ "যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী রাসূল (আ)-গণের অপরিসীম আল্লাহ্‌ভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তিকামতের উপর কায়েম থাকা সত্ত্বেও রাসূলে পাক (সা) সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ ইস্তিকামতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কি না?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের ইস্তিকামতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা আল্লাহ্র ফজলে তা পুরো মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তিকামতের আদেশদানের পর বলেন وَلَا تَطْغَوْا "সীমালংঘন করো না"। এটা طُغْيَانٌ শব্দ হতে গৃহীত, যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয়নি। বরং এর নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন ও নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সা)-এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ।

১১৩ নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ "ঐ সব পাপিষ্ঠের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" 'লা-তারকানু' শব্দের মূল হচ্ছে رکون, যার অর্থ "কোন দিকে সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা।" সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করেই, অধিকন্তু পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, আস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

এই ঝোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ কি ? এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটির উক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক।

'পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুঁকবে না' এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন, "পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথামত চলবে না।" হযরত ইবনে জুরাইয বলেন, "পাপিষ্ঠদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না।" হযরত আবুল আলিয়া (র) বলেন, "তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পছন্দ করো না।" —(কুরতুবী)। সুদ্দী (র) বলেন, "তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ করা বা নীরবতা অবলম্বন করবে না।" ইকরামা (র) বলেন—"তাদের সংসর্গে থাকবে না।" কাযী বায়যাবী (র) বলেন, "বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।"

কাযী বায়যাবী (র) আরো বলেন—পাপাচার অনাচারকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরাল ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্কই শুধু নিষেধ করা হয়নি, বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন—সমগ্র জগতে ঐ আলিমই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়, যে নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। —(তফসীরে মাযহারী)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায়—কাফির, মুশরিক বিদ'আতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। বস্তুতপক্ষে মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশত অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েয আছে।

হযরত হাসান বসরী (র) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু'টি শব্দ সম্পর্কে বলেন—আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ দীনকে দুটি ل হরফের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। এক— لَا تَطْغَوْا সীমালংঘন করবে না, দ্বিতীয়— لَا تَرْكَنُوْٓا পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। প্রথম আয়াতে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দীনদারীর সারসংক্ষেপ।

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ (১১৪) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِيْنَ (১১৫) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ
يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ (১১৬) وَمَا كَانَ رَبُّكَ
لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ (১১৭) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ
النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ (১১৮) إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۭ
وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۭ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِيْنَ (১১৯) وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ
وَجَاءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (১২০) وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا
يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۭ إِنَّا عٰمِلُوْنَ (১২১) وَانْتَظِرُوْا ۚ إِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ (১২২) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهٗ
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (১২৩)

(১১৪) আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতেরও প্রান্তভাগে; পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটা এক মহা স্মারক। (১১৫) আর ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (১১৬) কাজেই, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগবিলাসে মত্ত ছিল—যার সামগ্রী

তাদেরকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। (১১৭) আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে, জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন, সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও। (১১৮-১১৯) আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই পথের পথিক করে দিতে পারতেন। তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা বাদে সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে, এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার আল্লাহ্‌র কথাই পূর্ণ হলো যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। (১২০) আর আমি রাসূলগণের সবকিছু বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যা দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে। (১২১) আর যারা ঈমান আনে না, তাদের বলে দাও যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করে যাও, আমরাও কাজ করে যাই। (১২২) এবং তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। (১২৩) আর আল্লাহ্‌র কাছেই আছে আসমান ও যমীনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজেই প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁরই উপরে ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক কিছু বে-খবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর [হে মুহাম্মদ (সা)], আপনি (সকাল-সন্ধ্যায়) দিনের দু'প্রান্তেই নামাযের পাবন্দী রাখুন এবং রাতেরও কিছু অংশে (নামাযের পাবন্দী রাখুন। কেননা) নেক কাজ (আমলনামা হতে) পাপকে দূর করে দেয়, কোন সন্দেহ নেই। (নেক কাজের বদৌলতে গোনাহ্ মাফ করা হয়) এ কথাটি একটি (ব্যাপক) নসিহত, যারা নসিহত মেনে চলে তাদের জন্যে (যেহেতু প্রত্যেক নেক কাজ এই ব্যাপক নীতির অন্তর্ভুক্ত; অতএব, প্রতিটি নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত হওয়া কর্তব্য) আর (নসিহত অমান্যকারীদের পক্ষ থেকে যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উপর) ধৈর্য ধারণ করুন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যবানদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না। (সহনশীলতা ও ধৈর্য ধারণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সৎকার্য। সুতরাং তার পূর্ণ প্রতিদান আপনাকে দেয়া হবে। ইতিপূর্বে যেসব জাতির ধ্বংস কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে যে,) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের এমন (দায়িত্বশীল) বিবেকবান লোক ছিল না, যারা (অন্যদেরকে কুফরী ও শিরকীর মাধ্যমে) দেশে (ফিতনা-ফাসাদ ও) বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করত। তবে (মুষ্টিমেয়) কিছু লোক ছিল, (যারা নিজেরাও কুফরী ও শিরকী হতে দূরে ছিল এবং অন্যদেরকেও নিষেধ করেছিল। ফলে এ দু'টি কাজের বরকতে) তাদেরকে আমি অন্যদের (অর্থাৎ জাতির অন্যান্য লোকের) মধ্য হতে (নিরাপদে আযাব থেকে) রক্ষা করেছি। (অন্যেরা যেহেতু নিজেরাই কুফরী ও শিরকীতে লিপ্ত ছিল, সুতরাং অন্যকেও নিষেধ করেনি।) আর অবাধ্যরা তো ভোগ-বিলাসে

মত্ত ছিল, যার (উপকরণ) সামগ্রীও তাদেরকে প্রচুর (পরিমাণে) দেওয়া হয়েছিল। (আসলে) তারা ছিল (অপকর্মে অভ্যস্ত) মহা-অপরাধী। (তাই কেউ পাপকার্য হতে বিরত হয়নি। নাফরমানীর ব্যাধিতে তারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। বাধা দিতে কেউ দণ্ডায়মান হলো না। কাজেই সবাই একই আযাবের কবলে পতিত হয়ে ধ্বংস হলো। অন্যথায় কুফরী ব্যাপক হওয়ায় এর শাস্তিও ব্যাপক হতো। আর ফিতনা ফাসাদ ব্যক্তি পর্যায়ে বলে এর শাস্তিও পাত্রভেদে হতো। কিন্তু ফিতনা-ফাসাদে বাধা না দেওয়ার কারণে যারা দুষ্কৃতকারী নয়, তাদেরকেও ফিতনা-ফাসাদের অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সকলের উপর ঢালাওভাবে সমান আযাব নাযিল হয়েছে।) আর (তা একটি প্রমাণিত সত্য যে,) আপনার পালনকর্তা এমন নন যে, জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, অথচ সেখানকার লোকেরা (নিজেদের ও অন্যদেরকে) সংশোধনরত। (বরং তারা যখন সংশোধনের পরিবর্তে ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হয় এবং কেউ কাউকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে না, তখনই তারা ব্যাপক শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়।) আর আপনার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই দলভুক্ত করে দিতে পারতেন। (অর্থাৎ সবাই ঈমানদার হতো। কিন্তু কতিপয় বিশেষ রহস্যের কারণে তিনি এরূপ ইচ্ছা করেন নি। অতএব, তারা দীনের বিরোধিতায় বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে গেছে) এবং ভবিষ্যতেও তারা চিরদিন বিরোধিতা করতে থাকবে। তবে আপনার প্রতিপালক যাদের উপর রহমত করেছেন, (তারা কখনো দীনের বরখেলাফ পথ অবলম্বন করবে না। আর তাদের বিরোধিতার কারণে আপনি দুঃখিত, চিন্তিত বা বিস্মিত হবেন না। কেননা) এহেন (বিরোধিতা করার) জন্যই (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর (বিরোধিতা করার জন্য সৃষ্টি করার হেতু হচ্ছে) আপনার আল্লাহর (এ) কথা পূর্ণ হবে যে, আমি অবশ্যই জাহান্নামকে জিন ও ইনসান দ্বারা একযোগে বোঝাই করব। (কারণ অনুগতদের প্রতি যেমন রহমত প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়, অবাধ্যদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাও তদ্রূপ বাঞ্ছনীয়। পাত্রভেদে রহমত ও অসন্তোষ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় কেন ? তার নিগূঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি জাহির করার জন্য কিছু লোকের দোযখে যাওয়া আবশ্যক। জাহান্নামে গমনের জন্য কিছু লোকের কাফির থাকা প্রয়োজন। আর কাফির থাকার জন্য দীনের বিরোধিতা অপরিহার্য। সবাই মু'মিন না হওয়ার এটাই রহস্য ও তাৎপর্য।) আর পয়গাম্বরগণের কাহিনী হতে আমি (পূর্বোক্ত) সবকিছু বৃত্তান্তই আপনাকে বলছি, যা দ্বারা আপনার অন্তরকে মজবুত করছি। (এটা হলো কাহিনী বর্ণনার একটি ফায়দা অর্থাৎ আপনাকে সান্ত্বনা দান করাই অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এ কাহিনীগুলিতে আপনার নিকট (অকাট্য) মহাসত্য এসেছে, (এবং) ঈমানদারদের জন্য (পাপকার্য হতে বিরত হওয়ার) উপদেশ ও (সৎকার্য) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বিষয়বস্তু রয়েছে। [এটা হলো কাহিনী বর্ণনা করার দ্বিতীয় ফায়দা। প্রথমটি নবী (সা)-এর জন্য আর দ্বিতীয়টি তাঁর উম্মতের জন্য।] আর (এতসব অকাট্য দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও) যারা ঈমান আনে না, তাদের বলে দিন (যে, আমি তোমাদের সাথে তর্ক করতে চাই না;) তোমরা (নিজ অবস্থায়) কাজ করে

যাও, আমরাও (নিজেদের পথে) কাজ করে যাচ্ছি। অতঃপর (নিজ নিজ কার্যকলাপের প্রতিফলের জন্য) তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও প্রতীক্ষায় রইলাম (অচিরেই হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে যাবে)। আর আসমান ও যমীনের (যাবতীয়) গোপন তথ্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই রয়েছে। (পক্ষান্তরে বান্দাদের কার্যকলাপ তো প্রকাশ্য ব্যাপার। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করেই তা অবহিত রয়েছেন।) আর সকল কাজের শেষ গতি তাঁরই কাছে; (তিনি সবকিছু জানেন, সব কিছু করতে পারেন। কাজেই সর্বকাজের পুরস্কার বা শাস্তি তিনি অনায়াসে দিতে পারেন।) অতএব, [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি তাঁরই বন্দেগী করুন, (তবলীগ করাও ইবাদত-বন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত)। এবং (তবলীগের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ, ভয়-ভীতির সম্মুখীন হন তাহলে) তাঁরই উপর ভরসা রাখুন; [মাঝখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে দু'টি কথা বলার পর পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন।] আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা বে-খবর নন (যেমন পূর্ববর্তী বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রাসূলে পাক (সা)-এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত ঃ সূরা হুদে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর নবীয়ে-করীম (সা) ও উম্মতে মুহাম্মদীকে কতিপয় হিদায়েত দেওয়া হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ আয়াত হতে যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

কোরআন পাকের অপূর্ব বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন ঃ فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ "আপনি সোজাপথে দৃঢ় থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে থাকবে।" (১১২ নং আয়াত) ১১৪ নং আয়াতে وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ 'আপনি নামায কায়েম রাখুন।' ১১৫তম আয়াতে وَاصْبِرْ "আপনি ধৈর্য ধারণ করুন" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন ১১২তম আয়াতে وَلَا تَطْغَوْا "আর তোমরা সীমালংঘন করবে না", ১১৩ নং আয়াতে وَلَا تَرْكَنُوْٓا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا "এবং তোমরা পাপীদের প্রতি ঝুঁকবে না" বলা হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কোরআন মজীদে সাধারণত একই বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে উম্মতের প্রতি সম্বোধন করে। এর মাধ্যমে রাসূলে করীম (সা)-এর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কার্য আছে, রাসূলে পাক (সা) নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে এমন স্বভাবপ্রকৃতি দান করেছেন যে, কোন নিন্দনীয় প্রবৃত্তি বা পাপকার্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে

যেসব জিনিস জায়েয ও হালাল ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল, রাসূলে পাক (সা) জীবনে কখনো সেগুলোর কাছেও যাননি। যেমন মদ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি।

১১৪তম আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-কে লক্ষ্য করে তাঁকে ও তাঁর সমস্ত উম্মতকে সালাত কায়েম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উলামায়ে-তফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরয নামায, (বাহরে মুহীত ও তফসীরে কুরতুবী) এবং ইকামতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা। কোন কোন আলিমের মতে নামায কায়েম করার অর্থ সমুদয় সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায পড়া। أَقِمِ الصَّلَوٰةَ -এর তফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলত এটা কোন মতানৈক্য নয়। বস্তুত আলোচ্য সবগুলোই ইকামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ।

নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের পর ইজমালীভাবে নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবে।" দিনের দু'প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথম ভাগের নামায সম্পর্কেই সবাই একমত যে, এটা ফজরের নামায। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে কেউ বলেন—তা মাগরিবের নামায। কেননা দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামায পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। কেননা তাই দিনের সর্বশেষ নামায। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়। বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামায পড়া হয়। زُلَفًا শব্দ বহুবচন, তার একবচন زُلْفَةٌ যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কাতাদা, যাহ্হাক প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, এটা মাগরিব ও ইশার নামায। হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে ইরশাদ হয়েছে যে, زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ মাগরিব ও ইশার নামায। তফসীরে ইবনে কাসীর অনুসারে طَرَفَيِ النَّهَارِ অর্থ ফজর ও আসরের নামায এবং যে, وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও ইশার নামায। অতএব এ আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল যুহরের নামায। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ "নামায কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।"

আলোচ্য আয়াতে নামায কায়েম করার নির্দেশদানের সাথে সাথে আর উপকারিতাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ "পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।" শ্রদ্ধেয় তফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সদকাহ, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেনদেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য বোঝানো হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ্ শামিল রয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদের অন্য একটি আয়াত এবং রাসূলে করীম (সা)-এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য বলতে

সগীরা গোনাহ্ মোলাম হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ বিশেষ করে নামায সগীরা গোনাহ্সমূহ মিটিয়ে দেয়। কোরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি বড় (কবীরা) গোনাহ্সমূহ হতে বিরত থাক— যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গোনাহ্ মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামায এবং এক জুম'আ হতে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান হতে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গোনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ কবীরা গোনাহ্ তো তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি পুণ্য কার্য করার ফলে আপনা-আপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে 'বাহরে মুহীত' নামক তফসীরে উসুল শাস্ত্রের মুহাক্কিক আলিমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গোনাহ্ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গোনাহ্ না করার সংকল্প থাকতে হবে এবং একই গোনাহে বারবার লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায় সগীরা গোনাহ্ মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রিওয়ায়েতে গোনাহ্ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বারবার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া ও ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শর্ত রয়েছে। وَاللهُ أَعْلَمُ

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রিওয়ায়েতসমূহে নিম্নবর্ণিত কার্যগুলিকে কবীরা গোনাহ বলা হয়েছে ঃ (১) আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। (২) শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ফরয নামায ছেড়ে দেওয়া। (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (৪) ব্যভিচার করা। (৫) চুরি করা। (৬) মদ্য পান করা। (৭) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। (৮) মিথ্যা কসম করা। (৯) মিথ্যা সাক্ষী দান করা। (১০) যাদু করা। (১১) সুদ খাওয়া। (১২) অবৈধভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (১৩) জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। (১৪) সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। (১৫) অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। (১৬) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (১৭) আমানতের মাল খেয়ানত করা। (১৮) অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া। (১৯) কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গোনাহ্সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে উলামায়ে কিরাম সহস্র কিতাব প্রণয়ন করেছেন। আমার লেখা 'গোনাহে বে-লজ্জত' বা বেহুদা গোনাহ্ কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তাই রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন যে, "তোমাদের থেকে কোন মন্দ কাজ হলে পরে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসিখুশি ব্যবহার কর। —(মুসনাদে আহমদ ও তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবুল ইয়াসার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে আরয করলাম যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন, যদি তোমার থেকে কোন গোনাহের কাজ হয়ে যায়, তবে পরক্ষণেই কোন নেক কাজ কর, তাহলে গোনাহ্ মিটে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গোনাহ্ হতে তওবা করার সুন্নাত তরীকা ও প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে। যেমন—মুসনাদে আহমদে হযরত আবু বকর সিদ্দীকে আকবর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, "যদি কোন মুসলমান কোন পাপকার্য করে বসে তবে ওযু করে তার দু'রাকাত নামায পড়া উচিত। তাহলে উক্ত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।" এরূপ নামাযকে তওবার নামায বলে (উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ তফসীরে ইবনে ইবনে-কাসীর হতে গৃহীত)।

ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ 'ইহা' শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে—এই কোরআন পাক অথবা তাতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হিদায়েত ও নসীহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদি হঠকারী লোক যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোন কথা চিন্তা-বিবেচনা করতে সম্মত নয়, তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে।

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ "আপনি সবর অবলম্বন করুন, ধৈর্য ধারণ করুন, অবিচল থাকুন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।"

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাঁধা, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেও সবর বলে। সৎকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে অবিচল রাখা এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রাসূলে আকরাম (সা)-কে 'সবর' অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশদানের এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইস্তিকামত ও নামায কায়েম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেওয়া হয়েছে, আপনি তার উপর দৃঢ়তাবে কায়েম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যাবলম্বন করুন। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" এখানে স্পষ্টত 'মুহসিনীন' বা সৎকর্মশীল শব্দ ঐসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে ইস্তিকামতের উপর কায়েম, শরীয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণ বজায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালিমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাযকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

মোটকথা, মুহসিনীনদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সৎকার্য করতে হবে, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার

আনুগত্য ও ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ অথবা অন্ত এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও মহান গুণাবলী সম্পর্কে যখন কোন ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় হাসিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যে তিনটি বিশেষ বাক্য প্রচলিত ছিল, যা তাঁরা প্রায়শই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি স্মরণ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখিরাতের কাজে মগ্ন হয়, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর পার্থিব কাজগুলি অনায়াসলব্ধ এবং সু-সম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে—যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তার বাহ্যিক অবস্থা ভাল করে দেবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ঠিক করে দেবেন। সেই তিনটি বাক্যের মূল হলো ঃ وَكَانَ اَهْلُ الْخَيْرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ، بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ، مَنْ عَمِلَ لِاٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ اَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ اَصْلَحَ سَرِيْرَتَهٗ اَصْلَحَ اللّٰهُ عَلَانِيَتَهٗ وَمَنْ اَصْلَحَ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ اَصْلَحَ اللّٰهُ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّاسِ —(রূহুল বয়ান, ২য় জিলদ ১৩১ পৃঃ)

১১৬ ও ১১৭তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে মানুষকে তা হতে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। ইরশাদ করেছেন ঃ "আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না? যারা জাতিকে ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত, তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হতো না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবী (আ)-গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারা আযাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল।"

অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে اُولُوْا بَقِيَّةٍ বলা হয়েছে। بَقِيَّةٌ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও তা ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক-বিবেচনা ও দূরদর্শিতাকে بَقِيَّة বলা হয়। কেননা তা সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

১১৭তম আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "আপনার পালনকর্তা জনপদগুলিকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেন নি এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল ও আত্মসংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোন আশংকা নেই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য অপরাধী।

কোন কোন তফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظلم জুলুম অর্থ শিরকী এবং مُصْلِحُوْنَ অর্থে ঐ সব লোক যারা কাফির-মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেনদেন, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা ভাল। যারা মিথ্যা কথা বলে না, ধোকাবাজি করে না, কারো কোন ক্ষতি করে না। সেমতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফির বা মুশরিক হওয়ায় দুনিয়ায় কোন জাতির উপর আল্লাহর

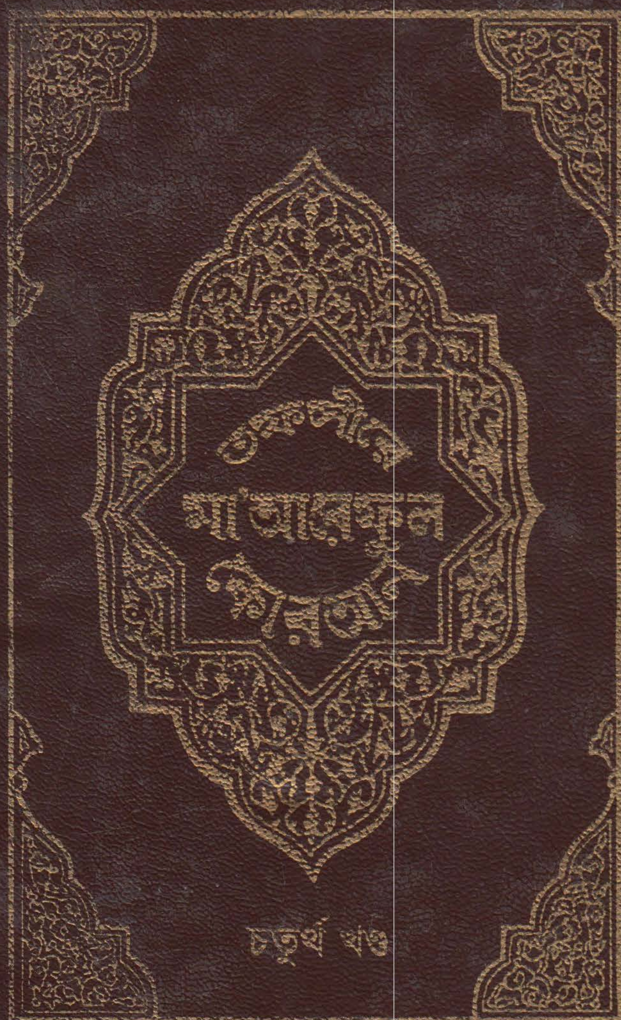
আযাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের কার্যকলাপ ও চাল-চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করে। পূর্ববর্তী যতগুলি জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ (আ)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শুয়াইব (আ)-এর দেশবাসী ওজনে-পরিমাপে হেরফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আ)-এর কওম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-এর কওমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করেছিল। তাদের এ সব কার্যকলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফরী বা শিরকীর কারণে আযাব আপতিত হয় না। কেননা তার শাস্তি তো দোযখের আগুনে চিরকাল ভোগ করবে। এজন্যই কোন কোন আলিমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফরী ও শিরকীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বজায় থাকতে পারে না।

মতবিরোধ ঃ নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় দিক ঃ ১১৮তম আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তবে সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত, কোন মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়াতে কাউকে কোন কাজের জন্য বাধ্য করবেন না, বরং তিনি মানুষকে অনেকটা ইখতিয়ার দান করেছেন, যার ফলে মানুষ ভালমন্দ পাপ-পুণ্য উভয়টাই করতে পারে। মানুষের মন-মানসিকতা বিভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফলে সর্বযুগেই কিছু লোক সত্য-ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাঁদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা খাস রহমত করেছেন অর্থাৎ যাঁরা সত্যিকারভাবে নবীগণের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছেন তাঁরা কখনো সত্য-বিচ্যুত হননি।

আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে—নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে উলামায়ে-দীন ও মুজতাহিদ আলিমগণের মধ্যে যে মতভেদ সাহাবায়ে কিরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা আদৌ নিন্দনীয় এবং আল্লাহ্র রহমতের পরিপন্থী নয়। বরং তা একান্ত অবশ্যম্ভাবী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ্র রহমতস্বরূপ। অত্র আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলের পরিপন্থী।

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

ইফা-২০০৯-২০১০-প্র/১৪৮৪(উ)-৫,০০০





ইসলামিক ফাউন্ডেশন